

বঙ্গোপসাগর সমুদ্রবিজ্ঞান

web

শহীদুল্লাহ মৃধা



web.

বঙ্গোপসাগর : সমুদ্রবিজ্ঞান

[প্রথম খণ্ড]

ডঃ শহীদুল্লাহ মৃধা

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

বাংলাদেশ পারমাণবিক শক্তি কমিশন

ঢাকা



বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪০২
জুন ১৯৯৫
বা.এ. ৩২৬৬

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি
ভৌতবিজ্ঞান ও প্রকৌশল উপবিভাগ

ভৌ ও প্র ১৫৩

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক

পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রক

মুছা আর্ট প্রেস

৪১, হেমেন্দ্র দাস রোড

সুত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ

মামুন কায়সার

মূল্য

একশত টাকা

HANSDOC Library

Accession No. 16388

Date 20/07/2015

BANGOPASAGAR : SAMUDRA BIJNAN (BAY OF BENGAL : OCEANOGRAPHY)
by Dr. Shahidullah Mridha, Principal Scientific Officer, Bangladesh
Atomic Energy Commission, Dhaka. Published by Gholam Moyenuddin,
Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First
Edition, June 1995. Price : Taka : 160/-

ISBN 984-07-3275-7

উৎসর্গ

বন্দোপসাগরের সৃষ্টিলাগ্ন থেকে এই সাগরের বুকে
যত বঙ্গ-সন্তান হারিয়ে গেছে
তাদের স্মরণে এই তিকুজী-ভরণ

ভূমিকা

সে আজ থেকে পঁচিশ বৎসর আগের কথা। ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ-সংসদের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে নাজমুল হাসান পাখী ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা চট্টিশ জন ছাত্র চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজার ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়েছিলাম। খুব ভোরে সমুদ্র তীরে পৌঁছলাম। বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে এই আমার প্রথম ও এ পর্যন্ত শেষ সাক্ষাৎ। সমুদ্র সৈকতে বালি ও খনিজ আহরণ কেন্দ্র নামে আমার কর্ম প্রতিষ্ঠানের একটি গবেষণা কেন্দ্র ও বিশ্রামাগারে থাকার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও গত এক যুগে বহুবার পরিকল্পনা করে বিভিন্ন কারণে বঙ্গোপসাগর ভ্রমণের স্বপ্নটি অপূর্ণই রয়ে গেছে। গত দুই যুগ ধরে পৃথিবীর বহু সাগর পাড়ি দিয়েছি, ভ্রমণ করেছি, মুগ্ধ হয়েছি নয়নাভিরাম সৌন্দর্য দেখে; তথাপি বঙ্গোপসাগরের কথাই বার বার মনে পড়েছে। কৃষ্ণ সাগরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। এই সাগরের দক্ষিণ-উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে এবং সাগর-চিহ্নে নৌ-ভ্রমণের সুযোগ আমি পেয়েছিলাম সত্তর দশকে। কৃষ্ণ সাগরের পূর্ব পাড়ে ককেশাস পর্বতে অবস্থিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে চার মাস আমি অবস্থান করেছিলাম। প্রতিদিন সমুদ্র-স্নান করতে যেতাম। সমুদ্র আমার মনে এক চিরস্থায়ী ছাপ রেখে দিয়েছে।

জীবনে যেদিন প্রথম সমুদ্র দেখলাম, সেদিনই অভিজ্ঞত ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। সমুদ্রের সুনীল জলরাশি, দূর দিগন্তে বিলীয়মান দিক চক্রবাল রেখার চিহ্ন, সাথে স্বেত, নীল বা রক্তিম আকাশের মিলন দৃশ্য দেখে আমার মন ভাবুক হয়ে উঠে। যেখান থেকে দাঁড়িয়ে বঙ্গোপসাগরকে দেখলাম সেখানে কোন প্রকাণ্ড ঢেউ এসে আমার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যায় নি। কিন্তু সফেন সমুদ্রের সেই ঢেউ, সেই আছড়ে পড়া প্রতিবাদ ধ্বনি শুনে সেদিন আমার মনে হয়েছিল, আমি যেন ধরিত্রীর হৃদস্পন্দন শুনিছি। আমার মনে হয়েছিল আরো কিছু কথা। কয়েকশ' কোটি বৎসর পূর্বে এই সাগরের বুকেই পৃথিবীতে প্রথম জীবনের উদ্বেগ ঘটে। এক কোটি আদিম প্রাণ আজ লক্ষকোটি কোষবিশিষ্ট চিন্তাশীল বুদ্ধিমান জীবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। মাঝে সাড়ে তিনশত কোটি বৎসরে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে কত নাটক অভিনীত হয়ে গেছে। আজ থেকে দশ লক্ষ বৎসর পরে বাংলাদেশে হয়ত কোন মানব সন্তান আর বেঁচে রইবে না। দূর নিহারীকা লোকে বিচরণ করতে করতে হঠাৎ জন্মভূমির কথা মনে পড়ে গেলে আমাদের আত্মাগুলি যখন এখানে আসবে, তখন তারা দেখবে আলো-ছায়ার খেলায় বঙ্গোপসাগর হাহাকাঙ্ক করে যাচ্ছে। সেই বেলাভূমি আর নেই। উপকূল ভাগের দৃশ্যপট বদলে গেছে। সাগর কাঁদছে তার সন্তানদের বিরহে। কি দুঃখই না পাবে আমাদের বিদেহী মনগুলি।

১৯৮৮ সালে শতাব্দীর বৃহত্তম প্রলয়ঙ্করী মহাপ্লাবনের সময় ঢাকায় বাসাবোতে গৃহবন্দী থাকার সময় আমার মনে বঙ্গোপসাগর সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি জানার জন্য ঔৎসুক্য জেগে উঠে। ওয়াপদাতে কর্মরত প্রকৌশলী বন্ধু শাহনেওয়াজের সঙ্গে আলাপ করি। বন্যার ঠিক পরেই অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী তরুণ বন্ধু ফারুকের কাছে কিছু প্রশ্ন পাই আমাদের জলবায়ু, মাটি, পানি ও সাগর সম্পর্কিত। বিদেশীরা তাঁর কাছে এ-সবের উত্তর জানতে চায়। ঢাকাতে আমি অনুসন্ধান চালানো শুরু করলাম। যা পেলাম তা খুবই সামান্য। ব্যাংককের মাধ্যমে মাত্র একটা প্রবন্ধ লগুন থেকে যোগাড় করা গেল। ভারতীয় সমুদ্রবিদ্যা ইন্সটিটিউট কিছু তথ্যের সংবাদ জানালো। ইতঃ মধ্যে ১৯৯১ সনের এপ্রিলের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের কিছু পরেই ইউরোপীয় কমিশনের পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশীপে আমি জার্মানী গমন করি। ইউরোপে আমাদের দুর্দশার প্রতি ওরা আন্তরিকভাবে সমবেদনা জানায়। ওখান থেকেই বিশ্বের প্রখ্যাত সমুদ্র-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাঁরা যথাসাধ্য তথ্যাদি দিয়ে আমায় সাহায্য করেছেন, তাঁদের নাম আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করছি। বঙ্গোপসাগরে মূলত কাজ করেছিলেন আমেরিকান ও রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা। সাথে ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও ছিলেন।

আন্তর্জাতিক সমুদ্র কমিশন ইউনেস্কো কর্তৃক পরিচালিত ভারত মহাসাগর অভিযান প্রকল্পের আওতায় বঙ্গোপসাগরে বিদেশীরা গবেষণা চালায়।

ভারত সরকার বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধান কাজ চালান আন্দামান নিকোবর ও পশ্চিম উপকূল ভাগে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর চট্টগ্রাম বন্দরকে কর্মোপযোগী করার পথে সাগর মুখে ডুবন্ত জাহাজগুলি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এইগুলি সরানোর কাজে রুশ নৌবাহিনী সাহায্য করেছিল। তারা দীর্ঘ দুই বৎসর (১৯৭২-৭৪) এই সাগরে কাটায়। এ সময়ে তারা বহু গবেষণা কাজ চালায় এবং সমুদ্রের বিভিন্ন ম্যাপ অঙ্কন করে। যাবার সময় তারা এগুলো বাংলাদেশকে দিয়ে যায়নি। মস্কোর রুশ একাডেমির অধ্যাপক নাভালিয়া তুরকো এক চিঠিতে আমাকে এগুলি পাঠানো হচ্ছে ব্যক্ত করেছিলেন কিন্তু তারপরই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায় এবং চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে এগুলি আর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। আন্তর্জাতিক সমুদ্র কমিশনের ভারত মহাসাগর অভিযানের ফলাফল দিয়ে ১০ বৎসরে দু'টি বিরাট এটলাস প্রণয়ন করে মার্কিনীরা ও রাশিয়ানরা। প্রায় ৭ কেজি করে ওজনের এই বিশাল ম্যাপগুলির দাম ৪০০ ডলারের উপর। বাংলাদেশের কোনো প্রতিষ্ঠানে এগুলি না পেয়ে আমাকে তা কিনে নিতে হয়েছে। এভাবে দীর্ঘদিন ধরে উপকরণাদি সংগ্রহ করে পড়াশুনা করে ১৯৯৩ সালে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ “বঙ্গোপসাগর” জমা দেই ইসলামী বিশ্বকোষের জন্য। বাংলা একাডেমীর তৎকালীন মহাপরিচালক অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদের উৎসাহে এটি পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য জমা দেই একাডেমীতে। তারপর দু'জন বিশেষজ্ঞের পরামর্শে পাণ্ডুলিপি সংশোধন, পরিমার্জন করি; যার ফলে বইটির আয়তন দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে পড়ে। সাত বৎসর ধরে পড়াশুনা করে ‘বঙ্গোপসাগর’ পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে সময় লাগে (দৈনিক ৮-১০ ঘণ্টা

করে) মোট ৮০ দিন। অন্য কোনো বই লিখতে আমার এত সময় ব্যয় হয়নি। বইটি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। তবে প্রতিটির সমানায়তন রাখা সম্ভবপর হয়নি।

বইটির প্রথম খণ্ডে রয়েছে : ভৌত সমুদ্র বিজ্ঞানের বিষয়াদি, যথা-সমুদ্র ও সমুদ্রবিজ্ঞান পরিচয়, বঙ্গোপসাগরের ভৌত সমুদ্রবিজ্ঞান (ভূগোল), সমুদ্র-আবহ বিদ্যা, বঙ্গোপসাগর, রসায়ন সমুদ্র বিজ্ঞান ও ভূ-তাত্ত্বিক সমুদ্র বিজ্ঞান।

দ্বিতীয় খণ্ডে আছে : জীব-সমুদ্র বিজ্ঞান ও সমুদ্র সম্পদ। এতে সমুদ্রোপকূল, সমুদ্র-প্রযুক্তি, সমুদ্রের আইন ও অধিকার প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচিত হয়েছে। চট্টগ্রাম ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরিন বাইওলজির ছাত্র-ছাত্রীদের বেশ উপকারে লাগবে এই খণ্ডটি।

তৃতীয় খণ্ড বঙ্গোপসাগর : মানুষ ও সমুদ্র গ্রন্থে বঙ্গোপসাগরে সামাজিক বিজ্ঞান সম্পর্কের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে অনেক বিষয় আলোচিত হয়েছে।

ভারতের ঐতিহাসিক অশীন দাশগুপ্ত বর্তমানে ভারত মহাসাগরের 'সমুদ্র ইতিহাস' লিখছেন। বাংলাদেশে অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার সমুদ্র বাণিজ্যের উপর গবেষণা করেছেন। তাঁর অনেক তথ্য আমি নিয়েছি।

দেশী-বিদেশী সবধরনের উৎস থেকে (পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক, গবেষণাপত্র গ্রন্থাগার ইত্যাদি) আমি দু'হাতে তথ্য সংগ্রহ করেছি। যে তথ্য যেভাবে সংগ্রহ করছি, সেভাবেই উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে বিভিন্ন পরিমাপের এককের সংশ্লিষ্ট ঘটেছে। এ ক্রটি পরবর্তীকালে সংশোধন করার সুযোগ পাওয়া গেলে সংশোধন করা হবে। বঙ্গোপসাগরে গিয়ে আমরা কেউ সমুদ্র গবেষণা করিনি। তাই এটি কোন মৌলিক পুস্তক নয়। মস্কোতে পি. এইচ. ডি করেছিলেন রাশিয়ানদের সংগৃহীত বঙ্গোপসাগরের তথ্যাদি নিয়ে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুভাষ চন্দ্র দাস। তাঁর কাছ থেকেও আমি অনেক তথ্য নিয়েছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাঁদের এই সহযোগিতার জন্য। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি যেসব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির-যাঁরা আগাগোড়া আমাকে এই বই লেখার ব্যাপারে প্রকাশ্যে সক্রিয় সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। এঁদের বাইরেও এমন সব ব্যক্তি রয়েছেন, স্থানাভাবে যাদের নাম সংযুক্ত করা গেলনা। বহু পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক থেকে চিত্র ধার নিয়েছি। তাঁদের ঋণ-স্বীকার করছি। যা কিছুই করেছি, সবই ঐ প্রেরণা থেকে যে, আমাদের শিক্ষার্থীরা আমাদের প্রাকৃতিক দান বঙ্গোপসাগর সম্পর্কে জানবে এবং স্বদেশের কৃতার্থে তাদের জ্ঞান প্রয়োগ করবে। দুই বাংলায় বঙ্গোপসাগরের উপর বাংলা ভাষায় সম্ভবতঃ এটিই প্রথম বই। তদুপরি আমি নিজে সমুদ্র-বিশেষজ্ঞ নই। তাই পুস্তক রচনায় ক্রটি থাকা স্বাভাবিক। এগুলির দিকে কেউ দৃষ্টি দিয়ে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

web

সৃষ্টিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় : সমুদ্র ও সমুদ্র বিজ্ঞান পরিচয়	১-৩২
সমুদ্র পরিচয়	
সমুদ্রবিজ্ঞান পরিচয়	
সমুদ্র জালের উৎপত্তি	
সমুদ্র বিজয়	
সমুদ্র গ্রাস, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি: গ্রীনহাউজ এফেক্ট	
সমুদ্রের রহস্য	
সমুদ্র গবেষণা	
সমুদ্র বিজ্ঞানের পরিচয়	
দ্বিতীয় অধ্যায় : বঙ্গোপসাগরের ভৌত সমুদ্রবিজ্ঞান	৩৩-৯৬
বঙ্গোপসাগরে সমুদ্র গবেষণার ইতিহাস	
বঙ্গোপসাগরের পানির তাপমাত্রা ও ঘনত্ব	
বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ততা	
বঙ্গোপসাগরে জোয়ার-ভাটা	
বঙ্গোপসাগরের পানির রং এবং স্বচ্ছতা	
বঙ্গোপসাগরের পানি সঞ্চালন	
বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র স্রোত	
তৃতীয় অধ্যায় : সমুদ্র আবহ বিদ্যা : বঙ্গোপসাগর	৯৮-১২৬
পৃথিবীর বায়ু প্রবাহ	
সাময়িক বায়ু	
অনিয়মিত বায়ু	
বাংলাদেশে কাল বৈশাখী	
বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগে বঙ্গোপসাগরের ভূমিকা	

চতুর্থ অধ্যায় : বঙ্গোপসাগরের রাসায়নিক সমুদ্রবিজ্ঞান	১২৭-১৮১
সমুদ্রের পানির রসায়ন	
দ্রবীভূত অক্সিজেন	
বঙ্গোপসাগরে ফসফরাস বিতরণ	
বঙ্গোপসাগরের পুষ্টিকর পদার্থসমূহ	
বঙ্গোপসাগরের উপকূল ও অদূরবর্তী এলাকায় নগণ্য পরিমাণে ধাতুর শনাক্তকরণ	
বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের নদীগুলোর দান	

পঞ্চম অধ্যায় : বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক ভূ-বিজ্ঞান	১৮২-২৪৭
সমুদ্রের উৎপত্তি রহস্য	
বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের বয়স	
বঙ্গোপসাগরের ভূ-ত্বক ও ভূ-তাত্ত্বিক ক্রমবিকাশ	
ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস	
বঙ্গোপসাগরের তলদেশ গঠন	
বঙ্গোপসাগরের তলদেশে জলবিদ্যাগত বিশেষত্ব	
বঙ্গোপসাগরের উপকূলভাগের আকৃতিতত্ত্ব ও তলদেশের ভূ-সংস্থান তত্ত্ব	
কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকতের ভূতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশ	
বঙ্গোপসাগরের তলদেশের পলল	

পরিশিষ্ট-১	২৪৮-২৫৯
পরিশিষ্ট-২	২৬০-২৬১

প্রথম অধ্যায়

সমুদ্র ও সমুদ্রবিজ্ঞান পরিচয়

সমুদ্র পরিচয়

সারা পৃথিবীর তিনভাগ স্থান জুড়ে কেবল পানি আর পানি। অবশিষ্ট একভাগ মাত্র স্থল ভূমি। বলা বাহুল্য, দক্ষিণ গোলার্ধে সাগরের আধিপত্য তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। উত্তর গোলার্ধে পানি এবং স্থলভাগের অনুপাত ৬১:৩৯, এবং দক্ষিণ গোলার্ধে এই অনুপাত ৮১:১৯। সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ৫১ কোটি ৫৪ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বা ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গমাইল। এর মধ্যে জলভাগের পরিমাণ ৩৬ কোটি বর্গ কিলোমিটার বা ১৩৭ কোটি ৩ লক্ষ ২৩ হাজার ঘন কিলোমিটার। নিখুঁত হিসাবে পৃথিবী পৃষ্ঠের ৭১.৪% জলভাগ এবং ২৮.৬% স্থলভাগ। ভূপৃষ্ঠ যদি সর্বত্র সমতল হতো, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত জলরাশি দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠ দুই মাইল পানির নিচে তলিয়ে থাকতো। এই বিপুল জলরাশি মহাসাগর, সাগর, নদ-নদী, খাল, বিল, প্রণালী, পুকুর দীঘি, হাওড় ইত্যাদিতে জমা থাকে। পৃথিবী পৃষ্ঠের ঐ সুবৃহৎ জলভাগকে ৫টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বিভাগগুলো মহাসাগর নামে খ্যাত। মহাসাগরগুলির নাম : ১। প্রশান্ত মহাসাগর ২। আটলান্টিক মহাসাগর ৩। ভারত মহাসাগর ৪। সুমেরু মহাসাগর বা উত্তর মহাসাগর এবং ৫। কুমেরু বা দক্ষিণ মহাসাগর। কিন্তু ১৮৯৭ সালের পর থেকে নতুন সংজ্ঞানুসারে মহাসাগরের সংখ্যা কমে এখন তিন—এ দাঁড়িয়েছে। উত্তর মহাসাগর এখন আটলান্টিকের সংলগ্ন সাগর হিসেবে গণ্য হচ্ছে এবং দক্ষিণ মহাসাগরকে তিন ভাগ করে এর এক একটি অংশ এক এক মহাসাগরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সাগর কিংবা মহাসাগরের সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। সাগর কাকে বলা হবে অথবা মহাসাগর বা উপসাগর কিরূপ হবে তাও নির্দিষ্ট নয়। ফলে হৃদের নায় ছোট হয়েও ডেডসী যেমন সাগর হিসেবে পরিচিত, পক্ষান্তরে এর চেয়ে ষাটগুণ বড় মিসিসিগান হ্রদ সাগর হিসেবে পরিগণিত নয়। আশিগুণ বড় সুপিরিয়র হ্রদ হিসেবেই পরিচিত। একইভাবে বঙ্গোপসাগর অনেক সাগরের চেয়ে বড় হওয়া সত্ত্বেও উপসাগর নামেই পরিচিত। একটি বিশাল মহাসাগরের বিস্তৃতির কেন্দ্রে একটি সাগরের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা সত্যিই কঠিন কাজ। উত্তর আটলান্টিকের মাঝখানে সারাগাশো সী ঠিক এরকম একটি অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করছে। পৃথিবীর জলভাগকে পাঁচ বা তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করলেও প্রকৃত জলভাগ তথা মহাসাগর একটিই। যদি পৃথিবীর সমস্ত

জলভাগ একই জায়গায় অবস্থান করতো (ছত্রিশ কোটি বছর আগের মতো) তাহলে জলের ব্যবধান বেশি হতো না। পৃথিবীর পৃষ্ঠে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করার জন্য এক একটি স্থলভাগে জলের যে বিরাট ব্যবধান হয়েছে সেইগুলিকে বলা হয়েছে মহাসাগর। পৃথিবীর স্থলভাগগুলি আবার নির্দিষ্ট কোনো জ্যামিতিক আকার বিশিষ্ট নয়। কোনো কোনো জায়গায় জলভাগ ক্রমশ সরু হয়ে প্রবেশ করেছে স্থলভাগের মধ্যেই। এইগুলিকেই সাধারণতঃ সাগর ও উপসাগর বলা হয়। নিচের ছকটিতে একবার নজর করলেই তিনটি মহাসাগর সম্পর্কে একটি ধারণা করা যাবে।

মহাসাগর বা মহাসমুদ্র	বিস্তার (x১০৩) বর্গ কিঃ মিঃ বঃ মাঃ	আয়তন (x১০৩) ঘন কিঃ মিঃ ঘনমাইল	গড় গভীরতা মিটার ফুট
১. আটলান্টিক; সংশ্লিষ্ট সাগর বাদে সংশ্লিষ্ট সাগরসহ	৮২.৫ ৩১.৮ ১০৬.৫ ৪১.১	৩২৪.৬ ৭৭.৯ ৩৫৪.৭ ৮৫.২	৩৯৩০ ১২৮৯০ ৩৩৩০ ১০৯২২
২. প্রশান্ত সমুদ্র সাগর বাদে সমুদ্র সাগরসহ	১৬৫.৩ ৬৩.৮ ১৭৯.৭ ৬৯.৪	৭০৭.৬ ১৬৯.৯ ৭২৩.৭ ১৭৩.৭	৪২৮০ ১৪০৩৮ ৪০৩০ ১৩২১৮
৩. ভারত নিকটবর্তী সাগর বাদে অন্তর্ভুক্ত সব সাগরসহ	৭৩.৫ ২৮.৪ ৭৪.৯ ২৮.৯	২৯১.০ ৬৯.৯ ২৯১.৯ ৭০.১	৩৯৬০ ১৩০৩৭ ৩৯০০ ১২৭৯২
মোট সাগর+মহাসাগর মহাদেশ	৩৬১.১ ১৩৯.৪ ১৪৮.৯৫	১৩৭০ ৩২৯	৩৭৯০ ১২৪৩০ ৮৪০ ২৭৬০ (গড় উচ্চতা)

সুমেরু মহাসাগর ও কুমেরু মহাসাগর উভয়েই পূর্বোক্ত মহাসাগরগুলি অপেক্ষা আয়তনে ছোট বলা যায়। সুমেরু মহাসাগরের জলভাগ এককোটি পয়তাল্লিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এবং কুমেরু মহাসাগরের বিস্তৃতি এককোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার। মেরু প্রদেশে অবস্থিত বলে এরা বছরের অধিকাংশ সময় বরফাবৃত থাকে। অপর দিকে সুমেরু মহাসাগর কোনো স্থলভাগকে ঘিরে না থাকায় মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত এবং মেরু দেশে স্তূপীকৃত বরফ জমা হয়ে থাকে। দক্ষিণ মেরু স্থলভাগের উপর অবস্থিত হওয়ায় কুমেরু মহাসাগর মেরুর স্থলভাগকে ঘিরে রেখেছে। রস সাগর, ওয়েডেল সাগর প্রভৃতি কুমেরু মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত। অন্য দিকে উত্তর মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্বেত সাগর, কারা সাগর, সাইবেরীয় সাগর ইত্যাদি। মহাসমুদ্রের সবচাইতে গভীরতম জায়গা হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা ট্রেঞ্চ, ৩৫৫৯৭ ফুট বা ১০৮৫০ মিটার গভীর। এর অবস্থান ফিলিপাইনের পূর্বে, গুয়াম দ্বীপের কাছাকাছি। আর স্থলভাগের উচ্চতম বিন্দু হচ্ছে মাউন্ট এভারেস্ট, মাত্র ২৯০২৮ ফুট বা ৮৮৪৮

মিটার চ্যালেঞ্জার নামে একটি জাহাজ যোগে ১৯৪৮ সালে মারিয়ানা ট্রেঞ্চ আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেই সুবাদে মারিয়ানা ট্রেঞ্চের গভীরতম অংশটির নাম চ্যালেঞ্জার ডীপ। কিন্তু পরবর্তীকালে ১৯৬২ সালে ব্রিটিশ জাহাজ 'কুক' প্রশান্ত মহাসাগরের একেবারে পশ্চিমে মিন্দানাও ট্রেঞ্চ-এ ১১৫১৬ মিটার বা ৩৭৭৭২ ফুট গভীর বলে জানা গেছে। কিন্তু, যে কোনো কারণেই হোক, এই আবিষ্কার এখনও ব্যাপক স্বীকৃতি পায়নি। গভীর ও বিস্তারে প্রশান্ত মহাসাগর বড় হলেও উপকূলের মোট দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে সে আটলান্টিকের তুলনায় ছোট। প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের মিলিত উপকূলের দৈর্ঘ্যের চাইতে আটলান্টিকের উপকূল ভাগ বেশি। বলা বাহুল্য অত্যাধিক আঁকা বাঁকা আকৃতির জন্যই আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলের দৈর্ঘ্য এত বড় হয়েছে। এই মহাসমুদ্রে মিলিত হয়েছে অসংখ্য নদী, তাই পৃথিবীর মোট প্রবাহিত জলধারার অর্ধেক এসে পড়েছে আটলান্টিকের বুকে।

সমুদ্র বিজ্ঞান পরিচয়

সমুদ্র বিজ্ঞান হলো সাগর এবং মহাসাগর বিষয়ের চর্চা। এটি প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান হিসাবে নবীন হলেও এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল কিছু বেশ প্রাচীন কালেই। আর সমুদ্রের সঙ্গে মানুষের পরিচয় কিছু দীর্ঘকালের। এক সময়ে বড় বড় নদীর তীরবর্তী অঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন মানব সভ্যতা। মানুষ বুঝতে পেরেছিল যাবতীয় নদী ও জলধারার আসল লক্ষ্য সাগর ও মহাসাগর। তাই সমুদ্রের উপকূলে, বিশেষ করে পৃথিবীর উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল মানব সভ্যতা। কয়েক হাজার বছর আগে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল মানুষের বসবাস। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সভ্যতার প্রসার ঘটেছিল আর নিকটবর্তী দেশগুলির (বার্মা, জাভা, শ্রীলংকা) সঙ্গে শুরু হয়েছিল ব্যাপক বাণিজ্যিক আদান-প্রদান। তারপর দুই হাজার বছর আগে বঙ্গোপসাগরের বুকে নৌকা ভাসিয়ে বাঙ্গালীরা মালদ্বীপ, পশ্চিম ভারত, আরব দেশ, পারস্য, ইরাকের বন্দরে বন্দরে পণ্য বেচা কেনা শুরু করেছিল। সমুদ্র বিজ্ঞান সম্পর্কে বেশ ভাল জ্ঞানই রাখত সেকালের সাহসী মানুষেরা।

মানব জীবনের পরিবেশের একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে সমুদ্র। আর এই সমুদ্রের ব্যবহারিক সমস্যা, ভৌত, জৈব প্রকৃতির বহু জটিল ও গুঢ় সমস্যার ব্যাখ্যাদান করে সমুদ্র বিজ্ঞান বা মহাসাগরিক বিজ্ঞান যা ইংরেজিতে (Marine Science, (Oceanography or Oceanology) হিসাবে পরিচিত। এইচ. এ. মারমের মতে সমুদ্র বিজ্ঞান বলতে প্রথমেই বুঝায় সাগর ও মহাসাগরিক অববাহিকার (basin) প্রকৃতি ও আকৃতি সম্পর্কে আলোচনা, অববাহিকার পানির বৈশিষ্ট্য ও সঞ্চালন পদ্ধতির পর্যালোচনা ইত্যাদি। অন্যান্য বিজ্ঞানের শাখার মত এটিও বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞদের অবদানে সমৃদ্ধ হচ্ছে দিনের পর দিন। সমুদ্র এর্মানিতেই বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে, তাই এর উপর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রও বিশাল বটে। অন্য সমুদ্র বিজ্ঞানী ওটিস ডাব্লিও ক্রিম্যানের মতে “আবহবিদ্যার মতই সমুদ্র বিজ্ঞান ভূগোল

মাটি হতে জন্ম নিয়াছে, ইহা পৃথিবীর সবচাইতে গতিশীল অংশ বারিমন্ডল সম্পর্কিত বিদ্যা নিয়ে আলোচনা করে।” জে প্রাউডম্যানের সংজ্ঞাটি উল্লেখনীয়। তিনি বলেন যে, “সমুদ্র বিজ্ঞান, গতিবিদ্যা ও তাপ-গতিবিদ্যার মৌলিক নীতিগুলি যাহা সমুদ্রের পানির ভৌত ও জৈবিক গুণাবলীর সঙ্গে সর্গশ্রুত তাহাই অনুসন্ধান করে থাকে।”

ভূগোল ও সমুদ্র বিজ্ঞান- ভূ-সম্পর্কিত বিজ্ঞান ভূগোল হচ্ছে এমন একটি সমন্বয়ী বিজ্ঞান যা তার প্রয়োজনীয় উপাত্তের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, মহাসাগরিক বিজ্ঞান, আবহবিদ্যা, জীববিদ্যা এবং প্রভুতত্ত্ব বিদ্যার মত বিশেষ বিজ্ঞানের ফলাফলের উপর নির্ভরশীল। ভূগোলবিদ হচ্ছেন সেই প্রজ্ঞাপতির মত, যে এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে পরাগ বহন করে নিয়ে যায়। এতে জ্ঞানের সমুদায়ন হয় আর এটাই হচ্ছে বিষয় হিসেবে ভূগোলের Summum bonum. সেই প্রাচীনকাল থেকেই ভূগোলে সব নির্দিষ্ট মাত্রার পার্থিব প্রপঞ্চগুলো (স্থলীয় শিলামন্ডল, বায়বীয় আবহাওয়া মন্ডল, জলীয় বারি মন্ডল) এখন ভূ-তত্ত্ব আবহবিদ্যা এবং সমুদ্র বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত হয়ে পড়েছে।

সমুদ্র বিজ্ঞান বারিমন্ডলের অবস্থা ব্যাখ্যা করে, তাই এটি ভৌত ভূগোলের অংশ হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। নিজস্ব উপাত্তের জন্য এটি সমুদ্র জলের ভূ-তত্ত্ব, আবহবিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন এবং জীব বিদ্যার উপর নির্ভরশীল। ভূ-পৃষ্ঠের ৭১% শতাংশই যেখানে বারি মন্ডল, সেখানে ভূগোলের ভিতরে থেকে সমুদ্র বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সমুদ্র বিজ্ঞান যে কোনো ও মৌল বিজ্ঞানের মত কোনোও একটি বিশেষ বিজ্ঞান নয়, বরং বলা যেতে পারে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমন্বয়। পৃথিবীর সাগর ও মহাসাগরগুলির পরিবেশগত যাবতীয় বিষয় নিয়ে এই বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। সমুদ্র বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর জন্য রয়েছে ভৌতবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, মানব বিজ্ঞান, বিশেষ করে মনস্তত্ত্ব, শারীর বিদ্যা এবং যুদ্ধবিদ্যার বিভিন্ন শাখা প্রশাখা। প্রয়োজন অনুসারে মৌলবিজ্ঞানের বিভিন্ন নীতি এবং পদ্ধতিও সমুদ্র বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই বিষয়গুলির সৃষ্টি সমন্বয় সাধন করা গেলে তবেই ভূপৃষ্ঠের এই জলময় তিন চতুর্থাংশ অঞ্চল সম্পর্কে যথাযথ ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে।

সমুদ্র বিজ্ঞান চর্চা খুবই ব্যয় বহুল। এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির অনুশীলন করতে হয় সমুদ্রে-সমুদ্রপৃষ্ঠে-অর্থাৎ সমুদ্রের জলের তলায়। অবশ্য এ ব্যাপারে নানারকম বিশ্লেষণ অথবা তাত্ত্বিক পর্যালোচনা উপকূলবর্তী গবেষণাগারেও করা যায়। কিন্তু পরীক্ষা বা উপাত্ত সংগ্রহের জন্য মানুষকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অজ্ঞাত অজ্ঞেয় সাগরে গিয়েই কাজ করতে হয়। অতীত কালে যারা সমুদ্র যাত্রা সেরে ফিরে আসতেন, তাঁদের কাছ থেকে নানা রকম রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনে মানুষ পরবর্তীকালে সমুদ্র অভিযান সম্পর্কে তৎপর হয়ে উঠত। অভিজ্ঞতা এবং তত্ত্ব, উভয়ই সমুদ্র বিজ্ঞানের বিকাশ সাধনে সাহায্য করেছে।

সমুদ্র জলের উৎপত্তি

সমগ্র পৃথিবীর পাহাড় পর্বত কেটে যদি সমতল করা যেতো তাহলে সাগর-মহাসাগরের জলভাগের প্রচণ্ড প্রাবনে পৃথিবী দেড়মাইল গভীর পানির নিচে ডুবে যেতো। পৃথিবীতে পানির পরিমাণ ত্রিশ কোটি ঘন মাইল। এককালে সমুদ্র খাদ এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের নিচে পাহাড় শ্রেণী স্থল ভাগের পাহাড় পর্বত এবং সমতলের মতোই মূল ভূ-পৃষ্ঠের উপরেই ছিল। পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ থেকে গলিত শিলা ক্রমান্বয়ে বেরিয়ে এসে ফুলে উঠে এবং ছড়িয়ে পড়ে। তারপর লক্ষ কোটি বছরের বিবর্তনে ক্ষয় ও পুনর্গঠন হয়ে বর্তমান আকার পায়। এ সময়ে ভূমিকম্প ও আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে গলিত শিলার সঙ্গে নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্পের মেঘে পৃথিবী আচ্ছাদিত হয়ে যায়। পৃথিবী তখন ক্রমান্বয়ে শীতল হতে থাকে এবং এই প্রক্রিয়ার ফলে বায়ু মন্ডলের সৃষ্টি হয়। এরপর শুরু হয় হাজার হাজার বছর এমনকি লক্ষ বছর ধরে শুধুই অবিরল বৃষ্টিপাত, যে বারিধারায় পৃথিবীর বিশাল বিশাল গহবরগুলি (উল্কাপাত ও ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট) পানিতে পূর্ণ হয়ে সাগর মহাসাগরের সৃষ্টি হয়। সমুদ্র তখন বর্তমানের তুলনায় অনেক নিচে ছিল। পরবর্তীকালে লক্ষ লক্ষ বছরে ভূ-পৃষ্ঠের পানি সমুদ্রে পতিত হয়ে সমুদ্র-পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়িয়ে দিয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী দশকোটি বছরে পৃথিবীতে স্থলভাগ বলতে কিছু থাকবে না।

এখন প্রশ্ন উঠে, প্রাচীন পৃথিবীর জলীয় বাষ্প জমে জল হতে পারে কিন্তু জলীয় বাষ্প আসে কোথেকে? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, জল আসে কতকগুলো জলবাহী বা হাইড্রোক্সিলবাহী মনিক থেকে। পৃথিবীর এই মনিকগুলি যেমন, মাইকা বা অম্ফিবোল (Mica) সার্পেন্টিন (Serpentine) এম্ফিবোল (amphibole) ইত্যাদি কোনো কারণে ২৩০° ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশি তপ্ত হলে এরা অন্য অবস্থাপ্রাপ্ত হয় এবং জল নির্গত হয়। পৃথিবীর বিশাল জড়বস্তুর মধ্যে নিহিত জলের মোট পরিমাণ এতখানি যে মাত্র ৩ মাইল গভীর জলের ক্ষীণ ত্বকের জলাশয় সৃষ্টি করা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। সমগ্র বায়ু মন্ডলও সমুদ্রের মোট জলের কয়েক হাজার গুণ বলে পৃথিবী এই ধরনের মনিকের মধ্যে কঠিন অবস্থায় বিধৃত হয়ে আছে। সুতরাং পৃথিবীর রাসায়নিক গঠনের সামান্য অংশ জল এবং সেই জলেই পৃথিবীর পৃষ্ঠে ৭১ শতাংশ সমুদ্র সৃষ্টি করে ঢেকে রেখেছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠের মোট জলের ৯৮ শতাংশ সমুদ্র বিস্তৃত, বাকী ২ শতাংশ ছড়িয়ে আছে হ্রদ নদী, হিমবাহ, মেঘ ও ভূ-জলে। আমরা জানি যে, সমুদ্রের পানি সূর্যের উত্তাপে বাষ্পীভূত হয়ে পর্বত শিখরে বা মেরু প্রদেশে বরফাকারে ঘনীভূত হয়। সেখানেও রৌদ্রে গলে বা বৃষ্টির ধারা হয়ে নদী-নালার মাধ্যমে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। এই পানি চক্র ক্রম চলছে পৃথিবী পৃষ্ঠে সমুদ্র সৃষ্টি হওয়ার শুরু থেকে। এই পানির কিছুটা মাটির মধ্যে ঢুকে ভূ-গর্ভে জল হয়ে নিচে প্রবাহিত হয়। কখনও কোথাও ভূ-তাপে উষ্ণ হয়ে প্রস্রবণ হয়ে ছুটে বেড়িয়ে আসে। আবার সৌর তাপে সমুদ্র জলের গভীরে শীতল জল প্রবাহও দেখা যায়। ঐ ধরনের সমুদ্রতলস্থ শীতল পানি সমুদ্র হতে বাষ্প হয়ে উঠে এবং তুষার হয়ে জমে, আবার গলে সমুদ্রের গভীরে মিলিত হতে মোট সময় লাগে

৪০,০০০ বছর। অর্থাৎ যে জলকণা আজ বঙ্গোপসাগরের অতল গভীরে আছে তা বাষ্পীভূত হয়ে মেঘ ও স্থল বিচরণ করে আবার সমুদ্র গভীরে পৌঁছতে চল্লিশ হাজার বছর লাগবে।

সমুদ্র বিজ্ঞান

আদিম মানুষ নিজেদের ভ্রমণ ও জিনিসপত্র পরিবহণের জন্য নানারকম জীবজন্তুকে যান হিসাবে ব্যবহার করতো। তারা গাছের গুড়ি ও বাতাসে ফোলানো জীবজন্তুর চামড়া নদী পারাপারে ব্যবহার করতো। তাদের বহন করে নিয়ে যাবার সময় স্রোতের টানে গুড়িগুলো নদীমুখে এবং পরে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সম্ভবত এমন কোনও আকস্মিক ঘটনায় এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা প্রথম সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছায়। নদীর স্রোত ও জোয়ারের টানে সমুদ্রে তাড়িত হওয়া আদিম যুগের এই মানুষেরাই প্রথম সমুদ্র সমীক্ষক এবং তাদের দুর্দশাই আমাদের পাওয়া প্রথম সমুদ্র সংক্রান্ত বিবরণ। প্রথম দিকের এই সিন্দাবাদেরা তাদের নদীতীরের বাসভূমিতে ফিরে এসে আপনজনের কাছে কি তথ্য দিয়েছিল তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু এটা লক্ষ্য করা যায় যে, নদী তীরবর্তী মানুষ ক্রমশই সমুদ্র উপকূলের দিকে সরে গিয়েছে এবং ব্যাপকভাবে বসতি স্থাপন করেছে। এখন পৃথিবীর সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলেই মানুষের সর্বাপেক্ষা ঘন বসতি দেখা যায়। সমুদ্র তীরেই স্থাপিত হয়েছে পৃথিবীর বেশির ভাগ বড় শহর।

মানুষ কাঠে চেপে কাছাকাছি দ্বীপে টাটকা ফল ও বাদাম খুঁজতে গিয়ে ঐ দ্বীপগুলিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। কেননা বিপদজনক প্রাণীসমূহ অরণ্যের অভ্যন্তরে বাস করা অপেক্ষা সমুদ্রতীরের কাছাকাছি স্থানে বাস করা অনেক বেশি মনোরম ও নিরাপদ। মানুষ এরপর মাছ ধরতে এবং অন্যান্য সামুদ্রিক পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করতে শিখল। তারপর পালতোলা নৌকা তৈরি হয়েছিল। এগুলিই মানুষের ব্যবহৃত প্রথম শক্তি চালিত যান। পালতোলা নৌকাই সমুদ্র বায়ুর সাহায্যে প্রথম যুগের মানুষদের দূরের দেশে বয়ে নিয়ে যেত। একদা অগম্য সমুদ্রের ওপারে মানুষের ইচ্ছামত বিচরণ সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠল। নবওয়ের বিখ্যাত আবিষ্কারক ও নাবিক 'থরহায়ার ডালের বিবরণে দেখা যায়, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহ ও দক্ষিণ আমেরিকার মত দূরের দেশের মধ্যেও প্রচরণ চলেছিল। সমুদ্র পার হয়ে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করে অবশেষে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলির যারা বর্তমান অধিবাসী, প্রকৃত পক্ষে তারা গ্রাম্য নৌকায় চেপে বিশাল এবং বিস্তৃত প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম তীর থেকে প্রচরিত হয়ে এসেছে।

প্রাচীন মিশরীয়রা ও ফিনিশিয়রাই প্রথমে সুপরিচালিতভাবে বিশাল সমুদ্রে চলাফেরার ঝুঁকি নিয়েছিল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মিশরীয়রা স্বচ্ছন্দভাবেই বিচরণ করতো। লোহিত সাগর ও আরব সাগরের সঙ্গেও তারা পরিচিত ছিল। এক সময়ে শাসক ফারাও-এর আদেশে মিশরীয়রা জিব্রাল্টার প্রণালী তথা হারকিউলিসের থাম

অতিক্রম করে আটলান্টিক মহাসাগরে এসে পড়েছিল। তারা উত্তর ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে পশ্চিম আফ্রিকা উপকূলভাগ হয়ে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে (বর্তমান কেপটাউন) গিয়ে পৌঁছে। এরপর তারা ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করে এবং আফ্রিকার পূর্ব উপকূল ধরে উত্তর দিকে মিশরে ফিরে যায়। প্রকৃতপক্ষে এর দু'হাজার বছর পরে ভাস্কোডা গামা ও তার সাক্ষীরা একই নাটকে আবার অভিনয় করে।

পরবর্তীকালে আরবেরা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সমুদ্র পথে বহুদূর ভ্রমণ করতো। জু-মধ্যসাগর ও দক্ষিণ পূর্ব আটলান্টিক মহাসাগর ছাড়াও তারা আরব-সাগর, ভারত মহাসাগর, দক্ষিণ চীন সাগর এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের কিছু অংশের উপর প্রভুত্ব করতো। ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভাস্কোডা গামাকে আহম্মদ ইবন মজিদ নামে এক আরব নাবিকই পথ দেখিয়ে পশ্চিম ভারতের মালাবার উপকূলে পৌঁছে দেন। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে আরবদের বহুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তারা দক্ষ নাবিক ও ব্যবসায়ী হয়েই থাকতে চাইত। পরবর্তীকালে ইউরোপীয়দের মত তারা বিদেশী রাজ্য জয় করার জন্য তাদের নৌকা শক্তিকে ব্যবহার করেনি। এই সূত্রে মনোভাবের জন্যই আরবেরা সমুদ্র বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নের এক বিরাট অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

আরবরা ছিল দক্ষ সমুদ্র অনুসন্ধানকারী। তারা বিভিন্ন সাগরের স্রোত, বায়ু প্রবাহ, বৃষ্টিপাত এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে সঠিক অনুসন্ধান করে সেইসব তথ্য নথিভুক্ত করে রাখতো। তারা সমুদ্র উপকূল ও দ্বীপসমূহের নক্সা আঁকত এবং যেসব সমুদ্র পথে তাদের ঘুরে বেড়াতে হতো, সেইসব অঞ্চলের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখতো। আরবেরাই সর্ব প্রথম মৌসুমী বায়ু পর্যবেক্ষণ করে এবং তা লিখে রাখে। এইসব তথ্য বিভিন্ন দেশের নাবিকদের খুবই সাহায্যে এসেছিল।

বুদ্ধের আবির্ভাবের পর ভারতবাসী সমুদ্র ভ্রমণ ও দেশ আবিষ্কারে বেশি মনোযোগ দেয়। বুদ্ধ এক বিশ্বজনীন ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর অনুগত শিষ্যেরা মনে করতেন, তারা যত বেশি সংখ্যক দেশে ভ্রমণ করতে পারবেন, বুদ্ধের মহৎ বাণী ততই ছড়িয়ে পড়বে। তাই তারা শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড, মালয় ও জাভাসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েন।

উত্তর ইউরোপের আর একদল মানুষ নরওয়ে এবং সুইডেনের ভাইকিংরা নবম খ্রিষ্টাব্দে গ্রীণল্যান্ড হয়ে উত্তর আমেরিকার নিউফাউন্ডল্যান্ডে পৌঁছে যায়। ক্যানাডেনেভিয়ার লোকেরা আজও খুব বেশি সমুদ্র ভ্রমণ করে এবং সমুদ্র বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে তাদের অবদানের জুড়ি মেলা ভার।

সমুদ্রে ক্রমাগত অভিযান চালানো সত্ত্বেও সমুদ্র এখনও রহস্যময়। সমুদ্রের বিশাল অংশ এখনও অজানা। প্রাচীনকালে এশিয়া ও আফ্রিকার উপকূলে বসবাসকারী মানুষই প্রথম চেষ্টা করে এই বিশাল অংশকে জয় করার। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পশ্চিম ইউরোপের মানুষ যখন সমুদ্র অনুসন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার আগেই সমুদ্র

বিষয়ে মোটামুটিভাবে প্রাথমিক তথ্য জানা হয়ে গিয়েছিল। ১৪৯২ সালে কলম্বাস ভারত আবিষ্কারের বদলে আটলান্টিক বিজয় করে আমেরিকা মহাদেশে পদার্পণ করেন। ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভাস্কোডা গামা ভারতে পৌছেন। ১৫২০ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের কার্ডিনাও মাগালেন তাঁর জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তের পর্বত সঙ্কুল দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে দিয়ে পূর্ব দিকে সবেগে চালিয়ে দেন এবং প্রশান্ত মহাসাগরে আসেন। স্থানীয় ফিলিপিনোদের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি প্রাণ হারান। মৃত্যুর পূর্বেই মহাসাগর সম্পর্কীয় তার লব্ধ সব জ্ঞান মানব জাতি তাঁর সহকারী সিবাস্তিয়ান ডেল কানোর মারফতে জানতে পারে। এই অভিযাত্রী দলের ২৪৩ জনের মধ্যে মাত্র ১৮ জন তিন বছর পর জীবিত ফিরে আসেন। সমুদ্র সমীক্ষক দলগুলোর মধ্যে এরাই প্রথম একক অভিযানে সবকটি সমুদ্রকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে পারেন।

পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে অগণিত মানুষ আটলান্টিক ও অন্যান্য সমুদ্রের বিশাল জলরাশি পেরিয়ে অনাদেশে অভিপ্রয়ান করে। ইউরোপীয়রা ছিল এ ব্যাপারে অগ্রগামী। সমুদ্র পার হয়ে মাতৃভূমির জন্য নতুন দেশ অধিকার করার কাজে নিজ নিজ সরকার তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করত। এর অবশ্যস্বার্থী ফল হলো জলে স্থলে সংঘর্ষ। অসংখ্য জলদস্যু বিভিন্ন সমুদ্র উপকূলে আবির্ভূত হয়। ১৫০০ সালের দিকেই বঙ্গোপসাগরে পর্তুগীজ হার্মাদরা (আর্মাদা) উপস্থিত হয়। সমুদ্রে মানুষের উপস্থিতি ও প্রয়োজন সর্বাধিক বেড়ে যায় এবং নানা দেশের জাহাজ সব সময়ে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে থাকে। পর্তুগীজ, তুর্কী, আরব, ভারতীয়, ব্রিটিশ ও ফরাসীদের মধ্যে বহু নৌযুদ্ধ হয় যার অনেকগুলিই ঘটে বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর ও ভূমধ্যসাগরে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে সমুদ্র বিজ্ঞানের জন্ম হয়। সুসংবদ্ধভাবে সমুদ্র বিষয়ক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ ও পুনর্বিন্যাস করতে ব্রিটিশরাই নেতৃত্ব দেয়। এরজন্য তারা যোগ্য মানুষ হিসাবে ক্যাপ্টেন জেমস কুকের (১৭২৮-১৭৭৯) সন্ধান পেয়েছিল। ১৭৬৯ থেকে দশ বছরের মধ্যে তিনি তিনটি প্রধান সমুদ্র অভিযানে ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। প্রথম অভিযানে তিনি অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ আবিষ্কার করেছিলেন। শেষ অভিযানে কুক বেরিং প্রণালীর মধ্য দিয়ে সুমেরু মহাসাগরে পৌছতে সমর্থ হন। ফেব্রার পথে তিনি হাওয়াই দ্বীপে পৌছেন এবং স্থানীয় লোকদের হাতে নিহত হন। সমুদ্র বিজ্ঞানে কুকের অবদান অত্যন্ত বেশি। প্রতিটি অভিযানে তিনি জীববিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ, গণিত বিশারদকে তাঁর সঙ্গে নিতেন। সমুদ্র বিষয়ে গুণগত এবং পরিমাণগত জ্ঞানে ব্রিটেন এভাবে অন্য জাতির তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে যায়। ব্রিটিশ নৌবাহিনীর বিশ্বব্যাপী আকস্মিক শক্তি হয়ে উঠার আসল কারণ এটাই এবং এর ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকৃতপক্ষে তারাই পৃথিবীর সমগ্র জলভাগের উপর কর্তৃত্ব চালিয়ে যায়।

১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে চার্লস ডারউইন নামে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ প্রকৃতি বিজ্ঞানী ব্রিটিশ জরিপ অভিযাত্রীদের সঙ্গে জাহাজে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। এরপর সমুদ্রে যানবাহন চলাচল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় তথ্যের স্তূপ জমা হয়। মার্কিন নৌ বাহরের এক সুপারিনটেনডেন্ট ম্যাথু ফনটেন মোরে ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে

এইসব তথ্য একত্র করে প্রথম সমুদ্র সংক্রান্ত বই 'দ্য ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি অব দ্য সী' লিখেন। ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ক্যাথেন জেমস সি রোজ সমুদ্রের গভীরতা মাপা ও কুমেরু মহাসাগর জরিপ শুরু করেন।

পৃথিবীর সবকটি সাগর ও মহাসাগরের মানচিত্র একই ক্ষেত্রে থাকার জন্য ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ব্রিটেন এইচ এম চ্যালেঞ্জারকে অভিযানে পাঠায়। সমুদ্র বিজ্ঞানের উৎকর্ষ শুরু হয় চ্যালেঞ্জারের অভিযান থেকে। এই অভিযানের দলপতি ছিলেন এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর চার্লস উইলি টমসন (১৮৩০-১৮৮২)। তিনি সাড়ে তিন বৎসরে ৬৯০০০ মাইল পথ অতিক্রম করেন আটলান্টিক, প্রশান্ত মহাসাগর, এন্টার্কটিকা মহাসাগর ধরে। চ্যালেঞ্জার অভিযানের ৫০ খন্ডের ২৯৫০০ পৃষ্ঠার সরকারী বিবরণ শেষ হতে ২৩ বছর লেগেছিল।

টমসনের অগ্রবর্তী ছিলেন এডওয়ার্ড ফোরবেস (১৮১৫-১৫৫৪)। পূর্ব ভূ-মধ্যসাগরে 'বীকন' জাহাজে করে ১৮৪১ সালে তিনি হাইড্রোগ্রাফিক্যাল অনুসন্ধান চালান। তিনি লাইসিয়া উপকূলে ১৮টি নিমজ্জিত প্রাচীন নগরীর সন্ধান লাভ করেন। ইজিয়ান সাগরের জীবকূল এবং পৃথিবীর সমুদ্রগুলিতে সামুদ্রিক জীবনের শ্রেণি বিভাগ ও বন্টন সম্পর্কে ১৮৫০ সনে একটি ম্যাপ তৈরি করেন। অপর বিজ্ঞানী জন মারে (১৮৪১-১৯১৪) ছিলেন আধুনিক সমুদ্র বিজ্ঞানের অগ্রপথিক। তিনি 'টিটন' (১৮৮২) ও চ্যালেঞ্জার অভিযানে জড়িত ছিলেন। তিনি সমুদ্র-তলানী নিয়ে বিশদ গবেষণা করেন। এ ছাড়াও তিনি প্রাক্কটন বা সমুদ্রের ভাসমান জীবন এবং প্রবাল দ্বীপ নিয়ে গবেষণা করেন।

এ ছাড়াও লুইস এবং আলেক্সজান্ডার আগাসীজ পিতা ও পুত্র (১৮০৭-১৮৭৩-১৯১০) আমেরিকার সমুদ্র বিজ্ঞানের ইতিহাসে দিরাট অবদান রাখেন। প্রিন্স অব মনাকো (১৮৪৮-১৯২২) সমুদ্রবিজ্ঞানের অপর একজন পথিকৃত। আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগরের সমুদ্র তলদেশের তাপমাত্রার পার্থক্য, প্রাণীকূল, সমুদ্র স্রোতের বিবরণ এসব তার অবদান। গত চল্লিশ বৎসরে অনেক সামুদ্রিক অভিযান পরিচালিত হয়েছে যার মধ্যে দক্ষিণ আটলান্টিক, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে গাজেলে অভিযান, উত্তর আটলান্টিকে মিসেল সারস অভিযান, পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে ফিশিং ও আলব্যাট্রাস কমিশন, ইউএম, কোস্ট এবং জিওডেটিক সার্ভে কমিশন, মিটিওর অভিযান, কার্ণেগী অভিযান, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের জন্য ডানা অভিযান, ক্রিপস এর নেতৃত্বাধীন স্লেলীয়াস অভিযান, ডিসকভারী ২য় অভিযান (১৯৫০-৫১), চ্যালেঞ্জার অভিযান (১৯৫১), ড্যানিস অভিযান (১৯৫১-৫২) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমানে সমুদ্র গবেষণার কাজ অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এ গুলোর মধ্যে বিশিষ্ট গবেষণাগারগুলি হচ্ছে যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাভাল হাইড্রোগ্রাফিক অফিস, কোস্ট এন্ড জিওডেটিক সার্ভে, ক্রীপস ইনস্টিটিউট অব ওসেনোগ্রাফি, স্ক্যান্ডেনেভিয়ার জিওফিজিক্যাল ইনস্টিটিউট, হাইড্রোগ্রাফিক বাইওলজিক্যাল কমিশন, যুক্তরাজ্যের মেরিন বাইওলজিক্যাল এসোসিয়েশন, প্যারিসের ওসেনোগ্রাফিক ইনস্টিটিউট, ক্যানাডার রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব ম্যারিন ফিসারিজ;

ইনস্টিটিউট অব ওসেনোগ্রাফি এবং স্পেশাল কমিটি অব ওসেনোগ্রাফিক রিসার্চ। এ ছাড়াও জাপান, রাশিয়া এবং জার্মানীর কয়েকটি সমুদ্র গবেষণাগারও ভূবন বিখ্যাত।

ব্রিটিশদের পরে ইউরোপের অন্যান্য জাতি সমুদ্র গবেষণায় মনোযোগী হয়ে পড়ে। ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, নরওয়ে, ইটালী, আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ সমুদ্র বিজ্ঞানের প্রসার এবং একই সঙ্গে সমুদ্রে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখা যায় সমুদ্র অনুসন্ধানের অগ্রগতির আর এক পর্ব। বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনীকে স্বল্প পরিচিত এবং অজানা সমুদ্রে যুদ্ধে যেতে বাধ্য হতে হয়। অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে তারা যতটা সম্ভব এইসব সমুদ্র সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ করতো। বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে এই সংগৃহীত তথ্য বিশাল হয়ে ওঠে। এতে সমুদ্র মহাসমুদ্রের সংস্থান, গভীরতা, উষ্ণতা, জল ও বাতাসের চলাচল, প্রাণী ও উদ্ভিদকূল এবং অন্যান্য বিষয়ের খুঁটিনাটি তথ্য ছিল। শুনতে অবাক লাগলেও এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেই অতিরিক্ত ব্যয় ব্যতিরেকে সংগঠিতভাবে সমুদ্র গবেষণার সূত্রপাত হয়। মানুষের সমুদ্র বিজয় এইভাবেই সংঘটিত হয়েছিল। মানুষের ভবিষ্যত ও সৌভাগ্য যে অঙ্গারি এবং অবধারিতভাবেই সমুদ্রের সঙ্গে জড়িত এটাও প্রমাণিত হয়। আজ এটি পরিষ্কার যে বর্তমানে এই মানব সভ্যতার অধিকাংশই সমুদ্র নির্ভর এবং সমুদ্র শাসিত।

সমুদ্র গ্রাস : (সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, গ্রীনহাউজ এক্কেট)

যুগে যুগে পৃথিবীর বহু অংশকে সমুদ্র গ্রাস করেছে। আগ্নেয় সমুদ্রের অভিযানের যুগে আমরা বাস করছি। প্রাইস্টোসিন তুষার যুগের শেষ পাদে পৃথিবীর হিমবাহগুলি গলে ছোট হয়ে আসছে এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের ক্রমস্ফীতি ঘটছে। তবে এই ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন নয়। উত্তর আমেরিকার বিশাল স্থলভূমি বহুবার সমুদ্র গ্রাস করেছে আবার হটেও গেছে। তেমনি পৃথিবীর বহু অঞ্চলেও সমুদ্রের এ রকম গতিপ্রকৃতি হয়েছে অনেকবার। বর্তমানে সমুদ্রগুলি তটসীমা ছেড়ে এগিয়ে আসছে দেশের মধ্যে, মহাদেশের উপকূলে অবস্থিত অগভীর সাগরগুলি ভরাট হয়ে ছাপিয়ে উঠছে। আজকের বেরেন্ট, বেরিং ও চীন সাগর এইভাবে জলপূর্ণ হয়েছে। তাছাড়া মধ্যস্থিত সাগর, যথা-হুডসন উপসাগর, সেন্ট লরেন্স, বাল্টিক ও সুন্দা সাগরে সমুদ্রের লোনা জল প্রবেশ করেছে। আটলান্টিকের উপকূলের বহু নদীর মোহানা অঞ্চল এখন গভীর সমুদ্রের নিচে। বর্তমান হার্ডসন নদী ও সামকুচোয়ানা নদীর মোহানা অঞ্চল কয়েকশ বছর আগেও বর্তমান সমুদ্রের মধ্যে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

গত তুষার যুগের বরফ মানব সভ্যতার শুরু থেকেই গলতে শুরু করেছিল। বর্তমান সময়ে ভূ-পৃষ্ঠের স্থলভাগের মাত্র ১০% বরফাবৃত। এর অধিকাংশই এন্টার্কটিকা, গ্রীনল্যান্ড, আইসল্যান্ড এবং বিভিন্ন পর্বতশৃঙ্গে অবস্থিত। প্রাইস্টোসিন কালে বরফ আবরণের পরিমাণ ছিল ১৮.৪ মিলিয়ন ঘন মাইল অথচ বর্তমান সময়ে মাত্র ৬.৩ মিলিয়ন ঘন মাইল স্থান জুড়ে বরফাবৃত রয়েছে। সে সময়ের বরফ যুগে বিস্তৃত বরফাঞ্চলের জন্য সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বর্তমানের চাইতে ৪৩১ ফুট নিচে ছিল।

বর্তমানে হিমবাহের সব বরফ যদি গলে যায় তাহলে সমুদ্র পৃষ্ঠ ২০০ ফুট থেকে ৫০০ ফুট উপরে উঠে আসবে। ১৭০০০ বছর আগে বা ছিল শুকনো স্থলভূমি বর্তমানে তা পানির নিচে মহীসোপানে পরিণত হয়েছে। প্রাইস্টোসিনকালে চারটি বরফ যুগ দশ লক্ষ বৎসর পূর্ব হতে শুরু হয়েছিল। অর্থাৎ ১৮ লাখ বৎসর পূর্বে বরফ শুরু হয়ে দশলাখ বৎসর পূর্বে সব গলে যায়, (১ম কাল); তারপর ১৩ লাখ থেকে ৯ লাখ বৎসর (২য় কাল); সাড়ে পাঁচলাখ থেকে ৩ লাখ ৮০ হাজার বছর (৩য় কাল); এক লাখ ২০ হাজার বছর থেকে ১০ হাজার বছর আগে (৪র্থ কাল)। এ সময় ইউরোপ, আমেরিকা এন্টার্কটিকা, আল্গস ও হিমালয় প্রভৃতি পর্বতমালার বরফ পৃথিবীর ৩০% স্থলভাগ গ্রাস করে। বর্তমান সময় হতে ৫০০০ বছর পূর্বে সর্বশেষ বরফের আবরণ সরে যায়। সামুদ্রিক তলানী পরীক্ষা করে এই কালগুলি নির্ণীত হয়েছিল।

সমুদ্রের জল ৬০০ ফুটের বেশি উচু হলে সারা পৃথিবী সমুদ্রের নিচে চলে যাবে। ভূপৃষ্ঠের বিরাট অঞ্চল জুড়ে সমুদ্রগুলির সংঘাত চলবে আর সে সংঘাতে সৃষ্ট ঢেউ সাদা ফেনা হয়ে ছিটিয়ে পড়বে আল্গস ও হিমালয়ের বিস্তৃত পর্বতের গায়ে। আমাদের চিরপরিচিত পৃথিবী এই জলপূর্ণরূপে আমাদের কাছে অচিন্তনীয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে, তারপরে ওলটপালট হয়ে গেছে পৃথিবীর রূপ, স্থলভাগের পরিধি ও বিস্তার। এই পরিবর্তন এখনও চলছে। আটলান্টিকের বৃকে তলদেশ ফুড়ে গজিয়ে উঠেছে বারমুডা দ্বীপ। ১৮৩০ সালে এক অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে সিসিলি ও আফ্রিকার মাঝখানে ভূমধ্যসাগরে এক দ্বীপ হঠাৎ জেগে উঠে শুধু ভূপৃষ্ঠ থেকে দশ ফুট উচু মাথা তুলে। কয়েক বছরে আবার তা অগাধ জলের নিচে নেমে যায়। ১৯১৩ সালে প্রশান্ত মহাসাগরের ফালকান দ্বীপ ডুবে গেছে যা ১৯৪৯ সালে কয়েক দিনের জন্যে ভেসে উঠেছিল।

১৮৮৩ সালের ২৭শে আগস্ট সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১৪০০ ফুট উচুতে মাথা তুলে দাড়িয়ে থাকা ইন্দোনেশিয়ার ক্রাকাতোয়া শৃঙ্গ কয়েক দিনের অগ্ন্যুৎপাতে ফেটে চৌচির হয়ে সমুদ্রের কয়েক হাজার ফুট গভীরে নেমে যায়। ১০ কোটি বছর আগে ক্রিটেশাস যুগে সমুদ্র জলে উত্তর আমেরিকাকে গ্রাস করেছিল উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব দিক থেকে এবং ঐ অঞ্চল জুড়ে এক আন্তমহাদেশীয় সমুদ্র ছিল যা চওড়ায় ১০০০ মাইল এবং আর্কটিক থেকে মেক্সিকো উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপর ক্রমে পূর্ব দিকের মেক্সিকো উপসাগর থেকে নিউজার্সি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো এই সমুদ্র। পানি বাড়তে বাড়তে বর্তমান উত্তর আমেরিকার অর্ধেকের বেশি এই সমুদ্রের অন্তর্গত হয়ে গেল। এশিয়া ইউরোপ, আফ্রিকাও সমুদ্র গ্রাসের আওতায় এসেছিল। ঠিক এই রকমের বিস্তৃত প্রাবন ঘটেছিল আরও আগে ৪০ কোটি বছর পূর্বের যুগে। বিভিন্ন যুগে বিচিত্র জল ও স্থল বিন্যাসের মাঝে হয়েছিল এই জলপ্রাবন।

হিমালয়ের ২০,০০০ ফুট উচ্চতায় সামুদ্রিক চুনাপাথর এবং জীবাশ্ম এক অতীত সমুদ্রের স্বাক্ষর বহন করে। ছয়কোটি মতান্তরে সাড়ে চার কোটি বছর আগে এই সমুদ্রের পানি ছিল উষ্ণ এবং পরিষ্কার। দক্ষিণ ইউরোপ উত্তর আফ্রিকা থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া পর্যন্ত এই টেথিস সমুদ্রের বিস্তার ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন

দেশে প্রাপ্ত চূনাপাথর ক্রিটেশাস যুগের প্লাবনের সময় পানি থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। আচমকা ঝাপ দিয়ে পড়া নির্ঝর নায়াগ্রা প্রপাতের সৃষ্টি হয়েছিল ৩৩ কোটি বছর আগে আর্কিটিক সাগরের আগ্রাসনের সময়। ভূতাত্ত্বিকদের মতে পৃথিবীর ইতিহাসের প্রধান অধ্যায়গুলো তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে দেখা যায় মহাদেশগুলি উচ্চ, দেশের ক্ষয় বেশি এবং সমুদ্রগুলি নিচু স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায় মহাদেশগুলি সবচেয়ে নিচু এবং সমুদ্র তটভূমির সীমারেখা অতিক্রম করে তাদের গ্রাস করছে। তৃতীয় পর্যায়ে পৃথিবীর স্থলভাগ সমুদ্রের অধীনতা থেকে বেরিয়ে এসে মাথা উচু করে তোলে। পৃথিবীর দেশগুলি এখন অতীতের চেয়ে অনেক বেশি উচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মনোরম। কিন্তু নতুন পর্যায়ের সমুদ্রগ্রাস ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, বিশেষত উত্তর আমেরিকায়।

বর্তমানে যে বরফ গলা যুগ অতিক্রান্ত হচ্ছে তাতে পূর্বের বরফগলা যুগের তুলনায় অধিক বরফ গলবে বলে বিজ্ঞানীরা আশংকা করছেন। এর কারণগুলির মধ্যে প্রধানটি হচ্ছে গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া। বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার ফলে সূর্যালোক পৃথিবীতে আসতে পারে কিন্তু ফেরত যেতে পারে না, ফলে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়। উত্তপ্ত হওয়ার দরুন বরফ গলা শুরু হয়। এই এফেক্টের বহুদীর্ঘতায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশের মধ্যে বাংলাদেশের দশ শতাংশ জমি বঙ্গোপসাগরের আওতায় চলে যাবার সম্ভাবনা বিজ্ঞানীরা আশংকা করেছিলেন। তা ছাড়া ডার্ক নেবুলার মধ্যদিয়ে সৌরমণ্ডলের অভিগমন, মাঝে মাঝে পৃথিবীর কক্ষপথের কেন্দ্রের পরিবর্তন, মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবীর হেলানো অবস্থানের পরিবর্তন এবং পৃথিবীর মেরু রেখার পরিবর্তনের কারণেও বায়ুমণ্ডলের তাপ বৃদ্ধি পায়। উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য বিজ্ঞানীরা এখন নিশ্চিত যে আগামী দশকগুলিতে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাবে। ভূতাত্ত্বিকেরা বলেন বিশ্বের অধিকাংশ তট রেখা ইতিমধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। গত এক শতকে মসুদ্রগুলি চার ইঞ্চি পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্দিকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা একশত বৎসরে এক ফুট বেড়ে গেছে। সমুদ্রের লবণাক্ত পানি দেশের অভ্যন্তরে বহু দূর পর্যন্ত প্রবেশ করছে। উডবোল ওসানোগ্রাফিক ইনস্টিটিউট বিজ্ঞানী, বি, মিলিমান (১৯৮৬) বলেন, “বাংলাদেশে গঙ্গা, পাকিস্তানে सिन्धু, চীনে ইয়াংশি, মিসরে নীল এবং কলম্বিয়ার ম্যাগাডেনার মোহানাগুলির চতুর্দিকের সমতল ভূমি ক্রমশ ঢালু হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশের দশ শতাংশ ভূমি গভীর সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাবে।”

মানব জীবনে সমুদ্রের ভূমিকা : বাস্তব মানব জীবনের অনেক কিছুর উপরেই সাগর ও মহাসাগরগুলির প্রভাব রয়েছে। মহাসাগরগুলির প্রধান প্রধান অঞ্চল হচ্ছে-

১. মহাসাগরগুলি জলীয় বাষ্পের উৎস হিসাবে বৃষ্টিপাত ঘটায়। সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানগুলিতে বর্ষণ অধিক এবং দূরে বর্ষণের পরিমাণ কম হয়।
২. মহাসাগরগুলি তাপমাত্রার উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। মহাসাগরের উপর বায়ু উত্তপ্ত এবং শীতল হতে অধিক সময় লাগে। কারণ সেখানে তাপ

বিশাল পানিরাশির উপর ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে বায়ুমন্ডল ধীরে ধীরে শীতলপ্রাপ্ত হয়। এইজন্য সমুদ্রবায়ুর প্রভাব মৃদু এবং তা তাপমাত্রার প্রখরতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। মহাসাগরের নিকটে তাপমাত্রার তারতম্যও খুব কম হয়ে থাকে।

৩. মহাসাগরগুলি হচ্ছে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।
৪. মহাসাগরগুলি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য ও ঔষধ, খাবার লবণ, ম্যাগনেশিয়াম, বিভিন্ন খনিজ পদার্থের উৎস।
৫. তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, ও সমুদ্রস্রোতকে শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করে সাগর মহাসাগরগুলি শক্তির আধার হিসাবেও বিবেচিত হচ্ছে।
৬. প্রতিরক্ষার ব্যাপারেও সমুদ্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কোনো দেশের নৌশক্তি তার স্বাধীনতা রক্ষার স্বরূপ। স্থল ও আকাশপথ অবরোধের বিকল্প পথ নৌপথ।
৭. সমুদ্র কোটি কোটি মানুষের আনন্দ ও আশার বিনোদনের অন্যতম উৎকৃষ্ট উৎস। মানুষের সমৃদ্ধির জন্য সমুদ্র অজস্র প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।

সমুদ্রের রহস্য

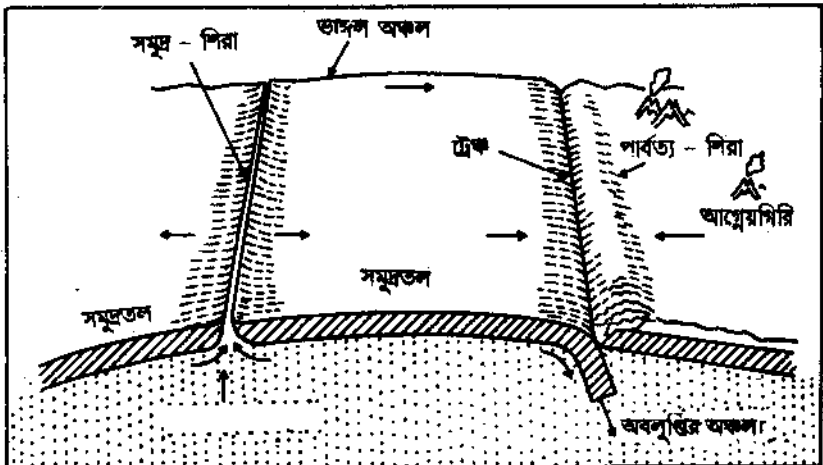
সমুদ্রের জলরাশির নিচে আছে বিশাল রহস্যময় জগত। যেখানে মহাদেশীয় ভূভাগ শেষ হয়েছে, সেখানে সমুদ্রের যাত্রা শুরু। সেখানে গভীরতা হয় সর্বোচ্চ ৬০০ ফুট বা ১০০ ফাদম। কক্সবাজারে বঙ্গোপসাগর অনেক দূর পর্যন্ত অগভীর রয়েছে যে অংশটাকেই মহীসোপান বলে। তারপরই সাগর ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে অনেক গভীরে (মহীঢাল)। এই মহীঢাল আরও খাড়া হয়ে সমুদ্র-তলদেশে নেমে গিয়েছে যেখানে হাজার হাজার বছর ধরে তলানী সঞ্চিত হয়েছে। এই অতি গভীর অংশে বড় বড় পর্বতমালা, উঁচু পর্বত শিখর সমুদ্রের ভিতর দভায়মান। শত শত মাইলব্যাপী খাড়া পর্বতমালা চলে গিয়েছে। যেমনটি বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ অংশে ৯০° পূর্ব শৈলশিরা মধ্যভারত মহাসাগরকে বিভক্ত করেছে ৫ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত।

সমুদ্রের অগভীর অংশেই মানুষের কার্যকলাপ সর্বাধিক। কারণ, এ অংশেই মাছের ভিড় থাকে। মহাদেশীয় ভূভাগের নিকটেই বিশাল শিলা, ছোট টিলার শিখর দেশে রয়েছে যা জাহাজ ধ্বংসের কারণ হয়। পৃথিবীর ১০০ সমুদ্রের মোট আয়তনের শতকরা ৮ ভাগ হলো মহীসোপান অঞ্চল। ৮০% সমুদ্রের গভীরতা ২ মাইলের কাছাকাছি। সমুদ্র বিজ্ঞানের একটি রহস্যময় দিক হলো এর উপত্যকা এবং গভীর খাদসমূহ বা ক্যানিয়ন। অসংখ্য সামুদ্রিক উপত্যকা ও গভীর খাদ ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর সমুদ্রগুলিতে। বঙ্গোপসাগরের রয়েছে অতলস্পর্শী মহীখাদ 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' যা বরিশালের দুবলা চরের অদূরে উপকূল থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে সমুদ্রগহ্বরে অবস্থিত। এটা শ্রীলংকার পূর্বে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে শেষ হয়েছে। এ থেকে বিজ্ঞানীরা

ধারণা করেন যে, স্থলভাগের নদীগুলোর সাথে সমুদ্রে এই খাদগুলোর একটি যোগসূত্র আছে। বর্তমানের তুলনায় সমুদ্রপৃষ্ঠ যখন আরও নিচে ছিল তখন স্থলভাগের এই নদীগুলি তাদের যাত্রাপথে এসব উপত্যকা কেটে তৈরি করেছে যা বর্তমানে সমুদ্রের পানির নিচে চলে গিয়েছে। অন্য ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, মূলত সমুদ্রের গভীরে পলিবাহিত তীব্র স্রোত এসব উপত্যকা ও গভীর খাদের জন্ম দিয়েছে।

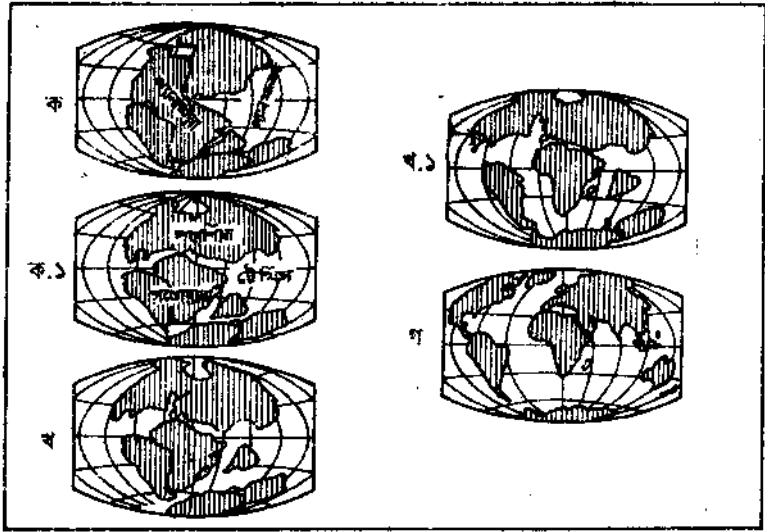
গভীর খাদগুলি হলো এইসব সমুদ্রের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং বিস্ময়কর। প্রশান্ত মহাসাগরে এরূপ খাদের সংখ্যা বেশি। এদের অনেক শৃঙ্গ উচ্চতার দিক দিয়ে এভারেস্টকেও হার মানায়। অনেক পর্বত আছে যেগুলি সমুদ্রতল থেকে সমুদ্রপৃষ্ঠ ভেদ করে উপরে উঠে এসেছে, যেমন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মওনাকিয়া। সমুদ্রতল থেকে শিখর দেশ পর্যন্ত এর উচ্চতা ৩৩,৪৭৬ ফুট যার ১৩,৭৯৬ ফুট সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। প্রায় সব সমুদ্রের গভীরে মাঝখানে পর্বতমালার অবস্থান রয়েছে। এ যেন কোরআনের কথায় পর্বতগুলিকে কীলকা হিসেবে বসানো হয়েছে যাতে মহাদেশগুলি স্থানচ্যুত হতে না পারে। পৃথিবীর সমুদ্রগুলির মাঝখানে যেসব দ্বীপপুঞ্জ দেখা যায় তাদের অনেকগুলি এসব পর্বতের শিখর দেশ। এ সম্বন্ধে সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য হলো এইসব মহাসাগরীয় পর্বত একটির সাথে আরেকটি অবিস্কিন্ন যোগসূত্রে আবদ্ধ। এদের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০,০০০ মাইল এবং প্রস্থ ৩০০ থেকে ১২০০ মাইল। এরা বেশির ভাগই আগ্নেয় পর্বত এবং ভূমিকম্পপ্রবণ।

সমুদ্রপৃষ্ঠের অনেক নিচে এইসব পর্বতের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো দু'টি পর্বতমালার মাঝখান দিয়ে বিশাল ফাটলের বিদ্যমানতা। এই ফাটল সৃষ্টি হয়েছে কোটি বছর ধরে মহাদেশগুলির একটির থেকে অপরটির অতি ধীর গতিতে সঞ্চরণের ফলে (চিত্র নং ১.১)। এভাবে প্রতি বছর উত্তর আমেরিকা এক ইঞ্চি করে বর্তমান



চিত্র : ১.১ ভূত্বকের সৃষ্টি ও অবলুপ্তির দৃশ্য: সমুদ্র শিরা যেরূপ সৃষ্টি হচ্ছে ত্বকের তেমনি লয় হচ্ছে ট্রেন্স, যার পাশে জেগে উঠছে আগ্নেয়গিরি।

অবস্থান থেকে সরে যাচ্ছে। বিশ কোটি বৎসর আগেও সারা ভূখন্ড একত্রে 'প্যানজিয়া' নামে স্থলঅংশে আবদ্ধ ছিল। তারপর সমুদ্রগুলি বিচ্ছিন্ন করে ফেললো মহাদেশগুলিকে। হিমালয়ের জায়গায় ছিল টেথিস মহাসমুদ্র। তখন বিশ্বব্যাপী একটি মহাসমুদ্র ছিল 'প্যান্থালাসা'। কয়েক কোটি বছর পরে এই মহাদেশ ভাঙতে শুরু করলো যার এক অংশ হলো গভোয়ানাল্যান্ড (মধ্য ভারতের 'গভ' জায়গার নামানুসারে) যাতে ছিল দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, এন্টার্কটিকা, ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। এবং আর এক অংশ হলো লরেশিয়া-যাতে ছিল ইউরেশিয়া (ইউরোপ-এশীয় ভূখন্ড), গ্রীনল্যান্ড এবং উত্তর আমেরিকা, এদের মাঝে সৃষ্ট হল টেথিস (Tethys) সাগর (চিত্র নং-১.২)।



চিত্র ১.২ : (ক) কুড়ি কোটি বছর আগেকার পৃথিবী পৃষ্ঠে বিস্তৃত লরেশিয়া ও গভোয়ানা-এর মাঝে বিস্তৃত টেথিস সাগর।

ক.১ চিত্র ১৮ কোটি বছর আগের পৃথিবী।

খ.১ চিত্র সাড়ে ১৩ কোটি বছর আগের পৃথিবী।

(খ) সাড়ে ছয় কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর রূপ, উত্তর পূর্বমুখী চলমান ভারত আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এন্টার্কটিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, কিন্তু উত্তরে তখনও টেথিস সমুদ্র বিরাজমান।

(গ) পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা।

দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা এর পরে ভেঙ্গে সরে গেল গভোয়ানাল্যান্ড থেকে। এর ফলে এদের মাঝখানে সৃষ্ট হলো দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর। প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে এই আটলান্টিকের বিস্তার ঘটে উত্তর দিকে এবং অস্ট্রেলিয়া সরে

যেতে থাকে গ্র্যান্টার্কটিকা থেকে। ভারতও বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমে সরে যেতে থাকে এশীয় ভূখন্ডের দিকে। এরপর ভারতের চাপে মধ্যবর্তী টেথিসের বিলুপ্তি ঘটে এবং উত্তর হিমালয় জন্ম নেয়। এই চাপে হিমালয় আজও উঠছে, এভারেস্ট শীর্ষেরও হচ্ছে ক্রমোন্নতি।

আজ থেকে কয়েক কোটি বছর পরে আটলান্টিক মহাসাগর আরও অনেক চওড়া হবে এবং প্রশান্ত মহাসাগর ছোট হয়ে পড়বে। অস্ট্রেলিয়া উত্তরে সরে যাবে। পারস্য উপসাগর নিশ্চিহ্ন করে আরও অন্তরীপ এশীয় ভূখণ্ডে জুড়ে যাবে, ফলে লোহিত সাগর চওড়া হবে আরও। ভূমধ্যসাগর ছোট হ্রদে পরিণত হবে এবং ইথিওপিয়া, সোমালী-ল্যান্ড আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য এক আলাদা দেশের সৃষ্টি করবে। কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান সাগর ছোট হয়ে যাবে। এককালে উরাল ছিল একটি আড়াআড়ি সমুদ্র যা সাইবেরিয়াকে পশ্চিম রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। আজ সেখানে সৃষ্টি হয়েছে উরাল পর্বত।

সমুদ্র গবেষণা

সমুদ্রতল গবেষণা কতকগুলি বিষয়ের দিক থেকে মহাশূন্য গবেষণার মতই ভীষণ জটিল। যুগ যুগ ধরে মানুষ সমুদ্রের অন্তঃস্থলের সন্ধান জানবার চেষ্টা করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমুদ্র গবেষণা একটি বিশেষ রূপ নেয়। এক্ষেত্রে বিশিষ্ট পদক্ষেপ নেয় চার্লস ডারউইনের বিখ্যাত বিগল জাহাজ (H. M. S. Beagle, ১৮৩১-১৮৩৬) ও দ্বিতীয়টি হচ্ছে চ্যালেঞ্জার জাহাজ (১৮৭২-১৮৭৬)। সমুদ্র বিজয় অংশে এ ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। বর্তমানে সমুদ্রের নিচে গবেষণার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ক্রমবর্ধমান পানির চাপ ও পানিতে বেশি ক্ষণ থাকার সুব্যবস্থা করা। প্রতি ১০ মিটার গভীরে পানির চাপ ৬.৩৫ কিলোগ্রাম করে বাড়ে। তার ফলে ৯১৫ মিটার নিচে পানির চাপে মানুষের দেহ গুড়ো হয়ে যাবে। সূর্যের কোনো রশ্মি ৫০০ মিটারের নিচে পৌঁছে না। পানির চাপকে উপেক্ষা করে কাজ করার জন্য নির্মিত হয়েছে ব্যাথিস্কেপ (Bathyscaph), ডেনিস (Denise)। সমুদ্রের তিন কিলোমিটার নিচে শুধু জমাট অন্ধকার। বর্তমান যুগে ইলেকট্রোনিগের সাহায্যে গবেষণা আরও ব্যাপক করা হয়েছে।

মহাসমুদ্রের গবেষণায় নিচেকার পলল এবং শিলা ছাড়াও গভীর সমুদ্রের পানি বিভিন্ন গভীরতা থেকে সংগৃহীত হয় নানসেন নামক একপ্রকার আঁধারের সাহায্যে। এই পানি পরীক্ষার দ্বারা গভীর তলদেশে পানিস্রোতের অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানা যায়। এই পানির বয়সও নির্ধারণ করা হয় পানিতে তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ এর পরিমাণ থেকে। পানির বয়স বলতে কোনো একটি স্থানে পানি প্রায় অচলমান অবস্থায় থাকার সময়টাকে বুঝায়। আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রের তলদেশে পতিত পললের সংযুক্তির পরিবর্তন ঘটে। এই ধরনের পাললিক শিলা ড্রিলিং করে তোলা হয়েছে এবং দেখা গেছে যে, এদের পরীক্ষার ফল থেকে পৃথিবীর আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব।

মহাসমুদ্রে খনিজ সম্পদে ভরা। দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে পুরু লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ স্তরে আচ্ছাদিত রয়েছে। এই খনিজ দ্রব্য হাইড্রোলিক পাম্পের সাহায্যে জাহাজে তুলে সোজা ইম্পাত কারখানায় ব্যবহার করা যেতে পারে। ভারত মহাসাগরে ম্যাঙ্গানিজ নডিউল যথেষ্ট পাওয়া যায়। এদের আকৃতি আলুর মত।

ভারত মহাসাগর অভিযান : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমুদ্রাভিমুখে মানুষের অগ্রগতি আরও নির্ভীক ও সংগঠিত হয়। সমুদ্র প্রকৃতপক্ষে অবিভাজ্য। সমুদ্র গবেষণার ক্ষেত্রে তাই যৌথ প্রচেষ্টার ফলে যে বেশি ভাল হবে সেটা উপলব্ধি করা গিয়েছিল। ফলে সমুদ্র বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিশ্বব্যাপী আর একটি প্রচেষ্টা করা হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালের আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বর্ষে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে সমুদ্র বিশেষজ্ঞগণ একত্র হয়ে সবকটি মহাসাগর বিশেষ করে আটলান্টিক মহাসাগর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জরিপ করেন। ব্রিটিশ, মার্কিন, রাশিয়ানদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রথমবারের মত আটলান্টিক মহাসাগরের বিশদ মানচিত্র প্রকাশিত হয়।

আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযান (International Indian Ocean Expedition) এবং ইন্টারন্যাশনাল ওসেনোগ্রাফিক কমিশনের (IOC) যৌথ সহায়তায় আর একটি অভিযান পরিচালিত হয়। এই মহাসাগরের বিশেষত্ব হচ্ছে বছরে দুইবার মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। এতদিন ভারত মহাসাগর সম্বন্ধে খুব কমই জানা ছিল। এই অভিযানের ফলে ভারত মহাসাগর ও তৎসংলগ্ন সাগরগুলি সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় ভারতসহ ২০টি দেশ তাদের ৩৪টি জাহাজ ও বিরাট গবেষক দল নিয়ে যোগদান করে। অভিযান চলে ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত। আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযানে যোগ দেওয়ায় ভারত খুবই উপকৃত হয়েছে। এর অভিজ্ঞতা থেকে তারা গোয়ার পানাজীতে 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ওসেনোগ্রাফি (NIO) প্রতিষ্ঠা করে।

ভারতে সমুদ্র গবেষণা : ভারত সমুদ্র গবেষণায় বহুদূর এগিয়ে গেছে এবং UNCLOS ভারতকে সমুদ্রের 'পাইওনিয়ার ইনভেস্টর' এর পর্যায়ভুক্ত করেছে। গভীর সমুদ্রে কাজ (তৈল ও খনিজ অনুসন্ধান) ছাড়াও নানা ধরনের গবেষণার জন্য বহু জাহাজ নিয়োজিত করেছে। এইসব জাহাজে বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণার জন্য গবেষণাগার রয়েছে। যেমন, ভূতত্ত্ব, ভূ-পদার্থ বিদ্যা, আবহাওয়া বিদ্যা, সমুদ্র বিদ্যা, সামুদ্রিক জীববিদ্যা এবং ম্যাঙ্গানিজ নুড়ির গবেষণার সব রকমের আয়োজন। তাছাড়া মৌসুমী বায়ু ও নিরক্ষীয় ঘূর্ণিঝড়ের ওপরও গবেষণার ব্যবস্থা আছে। সত্তর দশকের শেষার্শ্বে 'ইন্ডিয়ান ও সেন এক্সপেরিমেন্ট' (INDEX) একটি আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় পরিণত হয়েছে। এই প্রকল্পে ভারতের বহু বিজ্ঞানী অংশ নিচ্ছেন। তাঁরা একাধিক মহাদেশেও গবেষণায় অংশ নিয়েছেন যা বিশ্বের আর মাত্র ১১টি উন্নত জাতি করতে পেরেছে। ভারতের বহু জায়গায় সমুদ্র নিয়ে গবেষণা চলছে, যেমন- সেন্ট্রাল মেরিন ফিসারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, নেভাল ফিজিক্যাল ওসেনোগ্রাফিক ল্যাবরেটরি, গোয়ার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওসেনোগ্রাফি এবং অঙ্ক বিশ্ববিদ্যালয়। গোয়ার NIO পরবর্তীকালে সাতটি বিভাগে সম্প্রসারিত হয়েছে, ভৌত সমুদ্র বিজ্ঞান, রাসায়নিক

সমুদ্র বিজ্ঞান, জৈব সমুদ্র বিজ্ঞান, ভূ-বিদ্যা এবং ভূ-প্রকৃতিগত সমুদ্র বিজ্ঞান, সামুদ্রিক গবেষণায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি, সমুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পরিকল্পনা ও তথ্য সংরক্ষণ। এই প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলো আঞ্চলিক স্টেশন, ইউনিট এবং গবেষণা জাহাজ রয়েছে।

১৯৮৩ সালে তিরুপাটিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে সাতটি সুপারিশ কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে। সুপারিশের মধ্যে আছে : (১) দেশের ছাত্র সমাজকে সমুদ্রের আবহাওয়া বিদ্যা, সমুদ্র সম্পদ গবেষণায় ও নৌচালনায় উৎসাহ প্রদান। (২) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সমুদ্রে সাঁতার, ডুবুরীর কাজ ও নৌকা ক্রীড়া জনপ্রিয় করে তোলার জন্য উপযুক্ত সংস্থার সংস্থাপন। (৩) সমুদ্র সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রকাশের আয়োজন। (৪) সমুদ্রের জল-দূষণের ব্যাপারে সতর্কতা এবং উপযুক্ত আইন অবলম্বন। (৫) সমুদ্র গবেষণার জন্য উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ। (৬) ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী বৈজ্ঞানিকেরা যাতে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা রক্ষা করে সে ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ। (৭) সমুদ্র উপকূলে বসবাসকারীদের সমুদ্র সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

সমুদ্র গবেষণার ভৌত দিকগুলো সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্য ভারতের সেন্ট্রাল বোর্ড অফ জিওফিজিকস একটি ভৌত সমুদ্র বিজ্ঞান শাখা গঠন করেছে। অন্ধ্র, কেরালা, কোচিন এবং আন্ডামান-এর মত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্র বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করার জন্য বিশেষ বিশেষ বিভাগ খুলেছে। বর্তমানে ভারতের দশ/বার্টি বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্র বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষা চালু করেছে এবং সমুদ্র বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া অয়েল এন্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন (ONGC) পুরোপুরি কিংবা অংশিকভাবে সমুদ্র বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পড়াশুনা ও গবেষণার ব্যবস্থা করেছে। ভারত সরকার প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে সমুদ্র উন্নয়ন বিভাগ খুলেছে। এই বিভাগ সমুদ্র বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্যক্রমের সমন্বয় করেছে এবং সমুদ্র সম্পদের উপর নির্ভরশীল উন্নয়নমূলক ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বাঙ্গীন নির্দেশ ও অর্থ যোগানের ব্যবস্থা করেছে।

তাছাড়া দিল্লীতে 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওসেনোগ্রাফি'ও স্থাপন করা হয়েছে। এই ইনস্টিটিউটে ৪টি বিভাগ ও ২টি ইউনিট রয়েছে।

১. পরিকল্পনা ও উপাত্ত বিভাগ, দিল্লী। ভৌত ও রাসায়নিক উপাত্তগুলোর গ্রহণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বিনির্গমণ এবং বিশ্লেষণ করা এই বিভাগের কাজ।

২. ইন্ডিয়ান ওসেন বাইওলজিক্যাল সেন্টার বা ভারত মহাসাগরীয় জীববিজ্ঞান কেন্দ্র, এরনাকুলামে অবস্থিত। এখানে জ্যু প্র্যাকটন নমুনার শ্রেণিবিভাগ করা হয়।

৩. ভৌত সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ, এরনাকুলাম। এখানকার গবেষণা কর্ম হচ্ছে এরূপঃ

(ক) IOE থেকে প্রাপ্ত ভৌত সমুদ্র উপাত্তগুলোর প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ করণ।

(খ) উপকূলের অদূরে সোপানের তলানীর ভৌত ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ।

(গ) সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপন এবং আন্তঃসাগরীয় গভীর গিরিখাত অনুসন্ধান।

(ঘ) মোহনাজাত অবক্ষেপ, পরিবেশ অনুশীলন।

৪. জীব সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ, এরনাকুলাম। এখানে সমুদ্রের নিকটবর্তী নদীর জলবিদ্যা ও প্রাথমিক উৎপাদন সম্পর্কে গবেষণা হয়। ভৌত, রাসায়নিক, জীব ও অনুজীব উপাদানগুলোর অনুশীলন হয়।

৫. জাতীয় সমুদ্র বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, বোম্বাই। সমুদ্রের লবণাক্ততা, প্রাক্কটন এবং তলানীর গবেষণা এ ইনস্টিটিউটের কাজ।

১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ডঃ জে, উড, ম্যাসন আঞ্চলিক প্রাণীকুল ও উদ্ভিদকুল সম্বন্ধে গবেষণার জন্য আশ্রামান দ্বীপপুঞ্জে যান। ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতীয় সমুদ্রে এটিই প্রথম নথিভুক্ত গবেষণা। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় ভারতীয় মেরিন সার্ভে গঠিত হয়। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে সার্জন ও প্রকৃতি বিজ্ঞানী আর, বি, এস সিওয়েল ভারতীয় সমুদ্র সমীক্ষা শুরু করেন। বঙ্গোপসাগরের উপর তাঁর বিশদ গবেষণা এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের মোমোয়ার্সে (নবম বর্ষে) প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সংগৃহীত তথ্যই এখন পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের জৈব, রাসায়নিক, ভৌত এবং আবহাওয়া বিদ্যা বিষয়ের প্রাথমিক তথ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই অনুসন্ধানের কাজ বন্ধ রাখা হয়। পরে এই কাজ আবার শুরু হয়ে চলে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এইসব অনুসন্ধানের উপর গবেষণা করার ফলে দেশের সমুদ্র গবেষণা সম্বন্ধে প্রাথমিক বিষয় পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। অন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ১৯৫৫ সালের দিকে বঙ্গোপসাগরে বেশ কিছু গবেষণা চলেছিল।

IOE বঙ্গোপসাগরে সমুদ্র বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর গবেষণা করা হয়ঃ

১. ভৌত সমুদ্র বিজ্ঞান :

- ক. তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, ঘনত্ব এবং আপেক্ষিকমানের বন্টন।
- খ. জলরাশির ধরন নির্ণয়।
- গ. অব-পৃষ্ঠদেশের (Sub-Surface) জল সঞ্চালনের গতি, স্রোতের নিদর্শন এবং মিশ্রণ সম্পর্কে অধ্যয়ন।
- ঘ. পানির উর্ধ্ব ও নিম্নগমন প্রক্রিয়া।
- ঙ. তরঙ্গ, আভ্যন্তরীণ তরঙ্গ ও স্ফীতি (Swells) অধ্যয়ন।
- চ. সমুদ্র পানির আলোক ধর্ম-স্বচ্ছতা এবং আলোর ভেদনের ক্ষমতা।

২. রসায়ন সমুদ্র বিজ্ঞান :

- ক. পুষ্টিকর লবণের চক্র এবং বন্টন।
- খ. অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের বন্টন, বিস্তার, বিন্যাস।
- গ. জৈব রাসায়নিক সঞ্চালন।

- ঘ. বিভাজন বস্তু, রেডিও নিউক্লিয়াইডস, সূক্ষ্ম পদার্থ, যেমন স্ট্রনসিয়াম, সিজিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ, ইত্যাদির অধ্যয়ন।
 ঙ. সামুদ্রিক স্রোতের পরিচালন জানার জন্যে কার্বন^{১৪} সিজিয়াম^{১২}, এলুমিনিয়াম^{২৬}, বেরিলিয়াম^{১০} ইত্যাদি আইসোটোন অধ্যয়ন করা।

৩. সমুদ্র জীববিজ্ঞান এবং মৎস্য :

- ক. প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা এবং ফাইটোপ্লাঙ্কটনের মোট ফলন।
 খ. জোপ্ল্যাঙ্কটন এবং তলজীবী প্রাণীকুলের পরিমাণগত অধ্যয়ন।
 গ. মৎস্য ডিম্ব এবং শূককীটের বন্টন এবং মৎস্যের ডিম ছাড়ার ক্ষেত্র নির্ণয়।
 ঘ. জীবভূগোল বা প্রাণীজগতের বন্টন।
 ঙ. প্ল্যাঙ্কটনিক ব্লু (Bloom) এর অনুসন্ধান।
 চ. গুরুত্বপূর্ণ শারীর বৃত্তীয় দলের জীবাণু বিজ্ঞান পর্যালোচনা।

৪. আবহ বিদ্যা :

- ক. ঘটনার অনুক্রমবর্তিতা এবং ভারত মহাসাগরে ব্যাপক হারে মৌসুমী বায়ু প্রবাহের ব্যাপন স্থল সংক্রান্ত সম্পর্ক (Spatial relation) নির্ণয়।
 খ. উচ্চমাত্রার (১৫-৩০ কিলোমিটার) বায়ু প্রবাহের বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে তুলনা করা।
 গ. নিরক্ষীয় ঘূর্ণিবায়ু এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের বিকাশ অধ্যয়ন।
 ঘ. বঙ্গোপসাগরে মৌসুমী বায়ুগত নিম্নচাপ।
 ঙ. ভারত মহাসাগরে প্রভাব বিস্তারকারী নিম্ন বায়ুমণ্ডলে (troposphere) ব্যাপক হারে ভূমণ্ডলীয় বায়ু প্রবাহের ধরন অনুসন্ধান করা।

৫. সমুদ্র ভূ-বিদ্যা এবং ভূপদার্থ বিদ্যা :

- ক. তলদেশ বা সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়।
 খ. মহীসোপানে ভূপীকৃত তলানির প্রকৃতি ও উপাদান নির্ণয়।
 গ. মহাকর্ষ, চৌম্বকীয় এবং সিস্থমিক এক্সপ্রোরেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে বঙ্গোপসাগরে ভূপদার্থ বিদ্যাগত অনুসন্ধান চালানো।

সমুদ্র বিজ্ঞানের বিষয়

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে সমুদ্র বিজ্ঞানকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। ভৌত সমুদ্র বিজ্ঞান এবং সমুদ্র জীববিজ্ঞান। ভৌত সমুদ্র বিজ্ঞানে সমুদ্রকে একটি গতিশীল তরল বস্তু (যা আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃস্থ শক্তির উপর নির্ভরশীল) নামে অভিহিত করা হয়। এই বিষয়ের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে অববাহিকার গঠনের ধারণা এবং সমুদ্র স্রোতের রহস্য উদ্‌ঘাটন। এতে ভৌত সমুদ্র বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হচ্ছে : সমুদ্র পর্যায়ের (Basin) উৎস, ব্যাপকতা এবং প্রকৃতি, সমুদ্র তলদেশের ও উপকূলীয় অঞ্চলের

ভূপ্রকৃতির অনুসন্ধান, সমুদ্রের পানির ভৌত প্রকৃতি যথা লবণাক্ততা, তাপমাত্রা, চাপ, ঘনত্ব, সংনম্যতা (Compressibility), সান্দ্রতা (Viscosity), জলরাশি এবং এসবের সাধারণ বন্টন পদ্ধতি; সমুদ্রজলের তাপগতিবিদ্যা—বায়ু প্রবাহ, বায়ুতরঙ্গ, স্রোত প্রবাহ এবং সমুদ্র স্রোত; জলগতি বিদ্যা (hydrodynamics) পানির ভৌতধর্ম প্রকাশকারী নীতি ও তত্ত্ব—এই ভৌত সমুদ্র বিজ্ঞানের অন্তর্গত। আবহবিদ্যা অধ্যয়নের সময় সমুদ্র উপরিস্থিত বায়ুমন্ডলের হিসাব রাখাও বর্তমানকালের সমুদ্র বিজ্ঞানের পঠিতব্য বিষয়। সমুদ্রের বিরাট জলরাশির প্রসারের যে অংশটুকুতে বায়ুমন্ডল তথা বারিমন্ডলের ভাগ রয়েছে তাকে সমুদ্র আবহবিদ্যা বা মেরিন মেটোরোলজি বলা হয়। সমুদ্র আবহবিজ্ঞানকেও ভৌত সমুদ্রবিজ্ঞান থেকে আলাদা রাখা অসম্ভব ব্যাপার। বায়ুমন্ডল ও সমুদ্রের মধ্যে পারস্পরিক জটিল ক্রিয়ার সংমিশ্রণে সমুদ্র অঞ্চলে আবহাওয়া, জলবায়ু, সমুদ্রস্রোতের যে পরিবর্তন সাধিত হয়, প্রতিনিয়ত তার উপর নাবিকদের জীবনের নিরাপত্তা পুরোপুরি নির্ভরশীল বিধায় সমুদ্র আবহবিজ্ঞান অধ্যয়ন খুবই প্রয়োজনীয়। তাছাড়া বায়ুমন্ডলের চাপ, বাতাসের তাপমাত্রা, বায়ু, ঝড়-বৃষ্টি, হ্যারিকেনের উৎপত্তি, গতিপথ এবং বৃদ্ধির সূত্র, সমুদ্র স্রোত, হিমশৈল এবং আবহাওয়া চার্ট ইত্যাদি সমুদ্র আবহবিদ্যার অঙ্গ।

সমুদ্র বিজ্ঞানের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে সমুদ্রজীব বিজ্ঞান বা মেরিন বাইওলজি যা সমুদ্রে জীব ও উদ্ভিদের উৎস ও কারণ সম্পর্কে গবেষণা করে। পৃথিবীর মানুষ স্বীয় দেহে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে সমুদ্র খাদ্য বা সী-ফুড গ্রহণ করে থাকে। সমুদ্র জীববিজ্ঞানের অধিগত বিষয় হচ্ছে সামুদ্রিক জীবনের পরিব্যাপ্তি বা সীমানা, তাপমাত্রা ও সমুদ্র জলের গতির পরিবর্তনের সাথে সমুদ্রের প্রাণীকুলের গুড় সাড়া যা সমুদ্রের গভীরতা, অক্ষাংশ, বেগ এবং স্থলভাগের উপর সম্পর্কযুক্ত। তাছাড়া সমুদ্র জলের রাসায়নিক উপকরণ নির্ণয়, সামুদ্রিক জীব উদ্ভিদ ফ্রপ, প্র্যাক্টন, ভাসমান জীবন ও তাদের বন্টন, সমুদ্রের জীবপরিবেশ ইত্যাদি সমুদ্র জীব বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত বিষয়।

বর্ণিত মূল বিষয়গুলির পাশাপাশি সমুদ্র বিজ্ঞানের প্রতি ভৌগোলিক বিষয় বিবেচনায় নিচের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে :

১. সমুদ্র এবং আবহমন্ডলের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আবহাওয়ার উপর প্রতিক্রিয়া।
২. সমুদ্রে নৌ-চলাচলের সমস্যা এবং সম্ভাবনা।
৩. প্র্যাক্টিক খাদ্য সম্পদের বিকাশের সম্ভাবনা।
৪. বিশ্ব মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, উন্নতি এবং অন্য নতুন ধরনের খাদ্যের সন্ধান।
৫. সমুদ্র তলদেশে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন শক্তির রূপ উদ্ঘাটনের জন্য ভূপদার্থ বিদ্যাগত গবেষণা।

সমুদ্র বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয় : যদিও ভূগোলের মাটিতে সমুদ্র বিজ্ঞানের জন্ম, তথাপি এটি অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে ও যুক্ত রয়েছে।

১. ভূ-বিদ্যা বা ভূতত্ত্ব : মাটি ও পাথরের ইতিহাস এর অধিগত বিষয়। ভৌত সমুদ্র বিজ্ঞানের মূল ধারণাই হচ্ছে ভূবিদ্যা। সামুদ্রিক ভূবিজ্ঞানে রয়েছে সমুদ্র অববাহিকার উৎস বা উৎপত্তি, বয়স এবং উপাদান নির্ণয়, সমুদ্র পর্যায়ের উৎপত্তি এবং চিরস্থায়িত্ব, সমুদ্র তলদেশের প্রকৃতি।

২. সমুদ্র যেহেতু একটি গতিশীল তরল বস্তু, তাই এর তাপগতি বিদ্যাগত অনুসন্ধানের জন্য সমুদ্র বিজ্ঞান পদার্থবিদ্যা, গণিত এবং জলগতি বিদ্যার উপর নির্ভরশীল। প্রায়োগিক গণিতের বিভিন্ন নীতি, জলস্থিতি, জলগতি, সমুদ্র জলের বিভিন্ন গতি যথা, বায়ুচেউ, শ্রোত, জোয়ার এবং জোয়ার-ভাটা সমুদ্র তাপগতি বিদ্যার আওতাধীন।

৩. সমুদ্র বিজ্ঞান ও আবহবিজ্ঞান : পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের সাহায্যে আবহবিদ্যা কাজ করে থাকে। এই বিজ্ঞানের অধিগত বিষয়গুলো হচ্ছে সূর্যরশ্মির তাপীয় ফল (insolation)। সমুদ্রের তাপমাত্রা, তাপ বাজেট, চাপ নিম্ন আবহাওয়া মন্ডলে বায়ু পদ্ধতি এবং জলরাশির জীববিজ্ঞান, পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের সঙ্গে তাদের মিথস্ক্রিয়ায় সমুদ্র উপরিস্থিত আবহাওয়ামন্ডলে কি প্রভাব রাখে। শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের আবহাওয়া মন্ডলের অনুসন্ধান পর্যন্ত এটা গড়ায়। সমুদ্র বিজ্ঞান এবং আবহবিদ্যার এই আন্তঃসম্পর্কের জন্য পূর্বেরটাকে বিপরীতক্রম আবহবিজ্ঞান বলা হয়।

৪. রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা এবং উদ্ভিদ বিদ্যাও সমুদ্র বিজ্ঞানে অবদান রাখে। রসায়ন সামুদ্রিক বস্তুর উপাদান এবং পরিবর্তনের খবর রাখে। সমুদ্র জলের রাসায়নিক উপাদান, প্রাণী ও উদ্ভিদ জীবনের রাসায়নিক উপাদান এবং স্থানীয় জলের রাসায়নিক উপাদানের সঙ্গে তাদের কি সম্পর্ক তা নির্ণয় করে।

মেরিন জীব বিজ্ঞানের অংশ হচ্ছে প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদ বিদ্যা যা সমুদ্রের জলে বসবাসকারীদের পরিবেশগত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে।

৫. অধুনা সমুদ্র বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে এর উদ্ভূত সমস্যাবলির জন্য ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণের চাইতে ভূপদার্থবিদ্যাগত ধারণার প্রয়োগই ব্যাপকতর হচ্ছে। ভৌত-গাণিতিক নীতির জন্য এটা ভূ-পদার্থবিদ্যার অংশ হয়ে গেছে। সমুদ্রের তলদেশের অনুসন্ধান কাজের জন্য পদার্থগত অনুসন্ধান জোরেশোরে চলছে। এই গবেষণা কার্যক্রমে আছে : মধ্যাকর্ষণের পরিমাণ নির্ণয়, ভূকম্পীয় সঙ্গাবনা, তাপ সঞ্চালন মাপন, প্রবাল বলয়ের গঠন, আগ্নেয় দ্বীপ, গভীর সমুদ্রতলদেশের খাদের গঠন এবং সামুদ্রিক গঠন নির্ণয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমুদ্র বিজ্ঞান হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানের একটি সমারোহ যা বিভিন্ন সমস্যার প্রতি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নজর দেয়। আমাদের চারদিকের সমুদ্রের বিভিন্ন ঘটনাবলি বুঝার জন্য সমুদ্র বিজ্ঞান অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হয় অহরহ।

বাংলাদেশে সমুদ্র বিজ্ঞান শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা

মহাদেশগুলোতে বিরামহীনভাবে হাজার হাজার বছর ধরে প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলনের ফলে তার ভাগ্যের যখন ফুরিয়ে আসছে ঠিক তখনই পৃথিবীর মানুষ দৃষ্টি দিয়েছে সাগর মহাসাগরের দিকে। অনেক উন্নত দেশে এখন সমুদ্র নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে। পৃথিবীর দু'একটি দেশে যদিও এ ধরনের বিজ্ঞানকে মেরিন সায়েন্স (Marine science) হিসেবে গণ্য করা হয় কিন্তু সার্বজনীনভাবে সামুদ্রিক বিজ্ঞান এর আন্তর্জাতিক পরিভাষা হলো "ওসেনোগ্রাফি" (Oceanography)। ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে ওসেনোগ্রাফির উপর আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট, ফ্যাকাল্টি, বিভাগ ও গবেষণাগার রয়েছে। সামুদ্রিক বিজ্ঞান শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন মূলত পাঁচটি মুখ্য ক্ষেত্র নিয়ে গঠিত।

- ক. সামুদ্রিক পদার্থ বিজ্ঞান বা ভৌত সমুদ্রবিজ্ঞান
(Physical Oceanography).
- খ. সামুদ্রিক রসায়ন বিজ্ঞান বা রাসায়নিক সমুদ্র বিজ্ঞান
(Chemical Oceanography).
- গ. সামুদ্রিক ভূ-বিজ্ঞান বা ভূ-তাত্ত্বিক সমুদ্রবিজ্ঞান
(Geological Oceanography or Marine Geology).
- ঘ. সামুদ্রিক জীববিজ্ঞান বা জৈবসমুদ্রবিজ্ঞান।
(Biological Oceanography or Marine Biology).
- ঙ. সামুদ্রিক প্রকৌশল বিজ্ঞান বা প্রকৌশল সমুদ্রবিজ্ঞান।
(Marine Technology).

উন্নত দেশগুলি তাদের আওতাভুক্ত সমুদ্রসীমা থেকে আহরণ করছে নানাবিধ খনিজ সম্পদ, তৈল ও মৎস্য, শৈবাল ও অন্যান্য সামুদ্রিক খাদ্য। উন্নত প্রযুক্তি না থাকায় উন্নয়নশীল বিশ্ব সমুদ্র সম্পদ যথাযথভাবে আহরণ করতে পারছে না। তবে সবার উপলব্ধি হয়েছে যে, সামুদ্রিক সম্পদের ব্যবহার ছাড়া এই বিপুল জনসংখ্যাকে খাওয়ানো পরানো সম্ভব নয়। গভীর সমুদ্রে পড়ে আছে অপরিসীম সম্পদরাশি। উপকূলবর্তী এলাকায় তৈল উত্তোলন (offshore drilling) চলছে অনেক দেশে। সাগরের তলদেশে 'ম্যাসানিজ' খনিজ পদার্থ বেশি পরিমাণে মজুত আছে। তাছাড়া তামা, সীসা, বেরিয়াম, মলিবডেনাম ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু পাওয়া যায়। এই অফুরন্ত সম্পদের সন্ধান পাওয়ার জন্য ওসেনোগ্রাফি অধ্যয়ন আবশ্যিক।

বাংলাদেশ শুধু নদীমাতৃক দেশ নয়, সেইসাথে উপসাগরীয় নিম্নাঞ্চল দেশও। এর উপকূলভাগ উর্বর ও নানা প্রকার সম্পদে সমৃদ্ধ ও বটে। রয়েছে অনেক সম্ভাবনাময় Estuary বা সাগরের সাথে সংযোগ বিশিষ্ট ডোবা। পৃথিবীতে দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার যার বালিতে রয়েছে বহু দামি ধাতু বা পদার্থ। বন্যা, ঝড়, তুফান জলোচ্ছ্বাস, প্রাচীন সামুদ্রিক সাইক্লোন বা হ্যারিকেন এ দেশে লেগেই আছে।

মার্কিন গবেষক জোডি এল. জেকবসন (Jodi L. Jacobson) তাঁর এক গবেষণায় বলেছেন যে, (১৯৪৫-৭৫) এই ত্রিশ বছরে সামুদ্রিক ঝড়ে বাংলাদেশের

মোট ৭০০ কোটি ডলার (৪০ টাকায় ১ ডলার) সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে। এরপর রয়েছে গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে বিশ্বজোড়া ওজোন স্তর হ্রাস। পেট্রোলজাত পদার্থের বহুল ব্যবহারের ফলে আবহাওয়ায় ওজোন স্তরে ছিদ্র তৈরি হয়েছে। ফলে সূর্যের তাপ সরাসরি ভূপৃষ্ঠে পতিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও বিশাল এলাকা এতে আক্রান্ত হবে। আর ঠিক তখন বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে এন্টার্কটিকা, গ্রিনল্যান্ড ও উত্তর কানাডার বরফ গলে সমুদ্রে অতিরিক্ত পানি প্রবেশ করবে। অনুমান করা হয়, সমুদ্রপৃষ্ঠ ২০ ফুট উচু হবে। এশিয়ায় বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় বিপদের মুখে পড়বে। সমুদ্রের পানি পৃষ্ঠ মাত্র ৩ ফুট ফুলে উঠলেই বাংলাদেশের এক-দশমাংশ এলাকা ডুবে যাবে। বরিশাল ও খুলনা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত হবে। বঙ্গোপসাগরের উপকূল রেখা যশোহর, ফরিদপুর ও চাঁদপুর পর্যন্ত এগিয়ে আসবে। সাগরের পানি ৬ ফুট বাড়লে ফরিদপুরের ঢালু অংশ সাগরে পরিণত হবে। আর ৯ ফুট পানি বৃদ্ধি পেলে ঢাকার দক্ষিণাঞ্চল, কুমিল্লা ও সিলেটের হাওড়ালি সাগরের অংশে পরিণত হবে। যুক্তরাষ্ট্রের উডসহোল এসেনোগ্রাফিক ইনস্টিটিউটের গবেষক জন মিলিমান (John Miltman of Woods Hole Oceanographic Institute) তার যুগান্তকারী সমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে, গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া ও ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা ২০৯ সেন্টিমিটার (সাত্বে চারহাত) বৃদ্ধি পাবে।

ছাড়াও উপকূলীয় সাগরগুলির মধ্যে ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য ও পারিপার্শ্বিক স্থলভাগের পরিবেশের কারণে বঙ্গোপসাগর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এলাকা হিসেবে সমুদ্র বিজ্ঞানীদের নিকট চিহ্নিত হয়ে আছে। মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত বিধায় এই সাগরের পানি সমুদ্র সমতল থেকে নিম্নাভিমুখী। ঋতুভেদে প্রায় ২০০-৩০০ মিটার পর্যন্ত পানি স্তরের ভৌত রাসায়নিক ও জীব বৈশিষ্ট্যসমূহের পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের পরিবর্তনের ফলে এই অঞ্চলের সমুদ্রপৃষ্ঠের দ্রোণের দিক পরিবর্তিত হয়। ঋতুভেদে বায়ুপ্রবাহের পরিবর্তনের ফলে একই স্থানে এক ঋতুতে উর্ধ্ব পানি প্রবাহ (up welling) এবং পরবর্তী ঋতুতে সেখানেই পানির নিম্ন প্রবাহ (down welling or sinking) পরিলক্ষিত হয়।

বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র সমতলের (sealevel) অবস্থানের ঋতুভিত্তিক পার্থক্য পৃথিবীর সমুদ্রাঞ্চলের মধ্যে সর্বাধিক। এইসব অনন্য কারণেই বঙ্গোপসাগরের গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। তাছাড়া বহু গুরুত্বপূর্ণ ও সামুদ্রিক বৈশিষ্ট্য এই সাগরে রয়েছে যা অন্য কোনো সমুদ্রাঞ্চলে নেই। এতসব সমস্যার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণা করা একমাত্র সামুদ্রিক বিজ্ঞানের জ্ঞান দ্বারাই সম্ভব। সমুদ্র সম্পদের সত্ত্বা ও যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে সমুদ্রবিজ্ঞানের গবেষণা, অধ্যয়ন, উন্নয়ন ছাড়াও সমুদ্র বিজ্ঞানে পারদর্শী বিশেষজ্ঞ (সমুদ্র বিজ্ঞানী) তৈরি, সেইসাথে সামুদ্রিক প্রযুক্তির উন্নয়ন অত্যাৱশ্যক। আর তাই সমুদ্র বিজ্ঞানের গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন সমুদ্রবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট

স্থাপন করা। বাংলাদেশে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭১ সালে সামুদ্রিক জীববিদ্যা বিভাগ (Marine Biology Department) খোলা হয় এবং ১৯৮১ সালে বিভাগটি সামুদ্রিক বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের রূপলাভ করে। এ ইনস্টিটিউটের পাঠ্যসূচীতে রয়েছে : জীব পরিসংখ্যান (Bio-statistic), প্রতিবেশবিজ্ঞান, Ecology শরীরসংস্থান বিদ্যা, Physiology জীবজন্তুর আচার আচরণ (Animal Behaviour), শৈবাল এবং সাগর তলের প্রাণিকূল (Algae and Benthic Organisms), সামুদ্রিক মৎস্য চাষ (Marine Fisheries, সামুদ্রিক প্ল্যাঙ্কটন (Marine Plankton), মাছের জীবাণু বিজ্ঞান (Fisheries Microbiology), সামুদ্রিক বিজ্ঞান (Oceanography), পরিবেশ দূষণ বা মাছের রোগবিদ্যা (Environmental Pollution or Fish Pathology), মাংসা বিজ্ঞান (Ichthyology), মৎস্য চাষ প্রকৌশল (Aquaculture Engineering), ফলন পশ্চাৎ প্রতিস্থ (Post harvest technology), মাছ চাষ এবং ব্যবস্থাপনা (Fisheries Culture and Management), প্রসন্ধান এবং সামুদ্রিক সম্পদের উন্মোলন (Exploration and Exploitation of Marine resources), আবহাওয়া বিদ্যা (Meteorology), সমুদ্র নৌ-যাত্রা (Marine Navigation)। বক্ষ্যমান ইনস্টিটিউটের বিষয় নির্বাচন দেখে মনে হয় Marine Biology-এর উপর জোর দেয়া হয়েছে অত্যধিক। ওসেনোগ্রাফির বাকি ৪টি প্রধান বিষয় এখানে অনুপস্থিত, তাই এটা পূর্ণাঙ্গ সমুদ্রবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট নয়। অধিকাংশ শিক্ষক প্রাণবিদ্যা বিষয়ের। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে উপরের সবগুলি বিষয় পড়ানো যেতো। দরকার ছিল আসল সমুদ্রবিজ্ঞান শুরু করার। অথচ এদেশে সামুদ্রিকবিজ্ঞান শিক্ষার এত জরুরি প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও এর কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ও মূল্যায়নের প্রচেষ্টা আজও হয়নি। দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সামুদ্রিক বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট খুলে ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম ও ফিল্ডস্টাডি বা মাঠ পর্যায়ের কাজ সত্বর শুরু করা উচিত। ১৯৮৯ সালে সাইপ্রাস পতাকাবাহী জাহাজ এমডি কিলোথি বঙ্গোপসাগরে বিপুল পরিমাণে অপরিশোধিত তেল নিঃসরণ করে। তৎকালীন সরকার তেল দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব এবং ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেও অজ্ঞাত কারণে মাঝপথে এর কাজকর্ম বন্ধ করে দেন। সরকারের উচিত এসব সমস্যা সমাধানের জন্য সমুদ্র বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ দেয়া।

সমুদ্রবিজ্ঞান অত্যন্ত আধুনিক ও জটিল বিষয়, যেখানে বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখার কাজই অত্যাৱশ্যক। সমুদ্র সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হচ্ছে সমুদ্রবিজ্ঞানের কাজ। এই বিশ্লেষণে সমুদ্রের পানির সঙ্গে বায়ুমন্ডলের পারস্পরিক ক্রিয়া ও সমুদ্রের পানির সঙ্গে সমুদ্র খাতের সম্পর্ক, সমুদ্রের পানির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব গুণাগুণ, ভূতাত্ত্বিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সমুদ্রবিজ্ঞান শিক্ষায় ও গবেষণায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ ও প্রাণিবিজ্ঞান, ভূ-তাত্ত্বিক বিজ্ঞান, গণিত ও আবহাওয়া বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের প্রয়োজন। শুধু Marine Biology তে IOE অভিযানে রাশিয়ার জাহাজ “ভিতিজ” ৫ বৎসরে যেসব সমস্যার উপর

গবেষণা চালায় তার উপর এক নজর চোখ বুলালে বুঝা যাবে প্রতিটি ক্ষেত্রের সীমানা কি ব্যাপক। যেমন :

১. প্রবাহ এবং গভীর স্রোত (circulation and deep currents),
২. সমুদ্রের সীমান্ত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of ocean fronts),
৩. তাপ সাম্যতা এবং সমুদ্রের পানি বিনিময়তা (heat balance and water exchange in the Ocean),
৪. সমুদ্রপৃষ্ঠের আবহাওয়া মণ্ডলের স্তরের ভৌত বিদ্যা (Physics of the surface layers of the atmosphere above the Ocean),
৫. তলদেশের ভূমিরূপতা এবং গঠন (bottom relief and technics)।
৬. তলদেশে তলানী সঞ্চয় এবং পানিতে সঞ্চারমান কণাবালি (bottom sediments and particles suspended in the the water and connection with sedimentation)।
৭. সাগরে রাসায়নিক প্রক্রিয়া (Chemical processes in the Ocean)।
৮. সমুদ্রের উৎপাদনশীলতা নির্ণয়ের জন্য মাছ, প্রাঙ্কটন, তলাজীবীদের বিতরণ (distribution of fish, plankton and benthos to determine the productivity of the Ocean).
৯. ভৌত রাসায়নিক, জৈবিক বৈশিষ্ট্যাবলির ভৌগোলিক বিতরণ (Geographical distribution of Physical, Chemical and Biological characteristics)।
১০. পানি এবং তলদেশের বস্তুসমূহের তেজস্ক্রিয়তা (radio activity of the water and the bottom deposits).
১১. গবেষণা পদ্ধতির উন্নতিসাধন (improvement of research methods).

ভারত মহাসাগর তথা বঙ্গোপসাগরের উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও উপাত্তের (Data) পরিমাণ খুব একটা বেশি নেই। বিশেষকরে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের তুলনায়। ফলে বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র বিজ্ঞানের বহু রহস্য এখনও উন্মোচিত হয়নি। অবশ্য আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযান IIOE অনেক অজানা তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। এই অভিযানের উপাত্ত ব্যবহার করে কয়েক হাজার গবেষণা প্রবন্ধ ও দু'ডজন মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের ওপর সামুদ্রিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণার কোনো লক্ষ্য স্থির করেনি। মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রগুলির উপর ত্রিশ বৎসরে বহু স্টাডি করানোর পরও পর্যালোচনার অভাবে চূড়ান্ত রিপোর্ট আজও কার্যকর হয়নি। IIOE তে রাশিয়ানদের সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত নিয়ে ওয়ার্ল্ড ওসেনোগ্রাফির ডাটা সেন্টার মস্কো বি-তে রয়েছে। রাশিয়ানরা এ উপসাগরে দীর্ঘকাল ধরে বহু গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন। বাংলাদেশে বঙ্গোপসাগর নিয়ে ব্যাপক গবেষণার অন্য কোনো তৎপরতার কথা জানা যায়নি।

বাংলাদেশে সমুদ্র গবেষণা : বাংলাদেশে প্রথমবারের মত ১৯৮০ সালে একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমুদ্র গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ন্যাশনাল কমিটি ফর দ্যা এক্সপ্রোরেশন এন্ড এক্সপ্রোয়টেশন অব দ্যা রিসোর্সেস অব দ্যা সিজি এন্ড ওসেন (NCEERSO) কর্তৃক আয়োজিত “সমুদ্রবিজ্ঞান ও সমুদ্র সম্পদ” শীর্ষক এই জাতীয় সেমিনারে সামুদ্রিক সম্পদের অনুসন্ধান ও আহরণের জন্য প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সমুদ্রগর্ভে রয়েছে খাদ্য সম্পদ, প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল ও ধাতব পদার্থসহ বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান সম্পদ। স্থল এলাকায় যে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তারচেয়ে অনেক বেশি রয়েছে আমাদের সমুদ্রগর্ভে। এ সম্পদ আহরণের কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। সমুদ্র সম্পদ আহরণের জন্য অবশ্যই সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক। আমাদের দেশে সমুদ্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোক রয়েছে। তাঁদের প্রচেষ্টায় সম্পদ আহরণের প্রচেষ্টা অবশ্যই সফল হবে। সামুদ্রিক সম্পদ সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করে তুলতে হবে। সমুদ্র সম্পদের যথাযথ অনুসন্ধান ও আহরণের ব্যাপারে সেমিনার সঠিক দিকনির্দেশ করে। এ কারণে আয়োজিত সেমিনারটি খুবই গুরুত্ব পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই সেমিনারে জাতীয় ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে; দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এ ধরনের সেমিনার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সবাই এ সম্পর্কে জানতে পারে। অতীতে এ বিষয়ে কেবল ক’জন ব্যক্তি পৃথক পৃথকভাবে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। সেসবের ফল আমাদের জন্য তেমন উপকার বয়ে আনেনি। কেবল স্থলভাগের প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যাপকভাবে সামুদ্রিক সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণ করতে হবে। একাজে আমাদের অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিকে আরো সমৃদ্ধ করতে হবে।

এই সেমিনার ছাড়াও বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে সমুদ্র সম্পর্কিত যেসব সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

1. National marine fisheries seminar March 19-21, 1971. Chittagong university. দেশের প্রখ্যাত মৎস্য বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে এ সেমিনার আয়োজন করে এদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব দেশবাসীর নিকট তুলে ধরা হয়।

2. Training on Fresh Water shrimp (*Microbrachium rosenbergii*) Farming. 24 April-1 May 1989, Danido, Chittagong University) চিথিড়ি চাষের উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করে বাস্তবমুখী এবং বিজ্ঞানসম্মত ধারণা দেয়া হয়।

3. Innovated Technology for development of Prawn Hatchery. June 6-14, 1990, Marine Science Chittagong University. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় সার্ক দেশের বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে আয়োজিত এ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক কর্মশালায় চট্টগ্রাম চেষ্মার ডবনে টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ এবং কক্সবাজারে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

4 Package of state of the Art Technologies for upgrading shrimp production in Bangladesh, November 26-30, 1991 Chittagong University.

দেশের বিভিন্ন চিংড়ি খামার এবং ফিস প্রজেক্টের কর্মকর্তা এবং গবেষকদের নিয়ে ইউনেস্কোর সহযোগিতায় এই কর্মশালায় চিংড়ি চাষের উন্নতি সাধন নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সেমিনারের পর সমুদ্র ও মহাসমুদ্র সম্পদের অনুসন্ধান ও আহরণ সংক্রান্ত সরকারীভাবে গঠিত জাতীয় কমিটি কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে প্রথম অভিযান চলে ১৯৮০ সালের ১৮ থেকে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে সেন্টমার্টিনস দ্বীপ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে খুলনা-সুন্দরবন রায়মঙ্গল নদীর মোহনা পর্যন্ত ৩০৫ মাইল দীর্ঘ উপকূলের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে ২০০ মাইলব্যাপী অর্থনৈতিক জলাশয়ের যাবতীয় সম্পদসহ বিশাল সম্পদের উপর আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের অধিকার সংরক্ষিত। তাই বর্তমানে দেশের দক্ষিণের ৪০,০০০ বর্গমাইল সমুদ্র এলাকার পানিতে লুক্কায়িত সম্পদের গবেষণা ও আহরণের এক বিরাট মহাপরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

১৯৮০ সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ের সরকারিভাবে সমুদ্র ও মহাসমুদ্র সম্পদ অনুসন্ধান এবং আহরণ সংক্রান্ত একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির উদ্যোগেই ১৯৮০ সালের ১০ অক্টোবর ঢাকায় এ সংক্রান্ত একটি জাতীয় সেমিনারও অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, অনতিবিলম্বে বঙ্গোপসাগরের সম্পদের উপর ব্যাপক গবেষণা শুরু করা হবে এবং এ কাজ পরিচালনার জন্য চট্টগ্রামে একটি প্রধান গবেষণা কেন্দ্রসহ সেন্টমার্টিনস, কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও খুলনায় চারটি উপকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় তারপর দীর্ঘসময় অতিক্রান্ত হলেও সমুদ্র গবেষণা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।

১৯৫৮ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র সম্পদ নিরূপণে ১১টি জরিপ চালানো হয়। একটি জরিপ রিপোর্ট ১৯৯০ সনের আগস্ট মাসে মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়ের কাছে দেয়া হয়। বাংলাদেশের উপকূল থেকে ২শত মাইলের মধ্যে ৪৮ হাজার নটিক্যাল বর্গমাইল সমুদ্র এলাকা। এর মধ্যে ১ শত মিটার গভীরতম ৫ হাজার বর্গমাইল ফিলিং গ্রাউন্ড রয়েছে। এছাড়া ৪.৫ লাখ সামান্য লোনাযুক্ত জমি রয়েছে। কক্সবাজারের উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষোপযোগী ১ হাজার ৫শত কোটি টাকা মূল্যমানের ভারি খনিজ পদার্থ রয়েছে। পেশকৃত রিপোর্টে বঙ্গোপসাগরের বিশাল মৎস্য সম্পদ আহরণ, অপচয় ও চুরিরোধ, নতুন মৎস্য এলাকার সম্ভাবনার উল্লেখ রয়েছে। পেশকৃত রিপোর্টের উপর আজো কোনো নীতিমালা প্রণীত না হওয়ায় এ ব্যাপারে ব্যাপককোনো পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

১৯৮৯ সালের শেষের দিকে ঢাকাতে CARDMA (কোষ্টাল এরিয়া রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট এসোসিয়েশন) এর উদ্যোগে উপকূলীয় এলাকার

সম্পদের বিকাশ ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি 'জাতীয় কর্মশালা' অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক ১০টি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়।

১৯৯২ সালের ১৫ নভেম্বর ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয় ৪ দিনের একটি কর্মশালা। বাংলাদেশের জাতীয় ওসেনোগ্রাফিক ও মেরিটাইম, ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত এই কর্মশালায় Impact of rise in sea level due to global warming for the South Asian Region সম্পর্কে দক্ষিণ এশিয়ার বিজ্ঞানীরা আলোচনা করেন। ইউনোকোর ইন্টারগবর্নমেন্টাল ওসেনোগ্রাফিক কমিশন (IOC) এবং কেনিয়াস্থ ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রমেন্ট প্রোগ্রাম (UNEP)-এর উদ্যোগে একটি টার্ক টিম এই কর্মশালা পরিচালনা করে। ১ মিটার সমুদ্র পানির উচ্চতা বাড়লে বাংলাদেশের ১৬ শতাংশ সমুদ্র পানির নিচে চলে যাবে বলে এই কর্মশালায় আশংকা ব্যক্ত করা হয়।

গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রতি বৎসরই ঢাকাতে কোনো না কোনো সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবহারিক তথ্য ছাড়া সেমিনারগুলোতে বিদেশী তথ্যের ফলাফল নিয়ে বাংলাদেশের জন্য একটা গুরুতর সতর্কবাণী দেয়া হয়।

১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে ব্রিটেনের এক কনফারেন্সে বর্তমান লেখক যোগদান করেছিলেন। তখন লন্ডনে বিবিসির নতুন দিগন্ত নামে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এক অনুষ্ঠানে ১০ মিনিট ব্যাপী বাংলাদেশে সমুদ্র বিষয়ক গবেষণা ও বঙ্গোপসাগরের উপর প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন। এই ধরনের বিক্ষিপ্ত তৎপরতা ও নিঃসঙ্গ গবেষণা বাংলাদেশে এখনও চলছে। কোনো সামগ্রিক পরিকল্পনার অধীনে ভারতের মত বাংলাদেশে সমুদ্র গবেষণা হচ্ছে না।

জুলাই ১৯৯৪ সালে জার্মানির কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 'বিজ্ঞানী ও গবেষক কর্তৃক 'বাংলাদেশে ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস : বঙ্গোপসাগরে জরিপ' সম্পাদিত হয়েছে। বাংলাদেশের কয়েকজন বিজ্ঞানী তাঁদের এ কাজে সহায়তা করেছেন। বিশিষ্ট জার্মান বিজ্ঞানী কুড্রাসের নেতৃত্বে জার্মানির ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ জন গবেষক প্রথমবারের মত বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় এলাকায় বৈজ্ঞানিক জরিপ চালান। বাংলাদেশের তিনজন ভূতত্ত্ববিদ, নৌবাহিনী ও বি. আই. ডব্লিউ. টি-এর দু'জন সদস্য জার্মান দলের সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। বঙ্গোপসাগরের বদ্বীপ এলাকায় বছরে যে দুই বিলিয়ন টন পলিমাটি নামে সেগুলো কোথায় জমা হয় সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, হ্যারিকেন ও জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির কারণ নির্ণয়, বঙ্গোপসাগরের পানিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ নির্ণয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের উৎপত্তি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান, প্রাণিজগত ও বায়ুমণ্ডল হতে সমুদ্র তলদেশের পলিতে কি পরিমাণ কার্বন জমে উঠেছে তা নিরূপণসহ বিভিন্ন ধরনের জরিপ ও গবেষণা চালানো হয়। জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে এবং বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা কম্পিউটার ডাটা ভিত্তিতে গবেষণা চালিয়েছেন। দু'দেশের বিজ্ঞানীরা জার্মানিতে বসে একটি সমন্বিত রিপোর্ট প্রণয়ন করবেন। এই জরিপ থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ নিরূপণ ছাড়াও খনিজ ও মৎস্য সম্পদ সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য জানা যাবে।

১৯৮৩ সালে প্রশাসনিক পুনর্গঠনের পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগকে যে ১৮টি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার ৪ নম্বরটি হচ্ছে সমুদ্র বিজ্ঞানের উন্নয়ন। প্রতিবেদনে বলা হয় সৈকত বালি আহরণ কেন্দ্র, কক্সবাজার মূলত ফ্রোসিটের প্রয়োজনীয় সংশোধনের অভাবে নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হয় নি। অর্থাৎ জিরকন, রুটাইল, ইলমেনাইট, লিউক্সিন, মোনাজাইট, ম্যাগনেটাইট, গারনেট ইত্যাদি মূল্যবান ভারি খনিজ পদার্থ সৈকত বালি থেকে বাণিজ্যিকভাবে পৃথকীকরণ করা সম্ভব হয় নি। আর্থিক সহযোগিতার অভাবই এর কারণ।

মৎস্য পরিদপ্তরের অধীনে বাংলাদেশে (ক) সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প এবং (খ) সামুদ্রিক জীব গবেষণা স্টেশন কাজ করে চলেছে।

নোয়ামী বা ন্যাশনাল ওসেনোগ্রাফিক এন্ড মেরিটাইম ইনস্টিটিউট বর্তমানে বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ সংস্থার দেশী নৌকা পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধি ও লাভজনককরণে পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে পরামর্শদাতা হিসেবে ভূমিকা রাখছে। নোয়ামী বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলের সাম্প্রতিক পরিবর্তন এবং উদ্ভূত আর্থসামাজিক অবস্থার উপর একটি জরিপ চালায়। সংস্থার 'নোয়ামী জার্নাল' এবং 'নিউজ বুলেটিনে' প্রতিনিয়ত গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। নোয়ামীর সভা, সেমিনারে সমুদ্র আইন, বাংলাদেশের সামুদ্রিক সীমারেখা, বঙ্গোপসাগরে জলজ সম্পদের সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর মাঝে মাঝে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমুদ্র বিজ্ঞানের গুরুত্ব : গার্মেন্ট শিল্পের পর বাংলাদেশে রফতানি আয়ের দ্বিতীয় সেক্টরটিই হচ্ছে হিমায়িত চিংড়ি। রফতানি আয়ের প্রায় এক চতুর্থাংশই এখন চিংড়ি থেকে আসছে। সাতক্ষীরা জেলার ২.৫ লক্ষ একর উপকূলীয় জমিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিংড়ি চাষ করলে বছরে ১০,০০০ কোটি টাকা আয় করা সম্ভব। শুধু কক্সবাজার থেকেই বছরে ৫০০ কোটি টাকার চিংড়ি রফতানি করা যেতে পারে।

সেন্টমার্টিনস দ্বীপে প্রচুর শৈবাল দেখা যায়। শৈবাল সমুদ্র খাদ্য ও ভেষজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শৈবাল চাষ করা হচ্ছে। ওসেনোগ্রাফিক ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক নূরুদ্দিন মাহমুদ সেন্টমার্টিন দ্বীপে কোরালের উপর গবেষণা চালিয়ে ১১টি প্রজাতি চিহ্নিত করেছেন। বাংলাদেশের একমাত্র কোরালদ্বীপ সেন্টমার্টিন আজও অবহেলিত। বাংলাদেশে শৈবাল চাষ করা দূরে থাকুক প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত শৈবালকে কাজে লাগানো হচ্ছে না। সেন্টমার্টিনে ছড়িয়ে আছে মূল্যবান ওয়েস্টার (Oyster)। চীন ও জাপান ওয়েস্টার চাষের মাধ্যমে মুক্তা সংগ্রহ করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। বাংলাদেশে ব্যক্তি উদ্যোগে বা সরকারী উদ্যোগে এখনও মুক্তাচাষ শুরু হয়নি।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে জালের মত ছড়িয়ে আছে ২৩৫টি ছোট বড় নদ-নদী এবং ৫০০টি শাখা উপনদী ও খাল। আর দক্ষিণে ক্যানেল আকৃতির উপকূল ছুঁয়ে বিস্তৃত

হয়ে আছে ১০৫০ মাইল দীর্ঘ বঙ্গোপসাগর। সমুদ্র আর নদীগুলোতে রয়েছে বিচিত্র প্রাণী, লবণ, মৎস্যসহ অফুরন্ত ঝিনুক সম্পদ। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদকে উন্নয়নের নিমিত্তে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরের এই ঝিনুক সম্পদকে কাজে লাগানো যায়। প্রাচীন যুগ থেকে মানুষ ঝিনুককে পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে আসছে। ওয়েস্টার প্রজাতির ঝিনুক খেতে ছোট মাছের মত স্বাদ। ইউরোপ, দূরপ্রাচ্য ও আমেরিকার বাজারে এটি সমাদৃত। ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে ঝিনুকের তৈরি কারুশিল্পজাত দ্রব্য সৌখিন মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঝিনুক থেকে চুন তৈরি হয়, শাখা, আংটি, বোতাম, কাফলিং, লকেট, খেলনা, বাতি, ফুলের তোরণ, এট্রেই ইত্যাদি তৈরি হয়। সামুদ্রিক ঝিনুকে মুক্তা তৈরি হয়। তাই ঝিনুকের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষায় বঙ্গোপসাগরের গুরুত্বঃ বাংলাদেশের নৌ সীমান্ত রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণের সুবিধা না থাকায় অর্থনৈতিক সীমা (EEZ-Exclusive Economic Zone) ২০০ মাইল পুরোপুরি পাহারা দেয়া বর্তমানে সম্ভব হচ্ছে না। একটি যুদ্ধজাহাজ যদি ১০ নটস গতিতে চলে এবং একটি রাডার ১০ বর্গমাইল জায়গা পর্যবেক্ষণ করতে পারে তাহলে ৯দিন লেগে যাবে পুরো ২০০ মাইল টহল দিতে। অর্থাৎ প্রতি ২৪ ঘন্টায় পুরো ২০০ মাইল পাহারা দিতে লাগবে এক সাথে ৯টি জাহাজের। অথচ এই পরিমাণ জাহাজ আমাদের হাতে নেই।

একটি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে তার সমুদ্র সীমা অটুট রাখার গুরুত্ব অপরিসীম। ভৌগোলিক দিক দিয়ে বঙ্গোপসাগর একটি উপসাগর হলেও স্বচ্ছ উপসাগর ও কাষিয়া উপসাগরের মতই রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ। একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। জিওপলিটিক্স তত্ত্বের মত শক্তিশালী পৃথিবী শাসন করবে দুর্বলেরা নয়। বাংলাদেশকে তিনদিকে ঘিরে আছে প্রতিবেশী বৃহৎ দেশ ভারত। আরেক প্রতিবেশী শক্তিশালী দেশ চীন। চীন চায় বার্মা হয়ে বঙ্গোপসাগরে বের হতে। চীন ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষিতে চীনা সৈন্যদের বাংলাদেশ অভিযুক্ত অভিযান অসম্ভব নয়। এমনকি বার্মা-বাংলাদেশ যুদ্ধের আশংকাও অমূলক নয়। দক্ষিণ এশিয়ার এই ভৌগোলিক অঞ্চলে যেকোন সর্বাঙ্গিক যুদ্ধ আরম্ভ হলে বৃহৎ পরাশক্তি বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত ভূখণ্ডকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের জন্য দখল করার লক্ষ্যে সৈন্য প্রেরণ অসম্ভব নয়। তার কারণ, বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের দীর্ঘ উপকূলীয় অঞ্চল পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ এক সামুদ্রিক বন্দর ও শক্তিশালী নৌঘাঁটি স্থাপনের জন্য বিশেষ উপযোগী।

ভারত মহাসাগরকে বৃহৎ ও পরাশক্তিগুলি নিজেদের প্রভাব বলয়ে আনতে চায়। ভবিষ্যতে বিশ্বযুদ্ধ (অর্থনৈতিক কারণে) শুরু হলে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত বৃহৎ শক্তির সামরিক ঘাঁটি থেকে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবে এবং তাতে

বাংলাদেশসহ ছোট ছোট দেশগুলোর স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা চরম সংকটের মুখোমুখি হয়ে পড়বে।

প্রতিটি জাতির নিজের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা বা বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। ১৯৮৯ সালে ভারত ১ বৎসরের জন্য নেপালের সমুদ্র বাণিজ্য কোলকাতা বন্দর দিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। এতে পার্বত্য ছোট দেশটি প্রচণ্ড বিপদে পতিত হয়। সার্বভৌমত্বের প্রয়োজনে আমাদের সমুদ্র বহিঃস্বার সবসময় খোলা রাখতেই হবে। এক্ষেত্রে আমাদের শক্তি জনবলকে কাজে লাগাতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন অঙ্গনে। সুতরাং স্বাধীনতা রক্ষার্থেও বঙ্গোপসাগরের উপর আমাদের গবেষণা চালাতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্গোপসাগরের ভৌত সমুদ্র বিজ্ঞান

(Physical Oceanography of the Bay of Bengal)

বঙ্গোপসাগরের ভৌগোলিক পটভূমি

সূচনা : ভৌগোলিক সংজ্ঞানুসারে বঙ্গোপসাগরসাগরটি নামে উপসাগর হলেও পৃথিবীর বৃহত্তম প্রধান সমুদ্রগুলির মাঝে অন্যতম। তার কারণ হলো —

(১) বৃহত্তম পলল পূর্ণ ভূ-অধঃ ভাঁজ (sedimentary fill geosyncline) এমনটি আর কোথাও নেই;

(২) এমন বৃহত্তম উপসাগরীয় বদ্বীপ এলাকা ও (subaerial delta) অন্য কোনো সাগরের নেই যেমনটি গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র নদীর শাখা প্রশাখা দিয়ে গঠিত হয়েছে;

(৩) এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ উপবদ্বীপ, যেমন গভীর সমুদ্রে অবস্থিত (largest deep sea fan complex in the world), মহাদেশীয় সোপান (continental shelf) এবং অতলম্পর্শী মহীখাদ থেকে এই গভীর সামুদ্রিক উপবদ্বীপ দৈর্ঘ্যে তিন হাজার কিলোমিটারের মত। পৃথিবীর অন্য যে কোনো সাধারণ গভীর সামুদ্রিক উপবদ্বীপের চাইতে বেঙ্গল ডিপ-সি ফ্যান এক মাত্রা বৃহত্তর। কালিফোর্নিয়ার লা-জোলা সামুদ্রিক উপ-বদ্বীপ পুরাপুরিই বঙ্গোপসাগরের অতলম্পর্শী মহীখাদে ঢুকে যাবে।

(৪) বঙ্গোপসাগরের সবচাইতে তাৎপর্যময় ভূমিরূপগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ৩১° দক্ষিণ ১০° উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত নব্বই ডিগ্রী পূর্ব শৈলশিরার (ninety east ridge) উপস্থিতি যা এই সাগরকে দু'খণ্ডে বিভক্ত করেছে; যথা- প্রধানটি পশ্চিমীয় বাংলা উপ-বদ্বীপ (Western Bengal Fan) যা নব্বই ডিগ্রী পূর্ব শৈল শিরার পশ্চিমে অবস্থিত; দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিকোবর উপ-বদ্বীপ যা “নব্বই ডিগ্রী পূর্ব শৈলশিরার পূর্বে এবং সুমাত্রা ও সুন্দা পরিখার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত।

পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশের উপকূলভাগ হতে আরম্ভ করে সিংহলের দক্ষিণ অংশ ও সুমাত্রার সর্ব উত্তর বিন্দু সংযোজনকারী রেখার মাঝে এই জলরাশির অবস্থিতি। ভারতের তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ ও উড়িষ্যার উপকূল এবং মায়ানমার বা বার্মার পশ্চিম উপকূল হতে আন্দামান নিকোবর এবং দক্ষিণে সিংহল দ্বীপ হতে সুমাত্রাদ্বীপের উত্তর সীমা বরাবর সীমাবদ্ধ এই ২.২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট জলরাশির বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর বিরাট প্রভাব রয়েছে। বস্তুত একদিকে যেমন

বাংলাদেশের উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ততা এবং বন্যার জল নিষ্কাশনের বিলয়ের জন্য মূলত বঙ্গোপসাগরের প্রাকৃতিক অবস্থাই কারণ; আবার বঙ্গোপসাগরই জলপথে বিশ্বের সাথে সংযুক্ত করেছে বাংলাদেশকে আর বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক মৎস-সম্পদ আহরণ করে বাংলাদেশ তার খাদ্য সমস্যার বিশেষ করে প্রোটিন ঘাটতির বহুলাংশ সমাধান করতে পারে। তাছাড়া বঙ্গোপসাগরের উত্তর পূর্ব কোণে বিস্তৃর্ণ মহাদেশীয় সোপানে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। এসব রয়েছে সমুদ্রের বেশ গভীরে। এইসব কারণে বঙ্গোপসাগর ও বিশেষ করে বাংলাদেশের উপকূলীয় অংশের সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা ও অনুসন্ধান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভৌগোলিক অবস্থান : বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগরের উত্তর-পূর্ব দিকে একটি তুলনামূলক অগভীর খাত তৈরি করেছে যার অবস্থান ৫° - ২২° দক্ষিণাংশ এবং ৮০° - ৯৫° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। আয়তনের দিক থেকে সাগরটি ৮ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার চারশত পঁচিশ $৮,৪৯,৪২৫$) বর্গ মাইল বা $২,১৭২,০০০$ বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে আছে এবং এর সীমা ভারত, শ্রীলঙ্কার পশ্চিম ভাগ, বাংলাদেশের উত্তর উপকূল, বার্মা ও মালয় উপদ্বীপের পূর্ব পর্যন্ত। আন্তর্জাতিক জললেখ বিজ্ঞান ব্যুরোর (International Hydrographic Bureau) সংজ্ঞানুযায়ী দক্ষিণ শ্রীলঙ্কার শীর্ষ বিন্দু দন্ড্রা(Dondra) থেকে সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর ভাগ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের বিস্তৃতি এবং ভারত মহাসাগরের মধ্যভাগ পর্যন্ত উন্মুক্ত। প্রস্থে বঙ্গোপসাগর প্রায় ১০০০ মাইল (২৫৬০ কিলোমিটার) এবং গড়ে ২৬০০ ফুটেরও (আধামাইল) বেশি গভীর। সর্বোচ্চ গভীরতা হচ্ছে $১৪,৭৬৪$ ফুট ($৪,৫০০$ মিটার বা পৌনে তিনমাইল)। জাতিসংঘের সম্মেলনের সুপারিশমালার ভিত্তিতে ১৯৭৪ সনে বাংলাদেশ বেলাভূমি থেকে ২০০ মাইল সমুদ্র অভ্যন্তর পর্যন্ত “বহির্ভূত বা একান্ত অর্থনীতির অঞ্চল” (Exclusive Economic Zone) বলে ঘোষণা করেছে। এতে বঙ্গোপসাগরের $২৪,৮০০$ বর্গ মাইল এলাকা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের অধীনে ন্যস্ত হয়েছে। এ এলাকায় বাংলাদেশ জীবন্ত ও জড় সব ধরনের সম্পদরাশি উত্তোলন, আহরণ, পরিচর্যা এবং জাতীয় জীবনে এর ব্যবহার করার অধিকার রাখে।

উত্তর দিকে গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র। পূর্বদিকে ইরাবতী, পশ্চিম দিকে (গোদাবরী, মহানদী, কৃষ্ণা এবং কাবেরী বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ হচ্ছে এ সাগরের একমাত্র দ্বীপমালা। প্রধান বন্দর হচ্ছে বাংলাদেশের মংলা ও চট্টগ্রাম, ভারতের কলিকাতা, কাডালোর, কাবিনন্দা, মসলীপত্তম, মাদ্রাজ, পারাদীপ এবং ভিসাখাপত্তম।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এ সাগরে বৈজ্ঞানিক অভিযান শুরু হয় এবং “আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগরীয় অভিযানের” (International Indian Ocean Expedition) আওতায় ইউনেস্কো কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষায় ১৯৬০ - ১৯৬৫ সনে বঙ্গোপসাগরেও গবেষণাকর্ম চালানো হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের “ভিভিজ” এবং “পাইওনিয়ার” এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “আগুন ব্রু” এবং ভারতীয় ও পাকিস্তানী

জাহাজ এতে অংশ নেয়। ভারতের অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম উপকূলে বিশদ গবেষণা ও অনুসন্ধান কাজ চালিয়েছিল।

বঙ্গোপসাগরের বিবর্তন : বঙ্গোপসাগরের বিবর্তন শুরু হয়েছে ২০ কোটি বৎসর পূর্বে গভোয়ানা মহাদেশের ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে। দক্ষিণ মহাসাগর থেকে ছুটে এসে তিব্বতীয় ভূখণ্ডের সঙ্গে ভারত বর্ষীয় প্রেটের ধাক্কায় হিমালয় জেগে ওঠে ছয় কোটি বৎসর পূর্বে। ইয়োসিনকালে (ছয় কোটি বৎসর আগে) রংপুরের উচ্চভূমি অঞ্চল ছাড়া বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থান সমুদ্র গ্রাসের আওতায় আসে। তখন দুটি উপসাগর ছিল বাংলাদেশে যথা সিলেট উপসাগর ও বগুড়া উপসাগর। তারপর বাংলাদেশের রূপরেখায় বরেন্দ্র, মধুপুর, ঝালমাই অঞ্চলের উদ্ভব ঘটে। আলিগোসিন কালে (চার কোটি বছর আগে) আসাম ও তৎসন্নিকটবর্তী অঞ্চলে যে ভূ-আন্দোলন সংঘটিত হয়, তার ফলে তৎকালীন সমুদ্র আসাম এবং সিলেট অঞ্চল থেকে অনেক দক্ষিণে সরে আসে। মায়োসিনকালের (আড়াই কোটি বৎসর আগে) প্রথম দিকে পুনরায় সমুদ্র গ্রাস সংঘটিত হয় এবং তৎকালীন “রংপুর ঢাল” ছাড়া প্রায় সমগ্র বাংলাদেশই এর আওতায় চলে আসে।

গারো রাজমহল খাত সৃষ্টি হবার পর মায়োসিনকালের কোনো এক সময়ে ব্রহ্মপুত্র নদী সম্ভবত পশ্চিম হতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বদিকে বয়ে নিয়ে তার বিপুল জলরাশি সাগরে সঁপে দিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর তলানি বিসর্জন দিয়েছে। প্রাপ্ত ভৌগোলিক নিদর্শন থেকে এটা বলা যায় যে, কোনো এক সময়ে রাজমহল পাহাড় থেকে পূর্ব দিকের পুরো এলাকা এবং উত্তরের শিলং উপত্যকা সাগর দ্বারা বেষ্টিত ছিল প্রাইস্টোসিনকাল (দশলক্ষ বৎসর আগে) থেকেই বর্তমান বঙ্গভূমি জলরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছিল। ভূতাত্ত্বীয় ইতিহাসে বঙ্গোপসাগর এরকম বহুবার তার সীমানা উত্তরে প্রসারিত করেছে আবার দক্ষিণে সরে এসেছে।

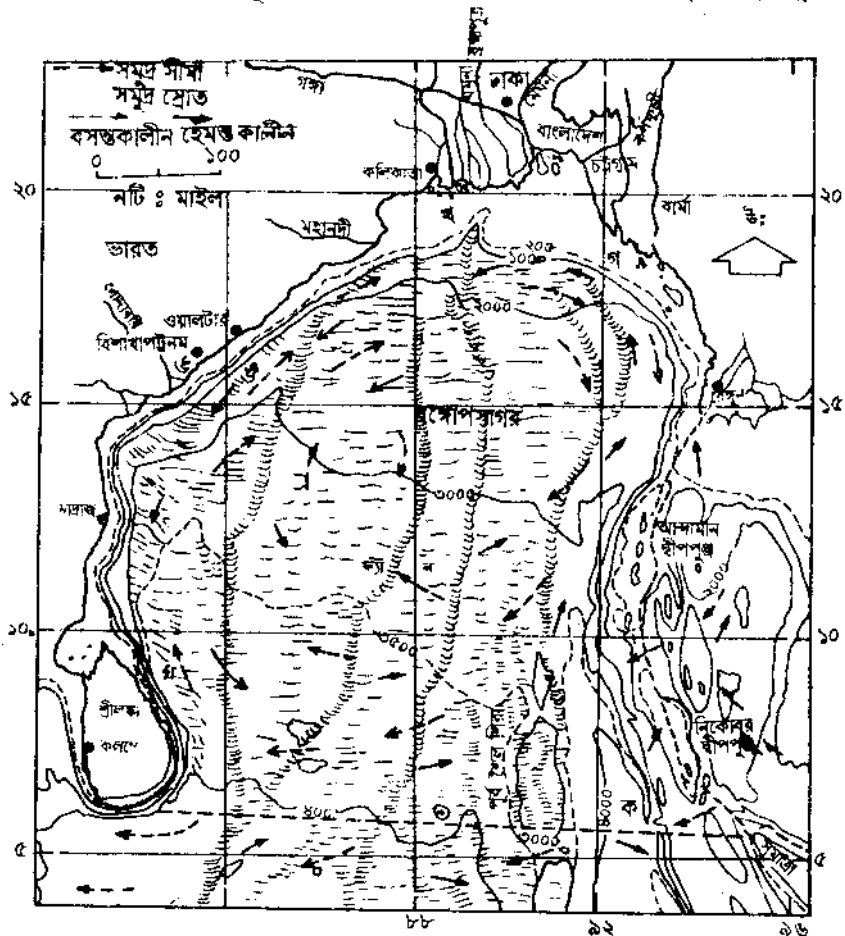
বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রগবেষণার ইতিহাস

৬০ খ্রিস্টাব্দে মিশরবাসী একজন গ্রীক বণিক এবং নাবিকের বই “Periplus of the Erythraean sea” হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রপ্রান্ত, জলবায়ুর উপর প্রথম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। এরপর গ্রীক এবং রোমানরা বঙ্গোপসাগর হয়ে চীন পর্যন্ত জলপথের বর্ণনা দিয়েছে। আরবরা রজনীর সিন্দাবাদের একটি অভিযান যে, বঙ্গোপসাগর হয়ে সুমাত্রা বা জাভায় শেষ হয়েছিল তা টিম সেবেরিনের গবেষণায় ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। ভৌগোলিক আবিষ্কারে গবেষকদের মতামত হচ্ছে এই যে, সিন্দাবাদ ভারত মহাসাগরে শ্রীলংকা, মাদাগাস্কার, বার্মা বা আন্দামান নিকোবর এবং জাভা, সুমাত্রার এলাকায় তাঁর ৭ টি জগৎবিখ্যাত অভিযানের অন্তত পাঁচটি সম্পন্ন করেছিলেন। আরবরা সমুদ্রপথে যাতায়াত করে উপকূল দ্বীপ প্রবালে এবং প্রবাল দ্বীপে, বায়ু, মৌসুমী বায়ু, সমুদ্রের দিক-নির্দেশনা ইত্যাদির উপর প্রভূত জ্ঞান লাভ করেছিল যা তাদের রচিত ভারত মহাসাগরের উপর বইয়ের সংখ্যা দেখে বুঝা যায়। পঞ্চদশ শতকে চীনা এডমিরাল জেংহি ভারত মহাসাগরে পঁচিশ বছর ধরে ৭ বার

অভিযান পরিচালনা করেন। সে সময় তিনি প্রত্যেকটি সাগর, উপসাগরের উপর মানচিত্র প্রণয়ন করেছিলেন যার অস্তিত্ব আজ আর নেই। তবে পরবর্তীকালে চীনারা যেসব মানচিত্র তৈরি করেছিল তা ছিল জেংহির মানচিত্রের উপর ভিত্তি করে প্রণীত। এরপর ইউরোপীয়রা এ অঞ্চলে আগমন করে। ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ম্যান্দারের আঁকা মানচিত্রে 'ভারত মহাসাগর' নামটি প্রথমবারের মত উল্লেখ করা হয়েছিল। ১৭৭২-১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে জেমস বুবার অভিযানের সময় ১৮০ মিটার গভীর পর্যন্ত সমুদ্র জলের তাপমাত্রা নির্ণয় করা হয়। ১৮৩১-১৮৩৬ সালে চার্লস ডারউইন ভূতাত্ত্বিক, জীববিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞানের উপর ভারত মহাসাগরে গবেষণা চালান। ১৮৫৭-১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গোপসাগরে ইংরেজরা সমুদ্রের তলদেশে টেলিফোন লাইন বসান। এ পর্যন্ত ছিল বঙ্গোপসাগর তথা উত্তর পূর্ব ভারত মহাসাগরের বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের প্রথম কাল। ইংল্যান্ডের "চেলেনঞ্জার" জাহাজ দ্বারা ১৮৭৩-১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারত মহাসাগর তথা বঙ্গোপসাগরের বিশদ বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্য দিয়ে সামুদ্রিক গবেষণার দ্বিতীয়কাল শুরু হয়। পঞ্চাশ খণ্ডে ৩০ হাজার পৃষ্ঠায় ভৌত-রাসায়নিক, ভূতাত্ত্বিক-জীব সামুদ্রিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের গবেষণালব্ধ তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর ১৮৭৪-১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানির জাহাজ "গাজেল" এ সাগরে জীববিজ্ঞান ক্ষেত্রে গবেষণা চালানো হয়। এসব গবেষণার পর ১৮৮১ সালে এম রিকার্ডের এবং ও. ক্রুমেল এবং ১৮৯৫ সালে ড. মেয়ের কর্তৃক প্রথমবারের মত ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন অংশের গভীরতা মাপক (bathymetric) চার্ট তৈরি করা হয়। ১৮৮৫ সাল থেকে ভারত মহাসাগরের উত্তর অংশ (বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে) ভারতীয় জাহাজ "ইন্ডেপেন্ডেন্ট" সামুদ্রিক গবেষণা চালায়। ১৯০২ সন পর্যন্ত এই জাহাজে করে বঙ্গোপসাগরের তলদেশের বিভিন্ন অংশের পরিমাপ এবং তলদেশে সঞ্চিত তলানী এবং জীব বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সমস্যার উপর গবেষণা করা হয়। ১৮৮৭ সনে রুশ জাহাজ "ভিতিজ" এ. সি. ও. সাকারভ কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক বিজ্ঞান গবেষণার কাজ চালানো হয়। ১৮৯৮-১৮৯৯ সালে জার্মানি "ভালস্কিভিয়া" জাহাজে করে ১২৯ টি স্টেশনে আবহাওয়া ও জীব বিজ্ঞানের উপর উত্তর ভারত মহাসাগরে তথা বঙ্গোপসাগরে গবেষণা চালায়। জার্মান বিজ্ঞানী জি. সট (G. Schott) ১৯০০ সালে বঙ্গোপসাগরের তলদেশের মাপ প্রণয়ন করেন। তাঁর প্রণীত দুটি বই *Geographie des indischen and stillen Ozeans*, Hamburg (Boysen), 1935; G. Schott : (1941) : *Handbuch für das Bengalische meer* খুবই বিখ্যাত বই; তবে ইংরেজিতে অনূদিত না হওয়ায় তা আমাদের জানার বাইরে রয়ে গেছে।

১৯০৬-১৯০৭ সালে জার্মান জাহাজ "প্লানেট" বঙ্গোপসাগর হয়ে পূর্ব ভারত মহাসাগরে আবহাওয়ায় জলানুসন্ধান বিজ্ঞান (Hydrology) এবং পানি রসায়ন (Hydro chemical) সমস্যা নিয়ে গবেষণা চালায় এবং ১৯১২ সালে এম. গ্রল সমুদ্র তলদেশের গভীরতা মাপক মাপ প্রণয়ন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিধ্বনির মাধ্যমে গভীরতা নির্ণয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে (Echolocator) ১৯২৮- ৩০ সনে ডেনমার্কের "ডানা" জাহাজ ভারত মহাসাগরে অনুসন্ধান চালায়। তারা পানির

তাপমাত্রা, গভীর পানির লবণাক্ততা, দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ, জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি সংগ্রহ করে। ফরাসীরা 'কমভান্ট শারকো' (১৯৪৯-১৯৫০), লাগেরুজ (১৯৫০-১৯৫১), নরসেল (১৯৫৫-১৯৫৬) জাহাজে করে মধ্য ভারত মহাসাগরে গবেষণা চালায়। ১৯৫০-৫২ সনে একই সাথে দুটি অনুসন্ধান কাজ চালানো হয়। প্রথমটি ডেনমার্কের 'গ্যালাটেয়া' জাহাজে করে বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল পর্যন্ত যায় এবং দ্বিতীয় জাহাজ ইংল্যান্ডের "চেলঞ্জার-২" উত্তরে ভারত মহাসাগরে গবেষণা পরিচালনা করে। এ প্রকল্পে ভূকেন্দ্রের গঠন এবং মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ (relief) নির্ণয়ের কাজ করা হয় (চিত্র ২.১ দ্রষ্টব্য)।



চিত্র ২.১ : বঙ্গোপসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ (সমোচ্চ রেখা টাটকে)।

- (ক) ইন্দোনেশিয়ান ট্রেঞ্চ, (খ) অভিলম্বশী মহীখাদ, (গ) বর্ম গিরি খাত
(ঘ) ত্রিকোণালী গিরিখাত, (ঙ) অক্ষমহাদেভাস ও কন্কণ গিরিখাত (অক্স মহীসোপান)।

১৯৩৫ সনে জার্মান G. Schott এবং রাশিয়ান A. M. Muromsev ভারত মহাসাগরের বিশেষ করে জলানুসন্ধান বিজ্ঞানের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। ১৯৫৭-৫৯ সালে রাশিয়ানরা 'ওব' জাহাজে করে ভারত মহাসাগরে ভূতাত্ত্বিক, প্রাণি-পদার্থ, প্রাণি জীববিজ্ঞানের বিষয়ে গবেষণা করেন।

সমুদ্র বিজ্ঞান গবেষণার সর্ববৃহৎ অভিযানটি চালানো হয় জাতি সংঘের 'ইউনেস্কো' কর্তৃক তার সমুদ্রবিজ্ঞান কমিশনের দ্বারা। এই প্রকল্পের নাম (International Indian Ocean Expedition (IIOE) যা চলে ১৯৬০-১৯৬৫ পর্যন্ত ছয় বৎসর ধরে। বঙ্গোপসাগরসহ পুরো ভারত মহাসাগরে ২০টি দেশ অনুসন্ধান চালায়। এর আগ পর্যন্ত মাত্র ১৫০০টি স্টেশনে অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল। আর IIOE এর ক্ষেত্রে ৭০০০ স্টেশনে কাজ চলেছিল। এর মধ্যে অর্ধেক ছিল গভীর সমুদ্রে অবস্থিত। এই প্রকল্পে সোভিয়েত ইউনিয়নের ১০টি জাহাজ অংশ নেয়, যার মধ্যে 'ওবি; 'আকাডেমিক ব্যাচাতভ', 'দিমিত্রি মেন্ডেলিভ' আকাডেমিক ভেরনাদস্কি মিখাইল লমসসভ' ছিল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা জাহাজ। রাশিয়ানরা বঙ্গোপসাগরে এক বিশাল কর্মকাণ্ড চালায়। এ সময়ে পানির গতিশীলতা অনুপ্রবাহ গভীর স্রোতের ধরন সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য পাওয়া যায়। রাশিয়ানরা প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের মত বঙ্গোপসাগরের গভীরে প্রতিমুখীন স্রোতের সন্ধান পায়। তারা সমুদ্রের তলদেশের ছবি তুলে। সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপতার চিত্রে শৈলশিয়ার ও গহবরের তলের, নাগীর, মহীসোপান ও মহাদেশের অবতলনের ছবি পাওয়া যায়।

আমেরিকান জাহাজ 'আরগো', 'হরিজন্ট (ক্রীবাস অসেনোগ্রাফিক ইনস্টিটিউট), 'ভিমা, 'রবার্ট কনরাড আর্থন ব্রাউন', আটলান্টিক-২, 'চেইন' (উডহোল ওসেনোগ্রাফিক্যাল ইনস্টিটিউট) IIOE-এর অধীনে প্রধানত ভূতাত্ত্বিক ভূভৌত অনুসন্ধান কাজ চালায়। 'আর্থন ব্রাউন' জাহাজে জীব বিজ্ঞান গবেষণা কাজ চালানো হয়েছিল।

ইংরেজরা উত্তর-পশ্চিম ভারত মহাসাগরে তাদের কাজ সীমাবদ্ধ রাখে। অস্ট্রেলিয়া তার সীমান্ত সংলগ্ন মহাসাগরে অনুসন্ধান চালায়। আর জাপানিরা উত্তর পূর্ব ভারত মহাসাগরে 'মাছ' নিয়ে গবেষণা অনুসন্ধান করেছিল। ভারত 'কিছুৎনা' 'বরুনা', 'কালাগ', 'কঙ্ক' জাহাজে করে বঙ্গোপসাগরে ও আরব সাগরে অনুসন্ধান চালায় (তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, পানি-রসায়ন, আবহাওয়া, প্রাক্কটন ও মৎস আধার নির্ণয়)। পাকিস্তান 'জুলফিকার', 'মাখের' নামের দুটি জাহাজের মাধ্যমে তার নিজ উপকূল ভাগে ছোট ধরনের গবেষণানুসন্ধান কাজ চালায়। ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও তাদের সীমান্তে কাজ করে। পর্তুগাল মাদাগাস্কার প্রণালীতে গবেষণা চালায়। জার্মান বিজ্ঞানীরা উত্তর পশ্চিম ভারত মহাসাগরে মিটিয়র-২ নামক জাহাজে করে গবেষণা চালায়। ফরাসীরা 'কম্যান্ডান্ট রবোর জিরাজ' জাহাজে করে পূর্ব আফ্রিকার উপকূল, আরব সাগর, লোহিত সাগর, পারস্য ও এডেন উপসাগরে গবেষণা করে। এই প্রকল্পে বহু নতুন নতুন আবিষ্কার সংযোজিত হয়। সেসবের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে ৯০° পূর্ব শৈলশিয়ার আবিষ্কার অন্যতম।

IOE এর পরেও রাশিয়ানরা নিরক্ষীয় স্রোতধারা নিয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান চালিয়েছে। মার্কিনীরা ১৯৭২-৭৩ সনে ১৩০০ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট তলানির সন্ধান পেয়েছে। তারা প্রমাণ করেছে যে ২ কোটি ও ৪০-৫০ লক্ষ বছর পূর্বে দক্ষিণ মেরুর বিস্তৃত অঞ্চল বরফাবৃত ছিল। ফলে ভারত মহাসাগরে ঐ সময়ে পানি কম ছিল। এইসব গবেষণার ফলে বঙ্গোপসাগর তথা ভারত মহাসাগরের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস জানা সম্ভব হয়েছে। অনেক প্রপঞ্চ বুঝা সম্ভব হয়নি। আরও যেসব গবেষণা ও অভিযান চালানো দরকার এমন সব বিষয়বস্তু বা সমস্যা হচ্ছে... বঙ্গোপসাগরের (ভারত মহাসাগর) প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান; বিশেষ সময়ে বিশেষ স্থানে স্রোতের পরিবর্তনশীলতার কারণ, অস্ট্রেলিয়া এশিয়া, ও এন্টার্কটিকা মহাসাগরের মধ্য দিয়ে অন্য মহাসাগরগুলির সঙ্গে পানি বিনিময়ের প্রকৃতি; সাগর-মহাসাগরের উত্থানতা ও নিম্নজ্ঞনতার স্বরূপ; বঙ্গোপসাগরের জীবকুল ও উদ্ভিদবর্গের উৎপত্তির ইতিহাস; এই পানিরাশির জৌব উৎপাদনশীলতার মাত্রা; প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণ ইত্যাদি। এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব এখনও নির্ণয় করা হয়নি। তাই দরকার আরও অনুসন্ধান যা বাংলাদেশ গত দুই যুগেও কিছু করেনি। ২.১ চিত্রে বঙ্গোপসাগরের সামগ্রিক রূপ দেখানো হয়েছে।

বঙ্গোপসাগরের ভৌত সমুদ্র বিজ্ঞান বিষয়

শুধু মৌসুমী বায়ু (Monsoon) প্রবাহের জন্যই বঙ্গোপসাগরের ভৌত বিজ্ঞান বিশ্বের ওসেনোগ্রাফির ইতিহাসে অনন্য। বায়ুর রোগের দ্বারা, নিয়মিতভাবে, ব্যাপকহারে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ঋতু পরিবর্তন করা, যার ফলে সমুদ্রস্রোতের বৈশিষ্ট্য একটি পরিবর্তন আসে, সে শুধু মৌসুমী বায়ুর ফলেই। মৌসুমী রহস্য উদঘাটনের জন্য IOE ছাড়া ISMEX ও MONEX অভিযান এ অঞ্চলে পরিচালিত হয়েছে, তথাপি এসব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান খুবই অপ্রতুল। CCCO (the Joint Sea-IOC Committee on Climatic Changes and the Ocean) কর্তৃক পরিচালিত TOGA (Tropical Ocean and Global Atmosphere) এবং WOCE (World Ocean Circulation Experiment) দিয়ে মৌসুমী বায়ুর আন্তঃবার্ষিক পরিবর্তন এবং ক্রিয়া কৌশল যা দিয়ে এর পরিবর্তনশীলতা ও ভবিষ্যৎদ্বাণী করা যায় এমন সব কিছু উপাদান শনাক্ত করা গেছে। এই প্রোগ্রামের বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ :

- (১) বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন ঋতুতে সমুদ্র স্রোতের চক্র পদ্ধতি (Seasonal cycles of the Bay of Bengal current system)
- (২) সাগর পৃষ্ঠের তাপমাত্রার তারতম্য (Surface temperature Variations)
- (৩) সাগর পৃষ্ঠ স্তরের গতি বিজ্ঞান (Surface layer dynamics)
- (৪) সাগর এবং আবহাওয়ায়ামন্ডলের মধ্যে শক্তি বিনিময় (exchange of energy between the ocean and the atmosphere)
- (৫) সমুদ্র সমতলের পরিবর্তনশীলতা (Sea level variations)

- (৬) ঘূর্ণিজলের গতিবিজ্ঞান (dynamics of eddies) ও পরিবহণ ব্যবস্থা (a transport process)
- (৭) লম্বভাবে এবং দিগ্বলয় মিশ্রণ (Vertical and horizontal mixing)
- (৮) তাপমাত্রার বিস্তার (distribution of temperature)
- (৯) লবণাক্ততার ব্যাপকতা (distribution of salinity)
- (১০) উর্ধ্ব পানি প্রবাহ গতিশীল (upwelling dynamics of the ocean)

মৌসুমী বায়ু প্রভাবিত সামুদ্রিক স্রোত প্রবাহ এবং সমুদ্র পানির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য জৈবউৎপাদনশীলতার (biological productivity) উপর প্রচলিত প্রভাব রয়েছে। আবহাওয়ায় পরিবর্তনশীলতার বাইরে অন্যান্য সমস্যা যেমন :

- (১১) বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের জন্ম ইতিহাস (genesis of cyclones in the Bay of Bengal). জলোচ্ছ্বাসের রহস্য জানাও খুবই দরকার।

বঙ্গোপসাগরের ভৌত বৈশিষ্ট্য : ভারত মহাসাগরের আয়তন হচ্ছে ৭৪.৯২ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার যা বিশ্বের সাগর মহাসাগরের ২০.৮ শতাংশ। এ মহাসাগরের জলে নেগেটিভ ভারসাম্যতা (negative water balance) বৎসরে নদীসমূহ হতে ৬০০০ কিউবিক কিলোমিটার পানি পায় এবং বৃষ্টি হতে পায় ৮৮০০০ কিউ. কিলোমিটার। আর এ মহাসাগর থেকে বাষ্পীভূত (evaporation) হয় ১০৩,০০০ কিউ কিলোমিটার। কিন্তু বঙ্গোপসাগর হচ্ছে গ্লোভারসাম্যতার দিক দিয়ে পজিটিভ। এখানে ১১০০০ কিউ কিলোমিটার বৃষ্টির পানি এবং ১৭৩০ কিউ কিলোমিটার নদীবাহিত পানি পাওয়া যায়। এ পরিমাণ পানি দিয়ে ২৫ মিটার গভীরতায় সমুদ্র পৃষ্ঠের ৫ শতাংশ পানি অধিকতর লঘুকরণ (dilution) করা যায়। এদিকে আরব সাগরের জলে ভারসাম্যতাও নেগেটিভ। এখানে ১০০০০ কিউ কিলোমিটার বৃষ্টির ও ৫২৫ কিউ কিলোমিটার নদীবাহিত পানি পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর সারা বিশ্বের সমুদ্রের মাত্র ৩ শতাংশ, কিন্তু এ দুটি বিশ্বের ৯ শতাংশ নদীবাহিত পানি পেয়ে থাকে।

বঙ্গোপসাগরের পশ্চিমাঞ্চলে লোহিত সাগর, পাকিস্তান উপসাগর ও আরব সাগরে উচ্চ লবণাক্ত পানির চিহ্ন পাওয়া গেছে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও বহু নদীবাহিত পানির প্রাচুর্যতার জন্য বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ততা অপেক্ষাকৃত কম। উত্তর ভারত মহাসাগরে এবং আরব সাগরে অতিরিক্ত বাষ্পীভবনের জন্য লবণাক্ততা বেশি, এককে এর পরিমাণ 'সিগমা-টি'=২৫ এবং ১২৫ মিটার গভীরতা পর্যন্ত এর ব্যাপ্ত। বঙ্গোপসাগরের স্বল্প লবণাক্ত পানিরাশি (Low salinity surface water mass) শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমে সরে যায় এবং আরব সাগরে এর হৃদিস মেলে। রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা ১০০-৩০০ মিটার গভীরতার পানিরাশিকে "গভীর পানি" (deep water) নামে অভিহিত করেছেন। এখানে লবণাক্ততা হচ্ছে সিগমা টি= ২৭.৬ আর ৩০০ মিটারের নিচের পানিরাশি, যার সিগমা-টি হচ্ছে ২৭.৮। একে "তলদেশের পানি" (bottom water) নাম দেয়া হয়েছে।

উত্তর ভারত মহাসাগরের এই দুই পানিরাশির (water mass) সৃষ্টি হয় এন্টার্কটিকা-গভীর এবং দক্ষিণ মেরুর পানি রাশির মিশ্রণের ফলে। এন্টার্কটিকা-মেরুঅঞ্চল থেকে দক্ষিণ পশ্চিম দিক দিয়ে কেন্দ্রীয় ও পূর্ব ভারত মহাসাগর বেসিনে এবং পানি প্রবেশ করে যা তাদের সিগমা এটি এর মান দেখেই বুঝা যায়। এই দুটি ছাড়া আরও কয়েকটি পানিরাশি আছে যা বঙ্গোপসাগরের জন্য উল্লেখযোগ্য নয়।

এশিয়া মহাদেশের উপস্থিতির জন্য ভারত মহাসাগরের উত্তর দক্ষিণের আকারটা হচ্ছে অপ্রতিসম (asymmetric)। এতে সমুদ্র উত্তর গোলাধের গভীরে ঢুকে যাওয়া উল্লম্ব সঞ্চলন (vertical convection) অঞ্চল থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে। এ ধরনের অপ্রতিসম অবয়বের দরুন দুর্বল স্রোত প্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং উত্তর ভারত মহাসাগরের গভীর অঞ্চলে স্বল্প নবায়নযোগ্য প্রবাহ বয়ে যায়। মৌসুমী বায়ু প্রবাহের দরুন ১০ ডিগ্রী দক্ষিণ পর্যন্ত এর প্রভাব অনুভূত হয়। প্রতি ছয়মাস অন্তর বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে স্রোত প্রবাহ দিকপরিবর্তন করে থাকে, উত্তর পূর্ব দিক থেকে শীতকালে এই স্রোত প্রবাহ গ্রীষ্ম মৌসুমে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সরে যায়। এই কারণটির জন্য এ সাগরের আবহাওয়ামন্ডলের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার অধ্যয়নের জন্য উত্তম সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

নভেম্বর-এপ্রিল মাসে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহের ফলে বিষুব রেখার উত্তরে বঙ্গোপসাগরের স্রোত খুবই শক্তিশালী থাকে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায়। এটা তাপমাত্রার নিম্ন (thermocline) পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ পর্যায়টির মগ্নচূড়া (shoaling) পর্যন্ত পৌঁছার ফলে বঙ্গোপসাগরে দুর্বল উর্ধ্ব পানি প্রবাহ (upwelling) দেখা যায়। বহুদীর্ঘ বাহিত পানির আগমনের দরুন উত্তর পূর্ব শক্তিশালী মৌসুমী বায়ু তাড়িত সমুদ্রস্রোত তার দুর্বল উর্ধ্ব পানি প্রবাহের ঘাটতি বেশ পুষিয়ে নেয়।

অপর দিকে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দক্ষিণ-নিরক্ষীয় স্রোতকে শক্তিশালী করে। এটা উত্তর দিকে সোমালী স্রোতের সঙ্গে মিলে নিরক্ষরেখার কাছে ভাগ হয়ে আরব সাগরে প্রবেশ করে এবং উর্ধ্ব পানি প্রবাহের সৃষ্টি করে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী ঋতুতে বঙ্গোপসাগরের পশ্চিমাঞ্চলে দুর্বল উর্ধ্ব পানি প্রবাহে পরিণত হয়।

বঙ্গোপসাগরের পানি বিজ্ঞান শর্তাবলি : পানির ভৌত গুণাগুণের বিশ্লেষণই ভৌত সমুদ্র বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। পানির তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, ঘনত্ব, সামুদ্রিক স্রোত, ঢেউ, জোয়ারভাটা পানিরাশি, পানির বর্ণ, স্বচ্ছতা ইত্যাদি হচ্ছে সমুদ্রের পানির ভৌত বৈশিষ্ট্য। ভারত মহাসাগরের খোলা অংশের পানির বিজ্ঞানগত বৈশিষ্ট্য ও মৌসুমী বায়ুর দ্বারাই বঙ্গোপসাগরের “হাইড্রলজিক্যাল কন্ডিশন” নির্ণীত হয়। বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশ তথা উপকূল ভাগ গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও অন্যান্য নদীবাহিত পানির দ্বারা প্রভাবিত হয়। উপসাগরটির বিরাট প্রশস্ত মুখটি দিয়ে ভারত মহাসাগরের কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে পানি রাশি বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে। তাই দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা ভারত মহাসাগরের খোলা অংশেরই সমান। তবে উপকূলভাগে নদীবাহিত পানির দরুন তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা কম। উপসাগরের দক্ষিণ থেকে

আগত ঢেউ ও তরঙ্গ চিহ্ন বা ক্ষুদ্রঢেউ (waves and ripples) শক্তি যোগায় দুধরনের (উচ্চ ও নিচু লবণাক্ততা) পানি রাশির মিশ্রণের জন্য, যার ফলে পানির ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলির মধ্যে সমতা স্থাপিত হয়। সক্ষীর্ণ উপকূলীয় ভাগে ঢেউয়ের প্রতিক্রিয়া বেশ শক্তিশালী।

বঙ্গোপসাগরের বিশেষ সামুদ্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণ হচ্ছে এর ভৌগোলিক অবস্থান। মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত বিধায় এই সাগরকে মৌসুমী সাগর বলা হয়। মৌসুমী বায়ু বলতে আমরা বুঝি ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুরও দিক পরিবর্তন করা। এই বায়ু শীতকালে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে সমুদ্রের দিকে এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। এই দুই দিক থেকে প্রবাহিত বায়ুদ্বয়কে যথাক্রমে উত্তর-পূর্ব বা শীতকালীন মৌসুমী বায়ু ও দক্ষিণ-পশ্চিম বা গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বায়ু বলে আখ্যায়িত করা হয়। গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বায়ু সমুদ্র থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প বহন করে নিয়ে এসে স্থলভাগে ব্যাপক বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই বায়ু শীতকালীন বায়ুর তুলনায় অনেক বেশি স্থিতিশীল ও গতিবেগ সম্পন্ন। মৌসুমী বায়ুর উৎপত্তি ও ফলাফল সম্পর্কে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, যার ফলে অনেক অজানা তথ্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে।

বঙ্গোপসাগরের পানির সামুদ্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশেষ করে উপরের স্তরের পানির ভৌত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রধানত মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভরশীল। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে জানুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠ স্রোত এই অঞ্চলে ঘড়ির কাটার মত এবং আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই স্রোত সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে অর্থাৎ ঘড়ির কাটার উল্টা দিকে প্রবাহিত হয়। কাজেই বুঝা যায় যে, বায়ু প্রবাহের সঙ্গে সমুদ্র স্রোতের একটি প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, জলবায়ুর উপর যেমন সমুদ্রের বিরাট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, ঠিক একইভাবে সমুদ্রের উপর সমুদ্র স্রোত, জলরাশির উর্ধ্ব ও নিম্নগতি, বায়ুমণ্ডলের বিরাট প্রভাব বিদ্যমান। বায়ুমণ্ডল ও সমুদ্র পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল এবং তাদের প্রভাব সমুদ্রপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডলে পরিলক্ষিত হয়।

মৌসুমী বায়ুর ফলে বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম অংশে অর্থাৎ ভারতীয় পূর্ব উপকূলে বিশেষ করে অন্ধ্র, বিসাখাপত্তম, মাদ্রাজ উপকূলে গ্রীষ্মকালে পানির উর্ধ্ব গতি এবং একই স্থানে শীতকালীন মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে পানির নিম্নগতি লক্ষ্য করা যায়। অনুরূপে বঙ্গোপসাগরের পূর্ব প্রান্তে বার্মার দক্ষিণ ও থাইল্যান্ড উপকূলের কিছু অংশে শীতকালে পানির উর্ধ্বগতি ও গ্রীষ্মকালে পানির নিম্নগতি দেখা যায়। কত গভীর হতে পানি উর্ধ্বগতিতে উপরে আসবে বা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে নিম্নগতিতে নিচে যাবে তা নির্ভর করে বায়ুর গতিবেগ, স্থলভাগের সঙ্গে বায়ুর কৌণিক অবস্থান, বায়ুর স্থায়িত্ব প্রভৃতির উপর। সাধারণত সমুদ্র সমতল থেকে ২০০ মিটার গভীরে বায়ুর প্রভাবে পানির উর্ধ্ব বা নিম্ন গতি পরিলক্ষিত হয়। পানির উর্ধ্ব প্রবাহ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার ফলে নিচের অগভীর স্তরের পানি সমুদ্র পৃষ্ঠ দেশে উঠে আসে। স্থিতিশীল বায়ু প্রবাহ দীর্ঘ দিন ধরে স্থল ভাগ থেকে প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রের উপকূল থেকে পানিকে সমুদ্রের দিকে ঠেলে স্থানান্তর করলে ঐ স্থানে পানির ঘাটতিপূরণের জন্য নিচ থেকে

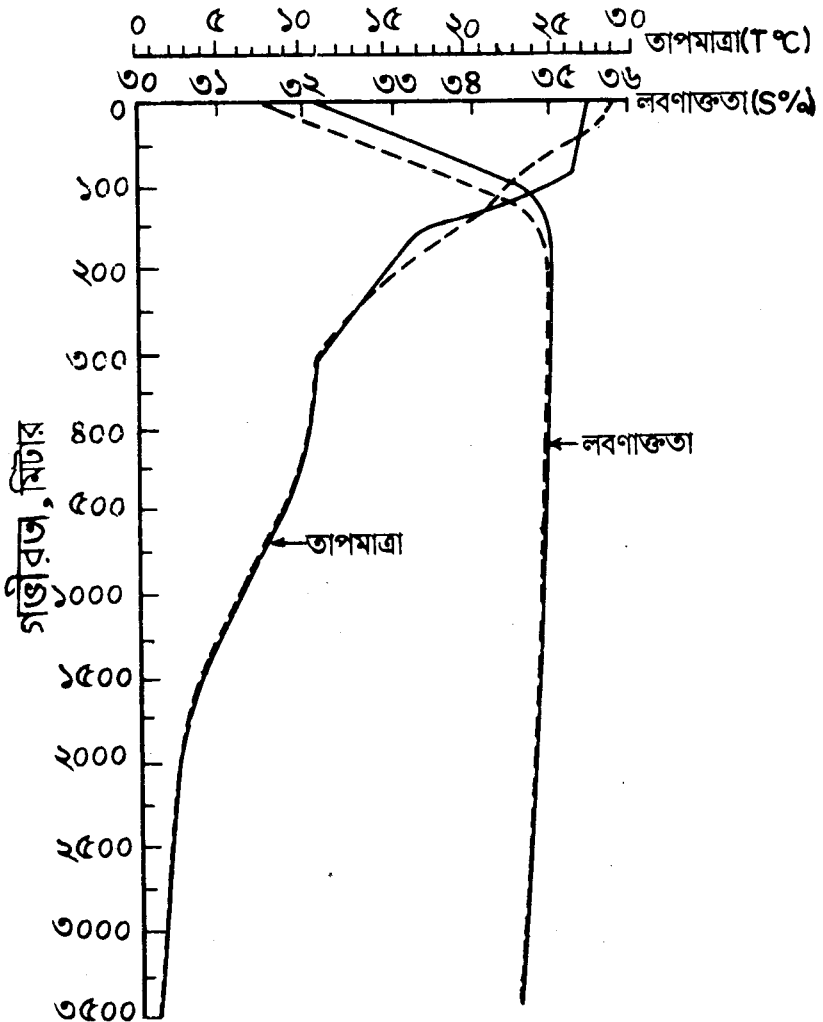
পানি উপরে চলে আসে। কিন্তু পক্ষান্তরে, যখন সমুদ্র থেকে প্রচণ্ড বেগে বায়ু প্রবাহ পানিকে ঠেলে উপকূলে এনে জমা করে তখন পানি উপকূল বরাবর নিম্নদিকে চলতে থাকে যাকে পানির নিম্ন প্রবাহ বলা হয়। পানির উর্ধ্ব প্রবাহের ফলে উপরের স্তরের পানির তাপমাত্রা হ্রাস পায় ও পানির ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এবং ঐ অঞ্চলের জৈব উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আর পানির নিম্ন প্রবাহের ফলে নিচের পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় ও অন্যান্য সামুদ্রিক বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন ঘটে।

বঙ্গোপসাগরের পানির তাপমাত্রা ও ঘনত্ব

বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব এই তিন দিকেই স্থলভাগের অবস্থানের ফলে পানির তাপমাত্রা বিন্যাসে স্থলভাগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উপরের স্তরের পানির তাপমাত্রা বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রার প্রতিফলন ঘটে। এই অঞ্চলে নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়কে শীতকাল ও মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়কে গ্রীষ্মকাল ধরা হয়। এপ্রিল ও অক্টোবর মাস দুটি হচ্ছে এক ঋতু থেকে অন্য ঋতুতে পরিবর্তনের মধ্যবর্তী সময় যে সময়ে কোনো স্থিতিশীল বায়ুপ্রবাহ থাকে না। বঙ্গোপসাগরের উপরের স্তরের পানির তাপমাত্রা-সর্বনিম্ন জানুয়ারিতে 25° সেলসিয়াস আর সর্বোচ্চ 30° সেলসিয়াস মে মাসে লক্ষ্য করা যায়। উপরের স্তরের পানির তাপমাত্রার মানচিত্র থেকে দেখা যায় যে বৎসরের সকল মাসেই পানির তাপমাত্রায় পার্থক্য উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের উত্তর দিকের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পানির তাপমাত্রা 25° থেকে 28° সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। উপরের স্তরের জন্য বার্ষিক গড় তাপমাত্রা হচ্ছে 28° সেঃ। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে বার্ষিক গড়পড়তা তাপমাত্রার তারতম্য 20° সেলসিয়াসের বেশি নয় এবং উত্তর অংশে এটা 5° সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়। শীতকালে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে স্থলভাগে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ার দরুন উপকূলের অগভীর অংশে এই সময়ে পানির তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। ঠিক একইভাবে গ্রীষ্মকালে (এপ্রিল থেকে অক্টোবর) বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন স্থলভাগ সংলগ্ন অগভীর অঞ্চলের পানির তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পায়। এপ্রিল মাসে বঙ্গোপসাগরের পানির তাপমাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে 28° - 30° সেঃ ও মে মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 30° সেঃ পৌছে। জুলাই মাসে তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পায় (29° সেঃ) ও সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ রকমই থাকে। অক্টোবরে তাপমাত্রা আবার সামান্য হ্রাস (28° - 29° সেঃ) পেতে থাকে এবং এই ধারা চলতে চলতে জানুয়ারিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 25° সেঃ এসে পৌছে।

তাপমাত্রার উল্লম্ব বিন্যাস : বঙ্গোপসাগরের পানির তাপমাত্রার উল্লম্বভাবে বিন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য হলো শীত ঋতুতে উপরের ৫০ মিটার পুরু স্তরে তাপমাত্রার উৎক্রম (inversion of temperature) অনুসারে পানির সংমিশ্রণ আগাগোড়া একই প্রকার। উপরের ৫০ মিটার পুরু স্তরে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই বায়ু প্রবাহ, স্রোত ও জোয়ার ভাটার কারণে পানির সম সংমিশ্রণের ফলে লবণাক্ততা ও তাপমাত্রায় প্রায় সমতা থাকে।

এই সমবৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুমিশ্রিত স্তরে নিম্নপ্রান্তে প্রায় ৫০ মিটার পর্যন্ত গভীরতায় শীতকালে তাপমাত্রার সামান্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। শীতকালে বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রা বেশ হ্রাস পায় এবং ফলে বায়ুমন্ডল সংলগ্ন উপরের স্তরে পানি বেশ শীতল হয়ে পড়ে। কিন্তু কিছু গভীরে (প্রায় ৫০ মিটার) পানির তাপমাত্রা সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির তুলনায় বেশি থাকে। তাপমাত্রার এই ব্যতিক্রমীধর্মী বিন্যাসকে তাপমাত্রার উৎক্রম বলে। (দাস, ১৯৯২)।



চিত্র ২.২ : বঙ্গোপসাগরের তাপমাত্রা ও লবণাক্ততার উল্লম্ব বন্টন : ----- গ্রীষ্মকালীন ও
 ——— শীতকালীন অবস্থা (লবণাক্ততা %, তাপমাত্রা ডিগ্রী সেঃ)।

ভৌগোলিক অবস্থানের দরুনই গ্রীষ্মকালে উপকূলীয় অঞ্চলে পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং দক্ষিণ দিকে তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। ২.২ নং চিত্রে তাপমাত্রার উল্লম্ব বিন্যাস দেখানো হয়েছে। উপরের ৫০ মিটার পুরুত্ববিশিষ্ট সুমিশ্রিত ও সমবৈশিষ্ট্যপূর্ণ (homogenous) স্তরে পানির তাপমাত্রা হচ্ছে সমোষ্ণ (isothermal)। এই স্তরের নিচে ৫০ মিটার থেকে ২০০—২৫০ মিটার পর্যন্ত স্পষ্ট অধঃতাপমাত্রার (thermocline) উপস্থিতি উভয় ধাতুতেই লক্ষণীয়। সাধারণত ৫০ মিটার গভীরতায় শীতকালে তাপমাত্রা 26° — 25° সেঃ এবং গ্রীষ্মকালে 28° — 29° এবং, থার্মোক্লাইনের নিম্ন প্রান্তে অর্থাৎ ২০০ থেকে ৩০০ মিটার গভীরতায় শীতে 15° — 13° সেঃ ও গ্রীষ্মকালে 16° — 13° সেঃ। চিত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে উল্লম্বভাবে পানির তাপমাত্রার ধাতুভিত্তিক তারতম্য শুধু উপরের ৩০০ মিটার দূরেই সীমাবদ্ধ। এই স্তরের নিচে উভয় ঋতুতেই তাপমাত্রা সমান। ৩০০ মিটার গভীরতা থেকে নিচ দিকে তলদেশ পর্যন্ত পানির তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে সমভাবে হ্রাস পায়। ৫০০ মিটার গভীরতায় পানির তাপমাত্রা প্রায় 10° সেঃ এবং ১০০০ মিটারে তাপমাত্রা 9° — 6.5° সেলসিয়াস। ১৫০০ মিটার গভীরতায় বঙ্গোপসাগরের সম্পূর্ণ অংশে তাপমাত্রা 8.95° — 8.50° সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। ২০০০ মিটার গভীরতায় 2.95° সেলসিয়াস সমোষ্ণ রেখা বঙ্গোপসাগরকে বেষ্টিত করেছে। ১০০০-২০০০ মিটার গভীরতায় তাপমাত্রার নতিমাত্রা (Gradient) প্রতি ৫০০ মিটারে 2° থেকে 1.5° সেলসিয়াস। বঙ্গোপসাগরের ২৫০০ মিটার গভীরতায় পানির তাপমাত্রা প্রায় 2° সেঃ ও ৩০০০ মিটার গভীরতায় প্রায় 1.95° সেলসিয়াস দেখা যায়। এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে, গভীর সাগরের পানি অর্থাৎ ১০০০ মিটার গভীরতার নিচে তাপমাত্রার বিন্যাস প্রায় সমমান যুক্ত এবং এখানে পানির তাপের প্রায় কোনো আঞ্চলিক পার্থক্য নেই বললেই চলে। উপসাগরের তলদেশে তাপমাত্রা দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে বৃদ্ধি পায়। এতে বোঝা যায় যে উত্তর ভারত মহাসাগরের তলদেশের পানি দক্ষিণ থেকে বঙ্গোপসাগরে আনুভূমিক ভাবে (advection) বিস্তৃত। মাদ্রাজে বার্ষিক বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রার তারতম্য ঘটে 6.3° সেঃ এবং কলিকাতায় 10.3° সেঃ। (দাস, ১৯৯২) (চিত্র ২.২ দ্রষ্টব্য)

বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ততা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বঙ্গোপসাগর হচ্ছে একটি ধনাত্মক জলরাশির সাম্যতার (positive water balance) ব্যতিক্রমধর্মী উদাহরণ। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদীসমূহ যেমন গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও মেঘনা, ভারতের মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, পেন্নার ও দামোদর, বার্মার ইরাবতী ও শ্রীলংকার মহাভালি বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এই নদীগুলি বৎসরে ১৭৫৫ ঘন কিলোমিটার মিঠা পানি বঙ্গোপসাগরে বহন করে আনে (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)। বঙ্গোপসাগরে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাষ্পীভবনের তুলনায় অনেক বেশি। গ্রীষ্মকালীন গড় প্রবাহ ১৪৯৬ ঘন কিলোমিটার এবং শীতকালে ২৫৯ ঘন কিলোমিটার। পুরো বঙ্গোপসাগরে বার্ষিক

বৃষ্টিপাত বার্ষিক বাষ্পীভবন অপেক্ষা বেশি এবং গড়ে তা ৫০০ মিলিমিটার। বাষ্পীভবনের পরও মিঠা পানির আয়তন ১৩৮৭ ঘন কিলোমিটার থেকে যায়। (দাস, ১৯৭৬)। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, নদী দ্বারা বাহিত মিঠা পানির প্রবাহ এবং বৃষ্টিপাত মিলে মিঠা পানির মোট আয়তন হচ্ছে $১৭৫৫ + ১৩৮৭ = ৩১৪২$ ঘন কিলোমিটার। বাষ্পীভবন, বৃষ্টিপাত অপেক্ষা নদী দিয়ে বাহিত পানি প্রবাহের আয়তন বার্ষিক গড়ে ৩৮৬ ঘন কিলোমিটার বেশি। এর ফলেই বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে নদীর পানির মিশ্রণ ঘটার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বঙ্গোপসাগরের পানির কম লবণাক্ততার পেছনে নদী বাহিত স্বাদু পানি ও বৃষ্টিপাত যৌথভাবে কারণ হলেও বৃষ্টিপাতের তুলনায় নদী বাহিত পানির প্রভাব অধিক।

সারণি ১ : বঙ্গোপসাগরে পতিত নদীসমূহের গড় বার্ষিক ও ঋতুভিত্তিক পানি প্রবাহের পরিমাণ

নদী	দেশ	গড় পানি প্রবাহ ঘনমিটার সেকেন্ড	বার্ষিক পানি প্রবাহের পরিমাণ ঘন কিঃ মিঃ	শীতকালীন পানি প্রবাহ ঘন কিঃ মিঃ নভেম্বর-এপ্রিল	গ্রীষ্মকালীন পানি প্রবাহ মে- অক্টোবর
পদ্মা	বাংলাদেশ	১৪০০০	৪৫৫	৬০	৩৮৫
ব্রহ্মপুত্র	বাংলাদেশ	২০০০০	৬৩০	১০৬	৫২৪
গোদাবরী	ভারত	৩১৮১	১০০	৬	৯৪
কৃষ্ণা	ভারত	১৭৩০	৫৭	৪	৫৩
মহানদী	ভারত	১৭১০	৫৬	৪	৫২
পেন্নার	ভারত	৯৫	৩	১	২
দামোদর	ভারত	৩২৯	১০	১	১
ইরাবতী	বার্মা	১৪১০০	৪৪৭	৭২	৩৭৫
মহাভাগী	শ্রীলঙ্কা	২২৬	৭	৫	২
			১৭৫৫	২৫৯	১৪৯৬

নদী বাহিত স্বাদু পানির সঙ্গে বৃষ্টিপাতের পানি মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরের উপরের স্তরের পানির লবণাক্ততা অনেক হ্রাস করে এবং এই স্তরের পানির উৎপত্তিস্থলও বঙ্গোপসাগর (দাস, ১৯৭৮)। আর তাই এই উপরের স্তরের পানিকে বঙ্গোপসাগরের তরলিকৃত পানিরাশি (diluted water mass of the Bay of Bengal) বলে।

গ্রীষ্মকালে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বঙ্গোপসাগর ও এর তীরবর্তী দেশসমূহে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ৭০ ভাগ হয়ে থাকে। ঠিক একই সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালে মোট নদী-প্রবাহের শতকরা ৮৫ ভাগ পানি বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। আর মাত্র ১৫ ভাগ পানি শীতকালীন পানি প্রবাহ হিসেবে আসে। গ্রীষ্মকালে নদীবাহিত স্বাদু পানি ও

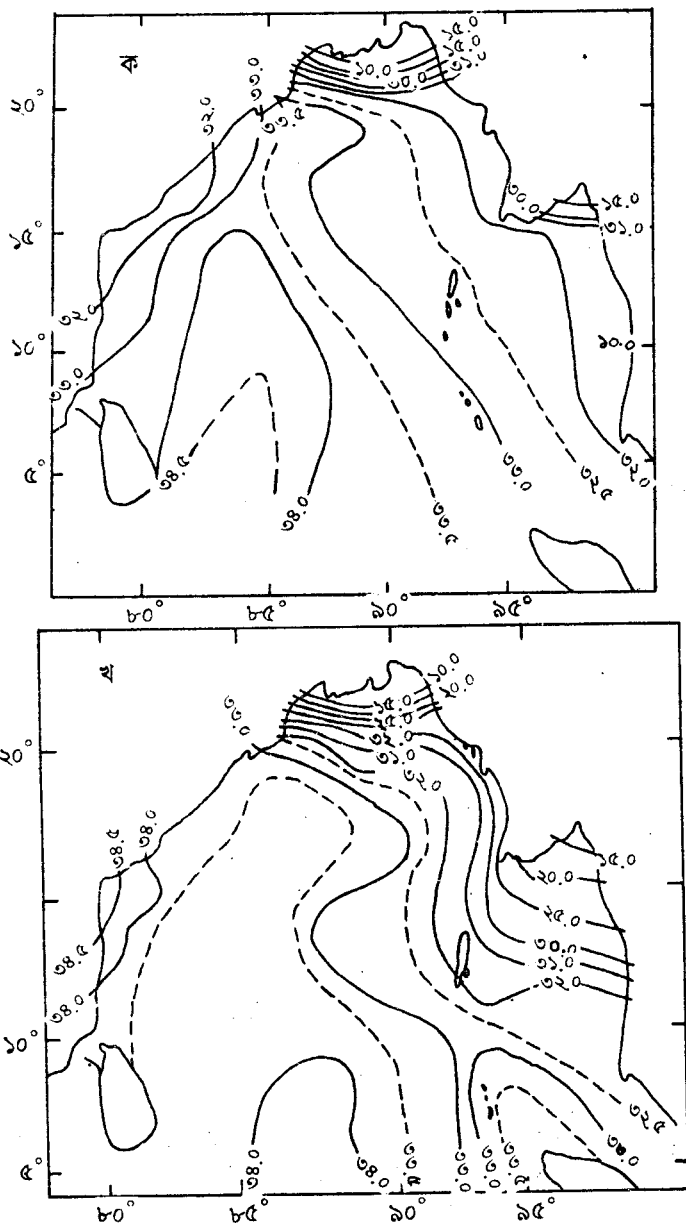
বৃষ্টিপাতের পানির সরবরাহের পরিমাণ এত ব্যাপক যে বঙ্গোপসাগরের উত্তরের অগভীর অঞ্চলে ও নদী মোহনায় লবণাক্ততার পরিমাণ প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে যায়।

নদীবাহিত পানি প্রবাহের পরিমাণ ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণের মধ্যে ঋতুভিত্তিক তারতম্য এত বেশি যে তা বঙ্গোপসাগরের উপরের স্তরের পানির লবণাক্ততার উপরও ঋতুভিত্তিক ব্যাপক ব্যবধান সৃষ্টি করে। অগভীর মহীসোপন অঞ্চলে নদী মোহনাতেই লবণাক্ততা বিন্যাসের ঋতুভিত্তিক পার্থক্য ব্যাপক কিন্তু উন্মুক্ত ও গভীর অঞ্চলে লবণাক্ততার পার্থক্য খুবই সামান্য। (দাস, ১৯৭৮, ১৯৮৩, ১৯৯২)।

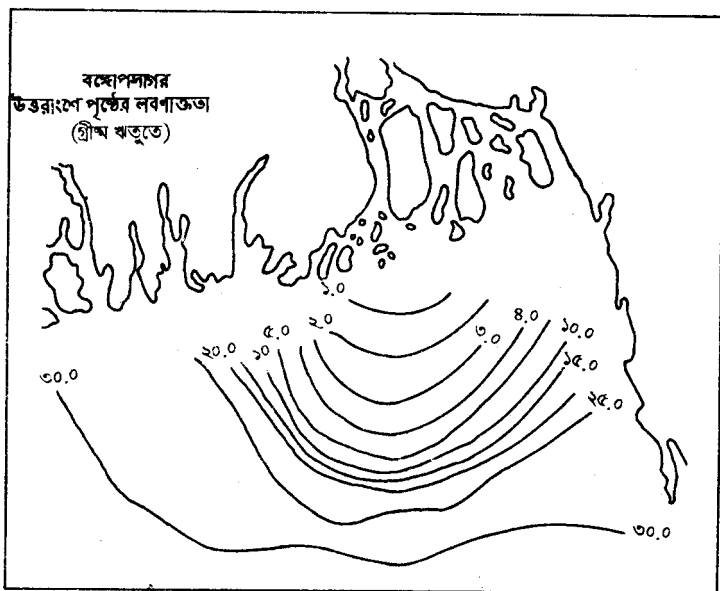
বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ততা বন্টনের বিন্যাস : বিশ্বে সমুদ্রের পানির গড় লবণাক্ততা প্রতি ১০০০ গ্রামে ৩৫ গ্রাম লবণ, আর বঙ্গোপসাগরের সর্ব দক্ষিণ প্রান্ত যা উত্তর ভারত মহাসাগরের কেন্দ্রীয় অঞ্চল, সেখানে প্রতি হাজারে লবণাক্ততা মাত্র ৩৪.৫ ভাগ। (Wyrtki, 1971)। উপসাগরের উত্তর অঞ্চলে বর্ষাকালে প্রতি হাজারে ৫ থেকে ১০ ভাগ লবণ দেখা গেছে, আর শীতকালে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি হাজারে ২০-২৫ ভাগে দাঁড়ায়। তথাপি এই পরিমাণ গড় সামুদ্রিক লবণাক্ততার তুলনায় অনেক কম। এর কারণ হচ্ছে নদীবাহিত বিপুল পরিমাণে স্বাদুপানি ও বৃষ্টিপাত। IOE এর বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন স্থানের উপরিভাগের লবণাক্ততা বন্টনের যে মানচিত্র রয়েছে তা থেকে এটাই সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ধাতু ভেদেও জলের সঙ্গে মিশ্রিত লবণের লবণাক্ততার মান ০-২৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ভিন্ন হয়। উপকূলের অগভীর এলাকায় ২০° উত্তর অক্ষাংশে ঋতুভেদে লবণাক্ততার ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ২০° উত্তর অক্ষাংশে দক্ষিণে সাগরের গভীরতা বাড়ছে এবং ঋতুভেদে লবণাক্ততার মান কমছে। মানচিত্রে দেখা যায় বঙ্গোপসাগরের উন্মুক্ত এলাকার উপরিভাগের লবণাক্ততা ৩২-৩৪.৫% এর মধ্যে উঠানামা করে। উপকূল এলাকায় তা ১০-২৫% এবং নদীনালায় মোহনায় এই মান ৫% কমে যায়। যদিও শীতকালে নদীর জলপ্রবাহ এবং বারিপাত কমে যায় তথাপি উপকূলীয় জলভাগে সারা বছর লবণ মিশ্রিত হয়। বদ্বীপ অঞ্চলের গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র নদীর মোহনায় উপকূলীয় এলাকায় শীতকালে তা বেড়ে হয় ১০-১৫%। লবণাক্ততার মান উপকূল হতে সাগরের উন্মুক্ত অংশের দিকে বাড়তে থাকে। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ইরাবতী, গোদাবরী প্রভৃতি নদীর মোহনার উপরিভাগের জলের লবণাক্ততার মান দিনে দিনে অধিক পার্থক্য নির্দেশ করে। স্থান এবং দিন বিশেষে লবণাক্ততার সর্বনিম্ন মান নির্ভর করে।

লবণাক্ততা বিন্যাসের উল্লম্ব চিত্র :

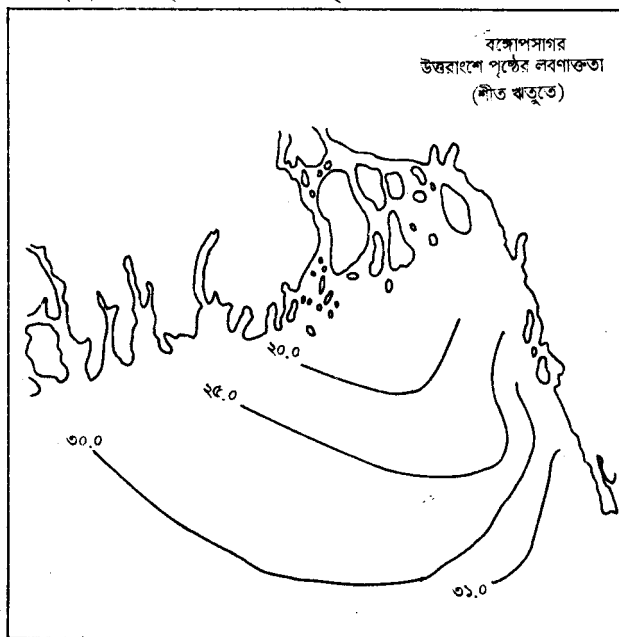
উপরিভাগ থেকে তল পর্যন্ত লবণাক্ততার উল্লম্ব গঠন নির্ভর করে জলভাগের উল্লম্ব বিন্যাসের উপর। উত্তর বঙ্গোপসাগরের অগভীর মহীসোপান অঞ্চলে ও নদী মোহনায় ঋতুভেদে লবণাক্ততার ব্যাপক পার্থক্য হলেও কম গভীরতার দরুন উল্লম্বভাবে লবণাক্ততার তারতম্য খুবই কম। কারণ এই অঞ্চলের পানি বেশ ভালভাবে মিশ্রিত হয়। তবু গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিচের দিকে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকে।



চিত্র ২.৩৪ বঙ্গোপসাগরের পৃষ্ঠদেশের পানির লবণাক্ততার বিন্যাস (%)
(শীত-গ্রীষ্ম ঋতুতে পানির উর্ধ্ব গমনের ফল)



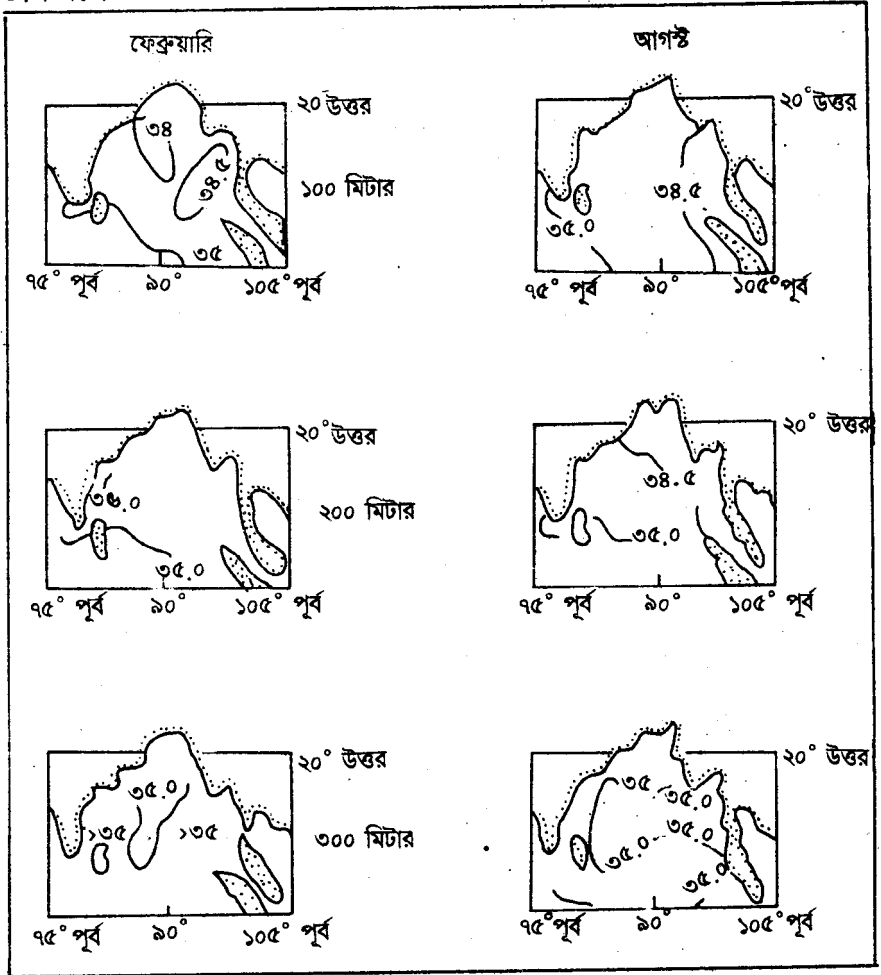
চিত্র ২.৩ : (ক) গ্রীষ্ম ঋতুতে বঙ্গোপসাগর পৃষ্ঠের লবণাক্ততা।



চিত্র ২.৩ : (খ) শীত ঋতুতে বঙ্গোপসাগর পৃষ্ঠের লবণাক্ততা।

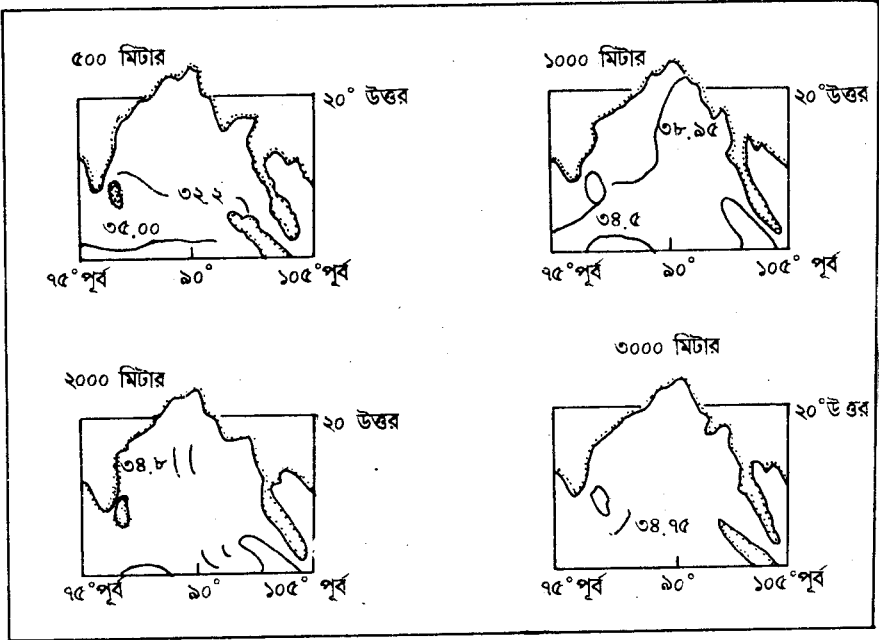
(২) নদীর জল মিশ্রিত মধ্যভাগের জলধারা (৩০০-১০০০ মিটার) লবণাক্ততার মান $> ৩৫\%$ । এই মাধ্যমিক স্তরের পানি রাশির উৎপত্তিস্থল লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর ও আরব সাগর। এইসব সাগরে বেশি লবণাক্ততায়ুক্ত ভারী পানির ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়ে নিচ দিকে চলতে থাকে এবং ঘনত্বের তারতম্যের দরুন বিভিন্ন গভীরতায় বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

(৩) গভীর জলধারা (১৫০০-৩৫০০ মিটার), লবণাক্ততার মান $৩৪.৮০-৩৪.৭০\%$ ।



চিত্র ২.৩ঃ (ঘ) সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে বিভিন্ন গভীরতায় লবণাক্ততার বিন্যাস (১০০, ২০০ ও ৩০০ মিঃ)।

(৪) তলদেশের জলধারা (৩৫০০ মিটার-অতলদেশ) লবণাক্ততার মান ৩৪.৭০%। লবণাক্ততার রেখাচিত্র চিত্র হতে এটা সুস্পষ্ট যে, লবণাক্ততার মান উপরিভাগ হতে ২০০-৩০০ মিটার গভীরতায় বেড়ে হয় ৩৫%। বঙ্গোপসাগরের ৩০০-৪০০ মিটার গভীরতায় সবচেয়ে বেশি লবণাক্ততা ১৩৫.৫০% দেখা গেছে। ৫০০ মিটার গভীরতায় >৩৫.০% এবং তারপর তা কমতে থাকে এবং ১০০০ মিটার গভীরতায় তা হয় ৩৪.৯৫%। আরও গভীরতায় লবণাক্ততার মান কমে হয় ৩৪.৮০%, ২০০০ মিটার গভীরতায় ৩৪.৭৫%, ৩০০০ মিটার ও ৪০০০ মিটার গভীরতায় ৩৪.৭০%। বিভিন্ন জলধারায় বিভিন্ন উৎস লবণাক্ততার উল্লম্ব পার্থক্য প্রদর্শনের কারণ।



চিত্র ২.৩ : (ঙ) সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে বিভিন্ন গভীরতায় লবণাক্ততার বিন্যাস (৫০০, ২০০০ ও ৩০০০ মিঃ)।

বঙ্গোপসাগরে জোয়ারভাটা

প্রশান্ত মহাসাগর থেকে অস্ট্রেলিয়া ও এন্টার্কটিকার মধ্য দিয়ে পশ্চিম দিকে সম্পূর্ণ ভারত মহাসাগর জড়ে জোয়ারের পানি ঢেউয়ের আকারে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করে। মালাগাছি প্রজাতন্ত্র পর্যন্ত পৌঁছে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

বঙ্গোপসাগরের পানির রং এবং স্বচ্ছতা

সমুদ্রের পানির স্বচ্ছতা সেচিডিঙ্ক (secchidisc) নামে সাধারণ একটি সাদা প্লেটের কেন্দ্রস্থলে রশি দিয়ে ঝুলিয়ে পানিতে নিমজ্জিত করে চাক্ষুস পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়। হাইড্রোফটোমিটার (hydrophotometer) ব্যবহার করে পানির স্বচ্ছতা আরো নির্ভুলভাবে নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। পানিতে আলো বিশোষণ বা বিক্ষেপণ করার (absorb or scattering) পরিমাণ নির্ভর করে পানিতে ভাসমান বা দ্রবীভূত পদার্থের প্রকৃতির ওপর। জৈব পদার্থ প্লাস্কটন অথবা অজৈব পদার্থ বালু বা কাদার কণা পানিতে ভাসমান বা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। বঙ্গোপসাগরের উন্মুক্ত অংশে পানির রং গাঢ় নীল, কিন্তু উপকূলের দিকে রং ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়ে হালকা নীল

থেকে সবুজ বর্ণ হয়ে থাকে। পানির স্বচ্ছতা যথেষ্ট, কোনো কোনো স্থানে ৪০ থেকে ৫০ মিটার পর্যন্ত দেখা যায়। শীতকালে ২০ মিটার পর্যন্ত গভীরতায় বঙ্গোপসাগরের পানি পরিষ্কার এবং নীল রংএর হয়ে থাকে। কিন্তু উর্ধ্ব পানি প্রবাহ স্তরের সময় পৃষ্ঠ দেশের নিচের দিকের কিছু অংশে পঙ্কিল পানি দেখা যায়। এর কারণ হতে পারে পৃষ্ঠি বাহিত পানির বদৌলতে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের জল। উর্ধ্ব প্রবাহ স্রোতে এসব পঙ্কিল উপর তলে পৌছে যায়। বসন্তকালে উপকূলভাগে পঙ্কিল পানির উর্ধ্ব প্রবাহ লক্ষ্য করা যায় যা তীর ভাগ থেকে দূরে যেতে থাকলে কমে আসে। বর্ষাকালে অন্য ধরনের পঙ্কিলতার সৃষ্টি হয়। নদী বাহিত পলি কণার সঙ্গে অজৈব কণা উপর ভাগে একটি ঘন স্তর সৃষ্টি করে, আর তলদেশে কাদা মাটির আন্তরণ পড়ে।

বঙ্গোপসাগরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে প্রতিঘূর্ণী স্রোত প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়, যায় কেন্দ্রে রয়েছে অভিসরন অঞ্চল (zone of convergence)। এ অঞ্চলের পানির স্বচ্ছতার পরিমাণ অত্যধিক। এখানে বিশোষণ ও বিসরণ (absorption and dispersion) খোলা সমুদ্রের অনুরূপ। বঙ্গোপসাগরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের উত্তর দিকে বিশোষণ ও বিসরণ বৃদ্ধি পায়। বিসরণের আকার দিয়ে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং শ্রীলংকায় নদীবাহিত পানির তারতম্য করা যায়। শ্রীলঙ্কার পানিতে যেহেতু ক্লোরোফিল ও ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন বেশি থাকে, তাই ওখানকার নদীর বিসরণের আকার গঙ্গা, মেঘনার চাইতে বেশি। এ অঞ্চলে সমুদ্র উপরিতলে পঙ্কিল পানির আধিক্য লক্ষণীয়, আর ৩০ মিটার গভীরে গেলে পানি পরিষ্কার দেখা যায়।

পানির স্বচ্ছতার মানের উপর বঙ্গোপসাগরকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায় :

১। আলোকভেদ্য সামুদ্রিক পানির অঞ্চল (Region of transparent oceanic water) : অভ্যন্তরে স্পষ্ট দেখা যায় এমন স্বচ্ছ সামুদ্রিক পানির অঞ্চল বঙ্গোপসাগরের কেন্দ্রীয় প্রতীক্ষা ঘূর্ণিবাতিময় ঘূর্ণন অঞ্চলে দেখা যায়।

২। স্বাভাবিক সামুদ্রিক স্বচ্ছতার অঞ্চল (zone of normal oceanic transparency) : শ্রীলঙ্কার উত্তর পূর্ব অঞ্চলে দেখা যায়। এখানে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের (phytoplankton) কোষ সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়।

৩। কম স্বচ্ছ অঞ্চল (region of low transparency) : ঘোলা পানির এলাকা স্থলভাগ থেকে বিভিন্ন নদী বাহিত কার্বন পদার্থের তলানীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র নদীর মোহনায় ব-দ্বীপ অঞ্চলে সীমিত এলাকায় অত্যন্ত ঘোলা পানি (turbid water) পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অনেক অঞ্চলে দেখা গেছে নদী বাহিত প্রলম্বিত পদার্থ (suspended material) অনেক দূর পর্যন্ত স্থানান্তরিত ও পরিবাপ্ত হতে পারে। বঙ্গোপসাগরে নদী বাহিত কঠিন পদার্থ গভীর স্রোত ও কাদা মিশ্রিত পানির স্রোতের (turbidity current) সঙ্গে উত্তরের ব-দ্বীপ থেকে প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার দক্ষিণে স্থানান্তরিত হতে পারে।

উল্লেখিত বঙ্গোপসাগরের স্বচ্ছতার অঞ্চল শুধু উপরের ১০০ মিটার গভীরতার স্তরের জন্য প্রযোজ্য। বলা যায় যে বঙ্গোপসাগরের পানির আলোক বৈশিষ্ট্য (optical

characteristics) গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র মেঘনা নদীর প্রভাব শুধু উত্তরের উপকূলীয় অগভীর অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি।

বাংলাদেশ উপকূলভাবে বঙ্গোপসাগরের পানির স্বচ্ছতা ১৫ মিটার এবং 10° উত্তর এলাকায় ৪০ মিটার পর্যন্ত দেখা গেছে (Voytor and Dementyev, 1970)। প্রতিঘূর্ণিবায়ুর কারণে অনেকটা এরকম হয়ে থাকে। উপকূল ভাগে নদীবাহিত বাইডমাস বা জৈববস্তুর আধিক্যের ও পলিমাটির জন্য স্বচ্ছতা কম থাকে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র নদী বাহিত তলানী সাগরের পানিকে ঘোলা করে। রাশিয়ান গবেষকরা এ অঞ্চলের ১০-২০০ মিটার গভীর পানিতে স্বচ্ছতা ও আলোভেদি হ্রাসসূচকের পরিমাণ নির্ণয় করেছেন মিটার প্রতি ০.২২-০.২৯। আর পৃষ্ঠদেশে ছিল ১.২৪ প্রতি মিটারে। রাশিয়ান গবেষকরা বাংলাদেশের নদী মোহনায় প্রতি ঘন মিটার পানিতে ২০.৪ ঘন সেন্টিমিটার জৈব পদার্থ পেয়েছেন। তা ছাড়া —

২০.৪ সেঃ মিঃ/মিটারঃ সেন্টিমিটার জৈব বস্তু

৪.১২ মিঃ গ্রাম/লিটার জৈব বস্তু কার্বন

০.৪৩৫ মিকোগ্রাম/লিটার ক্লোরোফিল

বঙ্গোপসাগর সঙ্গমের পৃষ্ঠদেশে পরিমাণ হচ্ছে —

১.৭০ সেঃ মিঃ / মিটারঃ জৈব বস্তু সিটোন

২.৪৬ মিঃ গ্রাম /লিটার জৈব বস্তু কার্বন

৬৪২০ ফাইটোপ্লাঙ্কটন কোষ/ লিটার

১.০২৯ মাইকোগ্রাম /লিটার-ক্লোরোফিল

সাগর তলদেশে ৫০-৭০ মিটার গভীরতার পানির স্বচ্ছতা হ্রাসের সূচক মিটার প্রতি ০.০৫ বা তার কমও হয়ে যায়।। ২৫-৫০ মিটার গভীরে এই সূচক ০.০৬-০.০৭/ মিটার ছিল। তবে নদী মোহনার বিভিন্ন স্থানে এই পরিমাণ ০.২২-০.২৯, এমনকি ০.৪০ পর্যন্ত হয়। কোনো স্থানেই এক রকম হয়না। নদী অববাহিকা পার হয়ে অতলপর্শী মহীখাদে দেখা যায় পানির পঙ্কিলতা নেই, এখানে পানি যথেষ্ট স্বচ্ছ।

বঙ্গোপসাগরের কেন্দ্রে ও উত্তর পূর্ব অংশে ও আন্দামান সাগরের পানির আলোক বৈশিষ্ট্য উন্মুক্ত সমুদ্রাঞ্চলের উপরের স্তরের পানির অনুরূপ। উত্তর ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে আলোক বৈশিষ্ট্যের ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেই জন্যই এই অঞ্চলের পানির আলোক বৈশিষ্ট্যও বিশেষভাবে ঋতুভেদে বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য নির্ণয়ে গবেষণা ও অধ্যয়ন প্রয়োজন।

পানিরাশি : বঙ্গোপসাগরের পানিরাশির উল্লেখ গঠন সম্পর্কিত তথ্য অপরিাপ্ত। পানি রাশি বলতে বোঝায় বিরাট আয়তনের পানি যা সমুদ্রের ব্যাপক এলাকা জুড়ে অবস্থান করছে ও সেই পানির একটি বিশেষ ও সতন্ত্র ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং ঐ বিশেষ সমুদ্র অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে ও উৎপত্তি স্থল থেকে এমনকি অনেক দূরে প্রবাহিত হয়েও পানির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। সমুদ্রে সমুদ্র সমতল থেকে নিচ দিকে সমুদ্র তলদেশ পর্যন্ত উল্লম্বভাবে চার প্রকারের পানি রাশি দেখা যায়।

অপেক্ষাকৃত সর্বোচ্চ লবণাক্ততা, তাপমাত্রা, অক্সিজেনের পরিমাণ এই তিনটি নির্দেশক দিয়ে পানিরাশিকে শনাক্ত করা যায় এবং পানিরাশির ভৌতিক ও রাসায়নিক ধর্মাবলি নির্ণয় করা যায়। ঘনত্বের উল্লম্ব কোনো বা নতির (vertical gradient) দিয়ে প্রতিটি পানিরাশিকে চারি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে।

১। বঙ্গোপসাগরের উপরের স্তরের তরলীকৃত পানি রাশিঃ সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় ৩০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এর উৎপত্তি স্থল বঙ্গোপসাগর।

২। মাধ্যমিক স্তরের পানি রাশি : ৩০০ মিটার থেকে ১০০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত এই পানির স্তর অবস্থিত।

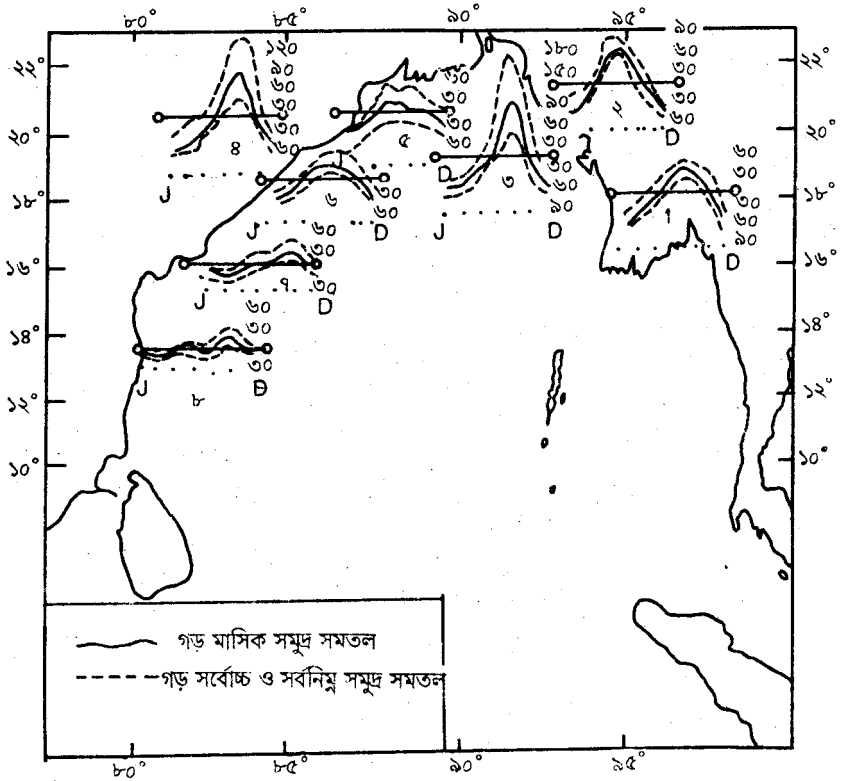
৩। গভীর সমুদ্রের পানিরাশি : ১৫০০ মিটার থেকে ৩৫০০ মিটার গভীরতায় অবস্থিত। এর উৎপত্তি স্থল হচ্ছে এন্টার্কটিকা মহাদেশের পাদদেশের অত্যন্ত শীতল ও বেশি ঘনত্বের পানি।

৪। তলদেশের পানিরাশি : ৩৫০০ মিটার গভীর থেকে শুরু করে তলদেশ পর্যন্ত এই স্তরের বিস্তৃতি। এই পানির উৎস এন্টার্কটিকা মহাদেশের সন্নিহিত শীতল ও ভারী পানি। (দাস, ১৯৯২)।

গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত ও নদীর পানির জন্য গড়পড়তা তরলীকৃত পানি রাশির পুরুত্ব হয় ৩০০ মিটার এবং শীতকালে হয় ২০০-২৫০ মিটার। মাধ্যমিক স্তরের পানিরাশির উৎপত্তি স্থল হচ্ছে লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর এবং আরব সাগর। শীতকালে দক্ষিণ পশ্চিম দিক দিয়ে এবং গ্রীষ্মে দক্ষিণ পূর্ব কোণ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে এই পানিরাশি ঢুকে। এই স্তরেই লবণাক্ততা সবচেয়ে বেশি, গ্রীষ্মে-৩৫.২৫% এবং শীতে (৩৫.০৮%। গ্রীষ্মে পুরুত্বও বেশি হয় ৮০০-৯০০ মিটারের মত আর এদিকে শীতে পুরুত্ব হয় ৫০০-৭০০ মিটার।

বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র সমতলের ঋতুগত পার্থক্য

ভূমি এবং পানির মিথস্ক্রিয়ার মিলন বিন্দু হচ্ছে সমুদ্রের উপকূলভাগ। বেলাভূমির গতি বিজ্ঞানে সমুদ্র সমতলের হ্রাস-বৃদ্ধি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সূর্য ও চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণে সমুদ্রের জোয়ার ভাটা নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিণামে যা সমুদ্র সমতলের পরিবর্তন হয়। তাছাড়া আবহাওয়াগত ও পানি বিজ্ঞান বিষয়ক কারণও এতে রয়েছে। মৌসুমী বায়ু প্রভাব বলয়ে বঙ্গোপসাগরের অবস্থাহেতু এই জলরাশির পানি বিজ্ঞান অনেকাংশে মৌসুমী বায়ুর পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত বিশ্বের সমুদ্রগুলির মধ্যে বঙ্গোপসাগরই হচ্ছে সমুদ্র সমতলের অবস্থানের ঋতুগত পরিবর্তনের মাফকাঠিতে সবচেয়ে উচুতে অবস্থিত। সমুদ্র সমতল গ্রীষ্মকালে উর্ধ্বে অবস্থান করে কিন্তু শীতকালে অনেক নিচে চলে আসে। শুধু বঙ্গোপসাগরে গ্রীষ্মকালীন সমুদ্র সমতল থেকে শীতকালীন সমুদ্র সমতলের এত ব্যাপক পার্থক্য আর কোনো সাগর মহাসাগরের বেলায় দেখা যায় না। বিষয়টি লক্ষ্য করার জন্য বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী ৯টি স্টেশনের মাসিক ও বার্ষিক গড় মসুদ্র সমতলের উচ্চতা ২নং সারণিতে দেখানো হলো। আন্তর্জাতিক ভূমিতি (geodesy) এবং ভূপদার্থিক (geophysical) ইউনিয়নের ভৌত



চিত্র ২.৪ : বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র সমতলের ঋতুগত পার্থক্য।

সামুদ্রিক বিজ্ঞান সংগঠনের প্রকাশিত উপাত্ত এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। এই সারণিতে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পানি স্তরের মান ও তারতম্যের পরিমাণ গড় হিসাবে ধরে ২০-৪৫ বৎসরের উপাত্ত থেকে হিসাব করা হয়েছে। ২ নং সারণি থেকে দেখা যায় সমুদ্র সমতলের ঋতুগত পার্থক্যের পরিমাণ উত্তর বঙ্গোপসাগরের অগভীর ও বিস্তৃত মহীসোপান বিশিষ্ট উপকূলের স্থানগুলিতে সবচেয়ে বেশি। ভৌগোলিক অবস্থান ও চোঙ্গাকৃতির কারণ ছাড়াও বঙ্গোপসাগরে ঋতু ভিত্তিক সমুদ্র সমতলের পার্থক্যে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রেঙ্গুন, চট্টগ্রাম, খিদিরপুর, কলিকাতা, ডায়মণ্ডহারবার ও সাগর দ্বীপ উত্তর বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত। তাছাড়া সাগর দ্বীপ ও ডায়মণ্ডহারবার ব্যতীত উত্তর উপকূলের বাকি ৪টি স্থান কিছুটা ভিতরে অবস্থিত।

সারণি-২ : বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী কয়েকটি স্থানের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পানির উচ্চতার মাস ও সমুদ্র সমতলের ঋতুগত পরিবর্তনের পরিমাণ

পর্যবেক্ষণের স্থান	অক্ষাংশ উত্তর	দ্রাঘিমাংশ পূর্ব	মাস ও সমুদ্র সমতল		পার্থক্য সে: মি:
			সর্বোচ্চ	সর্ব নিম্ন	
রেঙ্গুন	১৬°৪৬'	৯৬°১৯'	আগস্ট	জানুয়ারি	১০৮
চট্টগ্রাম	২২°১৯'	৯১°৪৯'	জুলাই	ফেব্রুয়ারি	১১৮
খিদিরপুর	২২°৩২'	৮৮°২০'	সেপ্টেম্বর	"	১৬০
কলিকাতা	২২°৩৩'	৮৮°১৮'	"	"	১৩০
ডায়মণ্ড হারবার	২২°১২'	৮৮°১০'	আগস্ট	"	৬১
সাগর দ্বীপ	২১°৩৯'	৮৮°০৩'	"	"	৫১
ভিশাখা পঞ্চম	১৭°৪১'	৮৮°১৭'	অক্টোবর	মার্চ	৪৫
মাদ্রাজ	১৩°০৬'	৮০°১৮'	নভেম্বর	"	৩৪

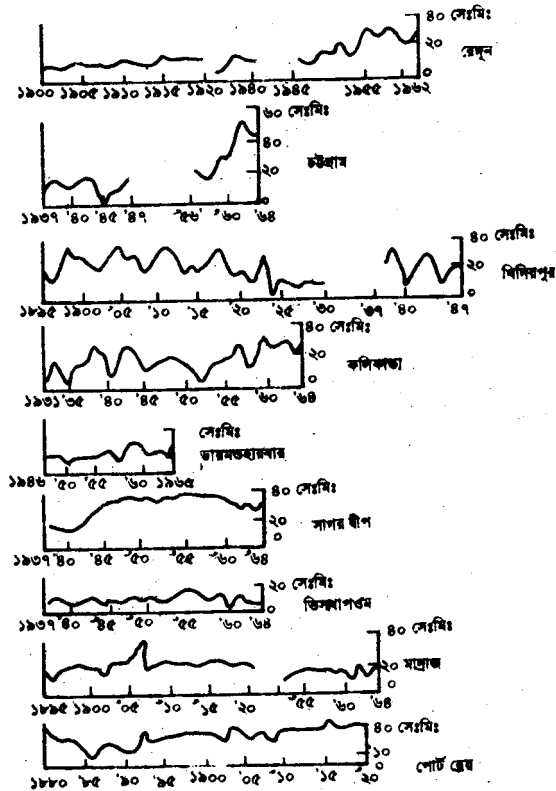
সূত্র : দাস, স. চ. ১৯৯২ পৃ: ৩০)

উত্তর বঙ্গোপসাগরের সবগুলি স্থানের পানির সর্বোচ্চ উচ্চতা জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসে হয়ে থাকে যখন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু স্থিতিশীলভাবে প্রচলিত বেগে দীর্ঘ দিন ধরে প্রবাহিত হতে থাকে। একদিকে যখন বাংলাদেশ, ভারত ও বার্মা থেকে নদীসমূহ সর্বোচ্চ পানি প্রবাহ নিয়ে সমুদ্রে আসতে থাকে, ঠিক সে সময়েই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সমুদ্রের পানিকে ঠেলে নদী অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে ক্ষীতি ঘটিয়ে পানির দেয়ালের সৃষ্টি করে ও পানি সমতলের উচ্চতা বৃদ্ধি করে। উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু নদীর পানির গতির দিকে অর্থাৎ ভাটির দিকে প্রবাহিত হয়ে পানি প্রবাহকে ত্বরান্বিত করে ও পানি সমতলকে দ্রুত হ্রাস করে দেয়। তার ফলে ঋতুভিত্তিক পানি সমতলের পার্থক্য বৃদ্ধি পায়। এরূপ ঘটে উত্তর বঙ্গোপসাগরে। বিসাখাপত্তম ও মাদ্রাজ গভীর সমুদ্রের সন্নিহিতে ও উপকূলের অতি নিকটে অবস্থিত। এখানে মহীসোপান অত্যন্ত অপ্রশস্ত। এইসব কারণেই মাদ্রাজ ও বিসাখাপত্তমে সমুদ্র সমতলের ঋতুভিত্তিক পার্থক্য উত্তরের অগভীর অংশের তুলনায় অনেক কম। মাদ্রাজে নভেম্বরে সমুদ্র সমতল সর্বোচ্চ হয় এবং মার্চে সর্বনিম্ন, উপসাগরের উত্তরাঞ্চলে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। উত্তরাঞ্চলের অগভীর জলভাগ এবং প্রশস্ত মহীসোপান ও ঋতুতে ঋতুতে পরিবর্তিত মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগরে ঋতুভেদে সমুদ্র সমতলের উঠানামা ঘটে। আবহাওয়াগত কারণও এদের মধ্যে একটি। উদাহরণ স্বরূপ সারণি থেকে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাতের সময় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সমুদ্র সমতল লক্ষ্য করা গেছে। জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত উত্তর উপকূলভাগে সারা বছরের শতকরা ৮৫ ভাগ বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

তাছাড়া নদী বাহিত পানি ও সমুদ্র-সমতলের উপর প্রভাব বিস্তার করে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর সময় উত্তর বঙ্গোপসাগরের পানি নদী বাহিত পানি প্রবেশের

ফলে বেশ পাতলা থাকে। বঙ্গোপসাগরের নদী বাহিত পানির ৮৭ শতাংশই আসে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও ইরাবতী নদীর মাধ্যমে, আর এদের ৮৫ শতাংশ পানি আসে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর সময়ে। নদীর ভরা জোয়ারের সময় শক্তিশালী দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু উপকূলের দিকে পানির পাহাড় ঠেলে দেয়, ফলে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পায় এবং বন্যার সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের জোয়ারভাটার ঢেউও এতে সহায়ক হয়। বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র সমতলের পরিবর্তনে বায়ুর চাপ, বৃষ্টিপাত, লবণাক্ততা তাপমাত্রা, বায়ু প্রবাহ ইত্যাদি আবহাওয়ার উপদানগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্ণিত উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, সমুদ্র সমতলের পার্থক্য ১৬৬,১৩০,১১৮ সেন্টিমিটারের মত যা বিশ্বের অন্যান্য সাগরগুলি থেকে অনেক বেশি। এদিক দিয়েও বঙ্গোপসাগর অনন্য।

সমুদ্র সমতলের দীর্ঘ মেয়াদী পরিবর্তন : সমুদ্র সমতলের দীর্ঘদিনের অবস্থা সম্পর্কে সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, উত্তর বঙ্গোপসাগরের প্রায় প্রত্যেক



চিত্র ২.৫ : বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র সমতলের দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন (১৮৮০-১৯৬৮)।

স্থানেই পানির স্তর উপরে উঠেছে। সারণিতে যেসব স্থানের জন্য ৩০-৪০ বৎসরের গড় সমুদ্র তলের উপাত্ত নিয়ে গ্রাফগুলো তৈরি করা হয়েছে (দাস, ১৯৭৮) তা থেকে দেখা যায় যে, সাগর দ্বীপ ১৯৩১ সালের তুলনায় ৩০ সেন্টিমিটার উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে। রেঙ্গুণে ১৯২০ সালের তুলনায় ১৯৬২ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬ সেন্টিমিটার। ১৯৪৪ সনের তুলনায় ১৯৬৪ সালে চট্টগ্রামে পানির উচ্চতা বৃদ্ধির পরিমাণ ২৫ সেঃ মিটার। বঙ্গোপসাগরের উত্তরাঞ্চলের সবগুলো স্থানে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেলেও দক্ষিণে মাদ্রাজ ও বিশাখাপত্তমে পানির সমতল প্রায় স্থির রয়ে গেছে। পানির উচ্চতা স্থির বা বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে এ পর্যন্ত সঠিক বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেয়া সম্ভব হয়নি।

বঙ্গোপসাগরের পানি সঞ্চলন

দিগন্তরাল সঞ্চলন (horizontal circulation) -সামুদ্রিক পানি সঞ্চলন হচ্ছে সমুদ্র পৃষ্ঠের বড় আকারের স্রোত। পানি রাশির বিতরণের বিভাগ বা স্তরগুলি থেকে যা ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে, তা থেকে পুরো বঙ্গোপসাগরের পানি সঞ্চলনের চিত্রটি ফুটে উঠে। জানুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত সমুদ্র পৃষ্ঠের পানি সঞ্চলন ঘড়ির কাটানুযায়ী ঘুরতে থাকে আর আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মৌসুমী বায়ুর গতি প্রবাহ অনুসারে ঘড়ির কাটার উল্টো দিকে পানি সঞ্চলিত হয়। মধ্যবর্তীকালে মনে করা হয় ঘূর্ণিজল (eddy) বিরাট প্রবাহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে। প্রবাহ কোনো সময়েই স্থির থাকে না, আর এটা নির্ভর করে বায়ুর শক্তি ও স্থায়িত্বের সময়ের উপর।

বায়ুর শক্তিঃ ৩১মে—১০ জুন এবং ২০-২৯ জুন ১৯৭৯ সনে বঙ্গোপসাগরের মধ্য অঞ্চলে ৩০-২০, দক্ষিণে ১৫ পর্যন্ত প্রতি মিটার জায়গায় ০.০১ নিউটন শক্তির বা ০.১ ডাইন (সেন্টিমিটার বর্গ) রেকর্ড করা হয়েছে। জুলাই ১৯৭৯ সনের গড় বাতাস আবর্তনের রেকর্ড হচ্ছে প্রতি মিটারে ১০-৮ নিউটন হিসাবে ১০ গুণ শক্তিসম্পন্ন পানি সঞ্চলনের হারের উপর উপর্যুপরি কয়েক দিন বায়ু প্রবাহের প্রভাব অত্যন্ত বেশি থাকে। উত্তর-পশ্চিম অভিযুক্তী স্রোত সাধারণত শক্তিশালী দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবের ফলে অনেক দিন ধরে তীব্র গতিতে চলতে থাকে। ভারতের ওয়ালটেয়ারের কাছে সমুদ্র স্রোত ৩ নটের (knot) এবং গোদাবরীর কাছে ৫ নটের মত শক্তিশালী। দক্ষিণের এই পানি সঞ্চলন কয়েক মাস পরেই উত্তরের নদী বাহিত পাতলা পানির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। বঙ্গোপসাগরের পানি সঞ্চলনের গতি বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা খুবই কম হয়েছে। এ সম্পর্কে রাশিয়ানদের কিছু কাজ ছাড়া আর বেশি তথ্য পাওয়া যায়নি।

উল্লম্ব সঞ্চলন (vertical or internal wave) : পানির উল্লম্ব সঞ্চলনের উদাহরণ হচ্ছে উর্ধ্ব পানি প্রবাহ। পানির নিম্ন দিকে প্রবাহকে বলে নিম্ন পানি প্রবাহ। সমুদ্রকূল থেকে বায়ু প্রবাহের দরুন উর্ধ্ব পানি প্রবাহ তৈরি হতে পারে। আবার কোনো কোনো সময় উত্তর গোলার্ধে বায়ু সমুদ্র উপকূলের সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্র পৃষ্ঠের পানিকে সরিয়ে উর্ধ্ব পানি প্রবাহের সৃষ্টি করে। বায়ুর দিক, গতি, স্থায়িত্ব এবং থেমে

যাওয়া (fetch), সেইসাথে উপকূলের আপেক্ষিক দিক নির্দেশনার উপর উর্ধ্বপানি প্রবাহের মাত্রা নির্ভর করে।

উর্ধ্ব পানি প্রবাহের ফলে পৃষ্ঠদেশের পানির ধর্মাবলি তলদেশের পানির ধর্মাবলি হতে আলাদা হয়ে থাকে। গভীর পানিতে পুষ্টিকর বস্তুর পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে এবং উর্ধ্ব পানি প্রবাহের দরুন স্থানান্তরিত হয়ে ফাইটোপ্লাঙ্কটন উৎপাদনের সম্ভাব্য অবস্থা তৈরি হয়। উর্ধ্বপানি প্রবাহ সামুদ্রিক খাদ্য উৎপাদনে এক বিশেষ ভূমিকা রাখে অঙ্ক প্রদেশের উপকূলে প্রতি মাসে এই উর্ধ্ব পানি প্রবাহ ১০-৪০ মিটার পর্যন্ত হয়। মৌসুমী বায়ু প্রবাহের সময় বৎসরে ২ বার উর্ধ্ব পানি প্রবাহের কাল। বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম তীরে গ্রীষ্মে হয় উর্ধ্বপানিপ্রবাহ এবং শীতকালে হয় নিম্নপানিপ্রবাহ; আর বাংলাদেশ উপকূল ভাগে ও বার্মায় হয় এর উল্টো সময়ে অর্থাৎ উর্ধ্ব পানি প্রবাহ হয় শীতকালে, আর গ্রীষ্মকালে হয় পানির নিম্ন প্রবাহ।

অঙ্ক প্রদেশের উপকূলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এমন কোণ সৃষ্টি করে বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম কূলে আঘাত হানে যে সমুদ্র পৃষ্ঠের পানি তীর থেকে সরে যায়, সেই সাথে নিম্ন তাপমাত্রা, উচ্চঘনত্বসম্পন্ন প্রায় পৃষ্ঠদেশের পানি একে সরিয়ে দেবার জন্য গভীর থেকে উঠে আসে। পানির ভৌতিক রাসায়নিক, মেবিক গুণ ও ঘনত্ব থেকেই এমন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। উল্টো সময়ে উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ু উপকূলের দিকে নিম্ন চাপের ফলে সাগর পৃষ্ঠের পানি নদী বাহিত স্বল্প লবণাক্ত পানি উপকূলের পানির বিপরীতে জমে উঠে। এখানে ঘন-উর্ধ্বপানি উল্লঙ্ঘভাবে ঘনত্বের একটি ক্রমোচ্চ কোণ তৈরি করে যা বায়ু প্রবাহের সঙ্গে পৃষ্ঠদেশের পানির উপর চাপ দিয়ে উপকূল ধরে জিওস্ট্রফিক (geostrophic) স্রোতের সৃষ্টি করে। পানির উর্ধ্ব প্রবাহ দিয়ে বিরাট পরিমাণের পুষ্টিকর পদার্থ (ফসফেট, নাট্রেট, ইত্যাদি) হাল্কা পানির অঞ্চলে প্রবেশ করে। এতে উচ্চ হারে জৈব পদার্থ উৎপাদনের মওসুম শুরু হয়ে যায়। উপসাগরের উত্তর ও পূর্ব দিকের উপকূল ভাগে ফাইটোপ্লাঙ্কটন বেশি পরিমাণে দেখা যায়। কেন্দ্রীয় অংশের পশ্চিমাংশ এবং দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ক্ষুদ্র জীবাণু কম দেখা যায়। উপকূলের পরিবেশের উপর উর্ধ্ব ও নিম্ন পানি প্রবাহ বিরাট ভূমিকা রাখে। পানির ও স্থল ভাগের তাপমাত্রার তারতম্য উপকূল ভাগের বায়ু প্রবাহকে প্রভাবিত করে।

সমুদ্র পৃষ্ঠের স্রোতও পানির উল্লঙ্ঘ গতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভৌতিক সমীক্ষায় এবং তাত্ত্বিক সূত্রে দেখা যায় যে, উত্তর দিকের প্রবাহিত পানি উর্ধ্ব পানি প্রবাহের জন্য অনুকূল এবং দক্ষিণমুখি পানি নিম্নপ্রবাহের জন্য উপযোগী। জানা আছে, উত্তর গোলার্ধে কোনো বায়ু যদি সমুদ্র অঞ্চল রেখাকে বাঁয়ে রেখে সমুদ্রতীরের সমান্তরালে প্রবাহিত হয় তাহলে তীর নিকটবর্তী বায়ু উপকূলের কাছে পানির উর্ধ্ব পানি প্রবাহ সৃষ্টি করে। বঙ্গোপসাগরের পানির উর্ধ্ব ও নিম্ন প্রবাহ ভারত মহাসাগরের সোমালী পানি প্রবাহ বা উত্তর দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলের স্রোতের মত দীর্ঘস্থায়ী বা তীব্রতাসম্পন্ন নয়। তবে সমুদ্রের অর্থনৈতিক সুবিধা ও সামুদ্রিক খাদ্য আহরণের জন্য বঙ্গোপসাগরের উর্ধ্বপ্রবাহ তার রাসায়নিক ধর্ম ও জীবকূলের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

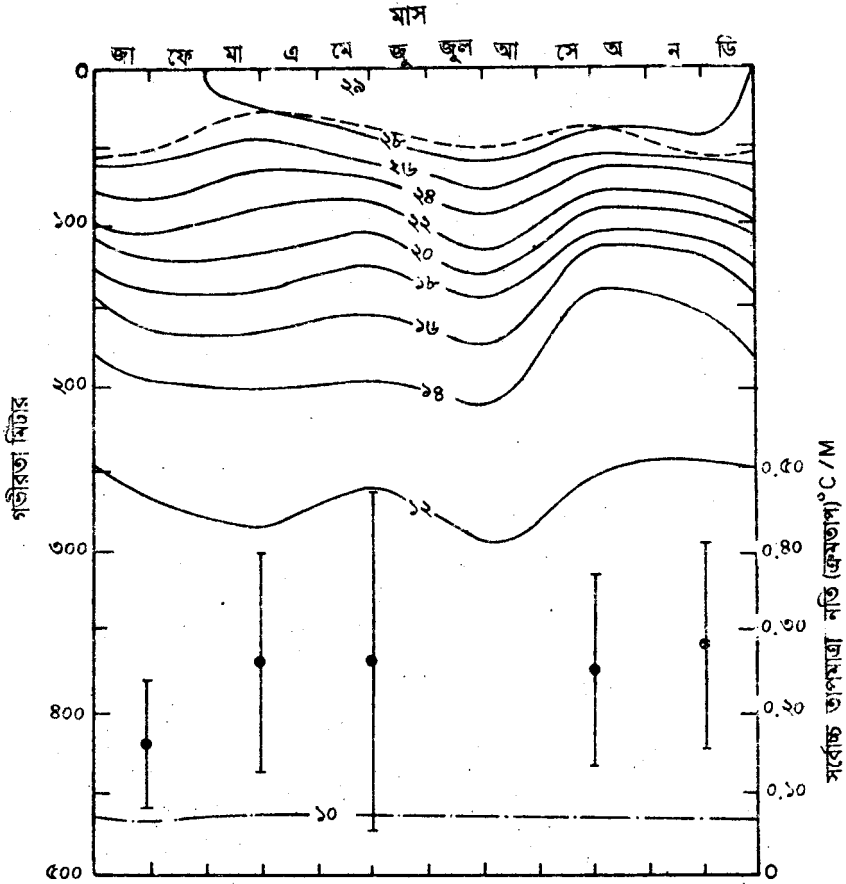
বঙ্গোপসাগরের ৫০০ মিটার গভীরে তাপীয় গঠন চিত্রের বিশ্লেষণ : বঙ্গোপসাগরকে ৪টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। আন্দামানের পশ্চিমে মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরকে (ক) অঞ্চল, এর দক্ষিণে শ্রীলংকার পূর্বাংশটি (খ) অঞ্চল এবং ভারতের মাদ্রাজ-উড়িষ্যা উপকূলকে (গ) অঞ্চল এবং বাংলাদেশ সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের অঞ্চলটাকে (ঘ) অঞ্চল নামে অভিহিত করে IOE এর সময় জরিপ কাজ চালানো হয়। বছরের প্রতি মাসে বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন অংশে ৫০০ মিটার গভীরে অঞ্চলটাকে (ঘ) অঞ্চল নামে অভিহিত করে IOE এর সময় জরিপ কাজ চালানো হয়। বছরের প্রতি মাসে বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন অংশে ৫০০ মিটার গভীরে তাপমাত্রার চিত্রের পানির সংজ্ঞা এবং শ্রেণীকরণ পর্যবেক্ষণ ও ঋতুভিত্তিক পার্থক্যের আলোচনার প্রেক্ষিতে করা হয়েছে। এই কাজ IOE এর মানচিত্রে তাপমাত্রার গঠনের ব্যাখ্যার পরিপূরক যেখানে অঞ্চল ভিত্তিক তাপমাত্রার গঠনের উপর জোর দিয়েছে।

ক' অঞ্চলের তাপীয় গঠন চিত্র : ক, খ, গ, ঘ এই চারটি অঞ্চল পুরোপুরি বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত। উপসাগরের পূর্ব দিকে অবস্থিত এই 'ক' অঞ্চলে রয়েছে সীমানা-পূর্বে আন্দামান সাগর, দক্ষিণে উত্তর সুমাত্রা পূর্বে শ্রীলংকা লাইন (দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর), পশ্চিমে মাদ্রাজ-উড়িষ্যা উপকূল। এই অঞ্চলে সারা বছরই স্থায়ী তাপনতিস্তর থাকে, কেবল নভেম্বর ডিসেম্বরে সামান্য একটু বাড়ে আর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে তলিয়ে যায়। 'ক' অঞ্চলের পুরো অংশেই এ রকমটা দেখা যায় যা বঙ্গোপসাগরের অন্য অঞ্চলগুলিতে নেই। শীতকালীন এই উচ্চ নিম্নগতি মিশ্রস্তর গভীরতায় প্রতিফলিত হয়। তবে ৫০ মিটার গভীরতায় সারা বছর স্থিতি থাকে। মার্চ-এপ্রিলের দিকে সমোষ্ণতা রেখা পশ্চিম দিকে নেমে যায়। মে-জুনে পৃষ্ঠদেশের স্তর সর্বোচ্চে থাকে আর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির দিকে কিছুটা ঠান্ডা দেখা যায় তবে তাদের পার্থক্য হয় সামান্য।

আবহাওয়া চক্রের পরিবর্তনের জন্য এবং তজ্জনিত স্রোত ধারার ধরন বদলের জন্য উন্মুক্ত বঙ্গোপসাগরে তাপমাত্রার গঠনে ঋতুভেদে বৈচিত্র্য দেখা যায়। এ ছাড়া বঙ্গোপসাগরের তিনদিকে এশীয় ভূখণ্ড ও উপকূলীয় ভাগের জলের তাপমাত্রার বিভিন্নতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। সূর্যের বার্ষিক গতি, মেঘমন্ডলের বিভিন্নতা ঋতুভেদে বায়ুর গতির উপর সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রার তারতম্য ঘটে। এপ্রিল-মে মাসে বঙ্গোপসাগরে উত্তর দিকে মেঘহীন আকাশে সূর্যের তীব্র আপতিত রশ্মির ফলেই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তারপর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সমুদ্রের স্তরীভূত পৃষ্ঠস্তরের সঙ্গে মিশ্রিত হয় এবং ঠাণ্ডা করে। সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয়বার অপসূর্যমান মৌসুমী বায়ুর বদৌলতে এবং সূর্যরশ্মির ঋতু ভিত্তিক তাপীয় ফল বৃদ্ধির জন্য তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে এই ঠাণ্ডা এবং পুনঃ উষ্ণতার মধ্যে মাত্র ২° সেন্টিমিটার তাপমাত্রার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শীতকালীন ঠান্ডার জন্য জানুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দৃষ্ট হয়।

দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহের সময় মে-জুন থেকে সেপ্টেম্বর অক্টোবর পর্যন্ত 'ক' অঞ্চলে তাপমাত্রার গঠনের তেমন কোনো উঠানামা ঘটে না। কিন্তু এই সময়ে

সমুদ্র পৃষ্ঠে স্রোত প্রবাহের ধরনে বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মার্চ-এপ্রিলের প্রতিঘূর্ণি-পশ্চাৎ বায়ু (anticyclonic eddy) বঙ্গোপসাগরে মে মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর পূর্ব দিকে গমনকারী স্রোতকে জায়গা ছেড়ে দেয়। আগস্ট মাসে সমুদ্র স্রোতের ধরন জটিল হয়ে উঠে, একটি ঘূর্ণিবায়ু জন্ম নেয় যা উপসাগরের উত্তরাংশে সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে বৃদ্ধি পায়। গ্রীষ্মে 'ক' অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত বিভিন্নমুখী স্রোতে থাকে নিরক্ষীয় এবং উত্তর পূর্ব ভারত মহাসাগরের জলরাশি। এই অঞ্চল দিয়ে এ সময়ে প্রবাহিত দিগন্তিক আনুভূমিক তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের দেখা যায় না।



চিত্র ২৬ : পূর্ব বঙ্গোপসাগরের ঋতুভিত্তিক তাপমাত্রার বিন্যাসের তারতম্য।

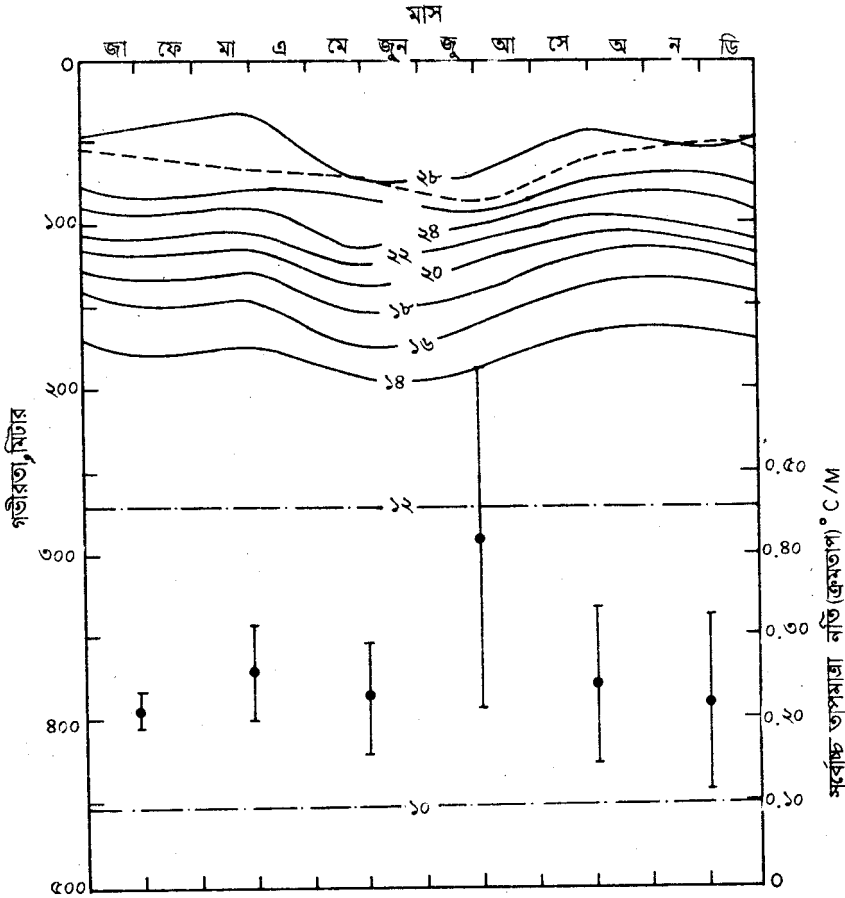
নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে মালাক্কা প্রণালী থেকে কিছু পৃষ্ঠদেশীয় পানি আসে। জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তর বঙ্গোপসাগরের প্রতি ঘূর্ণিবায়ু দক্ষিণমুখী হাওয়ায় মালাক্কা প্রণালীর জলরাশিকে ঠেলে বের করে দেয় এবং এই পানি 'ক' অঞ্চলের দক্ষিণ অংশে চলে যায়। খুব সম্ভবত মালাক্কা প্রণালীর জলরাশিই এ অঞ্চলে নভেম্বর ডিসেম্বর মাসের স্থায়ী তাপনতি স্তরের উর্ধ্ব গতির কারণ। তাছাড়া আন্দামান-নিকোবর দ্বীপমালার পশ্চিম দিকে তাপনতি স্তরের বৃদ্ধিও সম্ভবত উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ুর ক্রমবর্ধমানগতির জন্য সমুদ্র পৃষ্ঠের স্রোত পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। তবে আন্দামানের পূর্বাংশে জমাকৃত জলরাশির উপর যথেষ্ট উপাত্ত না থাকাতে সঠিক কারণটি জানা যায় না।

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে সমোষ্ণ তাপরেখার অবনতি এবং এর ফলে মিশ্র স্তরের অতি বৃদ্ধি এই নির্দেশ করে যে, বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ সীমায় প্রতি ঘূর্ণিবায়ুজনিত স্রোতের একটি কেন্দ্র ভাগ (convergenec) অঞ্চল রয়েছে। সম্ভবত মার্চ এপ্রিলেই শুধু কেন্দ্রাভিগতা দেখা যায় বলে (চিত্র ২.৬) এ অঞ্চলে ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে অনুরূপ সমোষ্ণ তাপ রেখা বৃদ্ধির ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় এই কেন্দ্রাভিমুখীনতা গঙ্গাধর রাও এবং জয়রামান (১৯৬৮) কর্তৃক প্রস্তাবিত হয়েছিল।

'খ' অঞ্চলের তাপীয় গঠন চিত্র : দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের এই অঞ্চলে স্থায়ী মগ্নচরে তাপনতিস্তর দেখা যায়। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানে তাপমাত্রার উঠানামা করতে দেখা যায় না। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাপনতি স্তরের (এটি সূক্ষ্ম এবং হাল্কা মগ্নচর বিশিষ্ট) উল্লম্ব পরিবর্তনও দেখা যায় না। তবে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু যখন এই অঞ্চলের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে প্রবাহিত হয় তখন তাপনতিস্তর কয়েক মিটার বৃদ্ধি পায়। মিশ্র স্তরে সারা বৎসর তাপমাত্রার উঠানামা দেখা যায় না, তবে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর সময় কিছুটা উষ্ণ স্রোত কিছু গভীরে পরিলক্ষিত হয়। এ অঞ্চলে সারা বৎসরের মোট তাপ বিনিময় খুবই সামান্য। শীতে সামান্য পরিমাণ তাপ হারায় আর গ্রীষ্মে সামান্য তাপ বেশি হয়। এই সামান্য তাপ বিনিময়ের ফলে সাগর পৃষ্ঠের তাপমাত্রায় সামান্য পরিবর্তন হয় যা ২.৭ চিত্রেও দেখা যায় না। কেন্দ্রাভিগ বা বিকেন্দ্রাভিগ কোনো স্রোত এ অঞ্চলে দেখা যায় না। ফলে তাপনতি স্তরের উল্লম্ব চিত্রেও কোনো প্রভাব পড়ে না।

শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে পশ্চিমমুখি সাগর পৃষ্ঠ স্রোত প্রবাহিত হয়, পূর্ব দিক হতে এ সময় জলরাশির সরবরাহ হয়। আর মে-আগস্ট মাসে পূর্বদিকে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু স্রোত প্রবাহকে প্রভাবিত করে। সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এ অঞ্চলে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণি প্রতিঘূর্ণি প্রবাহিত হয় এবং উত্তরের পানি উপরের স্তরে বিদ্যমান থাকে যা ভারতের পূর্বকূল ধরে আসে। এই সময় পানির অগভীর স্তরে তাপনতি স্তর ক্রমশ উত্তর দিকে চলে আসতে দেখা যায়।

'গ' অঞ্চলের তাপীয় গঠন চিত্র : ভারতের পূর্ব কূলে 10° উত্তর - 20° উত্তর পর্যন্ত অঞ্চল এটি। এখানকার তাপীয় চিত্র 'ঘ' অঞ্চলের অনুরূপ। তবে স্থায়ী তাপনতি স্তর উত্তর দিকে মোটা হতে শুরু এবং নতিমাত্রা খুবই দুর্বল দেখায়। বছরের



চিত্র ২.৭ : দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের ঋতুভিত্তিক তাপমাত্রার বিন্যাসের তারতম্য।

শেষের দিকে অনুরূপ চিত্র দেখা যায় (তাপনতিস্তরের ক্রম অগভীর হওয়া) যা বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম উপকূলভাগের একটি বৈশিষ্ট্যময় ধর্ম। মার্চ-এপ্রিল মাসে সমোষ্ণতা রেখা বাড়তে বাড়তে বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, এটাও 'গ' অঞ্চলের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। এটি 16° উত্তর - 20° উত্তর অঞ্চলে বেশি দেখা যায়। তবে মহাদেশীয় তাকেও (shelf) দেখা যেতে পারে। পানির উর্ধ্বদিকে গতি কেবল উপকূল ভাগেই সীমাবদ্ধ থাকে।

সারা বৎসর মিশ্রস্তর গভীরতা একরকমই থাকে, তবে দক্ষিণ প্রান্তে 'খ' অঞ্চলের তুলনায় পানি স্তরের তাপমাত্রা একটু বেশিই থাকে। জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা 26°

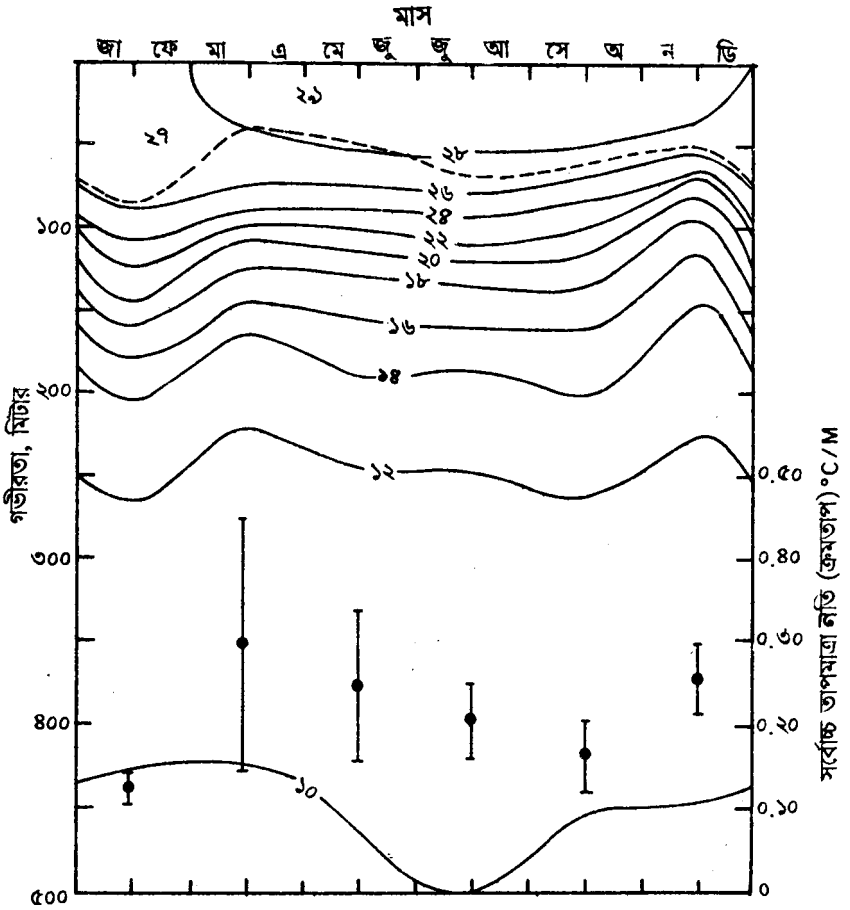
সেন্ট্রিগ্রেডে নেমে যায়, আর মে মাসে ২৯° সেন্ট্রিগ্রেড পর্যন্ত পৌঁছে। বছরের শুরুতে উত্তর বঙ্গোপসাগরের কেন্দ্রের দিকে মিশ্র স্তর কিছুটা বাড়তে থাকে।

গ্রীষ্মে ভারতের পূর্বকূল ধরে পৃষ্ঠদেশের মোট তাপ মাত্রার সমরেখা বাড়তে থাকে (Albrecht, 1958)। এ অঞ্চলের উত্তর এবং দক্ষিণ সীমায় এরকম উপরিস্তরে উষ্ণতা দেখা যায়। জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে শীতের জন্য পানির পৃষ্ঠের তাপমাত্রা কমে যায়। উত্তর বঙ্গোপসাগরে এ সময়ে পরিষ্কার আকাশে এবং মৃদু বায়ু সূর্য তাপকে বাষ্পীভবনের চাইতে বেশি সাহায্য করে বলে জানা যায় (রামাজি, ১৯৬৯)। ফলে সমুদ্রের পানিতে ধনাঙ্ক তাপ বদলে যায়। পৃষ্ঠের হ্রাসমান তাপমাত্রার জন্য নিম্ন পৃষ্ঠ স্তরে তাপমাত্রা কমে যায়। ডিসেম্বর মাসে এলাকায় বায়ু মন্ডলে তাপ হারিয়ে যায়।

‘গ’ অঞ্চলে শীতকালে পৃষ্ঠস্তর ঠাণ্ডা হওয়ার পিছনে অন্য কোনো ক্রিয়া-কৌশল কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রে ঠাণ্ডা পানির উল্লম্ব আনুভূমিক হওয়ার সম্ভাবনা কম যেহেতু জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বৃহৎ স্রোত প্রবাহ ঘূর্ণি প্রতি ঘূর্ণি ঝড়ের সৃষ্টি করে না। এটা আন্দামান সাগরের উষ্ণ এলাকার পৃষ্ঠদেশের পানির প্রভাবে হয়ে থাকে। শীতকালীন ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সময়টিতে নদীবাহিত ঠাণ্ডা পানির সরবরাহ কমে আসে, আর এটা উপকূলবর্তী অঞ্চলেই বেশি ঘটে (ganapati and Murthy, 1954)। জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে সমতাপ রেখার উর্ধ্বগতি দেখা যায় না। ফলে পানির উর্ধ্বগতিও পরিলক্ষিত হয় না। পানির উর্ধ্বস্তর থেকে তাপমাত্রা নিচের স্তরে চলে যাওয়ায় সমুদ্র পৃষ্ঠে ঠাণ্ডা নামে। বঙ্গোপসাগরের উত্তরদিকের প্রান্ত সমতল রেখা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে প্রায় পুরো অঞ্চলটিতে সমতল রেখা গভীর হয় এবং চারদিকে ছড়িয়ে যায়। তবে সেইসাথে এ সময়ে মোট পানির স্তরের সংখ্যা কমে না। যদিও এ সময় উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ু কোনো প্রবল বায়ুর জন্য দেয় না। পৃষ্ঠদেশের হ্রাসমান তাপমাত্রার জন্য শীতকালে সামান্য ঠাণ্ডা এবং মিশ্র স্তরে গভীর হতে পারে। সাথে লবণাক্ততা বৃদ্ধিও এর কারণ হয় (নদী কর্তৃক কম পানি প্রদানের ফলে সমুদ্রে লবণাক্ততা বেড়ে যায়) (LaFond, 1954)।

মার্চ এপ্রিল মাসে উত্তর দিকে উপরের স্তরে উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের পানির আগমনের দরুন যা ভারতের উপকূল ধরে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় পূর্ব উপকূলে অন্য স্থানেও পানির উর্ধ্বগতি প্রবাহ বহুসংখ্যক গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। (LaFond, 1954, 1957; Murthy, 1958; Poorna chandra Rao, 1959; Rama Sastry, 1954; LaFond and LaFond, 1968)।

২.৮ সংখ্যক চিত্রে দেখানো হয়েছে যে, দিগন্ত সমতাপ রেখা তাপনতিস্তরের সাথে উর্ধ্বস্তরের উর্ধ্বগতির সঙ্গে ছড়িয়ে যেতে থাকে বলে উপকূল অঞ্চলে পানির উর্ধ্বপ্রবাহ ঘটায়। উপকূলের ১০-২০ মাইলের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ থাকে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে মাদ্রাজ উপকূলে অনুরূপ সমোষ্ণরেখা মগ্নচরে প্রত্যক্ষ করা যায় (ganapati and Murthy, 1954; গঙ্গাধর রাও এবং জয়রামন) সম্ভবত উত্তর-দক্ষিণমুখী স্রোত প্রবাহের কেন্দ্রাভিমুখিনতার দরুন উত্তর দিকে পৃষ্ঠ দেশে একটু নিচে দিয়ে প্রবাহিত হয়। আগস্ট মাসে উপসাগরের উত্তরাঞ্চলে যখন ঘূর্ণি বায়ুর সৃষ্টি হয়



চিত্র ২.৮ : পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের ঋতুভিত্তিক তাপমাত্রার বিন্যাসের তারতম্য।

তখন সমোষ্ণ রেখা গভীর হতে থাকে। অক্টোবর মাসে উপকূলভাগে পানির নিম্ন প্রবাহ মহাদেশীয় তাকের উপরের স্তরে ঘটে যায় (LaFond and Borreswara Rao, 1955; LaFond 1957; Rama Sastry and Murthy, 1957)। তবে ১৯৭০ এর দিকে পর্যবেক্ষণে এ ধরনের প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়নি। অন্যদিকে সাধারণভাবে জুলাই আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে তাপনতি স্তর সঙ্কুচিত হয়ে আসে এবং বিবর্ণ হয় যা বঙ্গোপসাগরের পুরো পশ্চিম উপকূলীয় অংশে পরিলক্ষিত হয়। জুলাই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে (Laviolette, 1967) ১০০ মিটার গভীরতায় পশ্চিমাঞ্চলে উপপৃষ্ঠতলে

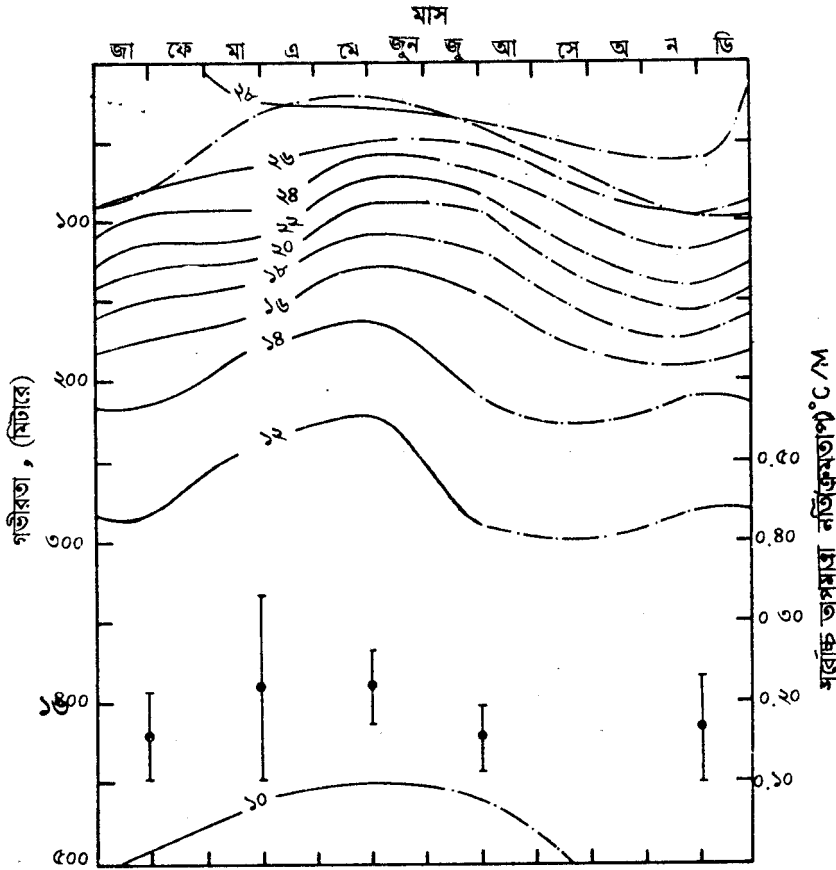
পানির তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে বিরাট হারে এক স্রোত প্রবাহ যা দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রবাহিত হয় তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপই এমনটি ঘটে থাকে। এই বৈশিষ্ট্যটি বৃহৎ ঘূর্ণিবায়ুর ঘূর্ণিপাতের দরুন সৃষ্টি হয়ে থাকে। অক্টোবর মাসের দিকে সম্পূর্ণরূপে পুরো বঙ্গোপসাগরে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘূর্ণিপাক উত্তরের পানিকে ভারত উপকূল ধরে দক্ষিণ দিকে ঠেলে দেয়। এই স্রোত প্রবাহে দুটি আলাদা এন্টি ঘড়ি ক্রম স্রোত প্রবাহ লক্ষ্য করা যায় (ganapati and Murthy, 1954)। যাই হোক, এইগুলি আঞ্চলিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে। তা ছাড়া এও মনে হয় না যে, নদী প্রবাহিত স্বল্প ঘনত্বের পানি যার স্থান দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর পরেই তা ১০০ মিটার গভীর পর্যন্ত তাপমাত্রায় কোনো হের ফের ঘটাতে পারে। বৎসরের প্রথম দিকে বঙ্গোপসাগরের কেন্দ্রের দিকে তাপনতিস্তর গভীর হতে থাকে ফলে উপসাগরের এই সময়ে প্রতি ঘূর্ণি স্রোত প্রবাহের কেন্দ্রে কেন্দ্রাভিমুখীনতা দেখা যায়। (চিত্র ২.৮)।

‘ঘ’ অঞ্চলের তাপীয় গঠন চিত্র : এই অঞ্চলটি পুরোপুরি বাংলাদেশের সমুদ্র সীমানায় (২০০ মাইল) অবস্থিত। এখানে হাল্কা গভীর শীত মিশ্র স্তর স্থায়ীভাবে মগ্নচরে তাপনতিস্তরবিশিষ্ট হয়ে থাকে। অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ‘ঘ’ অঞ্চলের আয়তন ছোট। বঙ্গোপসাগরের উত্তর পূর্ব কোণে, মোট মহীসোপান (ঢাল বা তাক) এর ৫০ শতাংশ জায়গার উপর ২০০ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট এই ‘ঘ’ অঞ্চলটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এশীয় ভূখন্ডের গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র নদী বাহিত পলি ও পানি সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রার উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে।

এ অঞ্চলে শুধু গ্রীষ্মকালের জন্য স্থায়ী তাপনতি স্তরকে বিবর্ণ (Shallow) শ্রেণীতে ফেলা যায়। নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে এটি গভীরতর হয় যখন মিশ্র-স্তরের গভীরতা ১০০ মিটার পর্যন্ত পৌঁছে। নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে এই প্রপঞ্চ লক্ষ্য করা গেছে শুধু “অতলস্পর্শী মহীখাদ” (swatch of no ground) এলাকায় যেখানে তাপনতি স্তর খুবই গভীর (Rama Sastry and Murthy, 1957)। বক্ষ্যমান তাপনতি স্তরটি কেন্দ্রীয় বঙ্গোপসাগরের তুলনায় কিছুটা সূক্ষ্ম হয়। যাইহোক এই স্তরের ঋতুভেদে উল্লম্ব গতি এবং অনন্যতাই এ এলাকাকে বৈশিষ্ট্যময় করেছে। মার্চ-এপ্রিল মাসের উষ্ণ পৃষ্ঠস্তর পানির উর্ধ্বগতির সঙ্গে মিলিত হয়ে ২৫ মিটার গভীর পর্যন্ত একটি অতি বিবর্ণ মিশ্র স্তর সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে পৃষ্ঠদেশের (স্তরের) তাপমাত্রা জানুয়ারি মাসে হয় ২৪° সেঃ আর মে মাসে হয় ২৯° সেঃ যা ৪° সেন্টিগ্রেডের এক বিশাল তারতম্য দেখায় (U.S. Naval Oceanographic office 1967)।

‘গ’ অঞ্চলের আলোচনার বেলায় উত্তর বঙ্গোপসাগরের মোট পৃষ্ঠদেশের তাপ বিনিময়ের বার্ষিক উঠানামা দেখানো হয়েছে। ‘ঘ’ অঞ্চলের জন্যও একই পরিস্থিতি বিরাজ করে অর্থাৎ উপরের স্তরের ঠান্ডা হওয়া পরিলক্ষিত হয় শুধু ধনাঙ্ক পৃষ্ঠদেশীয় তাপমাত্রা মাপার ক্ষেত্রে হেরফের (হ্রাস) ঘটলে। শীতকালীন তাপমাত্রা লিপিবদ্ধ করেছেন U.S. Naval Oceanographic office, 1967; Laviolette, 1967; LaFond and Borreswara Rao, 1954)। যেহেতু আবহাওয়া মন্ডলে তাপমাত্রার

স্থানান্তর কোনো মেকানিজমেই ব্যাখ্যা করা যায় না সেহেতু স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুধু জলরাশিতেই হতে হয়। উল্লম্ব তাপ স্থানান্তর এবং আনুভূমিকতা (advection) উভয়েই পৃষ্ঠদেশের স্তরের শীতকালীন ঠান্ডা আনয়নের জন্য কারণ।



চিত্র ২.৯ : উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগরের ঋতুভিত্তিক তাপমাত্রার বিন্যাসের তারতম্য।

মনে করা হয় যে উত্তর বঙ্গোপসাগরে বার্মা উপকূলে উত্তরপূর্ব মৌসুমী বায়ুর জনালগ্নে বায়ু তাড়িত উপকূলীয় স্রোতেই পানির উর্ধ্ব গমনের কারণ (LaFond and LaFond, 1968)। এই অঞ্চলের প্রাপ্ত একমাত্র উপাত্ত হচ্ছে মার্চ এপ্রিলের জন্য তাই বৎসরের অন্যান্য সময়ে উপকূলীয় অংশে ঋতুভিত্তিক পানির উর্ধ্বগমন প্রত্যায়ন করা

যায়নি। আর, ভি, এন্টন ব্রান (R/V Anton Brun) জাহাজ কর্তৃক ১৯৬৩ সনের মার্চ থেকে মে পর্যন্ত গবেষণায় দেখা গেছে যে, বার্মা উপকূলের 11° উত্তর এলাকায় একটি সাধারণ বিবর্ণ তাপনতিস্তর বিরাজ করে। লা-ফন্ডের ব্যাখ্যায় বলা হয় যে উপকূল ধরে দক্ষিণ দিকে যাওয়া স্রোত প্রবাহই পানির উর্ধ্বগমনের কারণ যা পানির উপরের স্তরে উর্ধ্বগতির সঞ্চর করে থাকে।

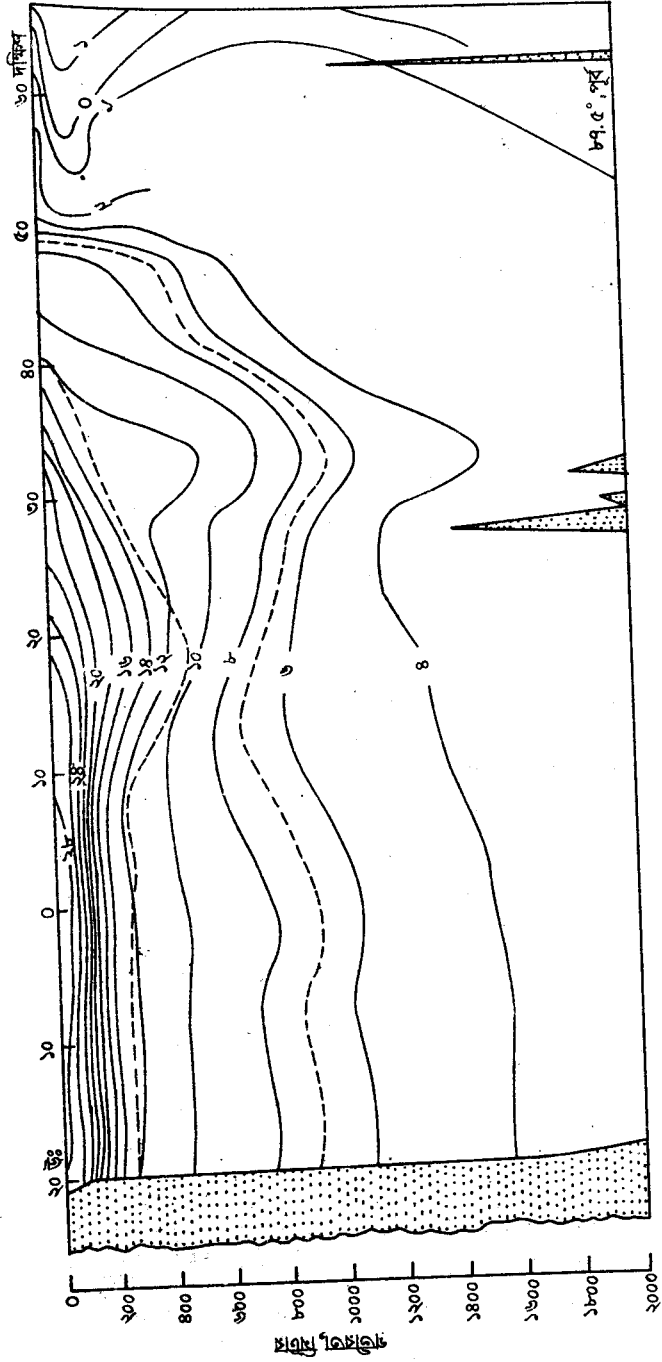
সাধারণভাবে উপাত্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রাথমিক স্তরেই কেবল স্থায়ী তাপনতি স্তরের উর্ধ্বগতি শুরু হয়। আর এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে কেননা উত্তর পশ্চিম দিকের প্রবাহের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বহমান আরেকটি স্রোত তীরের কাছ ঘেষে যা প্রবাহিত হত তার পৃষ্ঠদেশীয় স্রোত দিক বদলে ফেলে প্রতি ঘূর্ণি স্রোতের আদলে। মে-জুন মাসে যখন দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু জলরাশিকে তীরের দিকে ঠেলে দেয় তখন উপরের দিকের তাপনতি স্তরের গতি বন্ধ হয়ে যায়।

তাপমাত্রার কোনো উপাত্ত পাওয়া যায়নি বলে 'ঘ' অঞ্চলে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নয়। এই সময়ে বিশাল এলাকাব্যাপী ভারী বৃষ্টি পাতের দরুন নদীগুলি থেকে বিপুল পরিমাণের পানি সমুদ্রে প্রবেশ করে। সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে যখন সবচেয়ে বেশি পানি বঙ্গোপসাগরে পড়ে তখনই কেবল তাপনতি বিন্যাসের উপর নদীর পানির প্রভাব বুঝা যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় 11° উত্তরে আর এ সমস্যার উপর কোনো তাপমাত্রার উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়নি ফলে নদীবাহিত পানির স্বভাবের পুরো চিত্র মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। ডিসেম্বর মাসে নদীবাহিত পলিমিশ্রিত পানির প্রভাবে উপকূলের মগ্নচূড়া জলে (Laviolette, 1967) সাগরপৃষ্ঠের লবণাক্ততা ২৬% কমে যায় উত্তরের লবণাক্ত তরল পানির অনেকটাই সন্ধীর্ণ স্তরের আকারে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহের বেলায় (লা ফন্ড, ১৯৫৭)। পূর্ব ভারতীয় উপকূল ধরে দক্ষিণ দিকে চলে আসা সাগর পৃষ্ঠের মোট আলোক প্রাপ্তি হাসের জন্যেই বাংলাদেশের উপকূলের সন্নিহিতে বঙ্গোপসাগরের জলে নভেম্বর ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি—ফেব্রুয়ারি মাসে (লাভায়োলেটে, ১৯৬৭) সাগর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা হঠাৎ হ্রাস পায়। উত্তর পূর্ব শুষ্ক মৌসুমী বায়ু কর্তৃক বাষ্পীভবন ও সমুদ্রের পানি শীতলকরণও অন্যতম কারণ বটে।

পুরো বঙ্গোপসাগরের তাপনতি স্তরের উল্লম্ব গতির দিকে লক্ষ্য করলে যে একটি বিশেষ ধরন (প্যাটার্ন) দেখা যায় তা মৌসুমী ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'ঘ' অঞ্চল থেকে ক্রমান্বয়ে উত্তর দিকে গেলে দেখা যাবে যে, মে-জুন মাসে তাপনতিস্তর সর্বনিম্ন গভীরতায় পৌঁছে যায়, অন্যদিকে দক্ষিণ অংশে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্যন্ত এমনটি হতে দেবী হয়। পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত নিম্ন তাপনতি স্তর শুরু হয়না। এর ফলে উত্তর অঞ্চলে পুনরায় উর্ধ্বগতি হতে থাকে। স্থানীয় বায়ুর সঙ্গে সমুদ্র পৃষ্ঠে পানির স্থানান্তরণ প্রক্রিয়ায় কোনো সরল, সর্বাঙ্গীন সম্পর্ক এখনও সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই জন্য আরো অতিরিক্ত উপাত্ত সংগ্রহ করা এবং গবেষণা করা আবশ্যিক। তাহলেই কেবল একটি উপপ্রমেয় (hypothesis) সমর্থন করা সম্ভবপর হবে।

বঙ্গোপসাগরসহ উত্তর ভারত মহাসাগরের জলভাগ প্রক্রিয়া : ১০০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত সোমালী বেসিনের লবণাক্ত পানিরাশি যা মাধ্যমিক স্তর বলে পরিগণিত তা এডেন উগসাগর, পারস্য উপসাগর, আরব সাগর, উত্তর ভারত মহাসাগর এবং সেই সাথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে। এ ক্ষেত্রে আনুভূমিক ও মিশ্রণ প্রক্রিয়াগুলি সহায়তা করে থাকে। সোমালী বেসিনের জলরাশির প্রক্রিয়া যতটা জানা যায়, অন্যগুলি ততটা নয়। পূর্ব ভারত মহাসাগরের পর্যবেক্ষণে দেখা যায় (wyrski, 1967) যে, নিরক্ষীয় রেখার কয়েক ডিগ্রী উত্তরে উক্ত মাধ্যমিক স্তরের জলরাশির প্রভাবে বঙ্গোপসাগরে অস্ত্রিজেনের পরিমাণ ১ মিলি লিটার কমে যায়। এ স্তরে ৬৯ মিটার গভীরতায় দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে বিবর্ণতা দেখা যায়। এখানে উল্লম্ব ঘনত্ব বিন্যাস মাধ্যমিক স্তরের উচ্চমাত্রার লবণ স্তরের ধীরভাবে নবায়নের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে পানির ধীর আনুভূমিক এবং পাশ থেকে বিক্ষেপণ (diffusion) ঘটে। এই অতিথি পানিরাশি দূরত্বের আধিক্যের দরুন বঙ্গোপসাগরের তাপ বিন্যাসে খুব একটা বেশি প্রভাব ফেলতে পারে না। উল্লম্ব তাপ স্থানান্তর প্রক্রিয়া দ্বারা উল্লম্ব তাপ বিন্যাসে প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। বঙ্গোপসাগরের পৃষ্ঠদেশের তাপের পরিমাণ সংরক্ষিত থাকে। ধনাঙ্ক দিগন্তরাল আনুভূমিক তাপ স্থানান্তরের সাহায্যে (Ramanadham et. al. 1969) পৃষ্ঠ দেশ থেকে উল্লম্ব তাপপ্রবাহ সাগরের নিচু স্তরের দুর্বল উল্লম্ব ঠাণ্ডা পানির স্থানান্তরণের সঙ্গে একত্রে মিলে বঙ্গোপসাগরের মাধ্যমিক গভীরতার তাপমাত্রার ক্রমনতিস্তর বজায় রাখে। বঙ্গোপসাগরে ৭° সেন্টিগ্রেড সমোষ্ণ তাপমাত্রা দেখা যায় ২৭.২ সিগমা টি (ঘনত্ব) পৃষ্ঠদেশের একটু নিচে। অন্যদিকে আরব সাগরে এর উল্টোটিই দেখা যায়। তাপ স্থানান্তরণ প্রক্রিয়া যা ঘনত্ব পৃষ্ঠদেশে ঘটে, এর জন্যই তাপনতিস্তরের সর্বনিম্ন সীমার চিত্র রেখার বিভিন্নতা দেখায়। বিক্ষেপণ প্রক্রিয়া আস্তে আস্তে গভীর উষ্ণ পানির স্তরের প্রভাবকে পূর্ব দিকে দূর করে দেয়। ফলে ৯০০ মিটার গভীরতায় নিরক্ষীয় ভারত মহাসাগরে ও বঙ্গোপসাগরের মাঝামাঝি ধরে দক্ষিণ পূর্ব দিকে এই ৭° সেন্টিগ্রেডের সমোষ্ণ রেখা পরিলক্ষিত হয়। সোজা কথায় বঙ্গোপসাগরের উড়িয়া উপকূল থেকে মধ্য অংশ হয়ে আন্দামানের পাশ দিয়ে সুমাত্রার উত্তর পর্যন্ত ৯০০ মিটার গভীরতায় পানির তাপমাত্রা ৭° সেন্টিগ্রেড।

মহাসাগরীয় প্রধান তাপনতিস্তর : ভারত মহাসাগরের উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে গেলে মধ্য বা দ্রাঘিমা রেখার অংশে নদীর স্তরের বিভিন্নতা (একই গভীরতায়) চোখে পড়বে অর্থাৎ ১০° দক্ষিণ থেকে ২০° দক্ষিণের সকল অংশে পুরুত্ব হ্রাস পায়। এই অংশের উত্তরে বিশেষ করে আবর সাগরে তাপনতিস্তর ঘন হয়। ২.১০ চিত্রে বঙ্গোপসাগরের কেন্দ্রস্থল থেকে তাপমাত্রা বিভবের দ্রাঘিমা প্রস্থচ্ছেদ ৮৭.৫° পূর্ব এন্টার্কটিকা পর্যন্ত প্রসারিত। এতে দেখা যায় অক্ষাংশের সঙ্গে সঙ্গে তাপনতিস্তর পুরুত্ব বাড়ায় না, আপেক্ষিকভাবে একই রকম থাকে এবং আরব সাগরের তুলনায় পুরুত্ব বেশ কমই দেখায়। চিত্রে প্রতি ৫ ডিগ্রি বর্গক্ষেত্রের বেলায় গড় বার্ষিক হিসাবে



চিত্র ২.১০ : তাপমাত্রা বিভবের দ্রাঘিমা প্রস্থচ্ছেদ

সমোষ্ণ রেখার অবস্থান দেখানো হয়েছে। মহাসাগরীয় প্রধান তাপনতিস্তরের উপরের ও নিচের সীমানা বুঝাতে ভাঙ্গা লাইন ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ :

১। আরব সাগরের তুলনায় বঙ্গোপসাগরের পৃষ্ঠদেশের তাপ বিনিময় প্রক্রিয়া কম উঠানামা করে। এর কারণ, বসন্তকালে সূর্যরশ্মির বিকিরণ কম থাকে এবং মধ্য গ্রীষ্মে বাষ্পীভবন দ্বারা ঠান্ডার মাত্রাও হ্রাস পায়। এর ফলে স্বাভাবিক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মৃদু গ্রীষ্মের উষ্ণতা এবং শীতকালীন ঠান্ডা বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া গ্রীষ্মে তাপনতিস্তরের সৃষ্টি হয় না, শীতকালে বড় আকারে মিশ্র স্তরও গভীর হয় না।

২। ভারত ও বার্মা উপকূলে পানির উর্ধ্বগতি দেখা যায়।

৩। ব্যাপক হারে স্রোতের ধরনের পরিবর্তনের উপর প্রভাবকারী বিষয় যেমন, ঋতুভিত্তিক উপান্তের অভাবে বঙ্গোপসাগরে তাপনতিস্তরের ঋতুভিত্তিক উল্লম্ব উঠানামা পুরোপুরি নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

৪। আন্দামান সাগরে মৌসুমী বায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্রোত প্রবাহেরও পুরোপুরি ভাবে পরিবর্তন হয়।

৫। বঙ্গোপসাগরের ৫° উত্তর এলাকায় (শ্রীলংকার কাছে) সমুদ্রপৃষ্ঠের পানিতে সবচেয়ে বেশি অক্সিজেন থাকে।

৬। ৫০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের পানিতে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে তাপমাত্রার উঠা নামা বেশি হয়। এশীয় ভূখন্ডের নদীবাহিত পানি, বৃষ্টির পানি, পানির উর্ধ্বগতি এসব তাপমাত্রার বিন্যাসে প্রভাব ফেলে। পৃষ্ঠ উল্লম্ব তাপ প্রবাহ সাগরের নিম্ন স্তরের দুর্বল উল্লম্ব ঠান্ডা পানির পরিবর্তনের সঙ্গে মিলে বঙ্গোপসাগরে মাধ্যমিক গভীরতায় তাপমাত্রার ক্রমনতিস্তরকে রক্ষা করে থাকে।

বঙ্গোপসাগর ও অশান্ত জলরাশি : সমুদ্রের জল সতত প্রবাহমান। ঢেউ সমুদ্রের জলকে ধীরে অথচ বিরামহীনভাবে টেনে নিয়ে যায়। সমুদ্র মাঝে মাঝে উত্তাল ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে। সমুদ্রে ভ্রমণ যেন সতত ভুকম্পনে পীড়িত পৃথিবীতে চলে বেড়ানো। সমুদ্রের জলকণা পৃথিবী জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে গত ৩/৪ শত কোটি বছর ধরে। সমুদ্রের এই চরিত্র এবং তার উৎপত্তি ও স্থায়িত্বের কারণ (ক) পৃথিবীর আবর্তনের ফলে উদ্ভূত গতি, (খ) সূর্য ও চন্দ্রের মহাকর্ষের ফলে উদ্ভূত গতি এবং (গ) সূর্যের তাপের প্রভাবে উদ্ভূত গতি ইত্যাদির মাঝে নিহিত।

(ক) পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রতি ঘন্টায় ১৫০০ কিলোমিটার গতিতে পাক খেয়ে ঘোরার সময় সমুদ্রের উপরিতলে একই দিকে এক ধরনের টান অনুভূত হয়। পৃথিবী বিষুব রেখায় ঘন্টায় ১০০০ মাইল বেগে পাক খায়। সমুদ্রের একেবারে নিচে থেকে এই পাক খাওয়া আরম্ভ হতে চায় এবং বেরিয়ে এগিয়ে যায়। পাকটি পূর্বাভিমুখি হওয়ায় সমুদ্রের পশ্চিম তীরগুলিতে জল জমতে থাকার প্রবণতা থাকে। ফলে উত্তর গোলার্ধে এগুলি সামান্য দক্ষিণে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে সামান্য বামে বেঁকে যায়। এই বিষয়টি ফ্রান্সের গণিতবিদ কারিওটিসের নামে (Coriolis effect) নামকরণ হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সমুদ্রের উপরিতলের স্রোত বিশাল ঘূর্ণিবলয় সৃষ্টি করে, উত্তর

গোলাধে এটি দক্ষিণাবর্ত এবং দক্ষিণ গোলাধে বামাবর্ত। বলয় সৃষ্টি মহাসাগরের উপরিতলের সমুদ্র স্রোতের একটি অপরিহার্য নকশা। এর কারণ পৃথিবীর আবর্তন এবং তা থেকে উদ্ভূত শক্তি।

(খ) পৃথিবীর উপর চন্দ্র ও সূর্যের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের জলন্ত উদাহরণ হচ্ছে জোয়ার ভাটা: ব্যাপারটি দিনে দুবার ঘটে। মহাকর্ষের ফলে সমুদ্রতল উঁচু হওয়ার সময় প্রতিবারই স্থলভাগের দিকে জল প্রবাহিত হয় এবং ফলে আমরা জোয়ার দেখতে পাই। কয়েকঘন্টা পরে মহাকর্ষীয় স্পন্দন চলতে থাকলে উঁচু জলের স্তর নেমে যায় এবং ভরা জোয়ারের জল সরে গিয়ে ভাটা আসে। জলের এই ওঠানামা অর্থাৎ জোয়ারভাটা পৃথিবীর সমস্ত উপকূল অঞ্চলে দিনে দুবার দেখা যায়। জোয়ার ভাটার ব্যাপক প্রভাবে সমুদ্রের জল ক্ষণকালের জন্যও স্থির থাকতে পারে না। অন্যান্য শক্তিও এদের সঙ্গে মিলে সমুদ্রকে অশান্ত করে রেখেছে।

(গ) পৃথিবী প্রদক্ষিণের সময় সূর্যের দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকে থাকার জন্য নিরক্ষীয় অঞ্চল সর্বাপেক্ষা বেশি তাপ পায়। ফলে এই অঞ্চলের জল গরম হয়ে হাল্কা হয় এবং জলের স্তর কয়েক সেন্টিমিটার উঁচু হয়ে উঠে এবং মেরু অঞ্চলের দিকে ধাপে ধাপে তা কমে যায়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের এই হাল্কা, অধিক উষ্ণ জল উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে এইসব অঞ্চলের শীতল জলকে নিচের দিকে ঠেলে দেয়। শীতল ঘন জল মৃদু নিম্ন স্রোতের রূপ নিয়ে আবার বিষুবরেখার দিকে ফিরে আসে। সমুদ্রের উপরিতলে গৃহীত তাপ সমুদ্রের জলের ভৌত রাসায়নিক ধর্মে পরিবর্তন আনে, যার ফলে আনুভূমিক ও উল্লম্ব উভয় দিকের সন্নিহিত জলরাশির মধ্যে অবতল শক্তি সমীকরণের উদ্ভব হয়। তাপে জলের লবণাক্ততা, উত্তাপ ও চাপের পরিবর্তন ঘটায় এবং পার্শ্ববর্তী জলরাশিতে এই পরিবর্তনের প্রভাব দেখা যায়। এক স্তর জলরাশির সাথে পাশের জলরাশির আকর্ষণ, বিকর্ষণ অথবা মিশ্রণ ঘটে। এইরূপ প্রক্রিয়া নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে এবং নির্দিষ্ট দিকে সংঘটিত হলে বলা হয় আবর্তন প্রক্রিয়া। আবর্তন প্রক্রিয়ায় সমুদ্রে শক্তির পরিবহণ ও পরিবর্তন ঘটে। এতে সমুদ্র স্রোত ও হাল্কা প্রবাহের সৃষ্টি হয়। চার পাশের জল থেকে সমুদ্র স্রোত ও প্রবাহকে কতকগুলি ভৌত রাসায়নিক তারতম্য দিয়ে আলাদা করা যায়। আবার ঋতুর প্রভাবে বিশেষ কোনো স্রোতের জল বেড়ে এসে পাশের সমুদ্রে বন্যার মত ধেয়ে যেতে পারে। যার ফলে জলের মিশ্রণ ঘটে প্রচুর। সূর্যের রশ্মি (শক্তি), উষ্ণতা, চাপ প্রভৃতি ভৌত রাসায়নিক ব্যাপারগুলির উপর নির্ভর করে উপর থেকে নিচের জলের স্তরকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- (১) পৃষ্ঠতল, (২) উপরিতল (৩) মধ্যতল (৪) গভীরতল (৫) তলদেশ। প্রতিটি তলের মধ্যে এবং বিভিন্ন তলের মধ্যে জলের আবর্তন ঘটে। সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চলে জলের মিশ্রণ এবং শক্তির পারস্পরিক লেনদেনে এই ব্যাপারগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রের তাপ সংরক্ষণ ও তাপের ক্রমান্বয় ব্যবহারে জল সঞ্চালনের ভূমিকাই প্রধান। পৃথিবীর জলবায়ুর উপর এর বিশেষ প্রভাব রয়েছে। অনেক সময় সমুদ্রের উপরিতলের ঘন জল সমুদ্রের তলাস্তরে চলে যায় এবং সমুদ্রের নিচের স্তরের জল উপরিতলে উঠে আসে। এ বিষয়টিকে পরিচালন স্রোত বলে। এর ফলে সমুদ্রের

উপরে নিচে সরাসরি শক্তি বিনিময় হয়ে থাকে। সমুদ্রের পানির উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধির কারণ হচ্ছে অক্ষাংশের প্রভেদ, পানি রাশির অবস্থান, দিন-রাত্রির প্রভেদ, ঋতুর পরিবর্তন, অন্তর সাগরীয় শৈলশিরা, সমুদ্র স্রোত, বায়ু প্রবাহ, সমুদ্রের গভীরতা, লবণাক্ততা, গতির পরিবর্তন ইত্যাদি।

সূর্য পৃথিবীর পরিবেশে বাতাসকে নিরক্ষীয় অঞ্চলে বেশি করে উত্তপ্ত করে। উষ্ণতার এই ক্রমহ্রাস বাতাসে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাতাসের এই আলোড়ন স্থলভাগ অপেক্ষা সমুদ্রের উপরিতলকে বেশি প্রভাবিত করে। পানির উপরে বাতাস প্রবাহিত হয়ে চাপের সৃষ্টি করে। এই চাপের ফলে সমুদ্রের উপরিতলের পানিতে প্রভাব সৃষ্টি হয়। উপরিতলের পানি নিচের গভীর স্তরের পানিতে চাপ দিলেই সেখানকার পানিতে গতি সৃষ্টি হয়। স্থায়ীভাবে প্রসারিত বাতাস তলদেশ থেকে উপর পর্যন্ত পানিরাশিকে নাড়া দিতে পারে।

পানির উর্ধ্বগতি : সমুদ্রের পানির তলদেশের স্তর থেকে উপরিতলে পানির লম্বালম্বি গতিকে বলা হয় উর্ধ্বগতি। উর্ধ্বগতির সঙ্গে পানির তলে জমা বস্তুর একটা বড় অংশ উপরে উঠে আসে। উর্ধ্বগতি সমুদ্রের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আলোড়নকারী গতি। সামুদ্রিক পরিবেশে জৈব উৎপাদনের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টিকর খাদ্য বস্তু সমুদ্রের তলায় অধঃক্ষিপ্ত হয়। জলের প্রচণ্ড উর্ধ্বগতির ফলে এরা আবার জল থেকে সমুদ্রের উপরিতলে উঠে আসে। যেখানে জলের উর্ধ্বগতি নিয়মিত হয় সেখানে উদ্ভিদ ও প্রাণির উৎপাদন খুবই বৃদ্ধি পায়। তীরভূমির কাছে সাধারণত উর্ধ্বগতি হয়। তীরভূমির দিকে অথবা তীরভূমি থেকে ক্রমাগত জল যখন আসা যাওয়া করে, সেই সময় শুনা স্থান পূর্ণ করার জন্য অনুরূপ সমস্তরাল স্রোতের সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের পানির উর্ধ্বগতি যখন প্রবাহিত হয়ে তার উৎস কেন্দ্র থেকে দূরে চলে যায়, তখন জলের বিকিরণ পাওয়া যায়। আর সমুদ্র পৃষ্ঠের পানি থিতিয়ে তলিয়ে গিয়ে সরাসরি নিচের স্তরে যখন জমতে থাকে, তখন পাওয়া যায় কেন্দ্রীভবন।

সমুদ্রের ঢেউ : ঢেউ এর উৎপত্তি বাতাসের সঞ্চালনে। পানির দোদুল্যমান গতিই ঢেউ। পানি উচু হয়ে ওঠে, সামনের দিকে এগোয় এবং পিছনে সরে যায়। পানির অণুগুলি মুক্ত থাকে বলে ঢেউ এর গতিতে পানি হতাশায় পথ নেয়। তীরভূমি দ্বীপ বা জাহাজের গায়ে জলকণা আবর্তিত পথে বাধা পড়ে, ঢেউ সাদা টুপিতে মোড়া ফেনা হয়ে ভেসে ওঠে। সাধারণ বাতাসে ২-৫ মিটার উচু ঢেউ দেখা যায়। উত্তাল সমুদ্রে ১০-১২ মিটার উচু ঢেউ দেখা যায়। বঙ্গোপসাগরে ১৯৭০, ১৯৯১ সনে ২০-৩০ মিটার ঢেউ তীর ভূমিতে আঘাত হেনেছিল। সমুদ্রতলের আগ্নেয়গিরির ক্রিয়াকলাপ, ভূকম্পন বা ধস নামার দরুনই আকস্মিকভাবে ঢেউ তৈরি হয় এবং এই ঢেউগুলি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভূকম্পনে আলোড়ন খুব শক্তিশালী বলে সৃষ্ট ঢেউ সমুদ্রের কূল ভাসিয়ে ধ্বংস বয়ে আনে।

সমুদ্রের আবর্তন : অতি জটিল একটি ক্রিয়া যা এখনও ভালভাবে বুঝা যায়নি। সমুদ্রের অভ্যন্তরীণ ঘূর্ণির ফলে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এতে এই অভ্যন্তরীণ ঘূর্ণি সমুদ্রের জলের আবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বঙ্গোপসাগরের ভৌত সমুদ্র বিজ্ঞানের কয়েকটি দিক : আমরা জানি যে, সমুদ্র পৃষ্ঠে বায়ু প্রবাহের গতি যদি প্রতি সেকেন্ডে ১০ মিটারের কম হয় (২০ নটস) তাহলে উপকূলীয় ভাগে এর প্রভাব কম হয়। কিন্তু বাতাসের গতি সেকেন্ডে ২০ মিটার অতিক্রান্ত হলে তা মারাত্মক জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে। চৌধুরী এবং আলী দেখিয়েছেন যে, জোয়ার ছাড়া অন্য সময়ে বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র পৃষ্ঠ বায়ুর গতি বর্গহারে বৃদ্ধি পায়। বঙ্গোপসাগরে জোয়ারভাটার যে চার্ট তৈরি করা হয়েছে (Pugh, 1978) তাতে দেখা যায় পটুয়াখালি হতে চট্টগ্রাম তীর পর্যন্ত ১ম অঞ্চলটি অবস্থিত যেখানে জোয়ারের গতি বেশ উঁচু। দ্বিতীয় অঞ্চলটি হচ্ছে সুন্দরবন থেকে টেকনাফ পর্যন্ত। তৃতীয় অঞ্চলটি হচ্ছে ভারতের ভিবাখাপত্তম থেকে আকিয়াব উপকূল পর্যন্ত। 30° দশাকোণ এক চন্দ্র ঘন্টায় (৬২ মিনিটে) ভারত মহাসাগর থেকে জোয়ারের পানি বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের উপকূল থেকে সমুদ্রের দিকে যতই গভীরে যাওয়া যায় ততই সমুদ্র সমতলের জোয়ারের পরিবর্তন জোগানোর উপাত্তের উষ্ণতা একটি সমস্যা। Miller (1966) হিসাব করেছেন যে, বঙ্গোপসাগরের উত্তর দিকে জোয়ার শক্তির পরিমাণ হচ্ছে 6×10^{10} ওয়াট যা ক্ষয় হয় বা হারিয়ে যায় বাংলাদেশের বদ্বীপ মগুচুড়া অঞ্চলে। আর হারানো এই শক্তি হচ্ছে সারা পৃথিবীতে হারানো জোয়ারের মোট শক্তির ৩.৫ শতাংশ। সমুদ্র উপকূলের অবক্ষয়ে এই জোয়ার শক্তির অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া ও তার ভূমিকা নিয়ে গবেষণা চালানো উচিত। বঙ্গোপসাগরের ভৌত সমুদ্র বিজ্ঞানের অমীমাংসিত বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলি হচ্ছে :

১। বাংলাদেশ উপকূলে সমুদ্রের পানির উর্ধ্বগতি প্রবাহের অস্তিত্ব আছে কিনা? ভারতের পূর্ব উপকূলে ও বার্মা উপকূলে এর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে।

২। জৈব উৎপাদনে এই উর্ধ্বগতি প্রবাহের প্রভাব কতখানি? সমুদ্র খাদ্য উৎপাদনে এর ভূমিকা কতটুকু?

৩। বঙ্গোপসাগরে নতুন ভূমি বানানোর ব্যাপারে করণীয় কি? নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে ইতিমধ্যে যে অবক্ষিপ বা তলানি জমা হয়েছে এবং নদী বাহিত পলিজমা হচ্ছে তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের উপায় কি? ভবিষ্যতে ভূমিক্ষয় কেমন করে রোধ করা যায়?

৪। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের আগমন বার্তা অগ্রিম জানানোর ব্যবস্থা করা। জোয়ার এবং ঘূর্ণিবায়ুর গতিপথ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করে এটা সমাধান করা সম্ভব।

৫। বঙ্গোপসাগরে জলরাশির গতিপথ সবসময় মনিটর করার ফিজিক্যাল সিস্টেম গড়ে তোলা। স্পারশো এবং আবহাওয়া দপ্তর এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে।

মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের জললেখ বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য : IOOE প্রোগ্রামের অধীনে ১৯৬৩-৬৫ সনে ভারতীয় KISTNA জাহাজে করে L.V Gangadhara and R. Jagaraman গবেষকদ্বয় মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে Hydrographical বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে অনুসন্ধান চালান তার সারমর্ম হচ্ছে:

১। সাগর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা দক্ষিণ দিকে বাড়তে থাকে। তাপমাত্রা সাধারণত 29° থেকে 18° সেন্টিগ্রেড। তবে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে $8-9^\circ$ উত্তর অক্ষাংশে $29.5^\circ-28.5^\circ$ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা দেখা যায়।

২। মিশ্র স্তর : পশ্চিম দিকে (৯০° পশ্চিমে) ৭৫-১০০ মিটার গভীরতায় এই মিশ্র স্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগরের চাইতে বেশি উন্নত। বঙ্গোপসাগরের মধ্য ও দক্ষিণ অংশে মিশ্র স্তর ১১০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত দেখা গেছে। পূর্ব বঙ্গোপসাগরে মিশ্র স্তর ৫০-১০০ মিটার বিস্তৃত।

৩। তাপনতি স্তর : দক্ষিণ দিকে বাড়তে থাকে এবং পশ্চিম দিকে তাপনতিস্তর ৭৫-১২০ মিটার গভীরতায় অবস্থিত। পূর্ব বঙ্গোপসাগরে এটা ৫০-১০০ মিটার গভীরে। কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে তাপনতিস্তর বেশ উন্নত এবং এটার গুরুত্ব ৪০-৮০ মিটারের মধ্যে। $৮^\circ ৩০'$ উত্তর এবং ৮৭° পূর্ব ও ৯২° পূর্ব অক্ষাংশে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে একটি তীক্ষ্ণ ও পুরু তাপনতি স্তর ৮০ মিটার গভীরে দেখা গেছে, এর তাপনতি ক্রম হচ্ছে $(0.20^\circ/\text{m}-0.25^\circ\text{C}/\text{m})$

৪। ভগ্নঘনত্বস্তর (pycnocline) : পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ভগ্নঘনত্ব স্তর দেখা যায়, এটি দক্ষিণ দিকে ৭৫-১০০ মিটারের মধ্যে বাড়তে থাকে। পূর্ব বঙ্গোপসাগরে এটি আরও নিচু দিকে শুরু হয় এবং এখানেই এটি বেশি পুরু।

৫। অভ্যন্তরীণ ঢেউ : $১৩^\circ ২০'$ উত্তর এবং $৮^\circ ৩০'$ উত্তর বঙ্গোপসাগরে অভ্যন্তরীণ ঢেউ দেখা যায়। মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের তাপনতিস্তর, মিশ্রস্তর অঞ্চলে সুগঠিত স্তর বিন্যাসের চিহ্ন বহন করে। অভ্যন্তরীণ ঢেউয়ের প্রতিক্রিয়া বেশ গভীরে পৌঁছে।

৬। পৃষ্ঠদেশের লবণাক্ততা : দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। লবণাক্ততার মান হচ্ছে ৩২.০% থেকে ৩৪.৫%। তবে কেন্দ্রীয় বঙ্গোপসাগরের পূর্ব অংশে লবণের হার হচ্ছে ৩০-৩২.৫%।

৭। উপপৃষ্ঠতলের লবণাক্ততা : তাপনতিস্তরের উপরেই উপপৃষ্ঠতলের অবস্থান। এটা ভারত মহাসাগরে দেখা গেলেও বঙ্গোপসাগরে দেখা যায়নি। তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে $৮^\circ ৫২'$ উত্তর ৮৫° পূর্ব পর্যন্ত অঞ্চলে তাপনতিস্তরের উপরের অর্ধাংশে এই লবণ স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়।

৮। জলীয়রাশি : ১০০ মিটার উপর স্তরে দুটি জলরাশির ধারা প্রত্যক্ষ করা যায়। যেহেতু পৃষ্ঠদেশের স্তরে ঋতুভিত্তিক এবং পরিবাহিত পানির প্রভাব থাকে ফলে তাপমাত্রার বিরাট পার্থক্যও দেখা যায়। পূর্ব বঙ্গোপসাগরের ৫০ মিটার গভীর পর্যন্ত প্রথম জলরাশি দেখা যায়। এখানে লবণাক্ততা ৩৩% এবং ঘনত্ব ২১.০ এর কম। বার্মার নদী ও প্রশান্ত মহাসাগরের জলধারায় এই জলরাশির মিশ্রণ তৈরি হয়। দ্বিতীয় জলরাশির ধারাটি দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ১০০ মিটার গভীরে দেখা যায়। পশ্চিম দিকে এবং কেন্দ্রীয় বঙ্গোপসাগরের মধ্য অংশেও দ্বিতীয় জলরাশি প্রত্যক্ষ করা যায় যেখানে ৩৩-৩৪% লবণাক্ততা রয়েছে এবং সিগমা টাও বা ঘনত্ব হচ্ছে ২১-২২। লাফও (১৯৫৮) এই জলরাশিকে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরীয় বলে অভিহিত করেছেন।

উপসাগরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের ৩০০ মিটারে আরেকটি জলরাশি দেখা যায়। এটি, সম্ভবত পারস্য উপসাগর বা লোহিত সাগর থেকে উদ্ভূত। এ অঞ্চলে উপপৃষ্ঠতলের জলরাশির তাপমাত্রা হচ্ছে $১৬-৪^\circ$ সেন্টিগ্রেড, লবণাক্ততা ৩৪.৮-৩৫.২% এবং ঘনত্ব হয় ২৪.০ এর বেশি, উপপৃষ্ঠস্তর ১০০-১৫০ মিটার গভীরে অবস্থিত।

৯। অপসৃতি অঞ্চল : দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম অঞ্চলে ১৫০ মিটার গভীরতায় এই অঞ্চল বিস্তৃত। প্রতি ঘূর্ণিবায়ু এবং উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের মাঝেকার জলরাশি এখানে অপসারিত হয়। $৯^{\circ}৩০'$ উত্তর, ৯৩° পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ৭৫ মিটার গভীরে তাপনতি স্তর, ১৫০ মিটার গভীরে ভগ্নঘনত্ব স্তরে অপসৃতি অঞ্চল অবস্থিত। এই বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে যে, এ এলাকার ভগ্নঘনত্ব স্তরে উপপৃষ্ঠ স্রোত প্রবাহ রয়েছে— যা গভীর স্তরে প্রবাহিত স্রোতের চাইতে অন্য রকম।

১০। কেন্দ্রাভিগ অঞ্চল : বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ সীমান্তের মধ্য অংশে ১০০ মিটার পর্যন্ত গভীরতায় একটি কেন্দ্রাভিগ অঞ্চল অবস্থিত রয়েছে। ঘড়ির কাটানুযায়ী বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ সীমার স্রোত প্রবাহ এবং উত্তর দিকে নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে যুক্ত এই কেন্দ্রাভিগ অঞ্চল। দ্বিতীয় অঞ্চলটি রয়েছে কেন্দ্রীয় বঙ্গোপসাগরে ৮৬° পূর্ব এবং ৯০° পূর্ব এবং ১৪° উত্তর- ১৭° উত্তর অক্ষাংশে ১০০ মিটার গভীরে। এটি মধ্য বঙ্গোপসাগরে মার্চ মাসে ঘড়ির কাটানুযায়ী স্রোতের সঙ্গে জড়িত। এই অভিসরণ বা কেন্দ্রভিমুখীতা পানির নিম্নগতির সঙ্গে সম্পর্কিত, ফলে বেশ গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত।

১১। পানি সঞ্চলন : উপরের ৭৫ মিটারে দুটি সমুদ্র পৃষ্ঠ স্রোত প্রধান। প্রথমটি হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখী কম লবণাক্ততা বিশিষ্ট হালকা পৃষ্ঠদেশের পানি যা কেন্দ্রীয় বঙ্গোপসাগরে পূর্ব পাশে ১৫° উত্তর ৯০° পূর্ব ও ৯৪° পূর্ব হতে প্রবাহিত হয়। এই স্রোতটি ইরাবতী নদী বাহিত পানির ধাক্কায় উপরের ৩০ মিটারের মধ্যই সীমাবদ্ধ। এটি দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় স্রোতধারাটি উষ্ণ, লবণাক্ত এবং ঘন পানি বিশিষ্ট পশ্চিম দিকে ১৩° $২০'$ উত্তর এবং ৮৩° পূর্ব ৮৬° পূর্ব পর্যন্ত বহমান। এটি ৭৫ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এবং সম্ভবত মধ্যরেখা প্রবাহের সাথে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর থেকে উচ্চ মাত্রার লবণ বয়ে আনে।

মাদ্রাজ উপকূলে ৩০ মিটার গভীরে মহাদেশীয় ঢালের বাইরে একটি উপপৃষ্ঠ প্রবাহ উত্তর দিকে প্রবাহিত। এই প্রবাহ ৫০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত চলে যায়। $৮^{\circ}৩০'$ উত্তর, ৮৯° পূর্ব এবং ৯২° পূর্ব অক্ষাংশে তাপনতিস্তরের নিচে উপপৃষ্ঠ স্তরের একটি শক্তিশালী উল্লম্ব সঞ্চলন; (বেশি লবণাক্ত) দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে মধ্যমাংশে লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য অঞ্চলের গভীরতার অংশে উত্তম লবণ মিশ্রণ এবং ঘনত্ব সমসত্ত্ব বিদ্যমান।

১২। নদীবাহিত পানির প্রভাব : কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীবাহিত পানির প্রভাবে তাপনতিস্তর খুবই গভীর করে ফেলে। সমুদ্র পৃষ্ঠ কম লবণাক্ত নদীর পানি সমসত্ত্ব মিশ্রণ হ্যালোক্লাইন (Halocline) ও ভগ্নঘনত্বস্তর, তাপনতিস্তরকে গভীর বা নিম্নগ করে।

বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র স্রোত

সমুদ্রের স্রোতগুলিকে সমুদ্রের নদী বলা হয়। সমুদ্রের সর্বত্র স্রোত নেই। জনৈক বিজ্ঞানীর ভাষায় কেউ তাদের তীরে দাড়িয়ে সৌন্দর্য উপভোগ করে না, ওদের নিয়ে গান আর কবিতা লেখে না। তবু ওরাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদী, অন্ধকার নিঃশব্দ

রহস্য স্রোতের ধারা সমুদ্রের ভিতর বইছে। এ স্রোত সমুদ্রের উন্মত্ত তলে, সমুদ্রের গভীর স্তরে, এমনকি তলায়ও থাকতে পারে। নদীর মতো এদেরও সুনির্দিষ্ট প্রবাহ পথ থাকে। ১৫১৩ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের পনস্কে দে লেওন (Ponce di leon) গালফ গ্রীষ্ম উপসাগরীয় স্রোতের ব্যাপারে অনুমান করেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী গালফ স্ট্রীম এর ব্যাখ্যা দেন।

এই স্রোতগুলির কোনোটা সেকেন্ডে পাঁচ কোটি টন পানিও বহন করে থাকে। এগুলো মূলত চালিত হয় সাগর সংলগ্ন বাতাসের স্রোতের অভিমুখে। সমুদ্র স্রোতের কারণগুলির মধ্যে রয়েছে (১) বায়ুপ্রবাহ (২) পৃথিবীর আবর্তন, (৩) উষ্ণতার তারতম্য, (৪) লবণাক্ততার তারতম্য (৫) বাষ্পীভবনের তারতম্য, (৬) ভূভাগের তারতম্য (৭) শৈলশিয়ার অবস্থান, (৮) সমুদ্রের গভীরতা।

বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্যানুযায়ী মহাসাগরগুলির স্রোতগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) উষ্ণ স্রোত, (২) শীতল স্রোত, (৩) পৃষ্ঠস্রোত, (৪) অন্তঃস্রোত (৫) পরিচলন স্রোত।

নিরক্ষীয় উষ্ণ অঞ্চল থেকে প্রবাহিত স্রোতগুলিকে উষ্ণস্রোত বলে। উষ্ণস্রোত মেরু অঞ্চল হতে প্রবাহিত হওয়ার সময় ধীরে ধীরে শীতল পানির সাথে মিশ্রিত হয়ে শীতলতাপ্রাপ্ত হয়। মেরু অঞ্চল হতে প্রবাহিত স্রোতগুলিকে শীতল স্রোত বলে। সমুদ্রের কয়েকটি স্থানে উল্টোদিক হতে উষ্ণ ও শীতল স্রোতের সংমিশ্রণ ঘটে। সমুদ্রের উত্তম পানি হালকা। এইরূপ হালকা পানি সমুদ্রের উপর দিয়ে উষ্ণ অঞ্চল হতে শীতল অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়ে পানির এইরূপ প্রবাহকে পৃষ্ঠ প্রবাহ বা পৃষ্ঠস্রোত বলে। আবার শীতল পানি ভারী বলে তা সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে পৃষ্ঠস্রোতের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। এইরূপ স্রোতকে অন্তঃপ্রবাহ বা অন্তঃস্রোত বলে। অন্তঃস্রোত শীতল অঞ্চল হতে উষ্ণ অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়। উষ্ণ স্রোত মেরু অঞ্চলে ভারী হয়ে সমুদ্রের তলদেশে নিমজ্জিত হয় এবং অন্তঃস্রোতরূপে পুনরায় উষ্ণমন্ডলে পৌঁছে হালকা হয়ে উপরে উঠে আসে। পানির এই পর্যায়ক্রমিক আবর্তনকে পরিচলন স্রোত বলে। এই স্রোতকে উষ্ণ ও শীতল অঞ্চলে যথাক্রমে উর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী এই দুইভাগে ভাগ করা হয়।

সমুদ্রস্রোতের গতি : নিরক্ষ রেখার উভয় পার্শ্বে উষ্ণমন্ডলে আয়ন বায়ুর দিক অনুসারে স্রোতসমূহ সাধারণত উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিক হতে প্রবাহিত হয়। আবার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে প্রত্যয়ন বায়ুর দিক অনুযায়ী স্রোতসমূহ দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিক হতে প্রবাহিত হয়। সমুদ্র স্রোতগুলি প্রবাহিত হওয়ার সময় পৃথিবীর আবর্তনের জন্য বায়ুমন্ডলের মত ফেলের সূত্রানুযায়ী উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়। সমুদ্র স্রোতের গতি বেশ ধীর তবে অগভীর সমুদ্রে কিছুটা দ্রুতগতি সম্পন্ন হয় (প্রতিসেকেন্ডে তিন থেকে ৮ ফুট পর্যন্ত)।

সমুদ্রস্রোতের প্রভাব : যে এলাকার উপর দিকে সমুদ্র স্রোত প্রবাহিত হয় তার উপর এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার জলবায়ু এবং বাণিজ্যের উপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাব অত্যধিক।

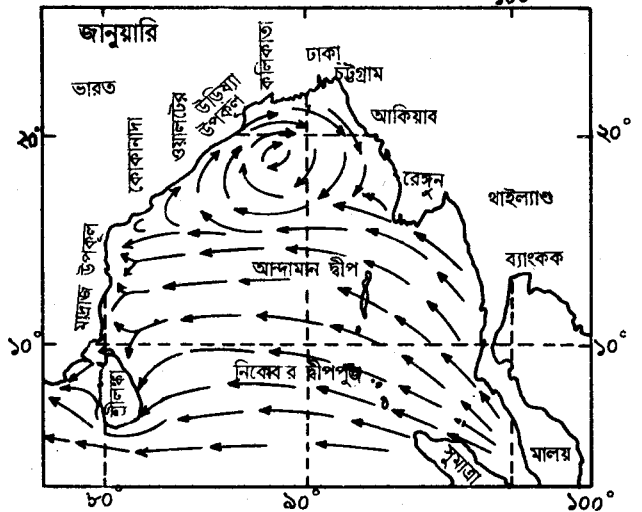
কোনো দেশের উপকূলের নিকট দিয়ে উষ্ণ সমুদ্রস্রোত প্রবাহের ফলে উক্ত দেশের জলবায়ুর উপর উষ্ণতার প্রভাব পড়ে। যেটব্রিটেন ও জাপানে উষ্ণ উপসাগরীয় ও উষ্ণ কুরোশিও স্রোত প্রবাহের দরুন সেখানকার শীত তুলনামূলকভাবে হ্রাস পায়। আবার নিউইয়র্কের নিকট দিয়ে শীতল লাব্রাডর স্রোত প্রবাহিত হয় বলে সেখানে শীতকালে লন্ডন অপেক্ষা বেশি শীত অনুভূত হয়।

কোনো স্থলভাগের নিকটবর্তী উষ্ণ সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত হলে সমুদ্র বায়ু স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে যা স্থলভাগে বৃষ্টিপাত ঘটায়। বঙ্গোপসাগরে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী উষ্ণ স্রোতের উপর দিয়ে যে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় তা প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে। ফলে এর প্রভাবে ঐ সময় বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনস্থলে অতি অল্প স্থানের মধ্যে ঝড়বৃষ্টি ও কুয়াশার সৃষ্টি হয় তবে এসব মিলনস্থলে বিদ্যুৎ মৎস্যচারণ ক্ষেত্র গড়ে উঠে।

সমুদ্র স্রোতের গতি ও দিক সামুদ্রিক জাহাজ চলাচলের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্রোতের অনুকূলে জাহাজ চালালে গতি বাড়ে, সময় কম লাগে। শক্তি খরচও কম হয়। হিমশৈল্যের প্রবাহ পথে জাহাজ চালানো বিপদজনক। ভাসমান হিমশৈল্যের আঘাতে টাইটানিক ডুবে গিয়েছিল। উষ্ণ ও শীতল স্রোতের প্রভাবে সমুদ্রের বিভিন্ন স্থানে জাহাজ চলাচল বিভিন্ন হয়। হিমশৈল্যগুলি উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলন স্থলে গলে গেলে এর সাথে বাহিত পদার্থগুলি সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত হয় এবং আন্তঃ-মহাসাগরীয় মালভূমির সৃষ্টি করে।

বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র স্রোতের বিবরণ : ইতিপূর্বে বিভিন্ন গবেষক বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র স্রোতের যে বিবরণ প্রকাশ করেছেন, এ অধ্যায়ের মাঝামাঝি অংশে এবং 'তাপমাত্রা' অংশে তা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে শুধু মাস ওয়ারী স্রোত-গুলির কথা বলা হলো। চিত্র ২.১১ (ক) থেকে ২.১১ (ঠ) দ্রষ্টব্য।

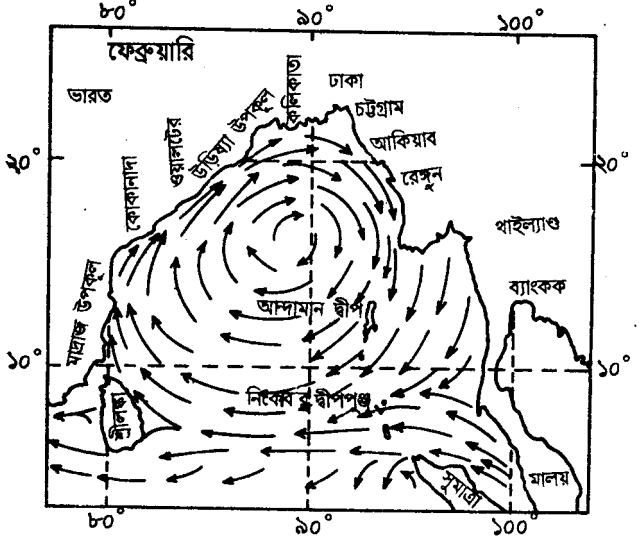
জানুয়ারি : সমুদ্র উপকূল ধরে দক্ষিণ দিকে স্রোত বহে। বঙ্গোপ-সাগরের মাথায় একটি প্রতিঘূর্ণিবায়ুর কেন্দ্রভাগে শক্তিশালী বিন্দু রয়েছে। এই প্রতিঘূর্ণি বায়ুর সৃষ্টি



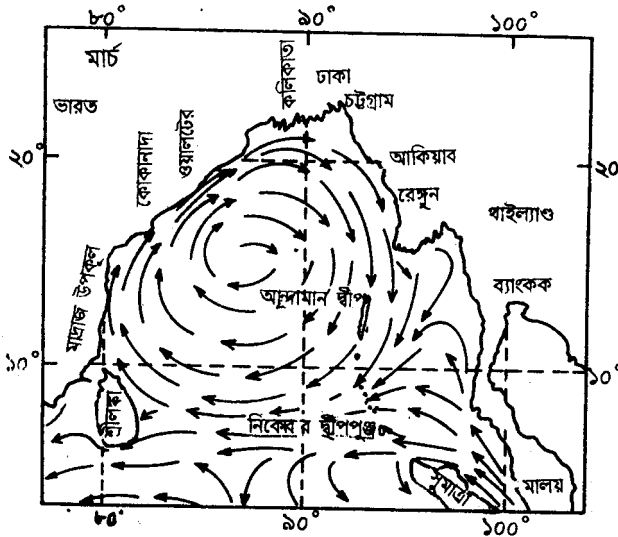
চিত্র ২.১১ : (ক) জানুয়ারি

হয় উত্তর-পূর্ব বায়ুর উত্তর বা উত্তর পশ্চিম দিকে প্রবাহের সময় (ভারত ও বাংলাদেশের উপর দিয়ে)। ফলে 16° উত্তর অক্ষাংশে উপকূলীয় স্রোত উত্তর দিকে বহে। চিত্র-২.১১ (ক)। নিরক্ষীয় একটি পশ্চিমমুখী স্রোত এখানে শুরু হয়।

ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমীয় স্রোতটি (জানুয়ারি মাসে) নিরক্ষ রেখার উত্তরে 20° চলতে থাকে। উত্তরপূর্ব বায়ু দুর্বল হওয়ার প্রেক্ষিতে বঙ্গোপসাগরের স্রোতটি ঘড়ির কাটানু-যায়ী দক্ষিণে যায় এবং এর শক্তি বৃদ্ধি পায়। চিত্র-২.১১(খ)।



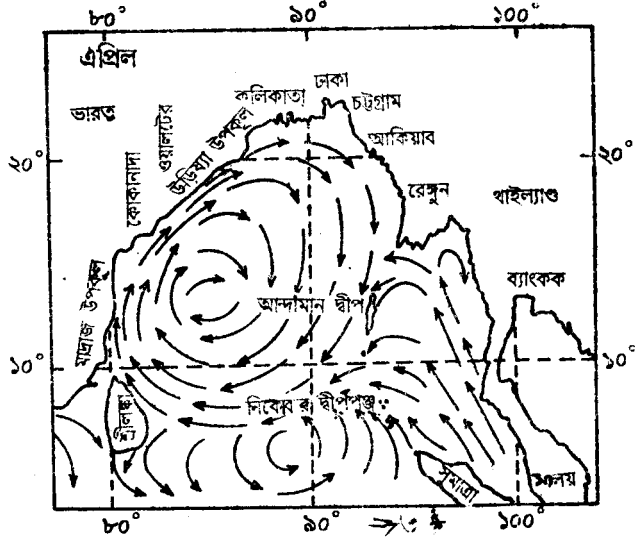
চিত্র ২.১১ : (খ) ফেব্রুয়ারি



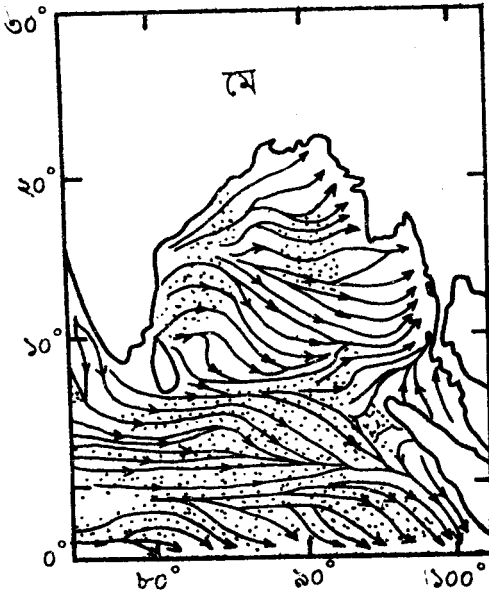
চিত্র ২.১১ : (গ) মার্চ

মার্চ : ঘড়ির কাটা অনুযায়ী বহমান বঙ্গোপসাগরের স্রোত দক্ষিণীয় অংশে যোগ হয়। পশ্চিমা স্রোতটি নিরক্ষীয় সাগরে তখনও বহমান থাকে। উপসাগরের কেন্দ্রীয় অংশে প্রতিঘূর্ণি আবর্ত-টিও থাকে। এসময় উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ু দুর্বল থাকে। চিত্র-২.১১(গ)।

এপ্রিল : উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাব শেষে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু উত্তর ভারত মহাসাগরে প্রভাব বিস্তার শুরু করে। এর প্রভাবে নিরক্ষীয় কাউন্টার স্রোত উত্তর দিকে সরে যায়। নিরক্ষীয় কাউন্টার স্রোত ও পশ্চিমে সরে আসা স্রোতের মধ্যে পশ্চিম দিকে সরে যায় উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত। এখানে ঘূর্ণি আবর্ত সৃষ্টি হয়। বঙ্গোপসাগরের প্রতি ঘূর্ণি আবর্ত দক্ষিণে 12° উত্তর 89° পূর্ব অক্ষাংশে সরে আসে। চিত্র-২.১১(ঘ)।



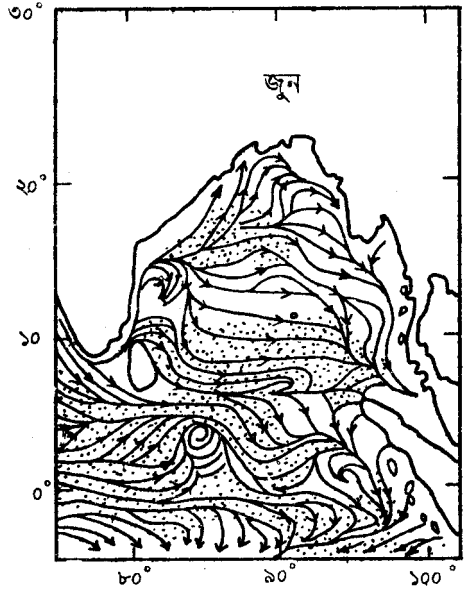
চিত্র ২.১১ : (ঘ) এপ্রিল



চিত্র ২.১১ : (ঙ) মে

মে : দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দ্বারা উত্তর ভারত মহাসাগরের স্রোতগুলি পূর্ব থেকে নিরক্ষীয় রেখার অঞ্চলে প্রবাহিত হতে থাকে। এটি দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী স্রোত; নিরক্ষীয় কাউন্টার স্রোতের সঙ্গে মিলে কেন্দ্রভাগের সৃষ্টি করে। চিত্র-২.১১(ঙ)।

জুন : মে মাসের মৌসুমী বায়ু এ মাসেও প্রবহমান থাকে। পূর্বাঞ্চলীয় স্রোতে কিছু ঘূর্ণি যোগ হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রতিঘূর্ণি পাকের সৃষ্টি হয় এ সময়ে মৌসুমী স্রোতের বেগ সবচেয়ে বেশি হয় ফলে প্রতিঘূর্ণি স্পর্শক (shear) এবং আবর্তন সৃষ্টি হয়। এ মাসে বঙ্গোপসাগরের মাথার দিকে নিমচাপ ও ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। উত্তর বঙ্গোপসাগরের এ সময়কার শক্তিশালী বায়ুর সঙ্গে মিলে মাদ্রাজ উপকূলে প্রতিঘূর্ণিচ্ছেদের জন্ম দেয়। চিত্র-২.১১(চ)।



চিত্র ২.১১ : (চ) জুন



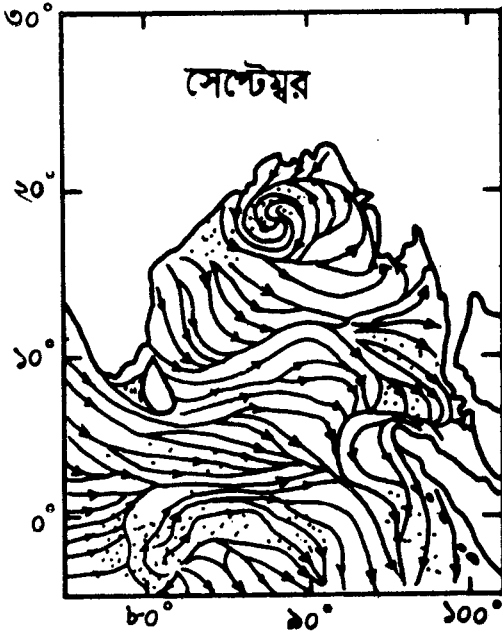
চিত্র ২.১১ : জুলাই (ছ)

জুলাই : পূর্ব দিকে বহমান স্রোত পরিবর্তনধর্মী। মাদ্রাজ উপকূলে জুন মাসের প্রতি ঘূর্ণিচ্ছেদক বায়ু দুর্বল হয়ে পড়ায় স্রোতগুলি উপকূল ধরে প্রবাহিত না হয়ে পূর্বমুখীন হয়ে পড়ে। চিত্র-২.১১(ছ)।

আগস্ট : জুলাই'র মত স্রোত ।
বঙ্গোপসাগরের মুখে একটি অপসৃতি
বিন্দু সৃষ্টি হয় এবং 18° উত্তর
অক্ষাংশে দক্ষিণমুখী স্রোত বহে ।
নিরক্ষীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিস্রোতের সৃষ্টি
হয় । চিত্র-২.১১(জ) ।

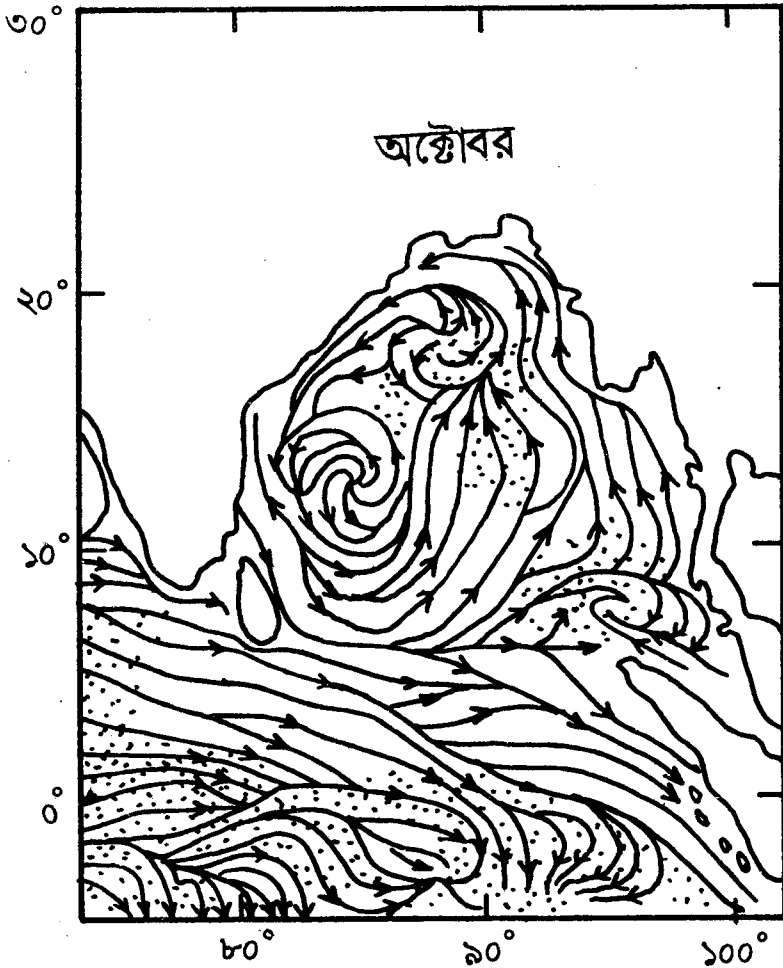


চিত্র ২.১১ : (জ) আগস্ট



সেপ্টেম্বর : উত্তর বঙ্গোপ-
সাগরের স্রোতের উল্টো ধরন শুরু
হয়ে যায় । এবং উপসাগরের
মাথায় একটি ঘূর্ণিঝড়ের শুরু
হয় । দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু
দুর্বল হয়ে পড়ায় দক্ষিণ নিরক্ষীয়
স্রোতের অনুপ্রবেশ বন্ধ হয় ।
চিত্র-২.১১(ঝ) ।

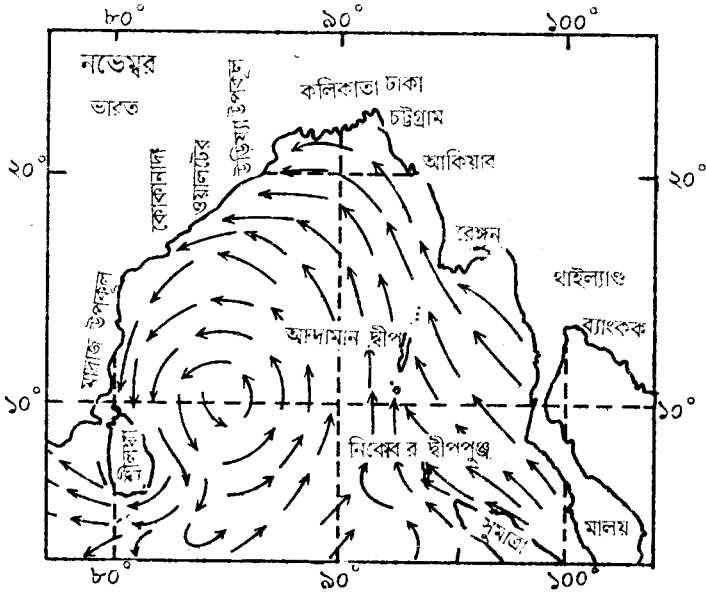
চিত্র ২.১১ : (ঝ) সেপ্টেম্বর



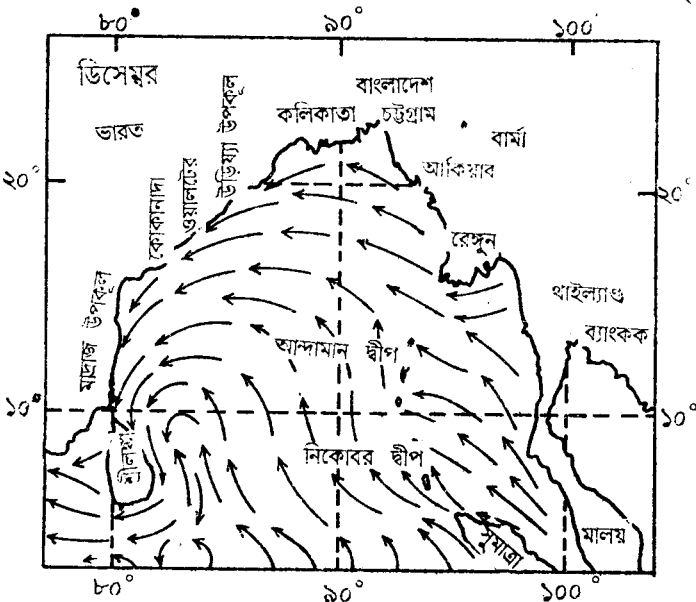
চিত্র ২.১১ : (এ) অক্টোবর

অক্টোবর : দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী এবং উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ুর পবিত্রনের সময় বঙ্গোপসাগরে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়। পশ্চিম উপকূল ধরে উত্তর পূর্ব মৌসুমী স্রোত চলা আরম্ভ করে আর পূর্ব উপকূলে উত্তরমুখী স্রোত বহে। বঙ্গোপসাগরে দু'টি ঘূর্ণিস্রোত দেখা যায়। চিত্র- ২.১১ (এ)।

নভেম্বর : স্রোতের বিপরীতকরণ বঙ্গোপসাগরে সমাপ্ত হয়ে যায়। ঘূর্ণিআবর্ত উত্তর বঙ্গোপসাগরে শেষ হয়। কেবল কেন্দ্রীয় বঙ্গোপসাগরের স্রোতটি দক্ষিণ দিকে সরে আসে। চিত্র ২.১১(ট)।



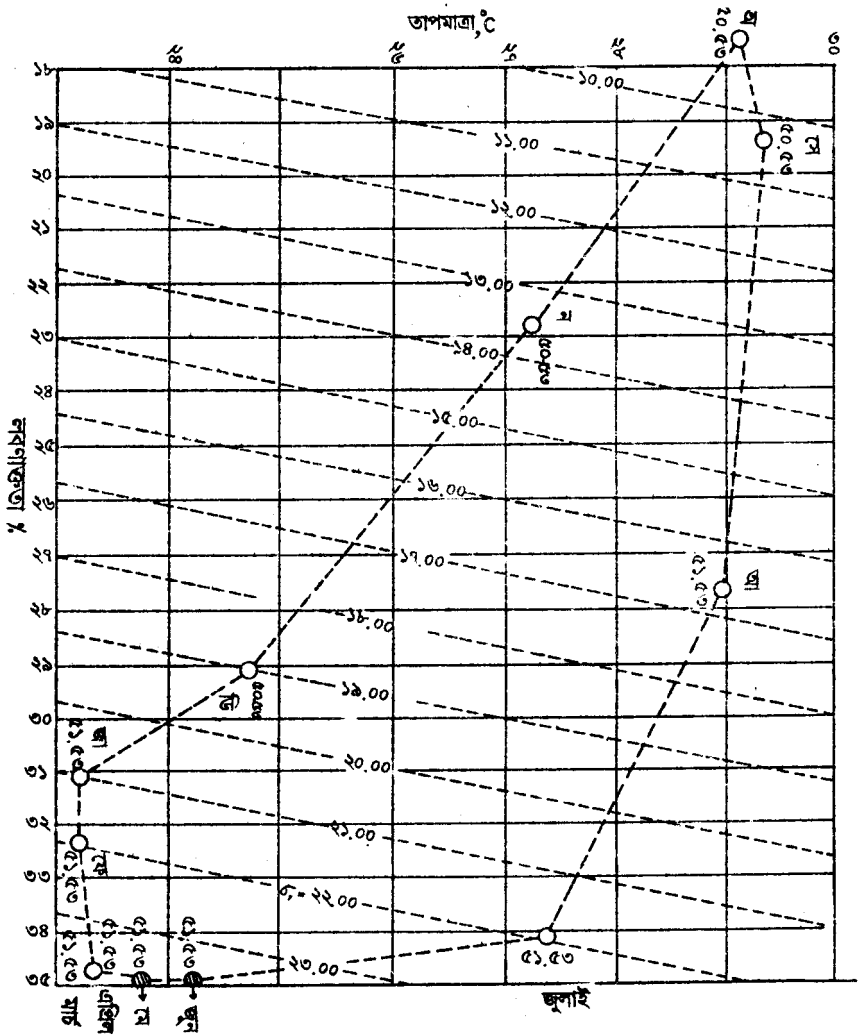
চিত্র ২.১১ : (ট) নভেম্বর



চিত্র ২.১১ : (ঠ) ডিসেম্বর

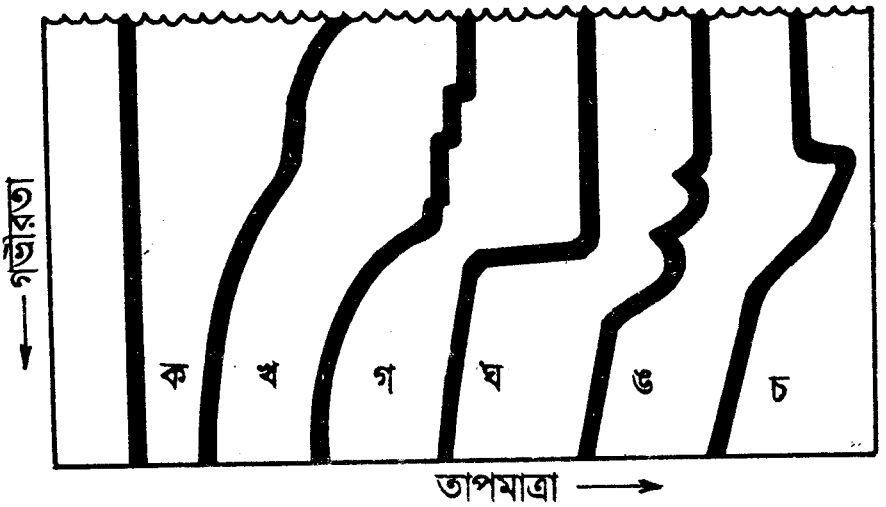
১ সেপ্টেম্বর : উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পশ্চিমমুখী স্রোত এবং নিরক্ষর স্রোতের মতো কিছু ঘূর্ণিচক্রের সৃষ্টি হয়। চিত্র-২.১১(ঠ)।

বঙ্গোপসাগরের পানির উল্লম্ব তাপমাত্রা, ঘনত্ব এবং জলরাশির বৈশিষ্ট্য :
২.১২ চিত্রে ১৯৫০-৫৩ সনে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন উপকূলের সাগর দ্বীপে সমুদ্রপৃষ্ঠের
মাসিক গড় তাপমাত্রা, লবণাক্ততা ও ঘনত্ব দেখানো হয়েছে। প্রতি মাসের অদ্যাক্ষর
নিয়ে এই তাপমাত্রার চার্টে দেখা যাচ্ছে যে ঋতুভিত্তিক তাপমাত্রার পার্থক্য মাত্র ৪-৬°
সেলসিয়াস।



চিত্র ২.১২ : ১৯৫০-৫৩ সনে সাগর দ্বীপে মাসওয়ারী গড় তাপমাত্রা, লবণাক্ততা ও ঘনত্বের চিত্র।

সমুদ্রের উল্লম্ব তাপমাত্রার গঠন থেকেই সমুদ্রের বুকে সংগঠিত ভৌত প্রক্রিয়াগুলো সম্বন্ধে ধারণা নেয়া যায়। ল্যাফগু (১৯৫৬) বঙ্গোপসাগরে ৬ ধরনের তাপমাত্রার স্তরের সন্ধান পান যার একটি গঠনমূলক ২.১৩ চিত্রে দেয়া হয়েছে। 'ক' রেখাটিতে বোঝায় সমোষ্ণ তাপমাত্রা বিশিষ্ট পানি বা গমন পথের নিচুস্তর পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে পানির মিশ্রণ (সমসত্ত্ব মিশ্রণ)। 'খ' রেখাচিত্র দিয়ে সচরাচর তিনস্তর বিশিষ্ট ব্যবস্থা (তাপ বলয়, তাপনতি স্তর এবং শীতল বলয়) এবং পৃষ্ঠদেশে তাপমাত্রা দিয়ে বায়ুমন্ডল থেকে স্বল্প বাতাসে পানিতে তাপ সঞ্চালন বুঝানো হয়েছে।



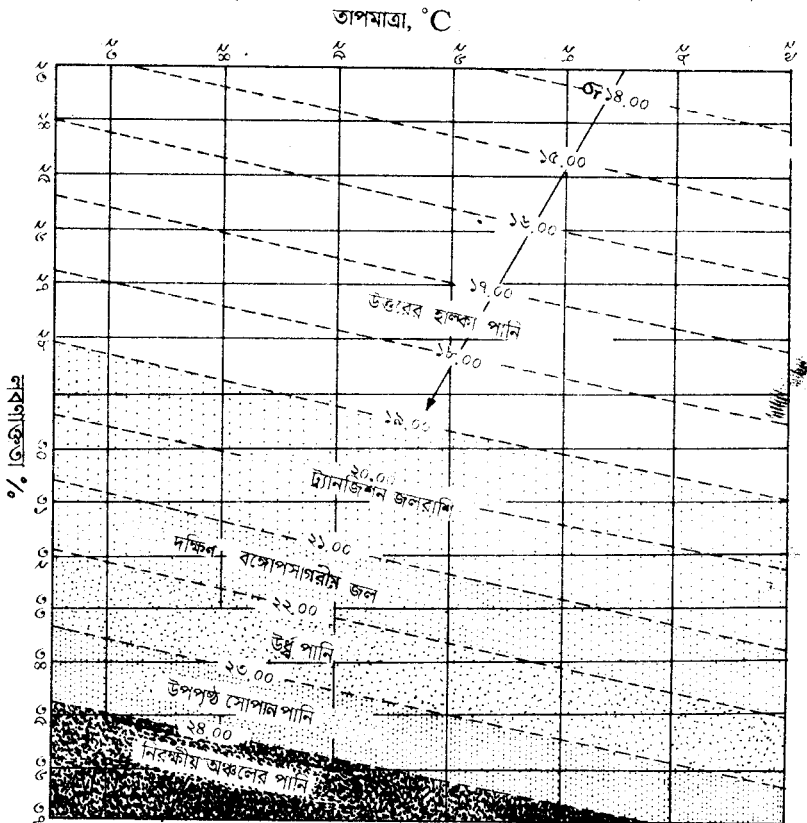
চিত্র ২.১৩ : বঙ্গোপসাগরে ৬ ধরনের সাগরতলীয় তাপ রেখা।

সিঁড়ির ধাপের মত 'গ' চিত্র দিয়ে পর্যায়ক্রমে বসন্তে পৃষ্ঠদেশের উষ্ণতা এবং বাতাসে মিশ্রণ বোঝানো হয়েছে।

সাগরতলের তাপমাত্রার 'ঘ' চিত্রটি ভাস্করূপ ধারণ করে-যখন একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার পানি রাশি অন্য তাপমাত্রার বিশেষ করে স্বল্প তাপমাত্রার পানির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। পরবর্তীকালে এই দুই পানির বিক্ষেপণ এবং মিশ্রণ না হওয়া পর্যন্ত পানিরাশি তীব্রভাবে আলাদা থাকে। একটি শক্তিশালী বায়ু প্রবাহও পানির উপরের স্তরের মিশ্রণ ভালভাবে করতে পারে এবং 'ঘ' রেখাচিত্রে দেখানো ভগ্নরূপ দান করতে পারে।

অনিয়মিত ইতস্তত : আন্দোলিত 'ঙ' রেখা চিত্রটি হচ্ছে শক্তিশালী স্রোতপ্রবাহের সীমানায় অশান্ত বা আলোড়নপূর্ণ অবস্থার ফলাফল। যখন সমুদ্রপৃষ্ঠে ঠাণ্ডা শুরু হয়, তখন সমুদ্রপৃষ্ঠতলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় পৃষ্ঠস্তরের পানিতে কম লবণাক্ততা থাকে, ফলে উল্লম্ব স্তম্ভগুলি ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। এই চিত্রগুলো

হচ্ছে পানির উর্ধ্বপ্রবাহ এবং নিম্নপ্রবাহের ফলাফল। উর্ধ্বপ্রবাহের সময় তাপনতিস্তর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পৃষ্ঠদেশের দিকে এই স্তরের অধঃতাপমাত্রা বাড়তে থাকে অর্থাৎ দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে পানি নিম্নদিকে প্রবাহের সময় তাপনতিস্তর খুবই তীক্ষ্ণ এবং গভীর হয়। কোনো কোনো সময় মহাদেশীয় তাকের বহিস্থ অংশে তাপনতিস্তর পরস্পরকে ভেদ করে। এতে শীত ও গ্রীষ্মে তাপের বা সোপানের অভ্যন্তরীণ অংশে সমোষ্ণ তাপ সৃষ্টি হয়। উপরে বর্ণিত ছয় ধরনের তাপমাত্রার ধরন দিয়ে সমুদ্র স্রোত, পানি মিশ্রণ এবং তাপ স্থানান্তরের সব প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যায় (La Fond, 1957)।



চিত্র ২.১৪ : তাপমাত্রা-লবণাক্ততা এবং সিগমা-টাও। বঙ্গোপসাগরের অগভীর মগ্নচূড়ার পানি এবং ছায়াঙ্কনতা দ্বারা ঘনত্ব (সিগমা-টাও) সীমা দেখানো হয়েছে।

ঘনত্ব এবং জলরাশি : লবণাক্ততা ও তাপমাত্রার কর্মফল হচ্ছে ঘনত্ব। একে সিগমা-টাও (σ_t) চিহ্নে দেখানো হয়ে থাকে।

তাপমাত্রা লবণাক্ততার এই চিত্র ধরে এমন জলরাশির সন্ধান পাওয়া যায় যদ্বারা স্রোত প্রবাহের দিক শনাক্ত করা যায়। অন্যান্য আরও গতি প্রবাহ যা সমুদ্রে ঘটে তা বঙ্গোপসাগর : সমুদ্র বিজ্ঞান ১২

নির্ধারণ করা যায়। ২.১২নং চিত্রে কোণাকূর্ণভাবে আঁকা ড্যাস লাইন দিয়ে পৃষ্ঠদেশের ঘনত্বও দেখানো হয়েছে।

ভারতের ওয়াল্টের উপকূলের পানির ঘনত্ব নিম্ন ($\sigma_t < 1.19$) হয় অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে। এই পানিকে উত্তরের হাল্কা পানি বলে। ২.১৪ নং চিত্রে 'ক' ধরনের রেখা চিত্রের (২.১৩নং চিত্রানুযায়ী) পরিবর্তি ও অবস্থা প্রাপ্তি জলরাশি ($\sigma_t = 1.19-2.1$) জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি এবং আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে দেখা যায়। যে পানির $\sigma_t = 2.1-2.2$, তাকে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরীয় পানি বলা হয়। উর্ধ্বগতির পানি রাশির σ_t হচ্ছে $\sigma_t = 2.2-2.3$ । যে পানির σ_t মান - ২.৩ এর চেয়ে বেশি, সেটি প্রায়শই উপপৃষ্ঠ পানিরাশিতে, তাই পৃষ্ঠদেশের ঘনত্বও দেখানো হয়েছে $\sigma_t = 2.3-2.8$ এমন পানিকে উপপৃষ্ঠীয় তাপ বা সোপানের পানিরাশি বলা হয়। উৎস এবং গঠন অনুসারে-এর সীমানা এবং নামকরণ নির্দিষ্ট হয়েছে পানির বিতরণ।

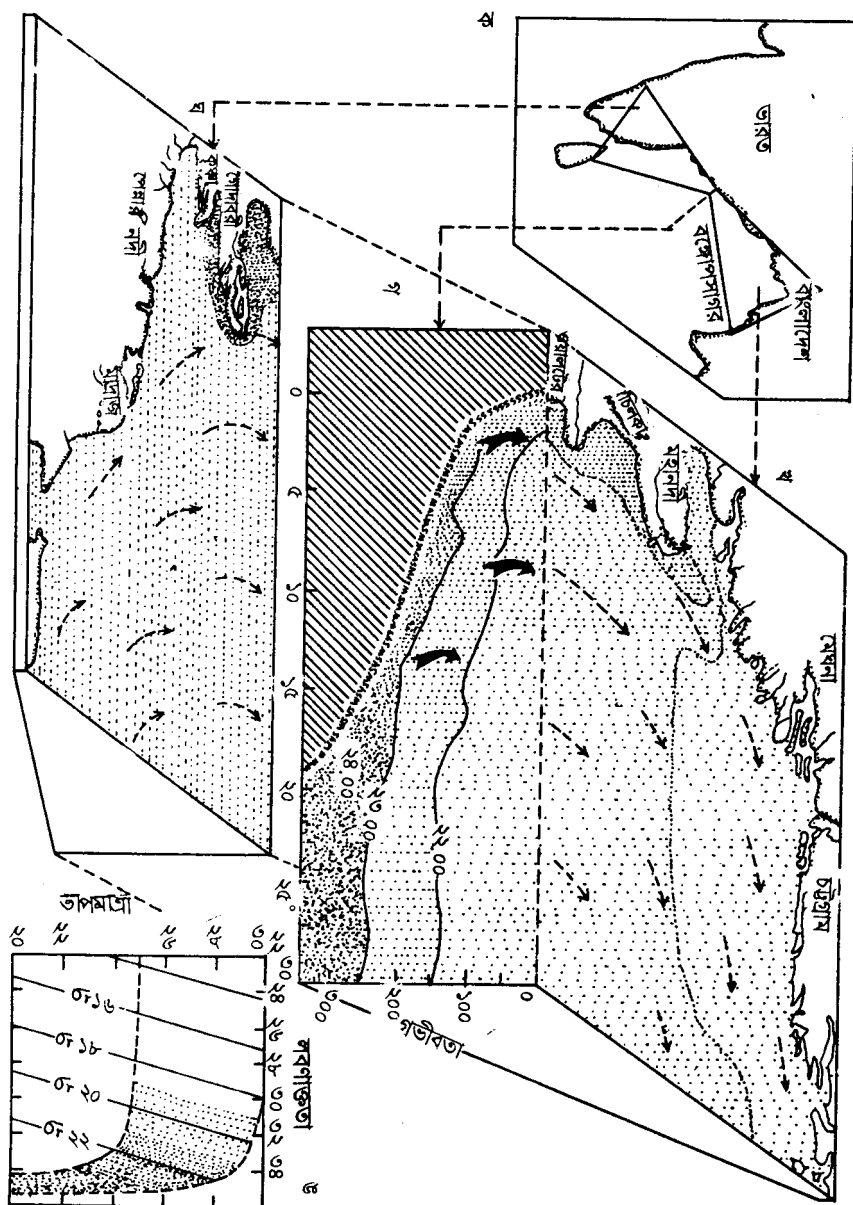
লাফও (১৯৫৭) বঙ্গোপসাগরের পাশ্চিম উপকূলের জন্য অক্টোবর-মার্চ মাস পর্যন্ত তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা পর্যবেক্ষণ করে পানিরাশি এবং ঘনত্বের উল্লম্ব বিন্যাস ও দিগন্তরাল বিন্যাস বের করেছেন। চিত্র ২.১৫ তে (অক্টোবর) এবং ২.১৬ চিত্র (মার্চ মাসের) তে লাফওর গবেষণার ফলাফল চিত্রিত হয়েছে। এ দুটি চিত্র ভৌত সমুদ্র বিপণনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ২.১৫ (ক) চিত্রের ক্ষেত্রটিকে দুটি কীলক আকার (Wedge shaped) অংশে ওয়েল্টায়ার থেকে উপরে এবং নিচে এই দুই অংশে বিভক্ত করেছে। ২.১৫ (গ) চিত্রে ওয়েল্টার থেকে ৩০ মাইল দূর পর্যন্ত অবস্থানের বর্ধিত অংশের চিত্র। দিগন্তরাল অংশ 'খ'তে ব্লক চিত্রটি বঙ্গোপসাগরের উত্তর অঞ্চলটিকে সঙ্কুচিত দেখানো হয়েছে যেমনটি করা হয়েছে দক্ষিণ অঞ্চলের শেষ অংশ 'ঘ'কে।

দিগন্তরাল এবং উল্লম্ব অংশে (খ, গ, ঘ) জলরাশিকে ছায়াময় দেখানো হয়েছে। পানি যেখানে পাতলা সেখানে পাতলা ছায়াময় বা শেডিং করা হয়েছে। ২.১৫ (খ) (অক্টোবর) চিত্রে সমুদ্রপৃষ্ঠ উত্তরের হাল্কা পানি দ্বারা আবৃত। উত্তর বঙ্গোপসাগরের শেষ মাথায় পানি বাহিত পানি এবং দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের পানির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এই হাল্কা পানি গঠিত হয়। বঙ্গোপসাগরে পতিত প্রতি বৎসর নদীবাহিত পানির পরিমাণ হচ্ছে 81×10^{11} ঘন মিটার (Sewell, R. B. Seymon, 1937)। উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের বিরাট অংশে এই পানি মিশ্রণ ছড়িয়ে পড়ে এবং পূর্ব উপকূল ধরে প্রবাহিত হতে থাকে।

বৎসরের এই সময়ে উপরে বর্ণিত পানি রাশি পুরো মহাদেশীয় সোপানে প্রবাহিত থাকে চিত্র ২.১৫ (গ) উত্তরের হাল্কা জলরাশি ($\sigma_t < 1.19$) উপকূলের নিচে ৫০ মিটার পর্যন্ত প্রসারিত হয় কিন্তু উপকূলের ৩০ মাইল দূরে পর্যন্ত এই জলরাশি মাত্র ২৫ মিটার প্রসারিত হয়। অন্যগুলি পৃষ্ঠদেশের নিচেই সূক্ষ্ম স্তর হিসেবে দেখা যায়।

চিত্র-২.১৫ (ঘ) তে দেখা যায় এই উত্তরের হাল্কা পানি শ্রীলংকা পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। যাইহোক উৎস থেকে দূরে যাওয়ার পর এর পুরুত্ব কমতে থাকে।

ঠিক এমনি প্রক্ষেপণ ব্যবহৃত হয়েছে ২.১৬ চিত্রে, তবে এটি বসন্তকালের জন্য প্রযোজ্য। এ সময়ে পৃষ্ঠদেশের ঘনত্ব বেশি হয়। সাগরপৃষ্ঠ দেশের পানি রাশির বৃহৎ



চিত্র ২.১৬ : বঙ্গোপসাগরে মার্চ মাসের জলরাশি (অক্টোবর মাসের মত)।

অংশটাই হচ্ছে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের (যেখানে $t_s=21-22$)। বঙ্গোপসাগরের কেন্দ্রীয় এবং দক্ষিণ অংশে এই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পানিরাশিকে দেখা যায়। মার্চ মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দ্বারা তাড়িত হয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে এই পানিরাশির প্রবাহ বইতে থাকে।

পৃষ্ঠদেশের ঘনত্বের অনন্যতা হচ্ছে উপকূল ধরে বয়ে যাওয়া পানির উর্ধ্বপ্রবাহের বন্ধনী বা ফানি (Band)। মার্চ মাসে ওয়ালটেয়ারের কাছে এই প্রবাহ কয়েক মাইল প্রশস্তের হয়ে থাকে। কিন্তু মে মাসে মহাদেশীয় সোপানের অর্ধেক পর্যন্ত বিস্তারিত হয়ে যায়। উড়িষ্যা উপকূলে এই প্রশস্ততা আরো বেশিও হতে পারে।

ওয়ালটেয়ার উপকূলে এই ঋতুতে কোনো উত্তরের হাল্কা পানি বা অবস্থান্তর পানির দেখা পাওয়া যায় না। সোপানে অবস্থিত অন্য পানিরাশি শীতকালের স্তরের চাইতে খুবই পুরু স্তরের হয়। ফলে এ সময়ে উল্লম্ব নীতিমাত্রা দুর্বল হয়ে যায়।

দক্ষিণে কিছু উর্ধ্বগতির পানি গোদাবরী বদ্বীপ এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু পৃষ্ঠদেশের অধিকাংশ এলাকায় দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের পানি দ্বারা আবৃত থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

সমুদ্র আবহবিদ্যা : বঙ্গোপসাগর

পৃথিবীর বায়ু প্রবাহ

পৃথিবীর বায়ু প্রবাহ প্রধানত চাপ বলয়ের উপর নির্ভরশীল। এই বায়ু প্রবাহকে প্রধান চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা :

ক. নিয়তবায়ু : আয়নবায়ু, পশ্চিমাবায়ু, মেরুবায়ু নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয়।

খ. সাময়িকবায়ু : সমুদ্রবায়ু, স্থলবায়ু ও মৌসুমীবায়ু বিভিন্ন সময়ে তাপচাপের পার্থক্যহেতু প্রবাহিত হয়।

গ. অনিয়মিতবায়ু : ঘূর্ণিবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণিবাত ইহাৎ যে কোনো দিক থেকে প্রবাহিত হয়।

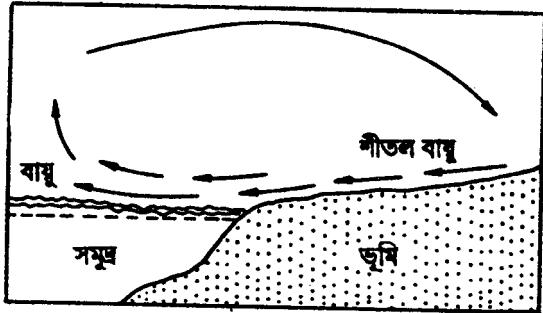
ঘ. স্থানীয় বায়ু : ফন, খামসিন, সিরকো প্রভৃতি স্থানীয় কারণে উৎপত্তি হয়।

সাময়িকবায়ু এবং অনিয়মিতবায়ু সমুদ্র সংশ্লিষ্ট বলে বিষয় দু'টি সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো।

সাময়িক বায়ু

সমুদ্র বায়ু : সমুদ্র তীরবর্তী কোনো স্থানের বায়ুপ্রবাহ সাধারণত জল ও স্থলের দিন ও রাত্রির উষ্ণতার তারতম্যের উপর নির্ভর করে। জলে ও স্থলে দিবাভাগে সূর্যকিরণ সমভাবে পতিত হলেও প্রকৃতিগত পার্থক্যের জন্য জলভাগ অপেক্ষা স্থলভাগ দ্রুত উত্তপ্ত হয়, আবার রাত্রিতে জলভাগ অপেক্ষা স্থলভাগ শীঘ্র শীতল হয়। সুতরাং দিবাভাগে সূর্যের উত্তাপে সমুদ্রের জল অপেক্ষা নিকটস্থ স্থলভাগ অধিক উত্তপ্ত হয় এবং স্থলের উপরিস্থিত বায়ু উষ্ণ,

প্রসারিত ও লঘু হয়। এই লঘু বায়ু উর্ধ্বে উঠে গেলে সেখানে বায়ুর নিম্নচাপ হয়। কিন্তু তখন সাগরের উপরিস্থিত বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল ও উচ্চচাপযুক্ত থাকে। এর ফলে জলভাগ থেকে স্থলভাগের দিকে বায়ুপ্রবাহ হতে থাকে। একে সমুদ্রবায়ু (sea breeze) বলে। দিবাভাগে

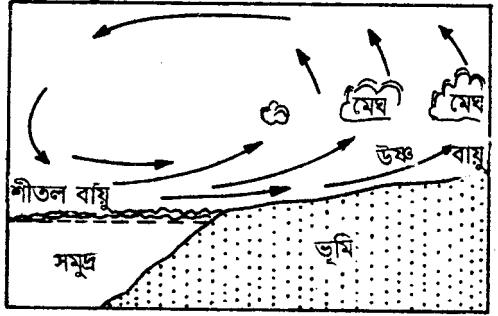


চিত্র ৩.১ (ক) : সমুদ্র বায়ু।

স্থলভাগের উপর উত্তাপের প্রখরতা বৃদ্ধির জন্য সমুদ্র বায়ুর বেগ ও বাড়তে থাকে। অপরাহ্নে তা প্রবল হয় (চিত্র-৩.১(ক)) সূর্যোদয়ের পর উপকূলের স্থলভাগ উত্তপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র বায়ু প্রবাহিত হতে শুরু করে। সাধারণত ১০—১১টার দিকে এরূপ অনুভব করা যায়। বেলা যত বাড়তে থাকে ততই উপকূলের ও জলভাগের তাপের তারমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সঙ্গে সমুদ্র বায়ুর গতিবেগও বাড়তে থাকে। বেলা ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত সমুদ্র বায়ু সর্বাধিক গতি লাভ করে। অপরাহ্ন ৩টার পর উপকূলের তাপমাত্রা কমতে থাকে। সেইসঙ্গে সমুদ্র বায়ুর গতিবেগও কমতে থাকে। সন্ধ্যার পর পর বায়ু প্রবাহ স্থির হয়ে যায়।

স্থলবায়ু (Land breeze) : সন্ধ্যার পূর্ব হতেই উত্তপ্ত স্থলভাগ তাপ বিকিরণ করে ক্রমশ শীতল হয়। স্থলের উপরিস্থিত বায়ু সমুদ্রের উপরিস্থিত বায়ুর মত শীতল হলে সমুদ্রবায়ু বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু রাত্রিকালে স্থলভাগের তুলনায় জলভাগ তত শীঘ্র তাপ বিকিরণ করতে পারে না বলে তা উষ্ণ থেকে যায়। জলের উপরিস্থিত বায়ুর চাপ নিম্ন হয় এবং স্থলের উপরিস্থিত বায়ুর চাপ উচ্চ হয়। সুতরাং তখন স্থলভাগ হতে সমুদ্রের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। একে স্থলবায়ু বলে (চিত্র-৩.১ (খ))। রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্থলভাগ যত শীতল হতে থাকে,

স্থলবায়ুর বেগও তত বাড়তে থাকে। এটি রাত্রির শেষভাগে প্রবল হয়। এই দুই বায়ুর জন্য সমুদ্র তীরবর্তী দেশসমূহের জলবায়ু সম-ভাবাপন্ন হয়। অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে এই দেশসমূহ খুব উষ্ণ হয় না বা শীতকালে খুব শীতল হয় না। চট্টগ্রাম, কক্সবাজারে, ভোলায় সন্ধ্যা বেলায় যে শীতল শিথিল বায়ু বহে তা বঙ্গোপসাগরের বুক থেকে আসে।



চিত্র ৩.১ (খ) : স্থলবায়ু।

সমুদ্র ও স্থলবায়ুর উপর দিয়ে পরিচলনে বিপরীত স্রোত প্রসারিত হয়। বড় হ্রদের উপকূলে সমুদ্রবায়ু ৭০০০—১৬০০০ ফুট গভীর হয়। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে সমুদ্র বায়ুর গভীরতা ৩,৫০০—৭০০০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। স্থলবায়ুর গভীরতা সমুদ্রবায়ুর গভীরতা অপেক্ষা অনেক কম হয়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সমুদ্র বায়ু ১০—১৫ মাইল স্থলভাগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। উষ্ণমণ্ডলে ২৫—৩০ এমনকি ৫০—৬০ মাইল পর্যন্ত সমুদ্রবায়ু স্থলভাগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। স্থলবায়ু সমুদ্র বায়ু অপেক্ষা অনেক অল্প পরিসরের হয়।

সমুদ্র বায়ুর গতিবেগও বিভিন্ন হয়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সমুদ্রবায়ুর গতিবেগ সাধারণত ঘণ্টায় ৮—১২ মাইল হয়, তবে ২৫ মাইলও হতে পারে। উষ্ণমণ্ডলের কোনো কোনো উপকূলে সমুদ্রবায়ুর গতিবেগ ঝড়ের আকার ধারণ করতে পারে। যেসব গুরু উপকূলের নিকট শীতল সমুদ্র স্রোত প্রবাহিত হয় সেসব স্থানে অপরাহ্ন

২ — ৩টার সময় জল ও স্থলভাগের তাপের তারতম্য অত্যধিক হয়। ফলে বায়ুচাপের তারতম্যও হয় অনেক। এ কারণে এসব উপকূলে অপরাহ্নের প্রথম দিকে সমুদ্রবায়ু ঝড়ের বেগে প্রবাহিত হয়। স্থল ও সমুদ্রবায়ু সর্বাধিক মাত্রায় সৃষ্টি হয় উষ্ণমন্ডলের উপকূলে। এখানে দুপুর পর্যন্ত আকাশ প্রায়ই পরিষ্কার থাকে এবং স্থলভাগ খুব উষ্ণ থাকে। ফলে এই অঞ্চলে জল ও স্থলভাগের তাপের তারতম্য খুব বেশি হয় বলে স্থল বায়ু এবং সমুদ্রবায়ু ভালভাবে সৃষ্টি হয়।

সমুদ্রে বাতাস ও তরঙ্গ : সাগরে কাজ করতে গেলে (নৌ-পরিবহণ, মৎস্য শিকার, খনিজ তৈল অনুসন্ধান, উত্তোলন, পাহারা ইত্যাদি) মানুষকে বাতাস এবং ঢেউয়ের মুখোমুখি হতে হয়। কাজেই সমুদ্রের পরিবেশ সম্বন্ধে তথ্য যত সঠিক পাওয়া যায়, ততই তার কাজ করার সুবিধে। ঝড়ের মাঝে পড়ে জাহাজ যখন ঘন ঘন উঠতে-নামতে বা ক্রমাগত দুলতে থাকে, তখন যাত্রীরা মনে করে যে তাদের জীবনের অন্তিমলগ্ন বুঝি এসে উপস্থিত। ছোট ছোট নৌকা ঝড়ের মাঝে পড়ে নিমেষেই তলিয়ে যেতে পারে। সমুদ্রের মাঝে রাখা তৈল উত্তোলনের কাঠামো ঠিকমত নির্মাণ করা না হলে তা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই সমুদ্রের বাতাস, ঢেউয়ের ধ্বংস করার যে বিরাট ক্ষমতা আছে, সে সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন ও আত্মরক্ষার বিভিন্ন উপায় বের করা উচিত।

সমুদ্রের বুকে বাতাসের চাপ সবসময় এক থাকে না। বিভিন্ন স্থানে বাতাসের চাপের পরিমাণের ভিত্তিতে মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়। এর থেকে হিসেব কষে বাতাসের গতি বের করা যায়। বাতাস প্রবাহের সঙ্গে সাগরের পানির উপরের স্তরের একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। নাবিকেরা সাগরের উপরিভাগের অবস্থা দেখে বাতাসের গতি নির্ণয় করে। সমুদ্রের বিভিন্ন অবস্থার সূচক হিসেবে এরা বিউফোর্ট স্কেল (beaufort scale) ব্যবহার করে। জলস্তরের বিভিন্ন অবস্থার মানদণ্ডে ১২টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এই স্কেলে শূন্য মানে সাগর আয়নার মত শান্ত, আর ১২ মানে প্রবল ঝড়ের (hurricane) ইঙ্গিত করে। বাতাস যখন সমুদ্রের উপর দিয়ে বয়ে যায়, তখন তার কিছু অংশ সাগরের জলস্তরে স্থানান্তরিত হয়। সে অংশের পরিমাণ কিন্তু খুবই সামান্য। বাতাসের সংঘর্ষে এসে জল যে গতিপ্রাপ্ত হয়, তা বাতাসের গতির ১ থেকে ২ শতাংশ। বাতাস যে দিকে প্রবাহিত হয়, জলের প্রবাহ সেই দিকে হয় না। জলের উপরের স্তরের প্রভাব ক্রমশ নিচের দিকে সংক্রমিত হতে থাকে। ২০০ মিটার গভীরে এর প্রভাব আর থাকে না।

সমুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টির প্রধান কারণ বাতাস। বিভিন্ন আকারেও ঢেউ সাগরে দেখা যায়। একমাত্র বাতাসের জন্যই ঢেউ সৃষ্টি হয় না। অন্য কারণেও হতে পারে, যেমন সাগর গর্ভে ভূমিকম্প, ডুবন্ত আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ এবং জোয়ারভাটা। জোয়ারের ক্ষেত্রে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশাল হতে পারে, কখনো বা তরঙ্গের শীর্ষ (crest) থেকে তরঙ্গের। সাগর গর্ভে ভূমিকম্প থেকে যে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়, তার নাম সুনামি (tsunamis)। এগুলো ঠিক ছন্দোবদ্ধ ঢেউ নয়। উৎপত্তির পর এই ঢেউয়ের উচ্চতা দ্রুত কমতে থাকে এবং দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে। এসব খুব দ্রুত গেলেও বিশাল দৈর্ঘ্যের জন্য জলের

ওঠানামা সহজে চোখে পড়ে না। মহীসোপানে এ রকম ঢেউ সৃষ্টি হলে তা বিধ্বংসীরূপ নেয়। প্রশান্ত মহাসাগরে সুনামী বেশি হয়। শব্দটি জাপানি। ভারত মহাসাগরে সুনামি হয়নি।

সমুদ্রের জলযান বা অন্য কোনো কাঠামোকে স্রোত থেকে সৃষ্টি বল সহ্য করতে হয়। সমুদ্রের স্রোতের বিভিন্ন উপাদান আছে। জোয়ারভাটা থেকে স্রোত সৃষ্টি হয়। বাতাসের প্রভাবে সমুদ্রের উপরের স্তরেও স্রোত দেখা দিতে পারে। অবশ্য তার প্রভাব ৩৫০ মিটারের বেশি গভীরতায় থাকে না। ক্রমাগত পশ্চিমী হাওয়ার প্রভাবে সাগরের জল স্থানান্তরিত হয়। উত্তর গোলার্ধে এই জলঘড়ির কাটার ঘূর্ণনের অভিমুখী (clockwise) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। এ ছাড়া পরিবেষ্টনী স্রোত (circulation current) সমুদ্রে সব সময়ই সৃষ্টি হচ্ছে। সাগরের গভীরের পানি মেরু প্রদেশ থেকে আসে। মেরু অঞ্চলে সাগরের উপরের পানি ঠাণ্ডা হয়ে যাবার ফলে ভারী হয়ে নিচে চলে আসে এবং তারপর তা বিষুব রেখার দিকে বইতে শুরু করে। প্রবাহের সময় তা অপেক্ষাকৃত গরম জলের সংস্পর্শে এসে হাল্কা হয়ে উপরে উঠে যায়। পরিশেষে সেই জল বায়ুত্যাগিত হয়ে মেরু অঞ্চলে আবার ফিরে আসে। এইভাবে চক্র পুরো হয়। এই জল প্রবাহের বেগ ৮—১৩ কিঃ মিঃ মাত্র। চক্র সম্পূর্ণ করতে কয়েকশ' বছর লেগে যায়।

সমুদ্রের সব এলাকার পরিবেশ এক থাকে না। সাগরের কোনো এলাকায় কাজ করতে গেলে সারা বছর ধরে সেখানকার বাতাস, ঢেউ, জোয়ারভাটা ও স্রোতের তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, অন্তত ১০০ বছরের আগের তথ্যসহ। তা না পাওয়া গেলে কয়েক বছরের তথ্য নিয়ে বিভিন্ন পরিসাংখ্যিক পন্থার সাহায্য নিয়ে সঠিক মাপের মঞ্চ, পাইপলাইন, বাড ইত্যাদি বসাতে হয়। তরঙ্গ মাপার বৈজ্ঞানিক পন্থা আজ অনেক উন্নত। কম্পিউটার মডেলিং করে তাকে নিখুঁত করা হয়। সাগরে যন্ত্রপাতি বসানোর সময় ভূমিকম্পের জন্য কম্পনের সূত্রপাতজনিত বলের অভিঘাত সহ্য করার ক্ষমতাও হিসাবে রাখতে হয়। দিনব্যাপী সাগরে বাতাস, তরঙ্গ ইত্যাদির মাপ স্থির থাকে না। তার উপর সারা বছর ধরেই এর তারতম্য ঘটে। তাই এই বিরাট পার্থক্যের মধ্যে কোন মানের উপর ভিত্তি করা হবে, তা নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়। সাগরে কোনো কাঠামো স্থাপন করা হলে তাকে সবচেয়ে বড় ঢেউয়ের আঘাতজনিত যে পরিমাণ বল সহ্য করতে হবে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারলে বিপদের সম্ভাবনা কম হয়। তাছাড়া সাগরতল (sea bed) সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করাও একান্ত জরুরী। প্রতিধ্বনি শব্দযন্ত্র (echo sounder), টেলিভিশন ক্যামেরা ইত্যাদির সাহায্যে তলদেশের চিত্র পাওয়া যায়।

সর্বনিম্ন স্থানের (trough) দূরত্ব দুই মহাদেশের যতটা ব্যাসার্ধ ততটা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য কয়েক হাজার কিলোমিটার হলে অবাক হবার কিছু নেই। ভূমিকম্প থেকে যে ঢেউয়ের জন্ম হয় তা অত লম্বা না হলেও কয়েকশ' কিলোমিটার হতে পারে। বাতাসের ফলে সাগরে যে ঢেউ দেখা দেয়, তাদের দৈর্ঘ্য সেন্টিমিটারের ভগ্নাংশ থেকে ১৫০০ মিটারের মধ্যে যে কোনো মাপের হয়। মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহে

সমুদ্রে ছোট ছোট ঢেউ দেখা যায়। এদের আকৃতি মূলত পৃষ্ঠতল টানের উপর নির্ভর করে। এদের দৈর্ঘ্য কয়েক মিলিমিটার মাত্র। ছোট ঢেউয়ের গতিও শূন্য, বড় জোর প্রতি সেকেন্ডে ৩০ সেঃমিঃ। সাগরের জলের উপর যদি তেল জাতীয় পদার্থ বিছানো থাকে, তবে ছোট ছোট ঢেউ সৃষ্টি হতে পারে না। তাই জলে ভাসমান তেল স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। বাতাসের গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঢেউগুলো বেশি উঁচু ও লম্বা হতে থাকে। সাগর তার মসৃণতা হারিয়ে ফেলে ক্রমশ রুক্ষ হয়ে উঠতে পারে। তিন নট বাতাসের বেগে ঢেউয়ের আকৃতি স্পষ্ট রূপ নেয় না। এর বেগ দশ নট হলে ঢেউয়ের উচ্চতা নিশ্চিতভাবে বেড়ে যায়। এ অবস্থায় মাঝে মাঝে ঢেউ ভেঙ্গে গিয়ে সাদা ফেনা সৃষ্টি করে। বাতাসের বেগ ১৫ নট হলে আবহাওয়া প্রতিকূলে বৃষ্টি হতে হবে। তখন ঢেউয়ের উচ্চতা ৩—৪ মিটার হবে। ঢেউয়ের বেশিষ্ট্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে বাতাসের উপর—তার বেগ, স্থায়িত্ব এবং কতটা এলাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তার উপর। যখন বাতাসের বেগ আরও বেড়ে যায়, যা প্রায় ঝড়ের সামিল, তখন ঢেউগুলো ১০—১৫ মিটার উঁচু হতে পারে। বিভিন্ন সাগরে ঢেউয়ের সর্বোচ্চ উচ্চতার পরিমাপ পাওয়া গেছে ৩০ থেকে ৩৫ মিটার।

বাতাসের বেগ যখন কম থাকে, তখন ঢেউহীন বলে স্তর থেকে তরঙ্গ শীর্ষ এবং তরঙ্গ নিম্নের দূরত্ব সব সময়ই সমান থাকে। ঢেউগুলো যত বড় হতে থাকে তরঙ্গশীর্ষ তত খাড়াই হয় এবং তরঙ্গ নিম্নের সমতল হবার প্রবণতা তত বাড়ে। ঢেউ বেশি উঁচু হয়ে গেলে তরঙ্গশীর্ষ ভেঙ্গে গিয়ে সাদা ফেনায় পরিণত হয়ে তার ঢাল দিয়ে তা নেমে যায়। মাঝ সমুদ্রে ঢেউগুলোর যে বৈশিষ্ট্য থাকে, তীরে আসার সময় তা পাণ্টে যায়। ঢেউ গভীর জল থেকে অগভীর জলে যেতে দিক পাটায়।

জোয়ারভাটা থেকে যে ঢেউয়ের জন্ম হয় তা ৩০ সেঃ মিঃ থেকে ২ মিটার উঁচু হয়। চন্দ্র সূর্যের প্রভাব সাগরতল ও তট রেখার আকৃতি ও মাপের উপর নির্ভর করে। উপসাগর বা প্রণালীর অপেক্ষাকৃত শান্ত জলে জোয়ারের জলক্ষীতির পরিমাণ বেশি। ভাটায় জলহাসের হারের চেয়ে জোয়ারের জলবৃদ্ধির হার ও বেশি।

মৌসুমী বায়ু (Monsoon Wind) : আরবি ভাষায় 'মৌসিম' কথার অর্থ ঋতু। ঋতুভেদে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাকে মৌসুমী বায়ু বলে। দক্ষিণ এশিয়ায় ছয়মাস উত্তর-পূর্ব দিকে থেকে এবং ছয়মাস দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু প্রবাহকে বুঝাবার জন্য প্রথম এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। এখন শীত ও গ্রীষ্মকালে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী বায়ু প্রবাহকে মৌসুমী বায়ু বলে। শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে বিশাল স্থলভাগ ও জলভাগের উপরের বায়ুর উষ্ণতা ও চাপের পার্থক্যের জন্য মৌসুমী বায়ুর উদ্ভব হয়। সমুদ্র বায়ু ও জলবায়ুর ব্যাপক সংস্করণ মৌসুমী বায়ু। এটি আমাদের দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমানরা এই বায়ুর কথা জানতো। মধ্যযুগে আরব নাবিক ও ভূগোলবিদরা মৌসুমী বায়ু সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। আরব নাবিক ইবনে মজিদ যিনি মৌসুমী বায়ু সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন, তিনিই ১৪৯৮ সালে ভাস্কোডাগামাকে পূর্ব আফ্রিকা থেকে ভারতে নিয়ে আসেন।

মৌসুমী বায়ু সম্পর্কে নানাবিধ ধারণা রয়েছে, যথা —

- (১) ঋতুভেদে বিপরীতমুখী বাতাস, শীতকালে উত্তর-পূর্ব আর গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়।
- (২) প্রায় চিরস্থায়ী কোষের একটি সাধারণ সঞ্চালন (এমন বায়ু প্রবাহ যা একই আবহাওয়া মণ্ডলে পুনর্জন্ম হয়) যা জল ও স্থলভাগের ঋতুভেদে তাপমাত্রার পার্থক্যের জন্যই প্রবাহিত হয়।
- (৩) গ্রহের বায়ু সঞ্চালনের একটি অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া।
- (৪) দু'টি আঞ্চলিক চাপীয় ধরনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাকারী প্রবাহ।
- (৫) উষ্ণ, জলীয়, বৃষ্টিপূর্ব গ্রীষ্মকালে এবং শূষ্ক, রৌদ্রময় শীতকালের আবহাওয়া-জনিত ঘটনা।
- (৬) এসব বৈশিষ্ট্য পরস্পরের পরিপূরক নয় কিংবা পুরোপুরি সত্য বা স্বয়ংসম্পূর্ণও নয়।

ইংল্যান্ডের মিঃ হ্যালি (Mr Halley) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শীত-গ্রীষ্মের বায়ু প্রবাহকে বুঝানোর জন্য ১৬৮৬ সালে 'মৌসুমী' শব্দটি ব্যবহার করেন (Trewartha : An Introduction to Climate, 1968, P.P. 102)। হ্যালির মতে, মৌসুমী বায়ু প্রবাহ সম্পূর্ণ তাপের কারণে সৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূখণ্ড পার্শ্ববর্তী সমুদ্র অপেক্ষা উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। তাপের এই বৈষম্যের ফলে স্থলভাগে নিম্নচাপ এবং পার্শ্ববর্তী সমুদ্রে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। ফলে গ্রীষ্মকালে সমুদ্র হতে এশিয়ার ভূখণ্ডের দিকে জলীয় বাষ্প পূর্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। অপর দিকে শীতকালে এশিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশ বিকিরণের ফলে পার্শ্ববর্তী সমুদ্র অপেক্ষা শীতল হয়ে পড়ে এবং যার ফলে স্থলভাগের উচ্চচাপ ও সমুদ্রে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। চাপের এই তারতম্যের জন্য শীতকালে শুষ্ক বায়ু স্থলভাগ হতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়।

হ্যালি ছাড়া অন্যান্য পণ্ডিতদের মধ্যেও মতের বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন কারো মতে এটি একমুখী বায়ু প্রবাহ-কেবল গ্রীষ্মকালীন এবং সমুদ্র হতে স্থলমুখী। আবার কারো মতে বিপরীত ঋতুতে বায়ুপ্রবাহ 180° দিক পরিবর্তন করলে তাকে মৌসুমী বায়ু বলা যায়। কেউ কেউ বলেন মৌসুমী বায়ুর বিপরীতমুখী প্রবাহ বায়ুমণ্ডলের নিম্ন ও উর্ধ্ব উভয় স্তরেই হতে হবে। এ ক্ষেত্রে বায়ু প্রবাহ বলয়ের অক্ষাংশিক স্থান পরিবর্তনের ফলে নিম্ন ও উর্ধ্ব স্তরে বায়ু প্রবাহের পুরোপুরি দিক পরিবর্তন হতে পারে। সেই জন্য বাণিজ্য বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় গোলার্ধে প্রবেশ করলে কেউ কেউ তাকে মৌসুমী বায়ু নামে অভিহিত করেছেন।

মৌসুমী বায়ু যে বেশ জটিল প্রক্রিয়া তা গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। গড় গ্রীষ্মকালীন মানচিত্রে স্থলভাগের উপর নিম্নচাপ ও এর আনুষঙ্গিক বায়ুপ্রবাহ দেখা গেলেও প্রতি দিনের আবহাওয়া মানচিত্রে তা সব সময় দেখা যায় না। সম্পূর্ণ অঞ্চলে চলমান বিভিন্ন নিম্নচাপের প্রভাবেই মৌসুমী বায়ুর অবস্থান ও ব্যাপকতার বিভিন্নতা দেখা যায়। এ সকল নিম্নচাপের অনেকগুলিই পরিণত অবস্থায় সমুদ্র হতে স্থলভাগের দিকে আগমন করে যার ফলে বলা চলে যে, স্থলভাগের তাপের কারণে এরা সৃষ্টি

হয়েছে। বাংলাদেশ, ভারত, চীন ও উত্তর অস্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্মকালে এরূপ নিম্নচাপজনিত ঝড়-বৃষ্টি হয়ে থাকে। নিম্ন অক্ষাংশ অঞ্চলগুলিতে যে মৌসুমী প্রবাহ দেখা যায় তা শীত ও গ্রীষ্মের তারতম্যের জন্য নহে। বরং এটি সৃষ্টি হয় সূর্যের উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নের ফলে বায়ুচাপ বলয়গুলির স্থান পরিবর্তনের কারণে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে শীতকালে সূর্য যখন হেলিয়া কিরণ দেয় তখন আয়ন বায়ু প্রবাহিত হয় এবং গ্রীষ্মকালে সূর্য যখন খাড়াভাবে কিরণ দেয় তখন পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হয়।

মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় প্রধানত নিয়ত বায়ু প্রবাহের সাময়িক পরিবর্তনের ফলে। তাপের কারণে সৃষ্টি হলে এতে পরিচলন জাতীয় বায়ু প্রবাহ সৃষ্টি হয় এবং ভূপৃষ্ঠের বায়ু প্রবাহের বিপরীত দিকে, উর্ধ্ববায়ু দিয়ে বায়ু প্রবাহ থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুপ্রবাহের সম্পূরক বিপরীতমুখী উর্ধ্ববায়ু প্রবাহ দেখা যায় না (রফিক আহম্মদ, জলবায়ু বিজ্ঞান, ১৯৯৩)।

মৌসুমী বায়ু যদিও গ্রীষ্মকালে প্রচুর জলীয় বাষ্প বহন করে আনে তবু এর ফলে সব সময়ই বৃষ্টিপাত হয় না। মৌসুমী বায়ু প্রবাহ হতে বৃষ্টিপাতের যে চিত্র পাওয়া যায় বাস্তবে তা হতে বহু ব্যবধানও দেখা যায়। সামুদ্রিক বায়ুপ্রবাহের ফলে মৌসুমী অঞ্চলে দীর্ঘ দিন বৃষ্টি হয় নি এমন উদাহরণও বিরল নয়। মৌসুমী অঞ্চলে সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাবে যে বৃষ্টিপাত হয় তা পার্বত্যাঞ্চলে শৈলোৎক্ষেপ (orographic) জাতীয় এবং সমতল ভূমিতে চলমান নিম্নচাপ ও অন্যান্য ঝড়-ঝঞ্ঝা জাতীয়।

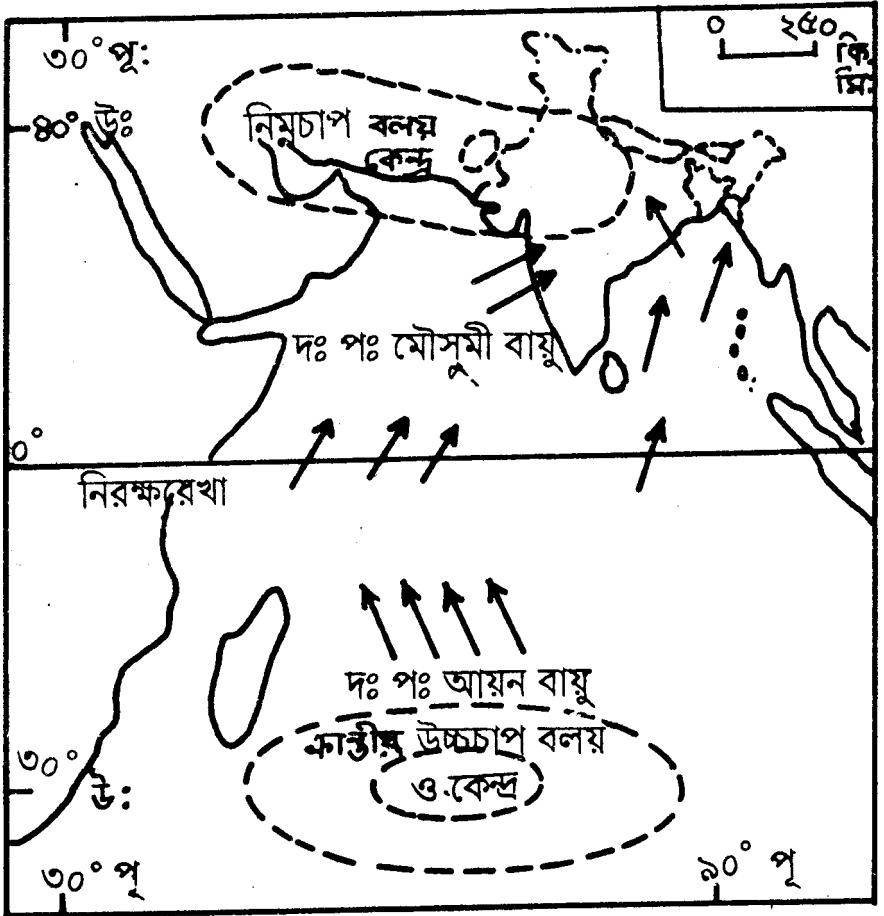
মৌসুমী বায়ু প্রবাহে শীত ও গ্রীষ্মকালে বিপরীত দিক হতে বিপরীত গুণবিশিষ্ট বায়ু প্রবাহিত হয়। এর ফলে মৌসুমী অঞ্চলে এ দুটি ঋতুতে এ দুটি বায়ু প্রবাহের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব দেখা যায়। মৌসুমী বায়ু অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় এবং শীতকালে শুষ্ক থাকে। গ্রীষ্মকালে সমুদ্র হতে বায়ু স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয় বলে বৃষ্টিপাত হয় এবং শীতকালে বায়ু স্থলভাগ হতে প্রবাহিত হয় বলে এই বায়ুতে অতি অল্প জলীয় বাষ্প থাকে। ফলে শীতকালে শুষ্ক থাকে। তবে শীতকালীন বায়ু প্রবাহ সমুদ্র অতিক্রম করে স্থলভাগে পৌঁছার পর বৃষ্টিপাত হতে পারে। তেমন বৃষ্টিপাত হয় মাদ্রাজ ও শ্রীলঙ্কার পূর্ব উপকূলে।

মৌসুমী বায়ুপ্রবাহে শীত ও গ্রীষ্মের তাপের তারতম্য নিম্ন অক্ষাংশে খুব একটা অনুভূত না হলেও মধ্য অক্ষাংশে শীতের তীব্রতা বেশ অনুভূত হয়। কারণ, এ সময় মহাদেশের উচ্চ অক্ষাংশের তীব্র শীতজনিত বায়ুপ্রবাহ মধ্য অক্ষাংশে এসে পৌঁছে। অপর দিকে গ্রীষ্মকালেও মধ্য অক্ষাংশে উষ্ণমণ্ডলীর বায়ুর প্রভাব পৌঁছে।

গ্রীষ্ম মৌসুমী : গ্রীষ্মকালে (মে-জুন মাসে) উত্তর গোলার্ধে সূর্য আপাত গতিতে ককটক্রান্তির নিকট আসে। এ অঞ্চলে স্থলভাগ বেশি আছে। এই স্থলভাগের অন্তর্গত মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, উত্তর-পশ্চিম ভারত, আফ্রিকার গিনি উপকূল গ্রীষ্মকালে খুব উত্তপ্ত হয়। এদের উপরিস্থিত বায়ু উষ্ণ ও লঘু হয়। সুতরাং এ সকল স্থানের বায়ুর চাপ নিম্ন হয়। কিন্তু নিকটবর্তী ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের জলভাগ তেমন উত্তপ্ত হয় না। এদের উপরিস্থিত বায়ু শীতল ও উচ্চ চাপযুক্ত হয়। গ্রীষ্মকালে এই উচ্চ চাপে সমুদ্র বায়ু উপরিউক্ত স্থলের নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত

হয় এবং স্থলের উপরিস্থিত নিম্নচাপের বায়ুকে উর্ধ্বে ঠেলে দেয়। উত্তর গোলার্ধে এই বায়ুকে গ্রীষ্ম মৌসুমী বায়ু বলে।

গ্রীষ্মকালে সূর্যের উত্তরায়েনের সঙ্গে তাপ বিষুব রেখা নিরক্ষরেখার 5° উত্তরে সরে যায়। ফলে দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ুও উত্তর দিকে তাপ-বিষুব রেখাকে অনুসরণ করে সরতে আরম্ভ করে। কিন্তু নিরক্ষরেখা অতিক্রমকালে ফেরেলের সূত্রানুসারে ডান দিকে বেঁকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে প্রবাহিত হয়। এটিই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। এর বেগ এত প্রবল যে, উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু এ সময় বন্ধ হয়ে যায়। ভারত, পাকিস্তান, বার্মা ও শ্রীলংকায় এই বায়ু প্রবাহিত হয় (চিত্র ৩২)।

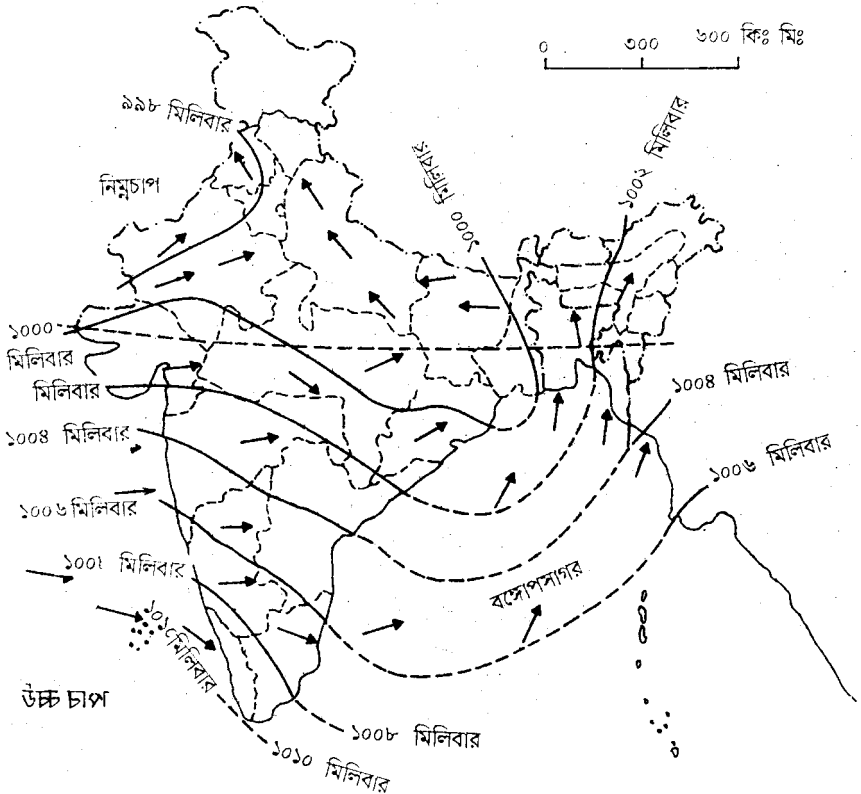


চিত্র ৩২ : জুলাই মাসে বায়ু বলয়গুলির অবস্থান।

দক্ষিণ - পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর যে শাখা আরব সাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তা ভারতের পশ্চিম উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং যে শাখা বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তা পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বাংলাদেশ, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও পাজ্রাবে বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে থাকে।

গ্রীষ্মের প্রথমার্ধে ভারতের সমভূমি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়। এই উত্তাপ মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে যতই বাড়ে ততই ভারতের বিভিন্ন অংশে স্থানীয় নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এই সময় উত্তর ভারত, আসাম এবং পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশে আকস্মিক ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হয়। কিন্তু জুন মাসের মাঝামাঝি পাজ্রার নিম্নচাপ বলয়, অধিক শক্তিসম্পন্ন হওয়ায় জলভরা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর গতিবেগ হঠাৎ বাড়ে এবং নিয়মিতভাবে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশে প্রবেশ করে অকস্মাৎ মৌসুমী বর্ষণ (monsoon bursts) শুরু করে।

দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের উপরে আপেক্ষিকভাবে উষ্ণ এলাকায় ৫০০—১০০ মিলিবার লেভেলে বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর ট্রপোস্ফিয়ার অবস্থিত। এখানে সমুদ্রপৃষ্ঠে

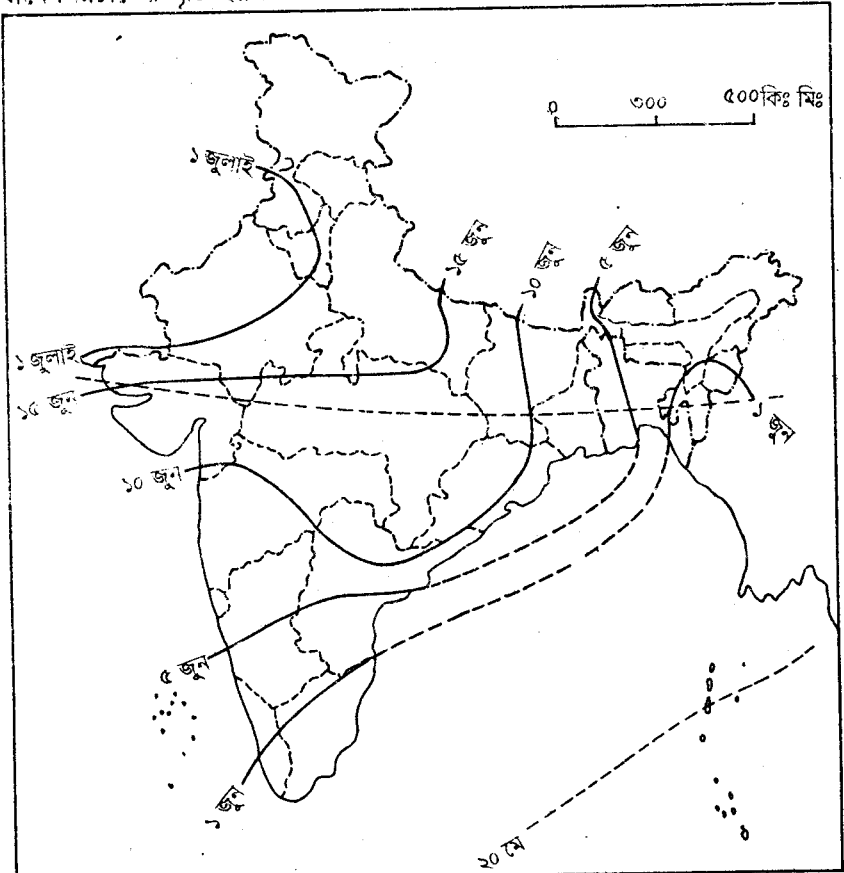


চিত্র ৩.৪ : জুলাই মাসে বায়ু চাপ ও বাতাসের দিক।

চাপের পরিমাণ হয় ১.০১২ মিলিবার যা হচ্ছে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৪.৭ পাউণ্ড বা ছয় কেজি ওজনের সমান। ৫০০—১০০ মিলিবার চাপ থাকে ৬০০০—১৬০০০ মিটার উচ্চতায়।

এশিয়ার মধ্যভাগে গোবি মরুভূমিতে অধিক উত্তাপের জন্য বায়ুর নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। সেজনা চতুর্দিক হতে উচ্চচাপের বায়ু নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়। কিন্তু গোবি মরুভূমির উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে স্থলভাগ থাকায় এই সকল দিকে প্রবাহিত বায়ু শুষ্ক হয়। কেবল দক্ষিণ-পূর্বের ও পূর্বের প্রশান্ত মহাসাগর হতে আর্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। এই সকল বায়ু মহাসাগরের উপর হতে আসে বলে এতে জলীয় বাষ্প থাকে যার ফলে চীন, জাপান ও ইন্দোচিনে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

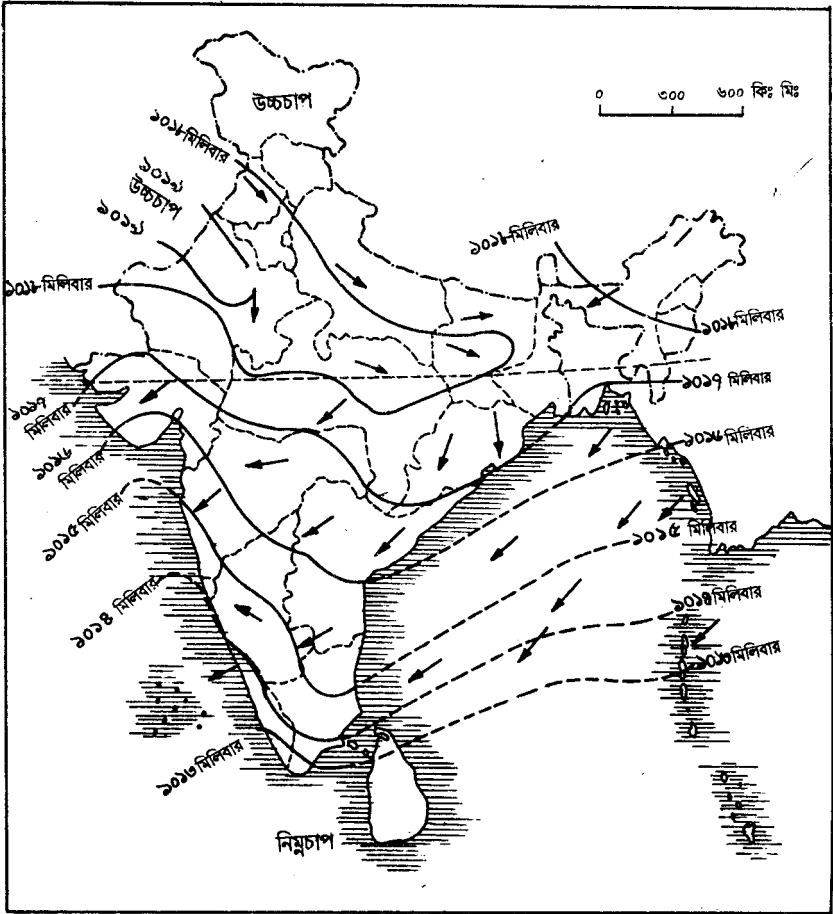
ভূমির উচ্চতার জন্য শীতকালে এশিয়াব পূর্বাংশে অতি উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। ফলে এতদসংশ্লিষ্ট বায়ুপ্রবাহও অতি প্রবল হয়। গ্রীষ্মকালে বেলুচিস্তান হতে রাজস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের উপর আন্তঃক্রান্তীয় অভিসরণ বিরাজ করে। অত্যধিক উত্তাপের জন্য এখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।



চিত্র ৩.৫ : দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আগমন।

দক্ষিণ এশিয়ার গ্রীষ্মকালীন প্রবাহ শীতকালীন প্রবাহ অপেক্ষা অনেক প্রবল। উত্তর গোলার্ধের গ্রীষ্মকালীন আন্তঃক্রান্তীয় অভিসরণ অঞ্চল নিরক্ষীয় অঞ্চল অতিক্রম করে দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু (দক্ষিণ গোলার্ধের) এই নিম্নচাপের দিকে (বেলুচিস্তান-রাজস্থান) আগমন করে। পশ্চিমদ্যে এই উষ্ণ বায়ু প্রচুর জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে থাকে। ফলে এই প্রবাহ হতে বার্মা, বাংলাদেশ ও পূর্ব ভারতে ও পশ্চিম ঘাট পর্বতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বার্মা অতিক্রম করে এই বায়ুর কিয়দংশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পৌঁছে।

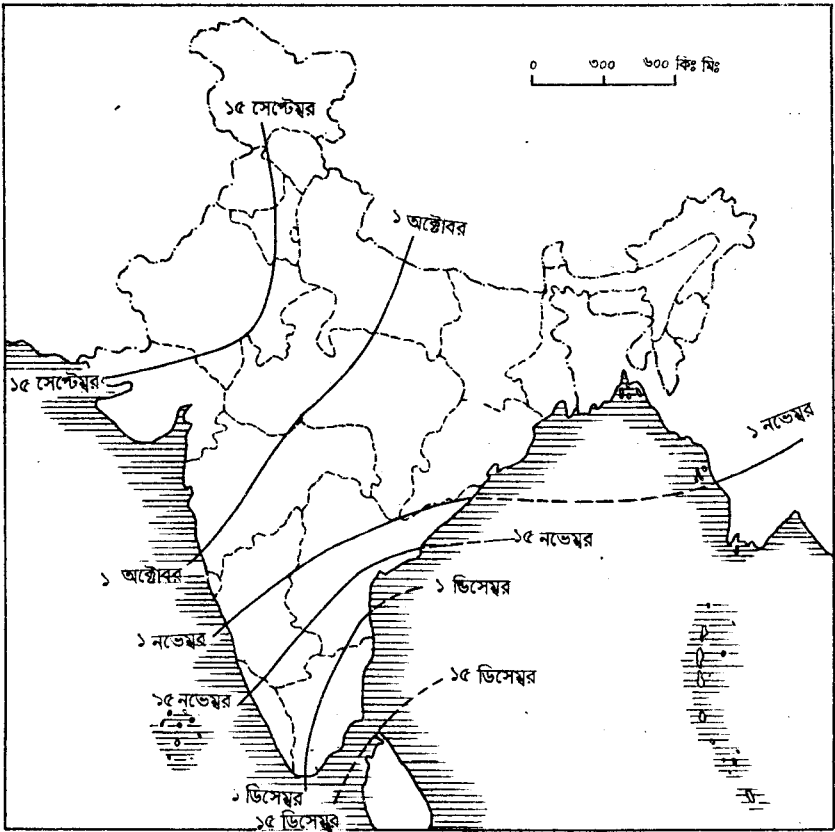
গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে যে সামুদ্রিক মৌসুমী বায়ু প্রবাহ দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবেশ করে তার প্রভাবে পার্বত্য ও পাহাড়ীয়া অঞ্চলে শৈলোৎক্ষেপ জাতীয়



চিত্র ৩.৬ : জানুয়ারি মাসে বায়ু চাপ ও বাতাসের দিক।

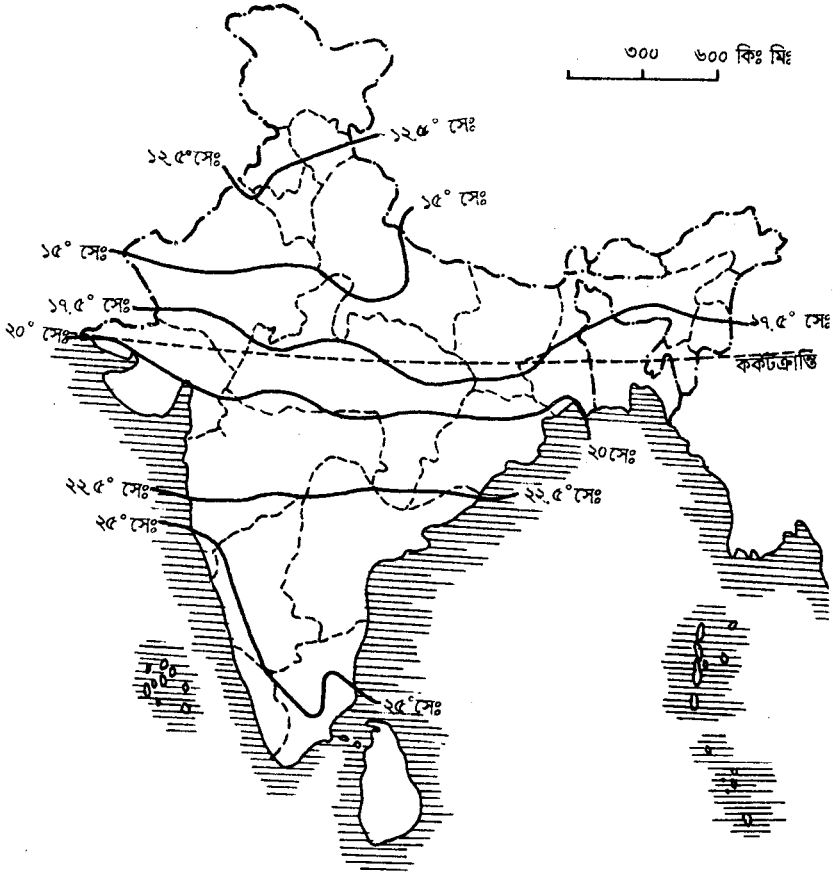
বৃষ্টিপাত হয়। সমতলভূমিতে যে বৃষ্টি হয় তা নিঃসন্দেহে নিম্নচাপজনিত। এই সময় বিপুল সংখ্যক চলমান নিম্নচাপ (কখনও ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন) এই বায়ু প্রবাহের সঙ্গে হামলা করে। আন্তর্ক্রান্তীয় অভিসরণ অঞ্চলের দিকে প্রথম ধাক্কায় আগমন করার সময় (মে মাসের শেষ ভাগে) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহ আকস্মিকভাবে বর্ষণ আরম্ভ করে। সেই সঙ্গে থাকে বায়বীয় গোলযোগ। এই বায়ু প্রবাহের পদার্পণকে 'মৌসুমী বায়ুর বিক্ষোরণ' নামে অভিহিত করা হয় যার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

শীত মৌসুমী : দক্ষিণায়নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর গোলার্ধে শীতকালে (জানুয়ারি মাসে) সূর্য দক্ষিণে মকরক্রান্তির নিকটে সরে যায় এবং লম্বভাবে কিরণ দেয়। সেজন্য মকরক্রান্তির নিকটবর্তী স্থানের যেমন, উত্তর-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায়, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণাংশের উপরিস্থিতি বায়ু উষ্ণ হয় এবং এই সকল স্থানে বায়ুর নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। কিন্তু উত্তর গোলার্ধের পূর্বোক্ত স্থানগুলি, বিশেষত মধ্য এশিয়া



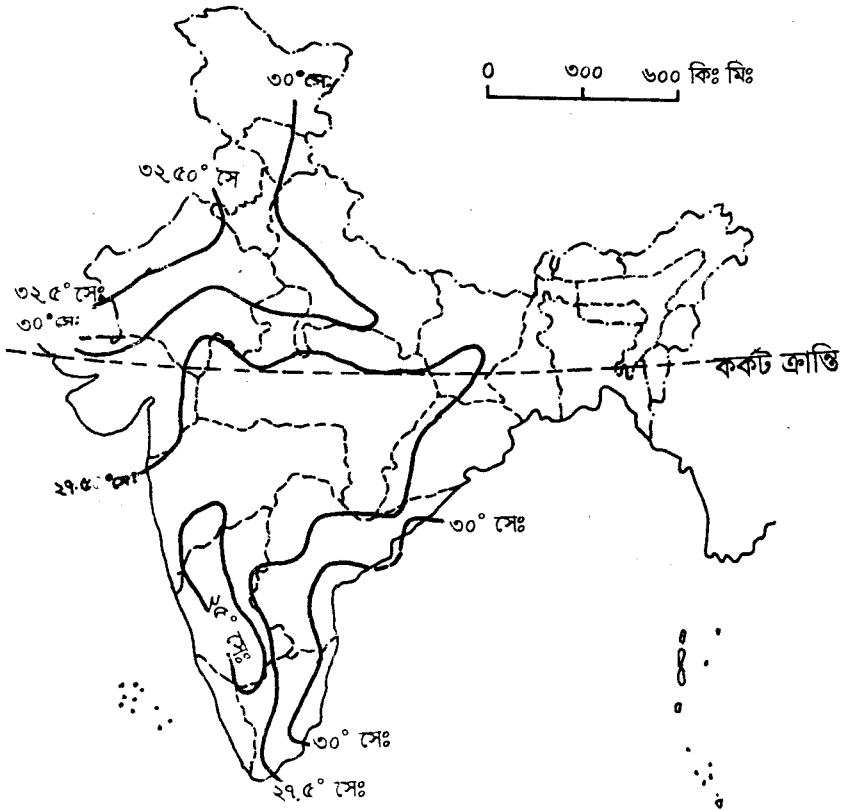
চিত্র ৩.৭ : দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রস্থান।

শীতল থাকে। এই সকল স্থানে বায়ুর চাপ উচ্চ হয়। সুতরাং মধ্য এশিয়ায় স্থলভাগ হতে শীতল শুষ্ক বায়ু সাগরের দিকে প্রবাহিত হয়। ভারতে এটি পাঞ্জাবের উচ্চচাপ বলয় হতে গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্য দিয়ে পূর্ব দিকে সরে এসে পরে উত্তর-পূর্ব দিক হতে প্রবাহিত হয়। একে উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ু বলে। স্থলভাগ হতে আসে বলে এতে বৃষ্টিপাত হয় না। কেবল এর একটি অংশ জাপান সাগর অতিক্রম করে আসার ফলে জাপানে এং বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে তামিলনাড়ু ও শ্রীলংকায় শীতকালেও বৃষ্টিপাত ঘটায়। বর্তমানের গবেষকরা বলেন যে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু যখন প্রত্যাবর্তন করে তখন শীতকালে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টির ফলে তামিলনাড়ু ও শ্রীলংকায় বৃষ্টি হয়। একে প্রত্যাবর্ত (Retreating) মৌসুমী বায়ু বলে। তাঁদের মতে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর ফলে এই অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না। এই মৌসুমী বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম



চিত্র ৩.৮ : জানুয়ারি মাসের গড় তাপমাত্রা।

করে বাম দিকে বেঁকে ভারত মহাসাগর হতে উত্তর-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুরূপে উত্তর অস্ট্রেলিয়ায় প্রচুর বৃষ্টিপাত করে। শীতকালে দক্ষিণ এশিয়ায় উপক্রান্তীয় উচ্চচাপের দুর্বল প্রভাব অনুভূত হয়। এর ফলে আয়ন বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক হতে প্রবাহিত হয়। অবশ্য এই সময় পশ্চিম ভারতে ও পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে ভূমধ্যসাগরীয় শীতল বায়ু প্রবাহ প্রবেশ করে জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চিনের শীতল বায়ু প্রবাহ প্রবেশ করে। এই দুই প্রান্ত ব্যতীত দক্ষিণ এশিয়ার অন্যত্র শীতল বায়ু প্রবাহ উত্তর এশিয়া হতে হিমালয়ে অবস্থানের জন্য প্রবেশ করতে পারে না।

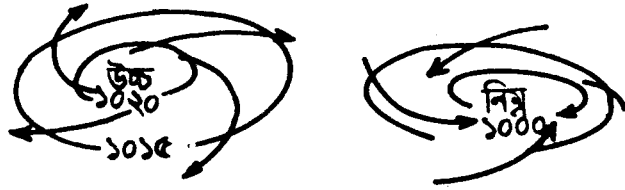


চিত্র ৩.৯ : জুলাই মাসের গড় তাপমাত্রা।

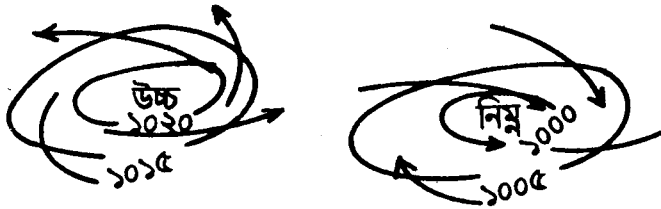
দক্ষিণ এশিয়ায় শীতকালে বায়ু স্থলভাগ হতে আগমন করে বলে এই ঋতুতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অতি নগণ্য। কেবল, যেখানে বায়ু সমুদ্র অতিক্রম করে উপকূলীয় উচ্চভূমিতে বাঁধা পায় সেখানেই বৃষ্টিপাত ঘটায়। এভাবে এ সময় মাদ্রাজ উপকূলে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

অনিয়মিত বায়ু

ঘূর্ণিবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণিবাত : (১) নিম্নচাপ বা ঘূর্ণিবাত (Low or Depression, Cyclones)— মধ্য অক্ষাংশে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে আবহাওয়ার এত দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যে, এই অঞ্চলে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। আবহাওয়ার এই দ্রুত পরিবর্তন এই অঞ্চলের পশ্চিমা বায়ুর সঙ্গে ঘূর্ণিবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণিবাতে ঘন ঘন আগমনের ফলে ঘটে থাকে। এই সকল ঘূর্ণিবাত বা প্রতীপ ঘূর্ণিবাতে একটির সাথে অপরটির কোনোই মিল দেখা যায় না।



উত্তর গোলার্ধ



দক্ষিণ গোলার্ধ

চিত্র ৩.১০ : ঘূর্ণিবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণিবাত।

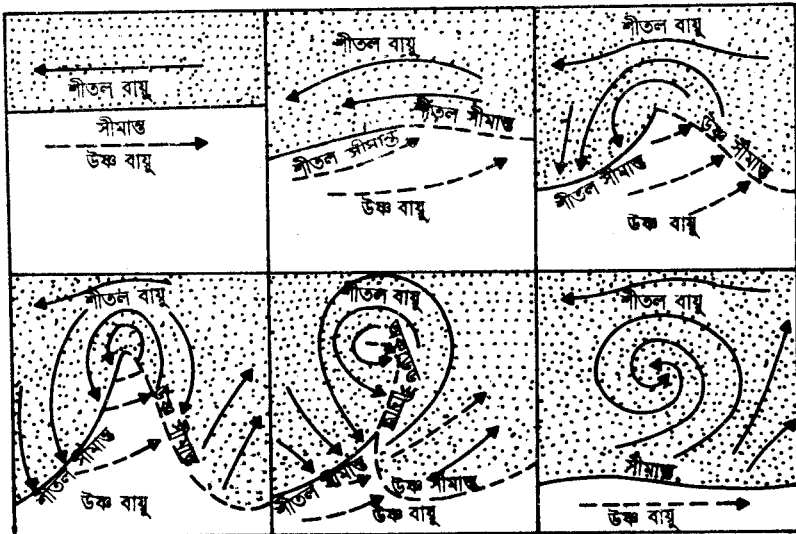
নিম্নচাপবিশিষ্ট ঝড়কে ঘূর্ণিবাত বা ডিপ্রেসন বলে। ঘূর্ণিবাতে কেন্দ্রে নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। চাপের সমতা রক্ষার জন্য চতুর্দিকে উচ্চচাপের শীতল বায়ু ঐ কেন্দ্রের দিকে প্রবল বেগে ধাবিত হয় এবং কেন্দ্রে প্রবেশ করে পর্যায়ক্রমে উষ্ণ ও উর্ধ্বগামী হয়। এই কেন্দ্রমুখী উর্ধ্বগামী বায়ুকে ঘূর্ণিবাত বলে। উত্তর গোলার্ধে এই বায়ু ঘড়ির কাটার বিপরীতক্রমে, অর্থাৎ বামাবর্তে (anticlockwise) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাটার দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণাবর্তে (clockwise) ঘুরতে থাকে। (চিত্র ৩.১০)। কুণ্ডলাকারে ঘুরতে ঘুরতে এটা প্রবাহিত বায়ু পথের দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়। মানচিত্রে কতকগুলো এককেন্দ্রীয় (concentric) বৃত্তাকার বা ডিম্বাকৃতি রেখা দ্বারা ঘূর্ণিবাত দেখানো হয়। এর কেন্দ্রে সর্বনিম্ন চাপ থাকে এবং বাইরের দিকে এই চাপ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। সাধারণত ঘূর্ণিবাতে কেন্দ্রের নিম্নচাপ এবং বাইরের চাপের মধ্যে ১০—২০ মিলিবার পার্থক্য থাকে। শীতকালে ৩৫ মিলিবার বা এক ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাতে উচ্চতা কখনও কখনও ৬ মাইল এবং ব্যাস

১০,০০০ মাইল পর্যন্ত হয়। এটি ঘন্টায় ৪৮—১০৮ কিঃ মিঃ বেগে (৩০—৮০ মাইল) প্রবাহিত হয়। সাধারণ নিম্নচাপ হতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। গভীর নিম্নচাপের সঙ্গে ঝড়ও প্রবাহিত হয়। ঘূর্ণিবাত গড়ে ১০০০ মাইল দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়।

(২) প্রতীপ ঘূর্ণিবাত বা উচ্চচাপ (anticyclones or highs) : হিমমণ্ডল ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অল্প পরিসর স্থানে অধিক শৈত্যের জন্য যদি উচ্চচাপ কেন্দ্রের (highs) সৃষ্টি হয় তবে সেখান হতে বাইরে নিম্নচাপ দিকে শীতল ও শুষ্ক বায়ু প্রবল বেগে কুণ্ডলী আকারে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু প্রবাহ অধঃগামী ও বহির্মুখী হয়। একে প্রতীপ ঘূর্ণিবাত বলে। এর গতি উত্তর গোলাধারে দক্ষিণাবর্তে ও দক্ষিণ গোলাধারে বামাবর্তে হয়। (চিত্র ৩.১০ (খ))। প্রতীপ ঘূর্ণিবাতে কেন্দ্রীয় উচ্চচাপ হতে বাইরের দিকে চাপ ক্রমশ কমে যায় এবং এই দুই অংশেও চাপের পার্থক্য ১৭ মিলিবার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ঘূর্ণিবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণিবাতে গতি ও প্রবাহ : এরা মধ্য-অক্ষাংশে পশ্চিম বায়ুর সাথে বায়ুর উচ্চস্তর দিয়ে মোটামুটি পশ্চিম হতে পূর্বে ধেয়ে যায়। এদের গমন পথকে ঘূর্ণিবাতে গতি (cyclonic track) বলে। সূর্যের উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নের সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণিবাতে গতিপথও যথাক্রমে কিছু উত্তরে ও দক্ষিণে সরে যায়। ঘূর্ণিবাতে গতি গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে অধিক থাকে। ফলে গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

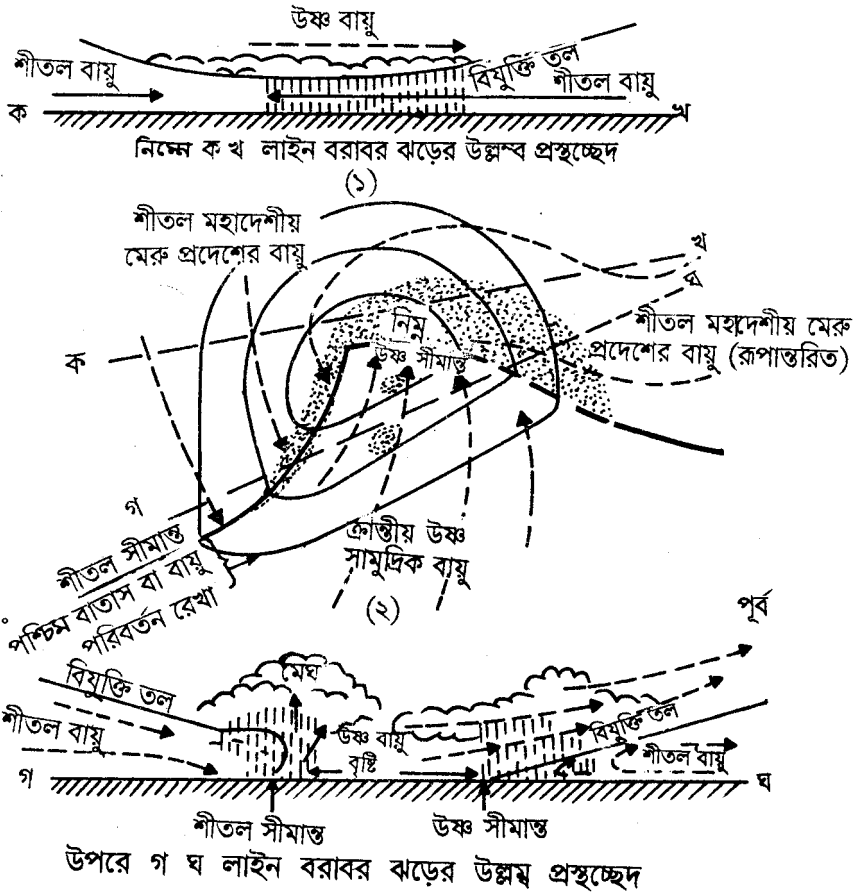
ঘূর্ণিবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণিবাতে উৎপত্তি ও গঠন : একই কেন্দ্রমুখী সম্পূর্ণ ভিন্ন উচ্চতা ও ঘনত্ব বিশিষ্ট দু'টি বায়ুস্রোত পরস্পরের সন্নিহিতে অবস্থান করলে তাদের



চিত্র ৩.১১ : ঘূর্ণিবাতে জীবন-চক্রের ছয়টি পর্যায়

স্পর্শতলে বা সীমান্তে তরঙ্গের মাধ্যমে কিছুটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এই আলোড়ন থেকেই ঘূর্ণিবাতের উৎপত্তি হয়ে থাকে। তাই পৃথিবীর যেসব অঞ্চলে এরূপ আনুভূমিক ভিন্ন উষ্ণতায়ুক্ত বায়ুপুঞ্জ পরস্পরের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয় সেসব অঞ্চলেই ঘূর্ণিবাতের সৃষ্টি হয়। (চিত্র ৩.১১)।

ঘূর্ণিবাতের উৎপত্তির বিভিন্ন পর্যায় দেখানো হয়েছে। সর্ব প্রথম দু'টি ভিন্নধর্মী বায়ু পরস্পরের বিপরীতে অবস্থান করে এবং এই দুই বায়ুপুঞ্জের সীমান্তে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এরপর উষ্ণ বায়ুপুঞ্জের কিয়দংশ শীতল বায়ুপুঞ্জের অভ্যন্তরে বক্রাকারে (bulge) চুকে পড়ে। দক্ষিণ ও পূর্বে ক্রান্তীয় সামুদ্রিক অঞ্চলের উষ্ণ আর্দ্র বায়ু মেরু অঞ্চলের দিকে অভিক্ষিপ্ত হয়। এই বায়ু (উষ্ণ ও আর্দ্র) পশ্চিম-উত্তরে এবং উত্তর-পূর্বে ঠণ্ড ও শীতল বায়ু দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। আরও কিছুদূর অগ্রসর হলে দেখা যায় উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুর



চিত্র ৩.১২ : একটি আদর্শ ঘূর্ণিবাতের বিভিন্ন অংশের প্রস্থচ্ছেদ।

এক অংশ (উষ্ণ বায়ু লঘু বলে) শীতল বায়ুর উপর তির্যকভাবে উঠে গেছে এবং অপর অংশ শীতল বায়ুর উপর উঠতে সাহায্য করছে। এরূপ উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুরাশি শীতল বায়ুর উপর উঠলে তা ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। (চিত্র - ৩.১২)।

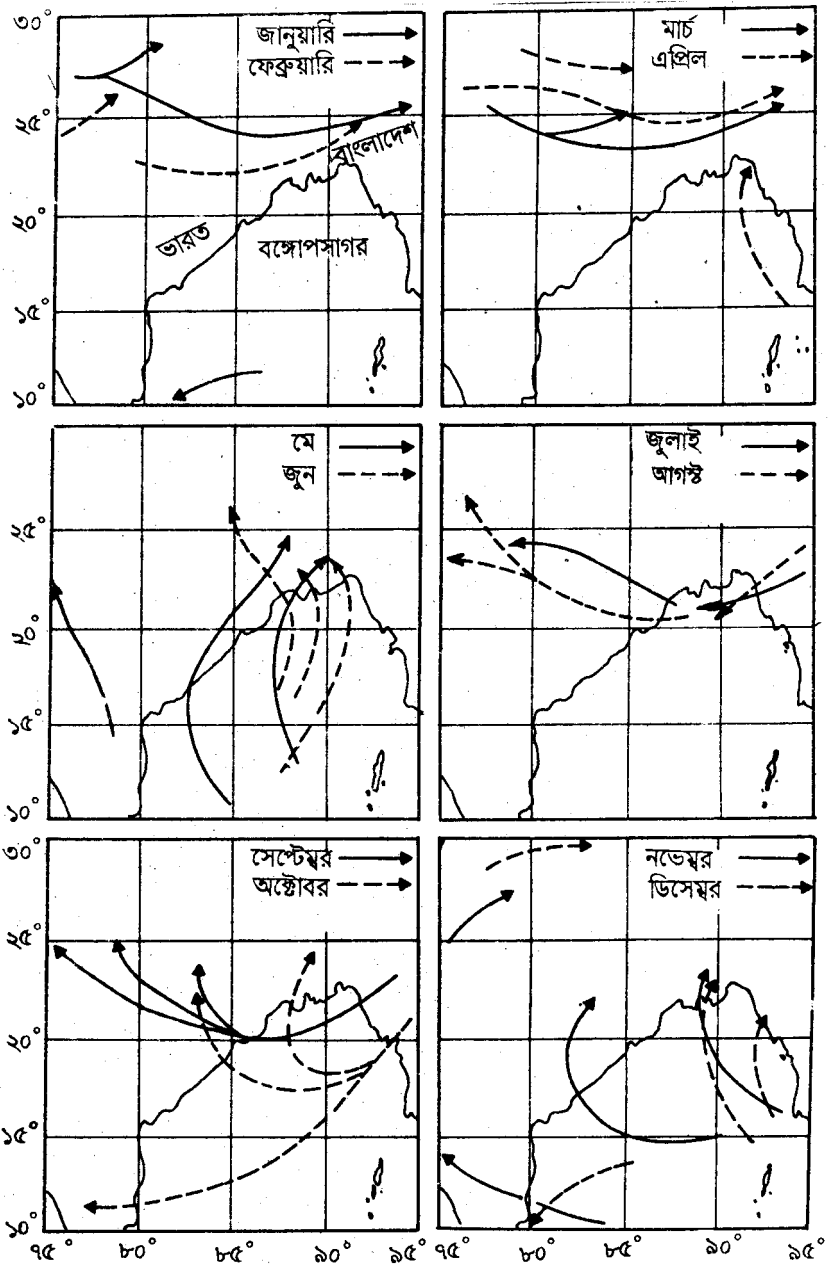
এই দুই ভিন্নধর্মী বায়ুপুঞ্জের উষ্ণ বায়ু যেখানে শীতল বায়ুর মধ্যে বেকে ঢুকেছে সেই সীমান্তকে উষ্ণ সীমান্ত (warm front) এবং বায়ু রাশির পশ্চাতে যেখানে শীতল বায়ু এসে উষ্ণবায়ুকে আঘাত করে, সেই সীমান্তকে শীতল সীমান্ত বলে (cold front)। এ অংশে শীতল বায়ু অধিক উদ্যোগী হয় এবং এটি উষ্ণ বায়ুকে উপরে উঠতে বাধ্য করে। সাধারণত এই শীতল সীমান্ত উষ্ণ সীমান্ত অপেক্ষা অধিক দ্রুত অগ্রসর হয় এবং অচিরেই উষ্ণ সীমান্তকে ধরে ফেলে। এরূপ অবস্থায় মধ্যবর্তী উষ্ণ বায়ু ভূ-পৃষ্ঠ হতে উর্ধ্বে উঠে পড়ে। একে অক্লুশান (occlusion) বলে। এর পরবর্তী পর্যায়ে ঘূর্ণিবাত ক্রমশ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকে এবং শীতল সীমান্তে অবস্থান করে।

প্রতীপ ঘূর্ণিবাত সাধারণত শীতল জল বা স্থলভাগের উপর উচ্চচাপ সৃষ্টির ফলে গড়ে উঠে। সুরতায় শীতকালে এটি স্বভাবতই মধ্য ও উচ্চ অক্ষাংশে গঠিত হয়। নিম্ন মধ্য অক্ষাংশে উপ-ক্রান্তীয় অঞ্চলে ধীরগতিসম্পন্ন উষ্ণ প্রতীপ ঘূর্ণিবাত গঠিত হয়। এদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা যায়নি।

মৌসুমী বায়ু প্রবাহের সময় ভারতে যখন প্রচণ্ড নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়, তখন নিরক্ষীয় অঞ্চলের ইন্টারট্রপিক্যাল কনভার্জেন্স (ITC) ঘূর্ণিবাত বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থান করে এবং তারপর ধীরে ধীরে পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমে ধাবিত হয়। ক্রান্তীয় অঞ্চলের এই দুর্বল ঘূর্ণিবাতগুলি বৃষ্টিপাত ঘটায়। অনেক সময় ঘূর্ণিবাত অল্পপরিসরে অনেক দিন স্থায়ীভাবে অবস্থান করলে সেখানে বন্যার সৃষ্টি হয়। আসাম ও বাংলাদেশে এ কারণে প্রায়ই বন্যা হয়ে থাকে।

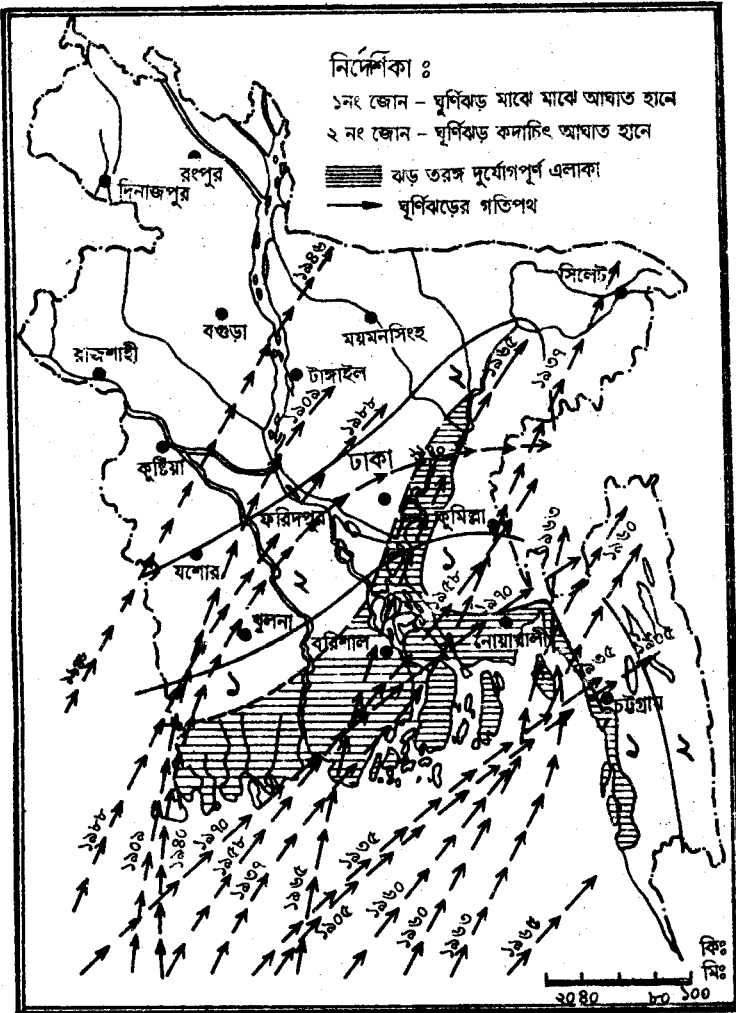
বাংলাদেশে কালবৈশাখী

চৈত্র-বৈশাখ মাসে কখনো কখনো এমন হয় যে, দুপুরের দিকে অসহ্য গরম পড়ে আর তার ফলে সারা দেহ থেকে ঘাম ঝরতে থাকে। সকাল থেকে আকাশ মোটামুটি পরিষ্কারই থাকে, কিন্তু ক্রমশ দুপুরের দিকে পশ্চিম আকাশের দিকচক্রবালে ঘন কালো মেঘের আভাস দেখা যায়। আন্তে আন্তে এই মেঘ আকাশের ওপরের দিকে ওঠে। এর পরে দ্রুত সারা আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যায় এবং উত্তর-পশ্চিম দিক হতে প্রচণ্ড বেগে ঝড় বইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় বজ্র-বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত, শিলাবৃষ্টি। ঘন্টাকানেক এ রকম চলার পরে ঝড়ের তীব্রতা কমতে আরম্ভ করে, আর বৃষ্টিপাতও ক্রমশ কমতে থাকে। তাপমাত্রাও কমে যায়, ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। এই রকম বিকেলের দিকে বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল ঝড় ও বৃষ্টিপাতকে আমরা কালবৈশাখী বলে থাকি। মাঝে মাঝে এই রকম ঝড় এত প্রবল হয় যে, ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ে এবং গাছপালা উৎপাটিত হয়। বাংলাদেশে মার্চ মাসে গড়ে ৪টি, এপ্রিল মাসে ৮টি মে মাসে ১২টি কালবৈশাখীর ঝড় হয়ে থাকে।



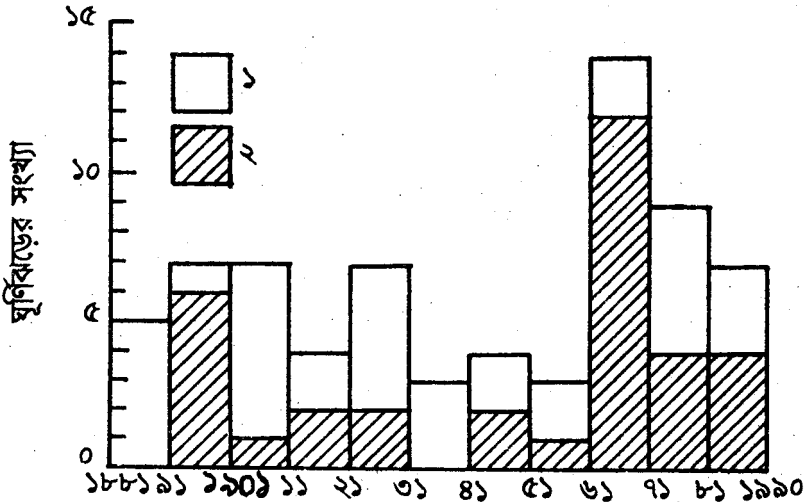
চিত্র ৩.১৩ : ঘূর্ণিবাত জনিত বিপর্যয়ের অনুসৃত গমন পথসমূহ।

বাংলাদেশে মার্চ থেকে মে মাসে উত্তরোত্তর উষ্ণতা চলতে থাকে। সূর্য যখন কর্কটক্রান্তির কাছে লম্বিকরণ দেয় গাঙ্গেয় উপত্যকায়, তখন তাপমাত্রা $30-35^{\circ}$ সেলসিয়াস। এই উত্তাপের আধিক্যেতু শুষ্ক গ্রীষ্মে বায়ুচাপ খুব কমে যায়। কারণ বাতাস ক্রমাগত গরম হয়ে আকাশের দিকে উঠে যায়। উর্ধ্বগতি বাতাসের শূন্য স্থান পূর্ণ করতে ক্রমাগত বঙ্গোপসাগর থেকে উষ্ণ-আর্দ্র অস্থির বায়ু বাংলা অববাহিকায় প্রবাহিত হয় মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসের শেষ পর্যন্ত। তার উপর আন্তঃক্রান্তীয় বায়ু সন্মিলন অঞ্চল (Inter Tropical Convergence Zone) এ সময় বিশ্ব রেখা



চিত্র ৩.১৪ : ঘূর্ণিঝড় ও ঝড়-তরঙ্গ দুর্যোগপূর্ণ এলাকা।

থেকে উত্তরে সরে এসে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যাংশে অবস্থান করতে শুরু করে। এটা চলে মার্চ-জুলাই মাস পর্যন্ত। শীতকালে উত্তর ভারতে সিন্ধু-গাঙ্গেয়-ব্রহ্মপুত্রের উপর দিয়ে, মাটির ২ মাইল উপর দিয়ে পশ্চিমা 'জেট' নামক এক অতি দ্রুত শক্তিশালী বায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ু প্রবাহটি উত্তর ভারতীয় উপত্যকার উপর থেকে তিব্বতের উত্তরে সরে যাবার জন্য তৈরি হয় মার্চ-মে মাসে। জুন মাসে 'জেট' বায়ু প্রবাহটি তিব্বতের উত্তরে চলে যায় তখনই ভারত ও বাংলাদেশে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বাংলাদেশে মার্চ থেকে মে মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক।



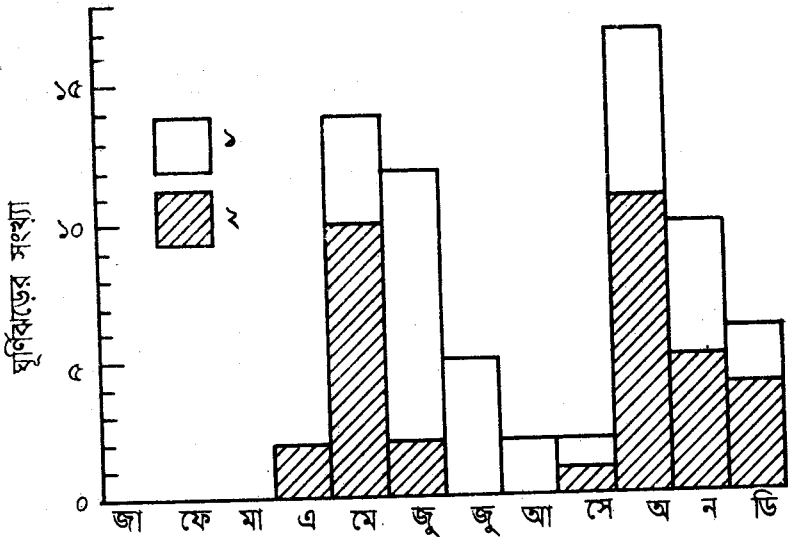
চিত্র ৩.১৫ : ১৮৮১-১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় অবতরণের সংখ্যা।

যে ঝড় ঝঞ্ঝার দ্বারা মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসে বাংলার অববাহিকায় বৃষ্টি হয় তাকে আমরা 'কালবৈশাখী' বলি। এদেশে ১০ মিনিট স্থায়ী কালবৈশাখীও হয়। তবে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সঙ্গে কালবৈশাখীর ঝড়বৃষ্টির প্রধান পার্থক্য এই যে, কালবৈশাখী মৌসুমী বাদল ধারার মত রোজ রোজ আসে না। কালবৈশাখী ঝড় একটি আদর্শ পরিচলন বৃষ্টিপাতের উদাহরণ। যেসব কালবৈশাখীর ঝড় ও বৃষ্টি বাংলাদেশের বিশাল অংশে প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসলীলা ঘটায়, তা সর্বদাই ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় (tropical cyclones)। সেগুলি বঙ্গোপসাগর থেকে আমাদের দেশে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়। শুষ্ক উত্তর পশ্চিমা বায়ু প্রবাহ যা গাঙ্গের উপত্যকা বেয়ে বাংলায় নেমে আসে তার উপরে জমে ওঠে বঙ্গোপসাগরের উষ্ণ আর্দ্র দক্ষিণ বায়ু। ফলে আবহাওয়া স্তরে তাপমাত্রা ভূপৃষ্ঠ থেকে আকাশের দিকে অতি দ্রুত হারে কমে যায়।

ক্রান্তীয় উষ্ণমণ্ডলীয় ঝড়ে নিম্নচাপ কেন্দ্রই প্রধান, তার দিকেই চারিপাশ থেকে বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। কিন্তু ক্রান্তীয় অঞ্চলে সববায়ুপ্রবাহই প্রধানত উষ্ণ, হয়তো

একটি উষ্ণ ও আর্দ্র আর আরেকটি উষ্ণ ও শুষ্ক। কিন্তু ফ্রন্ট তৈরি করার মত তাপমাত্রার পার্থক্য এতে দেখা যায় না। বায়ুর গতিবেগ অনুযায়ী এই রকম ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়গুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায় (১) দুর্বল শান্ত প্রকৃতির (২) ক্রান্তীয় নিম্নচাপ সংক্রান্ত ঝড় (৪০ কিলোমিটার)। বাংলাদেশে মৌসুমী বৃষ্টিপাত বেশিরভাগই এ জাতীয় ডিপ্রেসনের মাধ্যমে ঘটে। (৩) ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়- বাতাসের গতিবেগ ৪—১২০ কিলোমিটার থাকে। কালবৈশাখীর অনেকগুলোই এই জাতীয় ঘূর্ণিঝড় যেগুলো বঙ্গোপসাগর থেকে উঠে এসে বাংলার অববাহিকায় প্রলয়ঙ্করী গতিতে প্রবাহিত হয়। বায়ু প্রবাহের গতিবেগ যত বেশি হবে সেই ঘূর্ণিঝড় ততই ধ্বংসকারী হয়ে উঠবে। (৪) সবচেয়ে ভয়াবহ ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়- টাইফুন (তুফান), টর্নেডো বা হারিকেন যাতে বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ সর্বদা ঘন্টায় ১১৯ কিলোমিটারের বেশি।

কালবৈশাখী শুরু হয় অল্প ঝোড়ো হাওয়া, অল্প শিলাবৃষ্টি দিয়ে আর দশ মিনিটের অঝোর ধারায় সকলকে হতচকিত করে বিদায় নেয়। কালবৈশাখীর ঝড়গুলো আসে যেমন হঠাৎ তেমনি বজ্র বিদ্যুৎ সহকারে অঝোরে শীতল বৃষ্টি ও কখনো বা শিলাবৃষ্টি ঝড়িয়ে অকস্মাৎ উধাও হয়ে যায়। ততক্ষণে তাপমাত্রাও খুব কমে যায় এবং নীলাকাশে ফুরফুরে বাতাসে সকলেরই মন হয়ে উঠে প্রফুল্ল, অল্পক্ষণ আগের বিপর্যয়কারী ঝড়বৃষ্টির কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। এর থেকে বোঝা যায় যে, কালবৈশাখীর বৃষ্টিপাত প্রধানত পরিচলন জাতীয়, যদিও ঘূর্ণিবাতজনিত বৃষ্টিপাতও কালবৈশাখীর কালে প্রচুর হয়ে থাকে।



চিত্র ৩.১৬ : ১৯৭৭-৯০ সময়ে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে যেসব ঘূর্ণিঝড় আঘাত
হেলেছে সেসবের মাসিক বিস্তরণ।

পরিচলন বৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, সারাদিন লব্ধ সূর্য কিরণের ফলে উচ্চ উত্তাপ সৃষ্টি হয়, উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ থেকে অনবরত আকাশমুখী বায়ুপ্রবাহ (convection) চলতে থাকে ও আকাশচুম্বী “কিউমুলোনিম্বাস” (cumulanimbus) অর্থাৎ দীর্ঘতম মেঘের সৃষ্টি হয়। এই সুবিশাল মেঘ সৃষ্টি হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা ও তুষার কণা দিয়ে। এ রকম মেঘ থেকে বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত ঘটে ও ঝড় বইতে থাকে। এই মেঘের শীর্ষদেশ ১০—১২ কিলোমিটার পর্যন্ত উঁচু হতে দেখা যায়। শুধু এই রকম মেঘ তৈরি হলেই কালবৈশাখীর বজ্র-বিদ্যুৎসহ ঝড় ও বৃষ্টিপাত সম্ভব। মেঘের মধ্যে বাতাসের অনর্গল উর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে বরফ কুচিগুলির ধারে ধারে জলকণাগুলো জমে শিলা তৈরি হতে থাকে। ক্রমে শিলাখণ্ডগুলো আরো জলকণা জমায়ে ক্রমশ বড় হতে হতে মার্বেলগুলোর আকার ধারণ করে। বিকালের দিকে কালবৈশাখী ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়। তখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ফলে শিলাখণ্ডগুলো কিউমুলোনিম্বাস মেঘ থেকে বৃষ্টির জলধারার সঙ্গে পৃথিবীর দিকে নামতে শুরু করে। অনেকটাই গলে যায় বলে এই বৃষ্টি হয় প্রচণ্ড শীতল। এজন্যে প্রায়শই কালবৈশাখীর ঝড়ের সঙ্গে শিলাবৃষ্টি হয়ে থাকে। শিলাবৃষ্টি আম, তরমুজ, ধান ক্ষেতের প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করে।

আবহাওয়াবিদরা কালবৈশাখীর ঝড়গুলোকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যানুযায়ী চারটি ভাগে ভাগ করেছেন :

(১) দিনের যে কোনো সময়ে হতে পারে কারণ এগুলো শীতলফ্রন্টের গতিপথের উপর নির্ভরশীল যা পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এগুলো ভূমধ্যসাগর থেকে হিমালয় দিয়ে সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকা ধরে পূর্ব মুখে ধাবিত হয়ে স্বল্প বৃষ্টিপাত ঘটায়।

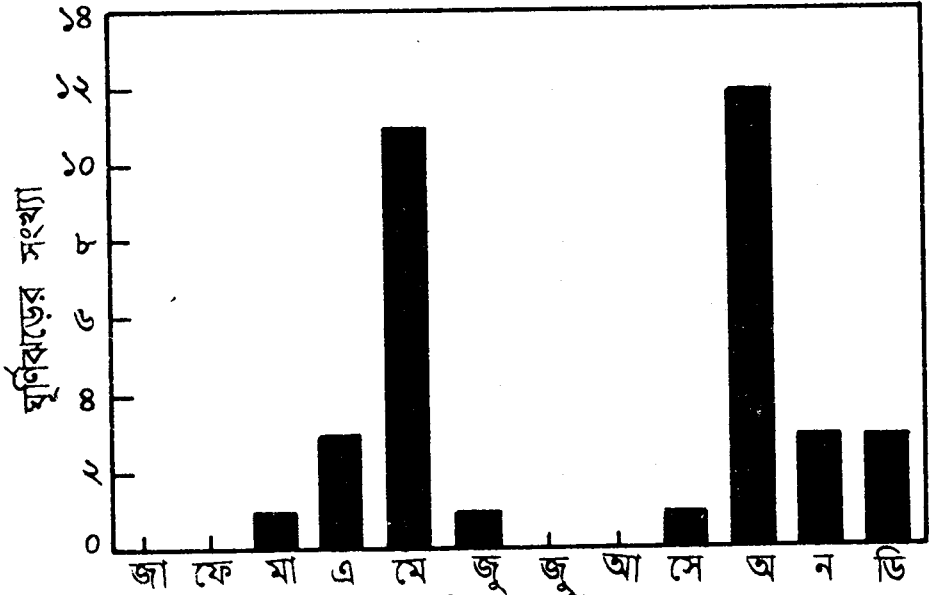
(২) যেসব কালবৈশাখী ঝড় বঙ্গোপসাগর থেকে উদ্ভিত নিম্নচাপঘটিত ঝঞ্ঝার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেসব ঝড় সামুদ্রিক কূল থেকে এসে যে কোনো দিকে বিধ্বংসী কাজ চালাতে পারে।

(৩) যে সমস্ত ঝঞ্ঝা ভোর রাতে বাংলা অববাহিকার পূর্ব ও উত্তর সীমান্ত ধরে, আসাম ও দক্ষিণ পূর্বের পাহাড়ের শীতল বায়ুর স্পর্শে সৃষ্টি হয়, যার ফলে মালার মতন বজ্রবিদ্যুৎ সহযোগে ঝঞ্ঝাগুলো সংঘটিত হতে থাকে।

(৪) বিকেলের দিকে যে সব ঝড় হয়, এগুলো পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ও বাংলাদেশে পূর্বে পশ্চিমে বিস্তৃত নিম্নচাপ বলয় যেখানে শেষ হয় তার সঙ্গে সম্পর্কিত। বাংলাদেশের ৭০—৮০% কালবৈশাখীর ঝড়ই এই প্রকার।

কালবৈশাখীর জনাত্ত : আবহাওয়াবিদরা দুই দলে বিভক্ত হয়েছেন এ ব্যাপারে। যেমন প্রথম দল মনে করেন যে, কালবৈশাখী ঝড়ের সূচনার কারণগুলো হচ্ছে (১) সূর্যকিরণজনিত উত্তাপ, (২) শীতল বায়ুর বিভিন্নমুখী বহির্প্রবাহ (divergence) যার ফলে হাতের আঙুলের মতন মূল ঝড়টি থেকে বিভিন্ন দিকে ঝড় শুরু হয়, (৩) পশ্চিমা ঝড়গুলির পূর্বমুখী গতিপথ, যদিও এই ঝঞ্ঝাগুলো ভারতে পৌঁছে প্রায় শেষ পর্যায়ে। এই আবহাওয়াবিদগণ মনে করেন যে, শুষ্ক পশ্চিমা ও উত্তর পশ্চিমা বায়ু প্রবাহ উর্ধ্বকাশে আর্দ্র ও শীতল হয়ে যায়, বৃষ্টির বাষ্পীভবনের ফলে এবং শীতল বায়ু হিসেবে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। যখন উচ্চ উত্তাপের ফলে কালবৈশাখী ঝড়

গুরু হয়, তখন উপর থেকে এই শীতলবায়ু প্রবাহের ফলে উত্তর পশ্চিমে বা দক্ষিণ পূর্বে আরো কালবৈশাখীর ঝড় উঠতে পারে- যেগুলোর মধ্যে অবশ্যই সময়ের ব্যবধান দেখা যাবে। যদিও সূর্য উত্তাপ প্রয়োজনীয়, তবুও কালবৈশাখীর প্রচণ্ড শক্তি শুধু এই একটি শক্তির উৎস দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় না। ভূপৃষ্ঠে দুই বিপরীতধর্মী বায়ুপ্রবাহের সম্মিলনই কালবৈশাখীর জন্ম দিতে সক্ষম। তবে সকালে বায়বীয় মিলনের সঙ্গে সাক্ষ্য কালবৈশাখীর যোগসূত্র নাও থাকতে পারে।



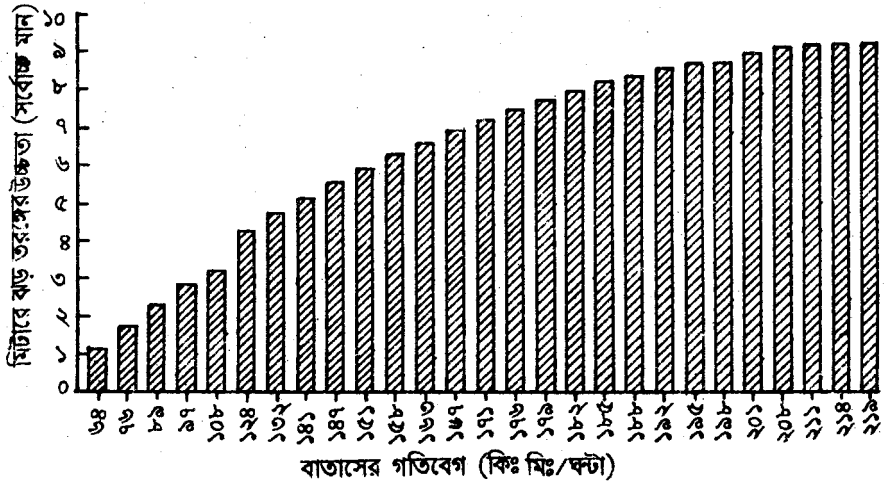
চিত্র ৩.১৭ঃ বাংলাদেশে আঘাতকারী ৩৫টি মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়ের (১৮৯৩-১৯৮৫)

মাসিক বিস্তরণ।

দ্বিতীয় দল মনে করেন যে, ভূপৃষ্ঠে বিপরীতধর্মী বায়ুপ্রবাহের সম্মিলনের উপরে উর্ধ্বাকাশে বায়ুর বহির্মুখী প্রবাহই কালবৈশাখীর মত উর্ধ্বমুখী ঝড়ঝঞ্ঝা (convectonal storm) সৃষ্টিতে সক্ষম। তাদের মত হলো এই যে, আকাশে বায়ুর বহির্মুখী প্রবাহ বিভিন্ন কারণে হতে পারে- পশ্চিমা জেট বায়ু প্রবাহ কিংবা একটি 'জেট স্ট্রীম' সংশ্লিষ্ট লম্বাকৃতি নিম্নচাপ কেন্দ্র (trough) অর্থাৎ একটি দীর্ঘাকৃতি নিম্নচাপ কেন্দ্র, এমনকি একটি উচ্চ চাপবিশিষ্ট ঘূর্ণি ও তার সঙ্গে ভূপৃষ্ঠে বিভিন্নধর্মী বায়ুর সম্মিলন—এরকম বহু কারণেই কালবৈশাখী হতে পারে। এ সম্পর্কে গবেষণায় দেখা যায়, উত্তর ভারতে মার্চ থেকে মে মাসে, মাটি থেকে ১২ কিলোমিটার উপরে পশ্চিমা 'জেটস্ট্রীম' কেন্দ্রীভূত থাকে ২৭° উত্তর অক্ষাংশের উপর। গাঙ্গেয় পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশে কালবৈশাখীর ঝড় অনেক সময়ই 'জেটস্ট্রীমের' অবস্থান ও ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুপ্রবাহের সম্মিলনের উপর নির্ভর করে।

আশ্বিনে ঝড় : বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক ঝড় : আবহাওয়া রেকর্ডে দেখা যায় নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বর্ষ মওসুম পরবর্তী ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ ঘটনা। এই ঘূর্ণিঝড়গুলোর আয়ু হয় ৫ থেকে ৭ দিন। এগুলো আরো প্রবল হয়, দূর সমুদ্র থেকে এগুলো ব্যাপক দূরত্ব অতিক্রমের পর অতিরিক্ত শক্তি সংগ্ৰহ করে আঘাত হানে। বর্ষা পরবর্তী ঘূর্ণিঝড়গুলো উত্তর-পশ্চিম দিক লক্ষ্য করে উপকূলের দিকে এগুতে থাকে। তাই এগুলো বাংলাদেশ অথবা ভারতে আঘাত হানে। বাংলা সাহিত্যে এ সময়কার ঝড়কে 'আশ্বিনে ঝড়' বলা হয়।

গভীর সমুদ্রে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়গুলো যে উপকূলীয় এলাকার দিকে ছুটে আসে তারও কারণ আছে। ঘূর্ণিঝড়গুলোর নিরক্ষ রেখা থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রবণতা আছে। উত্তর গোলার্ধে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় উত্তরমুখী হয়, দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণমুখী।



চিত্র ৩.১৮ : বাতাসের গতিবেগ এবং ঝড়-তরঙ্গের উচ্চতার সম্পর্ক।

সামুদ্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য তিনটি শর্ত অপরিহার্য যথা (১) ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য যে কোনো মাত্রার করিওনিস কোর্স (পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে সৃষ্ট শক্তি/বল) অপরিহার্য। নিরক্ষ রেখায় এই কোর্সের মাত্রা হচ্ছে শূন্য। এ কারণেই নিরক্ষ রেখার উভয় দিকে ৫ ডিগ্রী পর্যন্ত অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় না।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপ। সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াসের চেয়ে বেশি হতে হবে।

তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, বায়ুমণ্ডলের উইণ্ড শেয়ার অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকে বিভিন্ন পর্যায়ের বাতাসের গতিবেগের মধ্যে ন্যূনতম পার্থক্য। এই বৈশিষ্ট্য অত্যধিক

তাপ সৃষ্টি করে এবং প্রচুর অর্দ্রতা ধারণ করে। ফলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে বাতাস নিম্নচাপের মধ্যবর্তী কেন্দ্রের দিকে ছুটে আসে। ছুটে আসে ঘূর্ণনের মধ্য দিয়ে। ফলে সৃষ্টি হয় ঘূর্ণিঝড় (চিত্র ৩.১৩)।

ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের ইতিবৃত্ত : বাংলাদেশ বিশেষ করে এর উপকূলীয় অঞ্চলে ঝড়-জলোচ্ছ্বাস একটি নিয়মিত ঘটনা। ১৯৯০ সালের স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ার বুক অব বাংলাদেশে ১৭৯৭ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল সময় পর্যন্ত ৬০টি ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এইসব ঝড় জলোচ্ছ্বাসে প্রায় সবগুলো উপকূলীয় জেলাসমূহ এবং মেঘনার মোহনা অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

১৭৯৭ সালে ঝড়-জলোচ্ছ্বাস হয় মে-জুন মাসে। চাটগাঁয় আঘাত হেনে এই ঝড় সকল কাঁচা ঘর বিধ্বস্ত করে ফেলে। বন্দর এলাকায় দু'টি জাহাজ নিমজ্জিত হয়েছিল।

১৮২২ সালের মে মাসে ঝড় আঘাত হেনেছিল বরিশাল জেলায়। এই ঝড়ে প্রায় ৪০ হাজার মানুষ ও এক লাখ গবাদি পশুর প্রাণহানি ঘটে।

১৮৭৬ সালের অক্টোবর মাসে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়সহ ১৪, ১৫ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস মেঘনার মোহনায় আঘাত হেনে হাতিয়া, নোয়াখালী, পটুয়াখালী ও চট্টগ্রামের উপকূল এলাকা তলিয়ে দিয়েছিল। সরকারী রেকর্ডে উল্লেখ আছে, জলোচ্ছ্বাসের ফলে বিপুলসংখ্যক মানুষের প্রাণহানি ও বিপুল পরিমাণ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

১৮৯৭ সালের অক্টোবর মাসে জলোচ্ছ্বাসসহ প্রচণ্ড হ্যারিকেন চট্টগ্রাম ও কুতুবদিয়া দ্বীপে আঘাত হেনেছিল। উপকূলবর্তী মূল ভূখণ্ডের গ্রামগুলো বিধ্বস্ত হয়েছিল। নিহত হয়েছিল ১৪ হাজার মানুষ। ঘটনা পরবর্তী মহামারীতে আরো ১৮ হাজার ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে।

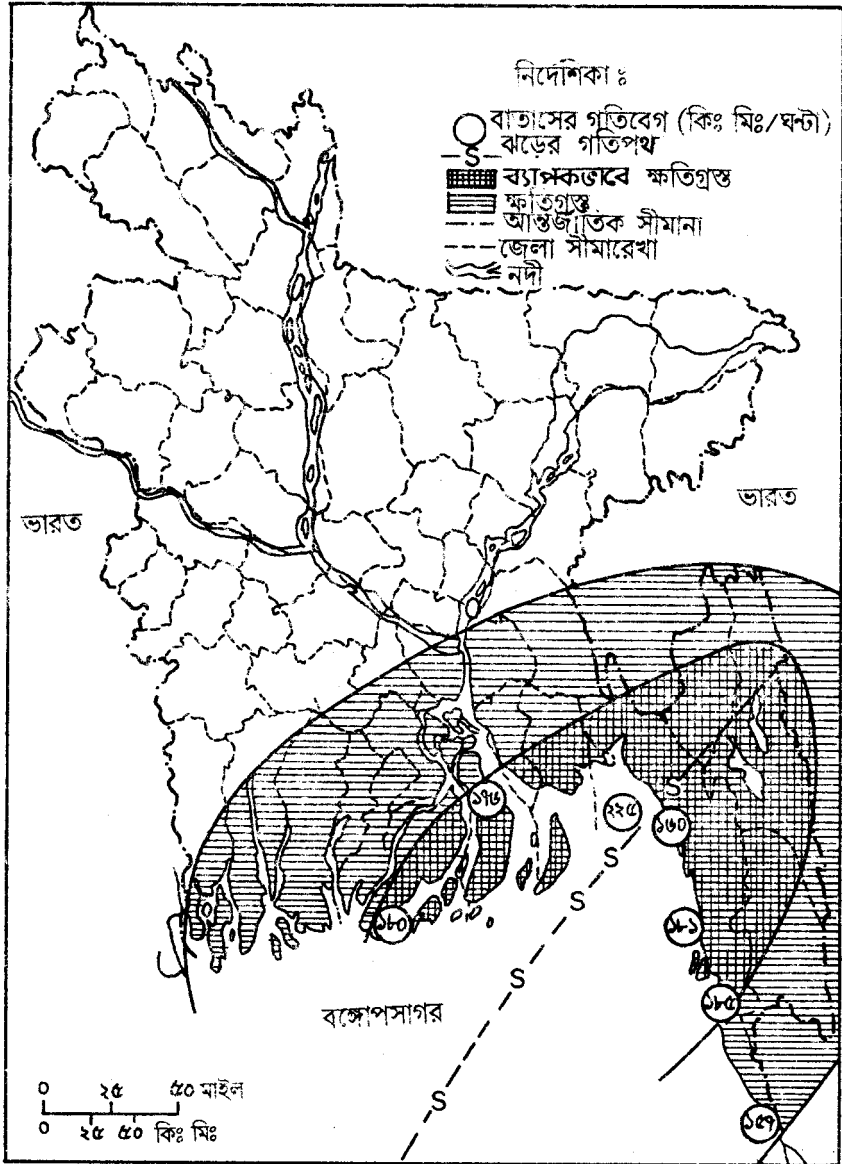
১৯১৯ সালে জলোচ্ছ্বাসসহ প্রচণ্ড হ্যারিকেন বরিশালে আঘাত করেছিল। কিন্তু এর কোনো বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়নি।

১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ১৩০ মাইল, জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ২০ ফুট) চট্টগ্রামে আঘাত হেনে ৮ হাজার ১শ' ৪৯ ব্যক্তির প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল। হাতিয়ায় প্রায় ৭০ ভাগ দালান এই ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়।

১৯৬১ সালের মে মাসে মেঘনার মোহনায় ঘন্টায় ৯০—৯২ মাইল বেগে ঘূর্ণিঝড় ও ৮—১০ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস আঘাত হেনে ১১ হাজার ৬শ' ৪৮ ব্যক্তির প্রাণ কেড়ে নেয়। চর আলেকজান্ডারের অনেক মানুষ এই ঝড়ে নিহত হয়েছিল।

১৯৬৩ সালে ঘন্টায় ১২৫ মাইল বেগে ঘূর্ণিঝড় এবং ৮—১০ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কক্সবাজারসহ বিভিন্ন দ্বীপে আঘাত করে। নিহত হয়েছিল ১১ হাজার ৫শ' ২০ জন মানুষ।

১৯৬৫ সালের মে মাসে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (বাতাসের গতি ঘন্টায় ১০০ মাইল ও জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ১২ ফুট) বরিশালে আঘাত হেনেছিল। নিহতদের সংখ্যা ছিল ১৯ হাজার ২শ' ৭০।



চিত্র ৩.১৯ : ১৯৯১ এর ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত অঞ্চল

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আরো একটি ঝড় হয়েছিল। বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ১৩০ মাইল, জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল ৮—১০ ফুট। কক্সবাজার ও টেকনাফের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এই দুর্যোগে কক্সবাজারে ৪০ হাজার সল্ট বেড ডুবে যায়। প্রাণহানি ঘটে ৮৭৩ জন মানুষের।

১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে ২০ থেকে ২২ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাসসহ প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় সন্দ্বীপে আঘাত হেনে চট্টগ্রাম জেলার প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। নিহত হয়েছিল ৮শ' ৫০ জন মানুষ।

১৯৯১ সালের দুর্যোগের কথা বাদ দিলে বিগত প্রায় ২২শ' বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে। মেঘনার মোহনায় ১২ই নভেম্বরের এই প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছিল। বর্তমান ভোলা জেলার বিভিন্ন দ্বীপের প্রায় সকল আদম সন্তান এই দুর্যোগে নিহত হয়েছিল। এই সংখ্যা কত তার সঠিক পরিমাণ করা সম্ভব হয়নি, তবে অধিকাংশের মতে, এ সংখ্যা ছিল ৩ লাখ। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ১৩৮ মাইল, জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল ১০—৩৩ ফুট।

১৯৮৫ সালের মে মাসে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর উপকূলে আঘাত হানে। বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ৬৬ মাইল, জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল ১৪ ফুট। এ ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, হাতিয়া, নোয়াখালী ও উড়িচর। উড়িচরে প্রাণ স্পন্দন থেমে গিয়েছিল। এ দুর্যোগ পরবর্তীকালে উড়িচর ট্রাজেডী হিসেবে অভিহিত হয়েছে। এ দুর্যোগে ১১ হাজার ৬৯ জন মানুষ এবং ১ লাখ ৩৫ হাজার ৩৩টি গবাদি পশু প্রাণ হারায়।

১৯৯১ সালের আগে শেষ ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছিল ১৯৮৮ সালের নভেম্বর মাসে। খুলনার উপকূলে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ৯৬ মাইল, মংলা পরেন্টে সাড়ে চৌদ্দ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল। প্রাণহানির সংখ্যা ছিল ৫ হাজার ৭৮। সুন্দরবনের প্রায় ১৫ হাজার হরিণ ও ৯টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার এবং ৬৫ হাজার গবাদি পশু প্রাণ হারায়। প্রায় ৯৪১ কোটি টাকার ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। (উৎস : সাপ্তাহি পূর্ণিমা, ৮ মে ১৯৯১)

ঘূর্ণিঝড় ১৯৯১ : ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিল দিবাগত রাতে দেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলের উপর যে ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত হানে তা ছিল স্বর্ণকালের মধ্যে ভয়াবহতম। এটি ছিল হারিকেন আকৃতিতে বাংলাদেশের দ্বিগুণ এবং ঝড়ের কেন্দ্রস্থলে মেঘের আয়তন ছিল ৬০০ কিলোমিটারেরও বেশি। কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়ের যে চিত্র পাওয়া গিয়েছিল তাতে বাতাসের বেগ ঘন্টায় ২৪০ কিঃ মিঃ বলে অনুমান করা হয়েছিল। সন্দ্বীপে বাতাসের বেগ ছিল ২২৫ কিঃ মিঃ/ঘন্টায়, চট্টগ্রামে ২১০ কিঃ মিঃ, খেপুপাড়ায় ১৮০ কিঃ মিঃ, কক্সবাজারে ১৮৫ কিঃ মিঃ, ভোলাতে ১৭৮ কিঃ মিঃ, টেকনাফে ১৫৭ কিঃ মিঃ। ঝড়-সৃষ্ট-জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল ৬ থেকে ১০ মিটার।

সরকারি হিসাবে এই ঝড়ে মৃতের সংখ্যা ছিল ১,৩৮,০০০ কিন্তু বেসরকারি হিসেবে এ সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি। বাংলাদেশ সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড স্টাডিজ (BCAS) কর্তৃক ঘূর্ণিঝড়ের পরে উপদ্রুত অঞ্চলে যে জরিপ চালানো হয়েছিল তাতে দেখা গেছে উপদ্রুত অঞ্চলের ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ শিশু, ২৫—৩০ শতাংশ মহিলা ও ১৫—২০ শতাংশ বৃদ্ধ লোক ঘূর্ণিঝড়ের ছোবলে প্রাণ হারিয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতি হয়েছে : কৃষিতে ৩৬৩.৫৭ মিঃ ডলার, শিল্পে ৩৮৮.২৭ মিঃ ডলার, ভৌত অবকাঠামো ৩৫৯.০৯ মিঃ ডলার, আর্থসামাজিক অবকাঠামো ২৬৭.৩৫ মিঃ ডলার, অন্যান্য ৫.৭২ মিঃ ডলার, সর্বমোট ১ বিলিয়ন ৩৮৪ মিলিয়ন ডলার। পশুপাখির মৃত্যুর সংখ্যা হচ্ছে : গরু ২২৪০০০, ছাগল, ভেড়া ২১৮০০০, হাঁস-মুরগি ২.৪ মিলিয়ন। ঘূর্ণিঝড়ে বনজ সম্পদ ধ্বংস হয়েছে অপরিসীম।

সারণি ৩ : ১৯৭০ ও ১৯৯১ সনের ঘূর্ণিঝড়ে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির তুলনামূলক খতিয়ান

ক্ষয়ক্ষতি	১৯৯১ (ক)	১৯৭০ (খ)	ক খ
১। ক্ষতিগ্রস্ত লোক	১,৯৭,২১,৭০৭	৪,৭০০,০০০	২.৩
২। মৃত ও নিখোঁজ লোক	১,৪০,১৬১	৩০০,০০০	০.৪৭
৩। ঘরবাড়ি ধ্বংস	১৬,৩০,৫৪৩	৪০০,০০০	
৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস	৯,৩৬৭	৩,৫০০	২.৭
৫। বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ	২৩৫ কিঃ মিঃ/ঘন্টা	১৯৬ কিঃ মিঃ ঘন্টা	
৬। ঝড়ের কেন্দ্রে চাপ	৯৫০ মিলিবার	৯৫০—৯৬০ মিলিবার	
৭। ঝড় তরঙ্গের সর্বোচ্চ মাত্রা	২০-২৫ ফুট	২০—৩০ ফুট	

(সূত্র : মনিরুল কাদের মির্জা, ১৯৯২)

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগে বঙ্গোপসাগরের ভূমিকা

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। এ দেশটিতে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, নদীভাঙ্গন সাংবাৎসরিক ঘটনা। বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টিতে স্থানীয় ও উজানের অববাহিকা এলাকার বৃষ্টিপাতই সবচেয়ে বড় কারণ। বৃষ্টিপাত হয় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে। বঙ্গোপসাগরে উদ্ভূত এই বাৎসরিক দুবারের মৌসুমী বায়ু সম্পর্কে বক্ষ্যমান নিবন্ধের ভৌত-সামুদ্রিক বিজ্ঞান অংশে আলোচিত হয়েছে। বন্যার পর যে দুর্যোগ বাংলাদেশের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে থাকে তা হলো ঘূর্ণিঝড়। মে-নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য খুবই অনুকূল থাকে। দেশের বঙ্গোপসাগরের প্রাকৃতিক অবস্থা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য খুবই অনুকূল থাকে। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ বহুবার আঘাত হেনে সৃষ্টি করেছে মহাপ্রলয়ের। ১৯৭০ সনের ১২ই নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী ও দ্বীপাঞ্চল থেকে দশ লক্ষাধিক মানুষ চিরতরে হারিয়ে গেছে সাগরে। ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিল শতাব্দীর ভয়াবহতম ঝড় আঘাত হেনেছিল দেশের উপকূলীয় এলাকায়। এ ঝড় ছিনিয়ে নেয় দেড় লক্ষাধিক মানব প্রাণ।

ঘূর্ণিঝড় শব্দটির অর্থ (গ্রীক কিরলস Kyklos) সর্পের কুণ্ডলী বা Coil of Snakes। প্রবল গতিসম্পন্ন বিশালাকার ঘূর্ণয়মান নিম্নচাপ বিশিষ্ট ঝড়কে ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন বলে। এই ঝড়ে প্রবল গতিসম্পন্ন হাওয়া উত্তর গোলাৰ্ধে ঘড়ির কাটার বিপরীতে এবং দক্ষিণ গোলাৰ্ধে ঘড়ির কাটার অনুকূলে আবর্তিত হয়। স্থানিক তাপমাত্রার পার্থক্য, জলভাগে বায়ু চাপের তীব্রতা, উষ্ণ ও শীতল বায়ুপুঞ্জের সংঘর্ষ, পৃথিবীর ঘূর্ণনজনিত ত্বরণ ইত্যাদি ঘূর্ণিঝড় উৎপত্তির প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে থাকে।

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপমালায় প্রায়শই ২৫০ মাইল বেগে সাইক্লোন বয়ে যায়। আর বঙ্গোপসাগরের ঝড় ১৫০ মাইলের বেশি হয় না কিন্তু এর ভয়াবহতা তুলনাহীন। ভয়াল বঙ্গোপসাগরের তলদেশে আছে পুকুরের পাকা ঘাটের মতো অগভীর জলের ১০০ মাইল দীর্ঘ মহীসোপান। গভীর সাগরের ৫ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস এ মহীসোপানের অগভীর জলের উপর গড়িয়ে পড়েই এক সময় দ্বিগুণ ১০ ফুট হয়ে উঠে। প্রশান্ত মহাসাগর এবং আন্দামান সাগরে জন্মানো ঝড়-জলোচ্ছ্বাসকে টেনে আনার জন্য এক চোঙা বা ফানেলের আকার ধারণ করে আছে বাংলাদেশের উপকূল ও বঙ্গোপসাগর। মেঘনা নদীর মোহনা যেন এ চোঙার পাইপ। গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড়-জলোচ্ছ্বাস এ ফানেল বেয়ে যখন এগিয়ে আসে মহীসোপানের কাছে, তখন বিশাল চাতালের মধ্যে পানি নাচতে থাকে, পাহাড় সমান হয়ে উঠে জলস্তম্ভের উচ্চতা। বঙ্গোপসাগরে যখন জোয়ার জাগে, তখন বাংলাদেশের কাছে জোয়ারের উচ্চতা দাঁড়ায় ভারতের পুরী উপকূলে ভুবনেশ্বরের চাইতে ১৮ ফুট বেশি। একটানা পানির সাগর এলাকায় পানির উচ্চতার এমন তারতম্য, এমন মহীসোপান, এমন ফানেল আকৃতির জলস্তম্ভের বাঁধন ও গড়ন বিশ্বের আর কোথাও নেই। স্মরণাতীতকাল থেকে বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণনে বিশ্বের নাবিকদের কাছে পরিচিত হয়ে রয়েছে তার ঘূর্ণিঝড়ের বিশ্বাসঘাতক ভয়াবহরূপের দরুন। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত, প্রধানত সমতল, গাঙ্গেয় পানিতে গঠিত পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান এমন যে উজানে বেশি বর্ষণ হলে এখানে বন্যা দেখা দেবেই। তেমনি বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ জন্ম নিলে তা যেন সাইক্লোনের রূপ ধরে এদেশের উপকূলে আঘাত হানা অনিবার্য।

বঙ্গোপসাগরে বেশিরভাগ ঝড়ের জন্ম হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছে, চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ১২শ' কিঃ মিঃ দক্ষিণে। এখানে উৎপন্ন নিম্নচাপ এবং প্রশান্ত মহাসাগর থেকে দক্ষিণ চীন সাগর ও শ্যাম উপসাগর হয়ে যত নিম্নচাপ আন্দামান অঞ্চলে এসে পৌঁছাবে, ধরে নেয়া যায় সেগুলো ৩/৪ দিনের মাথায় বাংলাদেশে আঘাত হানতে পারে। ভারত মহাসাগরের ৫° থেকে ১০° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে সাইক্লোনের জন্ম হয়ে থাকে বেশি। সাগরের উপরে বায়ুমণ্ডলের কোনো অংশ উত্তপ্ত হলে বাতাস প্রসারিত হয়ে উঠে যায় উপরের দিকে। তখন ফাঁকা নিচের জায়গাটিতে বায়ুচাপ কমে যায় সৃষ্টি হয় নিম্নচাপ। ফলে আশেপাশের উচ্চচাপসম্পন্ন এলাকা থেকে বাতাস দ্রুত ছুটে এসে শূন্যস্থান পূরণ করতে চায়। এ বায়বীয় আলোড়নের পাশাপাশি উর্ধ্বমণ্ডলের শীতল বায়ুর সাথে উর্ধ্বমুখী উত্তপ্ত বায়ুর সংযোগ ঘটে। এমনি এক অস্বাভাবিকতায়

নিম্নচাপ এক ভটিল প্রক্রিয়ায় ঘূর্ণিঝড়ে পর্যবসিত হয়। তাছাড়া পানির তাপমাত্রা 29° সেন্টিগ্রেডের কম থাকলে বিষুবীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় হয় না। ঝড়ের মাঝখানে একটি কালো জায়গায় কুণ্ডলী পাকানো রাশি রাশি সর্বনাশা মেঘ থাকে যাকে 'চোখ' বলা হয়। এই 'চোখ' ৮—৫০ কিঃ মিঃ পরিসরের হয়। এখানে বাতাসের বেগ ২৪-৩২ কিঃ মিঃ আর তাপমাত্রা ১০/১৫ ডিগ্রী বেশি।

বাংলাদেশের সমুদ্রোপকূলে সাগরের পরিধি অত্যধিক সঙ্কুচিত। এ অংশটাকে উল্টানো ফানেলের শীর্ষদেশ বা চূড়া মনে করা যায়। এমন এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে বারবার সাইক্লোনের আঘাত হয়ে উঠে তীব্রতর। বৃটিশ আমলে ডঃ লেডিংটনই সর্বপ্রথম বঙ্গোপসাগর থেকে উত্থিত ঝড়ের ধরন-ধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এর নাম রাখেন 'সাইক্লোন'। সাইক্লোনের লেজ বা পুচ্ছ কোনো কোনো সময় কয়েকশ' কিঃ মিঃ পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। লেজ ঝড়কেন্দ্রের আগেই অতিক্রম করে যায়। এজন্য সাইক্লোনের দু'তিন দিন আগে থেকে আকাশ থাকে মেঘাচ্ছন্ন। মুঘলধারে বা গুড়িগুড়ি বৃষ্টিও পড়তে থাকে ঝড়ের আগে।

ঘূর্ণিঝড় ৪ ভাগে বিভক্ত : নিম্ন (৬২ কিঃ মিঃ পর্যন্ত বেগ), ঝড় (১৩—৮৭ কিঃ মিঃ), মারাত্মক ঝড় (৮৮—১১৮ কিঃ মিঃ) ও হারিকেন (১১৯—৩২২ কিঃ মিঃ)। ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড়টি ছিল হারিকেন। এর গতিবেগ ছিল দেড়শ থেকে সোয়া দু'শ' কিঃমিঃ। একটি মাঝারি সাইক্লোনের শক্তি কয়েক সহস্র আণবিক বোমার সমতুল্য। বঙ্গোপসাগরে উৎপন্ন ঝড়গুলো সাধারণত প্রথমে উত্তর-পশ্চিমে ও ক্রমশ উত্তর, উত্তর-পূর্ব, অনেক সময় পূর্ব দিকে বাক নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। অপ্রত্যাশিতভাবে সাইক্লোন হঠাৎ দিক পরিবর্তন করেও থাকে। জন্মের সময় ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণনগতি এবং একই সাথে অগ্রগতি উভয়ের হার বাড়তে থাকে। ভূখণ্ডে আঘাত হানার মুহূর্তে তার বেগ বা শক্তি থাকে প্রচণ্ড। কখনো কখনো ঝড় অগ্রসর হয়ে দু'একদিনের জন্য থেমে যায়, পরে আবার শক্তি সঞ্চয় করে চলতে থাকে। বিভিন্ন রকম মর্জি হয় তার।

১৮৭৭ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ১০৪ বৎসরে মোট ৩৯২টি ঘূর্ণিঝড় বঙ্গোপসাগরে উৎপত্তি লাভ করেছে যার ৬৩টি (১৬%) বাংলাদেশের উপর আঘাত হেনেছে। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত গড়ে বৎসরে ০.৫১টি ঝড় আঘাত হেনেছে আর ১৯৬৫—৮০ সময়ে বৃদ্ধি পেয়ে ১—১২ হয়েছে। ৩৪টি ঝড় অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে এবং ২৪টি এপ্রিল-জুন মওসুমে হানা দিয়েছে। মেঘনা মোহনার কাছাকাছি জেলাগুলোই ধ্বংসযজ্ঞের বেশি শিকার হয়েছে। গত একশ' বছরের পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশে কালবৈশাখী ও টর্নোডোর সংখ্যা সাড়ে ৩ হাজার। এ মওসুমে প্রতি বছর ৩০—৩৫টি কালবৈশাখী হয়, এর মধ্যে ২—৩টি টর্নোডো থাকে। ১০০ বছরে বঙ্গোপসাগরে ১২৪৭ টি ঝড় হয়েছে যার মধ্যে ৪৬৮টি ছিল প্রবল ঘূর্ণিঝড় বা হারিকেন। এর মধ্যে ১৮৯৭, ১৯৪১, ১৯৬০ (২ বার), ১৯৬৩, ১৯৬৫ (২ বার), ১৯৭০, ১৯৮৫, ১৯৮৮ ও ১৯৯১ সনের এই ১১টি ছিল প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়।

ঘূর্ণিঝড়ের সবচেয়ে প্রাচীন রেকর্ড হচ্ছে ১৫৮৪ সালের ঘূর্ণিঝড়। আইন-ই-আকবরীতে এর উল্লেখ রয়েছে। এরপর ঘূর্ণিঝড় হয়েছে ১৭৭০, ১৭৭১, ১৮২২, ১৮২৫, ১৮৩২, ১৮৪৮, ১৮৫৫, ১৮৬৪, ১৮৬৫, ১৮৬৭, ১৮৬৯, ১৮৭০, ১৮৮২, ১৮৯৩, ১৮৯৫, ১৮৯৭, ১৯০৪, ১৯০৫, ১৯১০, ১৯৪১, ১৯৪৮, ১৯৬০, ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৫, ১৯৬৬, ১৯৭০, ১৯৭৩, ১৯৭৭, ১৯৮৩, ১৯৮৫, ১৯৮৮, ১৯৯১ তে। ১৮২২ সালের 'শ্রেট বাকেরগঞ্জ কিলার' ঘূর্ণিঝড়ে হাতিয়া নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ১৮৭৬ সালের ঘূর্ণিঝড়টি ছিল বঙ্গোপসাগরে অন্যতম প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়। এতে ২ লাখ ১৫ হাজার মানুষ মারা যায়। ভারতে ১৭৩৯ সালের ঘূর্ণিঝড়ে কলিকাতায় ৩ লাখ মানুষ প্রাণ হারায়। এ প্রলয়ংকরী ঝড়ের ফলে যে ভয়াবহ ঝড়-তরঙ্গ, ঝড়ের জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাস হয় মূলত এদের কারণেই ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য, ঘূর্ণিঝড় যদি জোয়ারের সময় আঘাত হানে তাহলে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ২০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। ২৫০ বৎসরব্যাপী সংঘটিত ২০টি ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের ১৪টিই বাংলাদেশের উপর আঘাত হেনেছে। ঘূর্ণিঝড়ের ফলে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্গোপসাগরের রাসায়নিক সমুদ্র বিজ্ঞান

(Chemical Oceanography of the Bay of Bengal)

সমুদ্রের পানির রসায়ন (Chemistry of Sea water)

সমুদ্রের পানি হচ্ছে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সহজলভ্য রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ। পৃথিবীর সমুদ্রগুলোতে প্রায় ১৪০০০ লক্ষ ঘন কিলোমিটার জটিল রাসায়নিক দ্রবণ আছে। এক ঘন কিলোমিটার সমুদ্রের পানি বাষ্পে পরিণত করলে ৪ কোটি টন লবণ পাওয়া যায় এবং সমুদ্রের সব লবণ দিয়ে ভূপৃষ্ঠে ১৬০ মিটার লবণস্তর তৈরি হবে। লবণের উপাদানে সোডিয়াম এবং ক্লোরিন ছাড়াও ৭০ ধরনের অন্যান্য মৌলিক পদার্থ রয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মাত্র ৯২টি মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি। প্রতি ঘন কিলোমিটার সমুদ্রের পানিতে উল্লেখযোগ্য মৌলিক পদার্থের পরিমাণ ৪নং সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি ৪ : প্রতি ঘন কিঃ মিঃ সমুদ্রের পানিতে মৌলিক পদার্থের পরিমাণ

মৌলিক পদার্থ	পরিমাণ (টন)	মৌলিক পদার্থ	পরিমাণ (টন)	মৌলিক পদার্থ	পরিমাণ (টন)
হাইড্রোজেন	১২২,০৬,২৩,৫০০	বোরন	৫,৫৪২	আয়রন	১১
অক্সিজেন	৩৬,৮১,০৫,৫০০	সিলিকন	৩,৩৮৮	অ্যালুমিনিয়াম	১১
ক্লোরিন	২১,৪৬২,৮৩০	ফ্লোরিন	১,৪৬৮	মলিবডেনাম	১১
সোডিয়াম	১১,৮৭০,৫০০	আরগন	৬৭৭	বেরিয়াম	৭
ম্যাগনেসিয়াম	১,৪৬৮,৮২০	নাইট্রোজেন	৫৬৪	লেড/সীসা	৩.৪
সালফার	১,০১৬,৭৮০	লিথিয়াম	২২৫	টিন	৩.৪
ক্যালসিয়াম	৫৫০,৮৪০	রূবিডিয়াম	১৩৫	কপার/তামা	৩.৪
পটাসিয়াম	৪২৯,২৬০	ফসফরাস	৭৯	আর্সেনিক	৩.৪
ব্রোমিন	৭৩,৩৮১	আয়োডিন	৫৬	প্রোটেকটিনাম	৩.৪
কার্বন	৩১,৬৫৫	ইনডিয়াম	২৩	সেলেনিয়াম	৩.৪
স্ট্রনসিয়াম	৯,০৪০	জিংক	১১	ভ্যানডিয়াম	২.৩

মৌলিক পদার্থ	পরিমাণ	মৌলিক পদার্থ	পরিমাণ	মৌলিক পদার্থ	পরিমাণ
ম্যাঙ্গানিজ	২.৩ (টন)	ল্যাঙ্কাম	৩৮০ কিগ্রাঃ	পারদ/মারকারি	৩০.০ কিগ্রাঃ
টাইটেনিয়াম	১.১ (টন)	ক্রিস্টন	৩৮০ "	গ্যালিয়াম	৩০.০ "
থোরিয়াম	৭৯০ কিগ্রাঃ	বিসমাথ	২০৪.৩ "	টেলুরিয়াম	১০.৪ "
সিজিয়াম	৫৮০ "	টাংষ্টেন	১০১.৩ "	নিয়োবিয়াম	৫.১ "
অ্যান্টিমনি	৫৮০ "	জেনন	১০১.৩ "	হিলিয়াম	৫.১ "
কোবাল্ট	৫৫০ "	জারমেনিয়াম	৬০.৮ "	গোল্ড/স্বর্ণ *	৪.১ "
নিকেল	৫৫০ "	ক্যাডমিয়াম	৫৫.৮ "	রেডিয়াম	১০০ গ্রাঃ
সিরিয়াম	৪৩০ "	ক্রোমিয়াম	৫০.৪ "	রেডন	<১০০ গ্রাঃ
ইট্রিয়াম	৩৪০ "	ক্যান্ডিনিডিয়াম	৪০.৫ "		
সিলভার/রূপা	৩৪০ "	নিয়ন	৪০ "		

* ২ গ্রাম সোনা পেতে হলে ৫৫০ কোটি লিটার সমুদ্রপানি ছাঁকতে হবে। সমুদ্রে মোট স্বর্ণের পরিমাণ ৫৩ লক্ষ টন।

সমুদ্রের পানির ধর্ম : পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টি ও রক্ষার জন্য সমুদ্রের জল প্রয়োজন। জল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক যৌগ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যার তুলনা নেই। এই যৌগের উপর জীবন নির্ভর করে। পারদ ও পেট্রোলিয়াম ছাড়া জলই একমাত্র তরল পদার্থ যা পৃথিবীতে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়। জলের কতকগুলো ধর্ম জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় :

- (১) যে কোনো তরল অপেক্ষা জল বেশিসংখ্যক বস্তুকে দ্রবীভূত করতে পারে।
- (২) জলের আপেক্ষিক তাপ প্রকৃতিতে সর্বাধিক।
- (৩) যে স্বল্প কয়েকটি যৌগ বরফে পরিণত হলে আয়তনে বাড়ে জল তাদের মধ্যে অন্যতম।

সমুদ্রের জল লবণাক্ত হওয়ার জন্যই আরও কয়েকটি বিশেষ ধর্ম লাভ করেছে।

(১) জল অনেক বেশি বস্তুকে দ্রবীভূত করে : প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রের সৃষ্টির জন্য এটি একটি কারণ। কোটি কোটি বছর পূর্বে পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার সময় নানা প্রকার লবণ ও অন্যান্য রাসায়নিক বস্তু জলে দ্রবীভূত হয়েছে। পরের দিকে এই লবণাক্ততা দুটি কারণে বৃদ্ধি পায় :

প্রথমত নতুন সৃষ্টি সাগরের টাটকা জল ক্রমাগত বাষ্পীভবনের ফলে অবশিষ্ট দ্রবণ বেশি লবণাক্ত হয়।

দ্বিতীয়ত : অগণিত স্রোত ও প্রবাহমান বৃষ্টিধারায় আরো লবণ সাগরে বাহিত হয়। পৃথিবীর নদীগুলি প্রতি বছর ৪০০০ লক্ষ কোটি টন লবণ দ্রবীভূত করে সমুদ্রে বয়ে নিয়ে যায়।

(২) উচ্চ আপেক্ষিক তাপ : পৃথিবীর মোট তাপ সংক্রান্ত আয়-ব্যয়ের হিসাবে জলের উচ্চ আপেক্ষিক তাপের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। যে পরিমাণ তাপ ১ গ্রাম জলের উষ্ণতা ১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বাড়াবে, তা সমান ওজনের লোহার তাপ ১০ ডিগ্রী বাড়াবে। উচ্চ আপেক্ষিক তাপের অর্থ উষ্ণতা বিশেষ না বাড়িয়ে তাপ সংরক্ষণের ক্ষমতা বেশি থাকা। আবার তাপমান খুব বেশি হ্রাস না পেয়ে জল বেশি পরিমাণ তাপ হারাতে পারে। আপেক্ষিক তাপ উচ্চ হওয়ার জন্য সমুদ্রের জল নিজে বেশি উত্তপ্ত না হয়েও দিব্যভাগে প্রচুর পরিমাণে সৌরশক্তি শোষণ করতে পারে। এই শক্তি যে কেবল অনেকক্ষণ সংরক্ষিত থাকে তা নয়, এই তাপশক্তি পৃথিবীর শীতলতর স্থানে সঞ্চালিত হয় এবং সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে মুক্ত হয়ে সেইসব অঞ্চলের প্রচণ্ড শীতের উপশম ঘটায়। সমুদ্রের জল কিন্তু এর ফলে বেশি শীতল হয় না। উচ্চ আপেক্ষিক তাপ এভাবে সমুদ্রকে এক অমূল্য তাপ কোষাগারে পরিণত করেছে এবং সমস্ত পৃথিবীর জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে।

জল বরফে পরিণত হবার সময় প্রচুর পরিমাণে তাপশক্তি মুক্ত হয়। অপর দিকে বরফ যখন গলে তৈরি হয় তখন প্রচুর পরিমাণে তাপশক্তি শোষিত হয়। জল যে কেবল যে কোনো উষ্ণতায় বাষ্পীভূত হয় তা নয়, বাষ্পীভবনের সময় যে কোনো তরল অপেক্ষা জল অনেক বেশি তাপশক্তি শোষণ ও সংরক্ষণ করতে পারে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে মেপে দেখা গেছে, সমুদ্রের উপর প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ১ মিটার গভীরতার মত জলের বাষ্পীভবন হয়। অর্থাৎ সমুদ্রের উপরিতল থেকে বাষ্পীভূত জল দু'ভাবে কাজ করে। বায়ুমণ্ডলে যাবার সময় সমুদ্র থেকে তাপ পরিবহণ করে নিয়ে যায় ও বায়ুমণ্ডলে তাপ সঞ্চয় করে রাখে। তরল জল অপেক্ষা বাষ্প বেশি সঞ্চরণশীল বলে এক জায়গা থেকে শোষিত তাপ সহজেই দূরবর্তী স্থানে যেতে পারে। জল যে কোনো জায়গায় ঘনীভবন হয়ে সঞ্চিত লীনতাপ মুক্ত করে। এভাবেই জলের বাষ্পীভবন পৃথিবী পৃষ্ঠে তাপবন্টনের কাজে বিরাট অংশ গ্রহণ করে। এই জন্যই সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পকে তাপের বিরাট আধার বলে মনে করা হয়।

(৩) বরফে জলের আয়তন বাড়ে : খুব কম তাপমাত্রার কারণে মেরু দেশে ক্রমাগত বরফ তৈরি হয়। তারপর সমুদ্রের উপরিতলে কঠিন চাকার মত ভাসমান থাকে এবং এইভাবে সমুদ্রের এলাকায় জলের তাপ অপচয় রোধ করতে সক্ষম হয়। সূর্যরশ্মি পড়লে এই বরফ জল অপেক্ষা দ্রুত এবং অধিক পরিমাণে সূর্যের তাপ শোষণ করে। প্রক্রিয়াটি সমুদ্রের উত্তাপের সঞ্চয়কে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে সাহায্য করে। উপরন্তু, সমুদ্রের নিচের তলের জল তরল অবস্থায় থাকায় ঐ অঞ্চলের প্রাণী ও উদ্ভিদের খুব একটা বেশি ক্ষতি হয় না। হিমশৈলগুলো বরফের বিরাট চাঙড়। সূর্যালোকের প্রভাবে এগুলো মেরু অঞ্চল থেকে আলাদা হয়ে সমুদ্রে ভাসতে থাকে এবং যেসব অঞ্চলের তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা স্বাভাবিকভাবেই বেশি, সেইসব স্থানে ভেসে যায়। প্রতিকূল পরিবেশে এসে হিমশৈলগুলো সহজেই গলে যায় ও সেখানের জলের লবণাক্ততা হ্রাস করে। বরফের ভাসমান হবার এই ধর্ম সমুদ্রের জল বিনিময় এবং উষ্ণ ও শীতল অঞ্চলের তাপ, লবণাক্ততা প্রভৃতি ধর্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করে।

সমুদ্রের পানির লবণাক্ততা : সমুদ্রের জল লবণাক্ত না হয়ে মিষ্টি হলে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ হতো কিনা সন্দেহ। পৃথিবীর যেকোনো স্থানে ছোট সীমাবদ্ধ গভীর মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় উষ্ণতার পরিবর্তনের ফলেই পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রের জটিল ও সর্বব্যাপী জল সঞ্চালনের ফলেই আবহাওয়ার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়। অধিকতর উষ্ণ জলস্রোত শীতলতর অঞ্চলে এবং শীতলতর স্রোত ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রবাহিত হয়। জলের লবণাক্ততার জন্য সমুদ্রে স্রোতের সৃষ্টি হয়। এটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ কারণ। ক্রান্তীয় অঞ্চলে সূর্য জলের উপরের স্তর উত্তপ্ত করলে উত্তপ্ত বলে আশপাশের জল অপেক্ষা হালকা হয়ে যায়। তাপ ও লবণাক্ততার পার্থক্য গড়ে ওঠার ফলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জল প্রবাহিত হতে থাকে। প্রবাহিত জলের শূন্যস্থান পূর্ণ করতে নিচ থেকে শীতলতর ও বেশি ঘন জল উপরে উঠে আসে। সমুদ্রের যে কোনো স্থানে আলোড়ন ঘটলে তা অন্যসব স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশ্বব্যাপী জলে সঞ্চালন সৃষ্টি করে। সমুদ্রে কেবল মিষ্টি জল থাকলে লবণাক্ততার পার্থক্যও ঘটতো না এবং শক্তিশালী সমুদ্রস্রোতের উৎপত্তিও ঘটতো না। ফলে স্থলভাগের শীতলতর স্থান খুব বেশি শীতল এবং উষ্ণতর স্থান খুব বেশি উষ্ণ হতো। তখন বসবাসযোগ্য স্থলভাগ খুব অল্পই পাওয়া যেত। অন্য কথায়, লবণাক্ততা না থাকলে সমুদ্রের জলের তাপ পৃথিবীতে জীবনের সৃষ্টি এবং উন্নতির ভারসাম্যকারী কারণ না হয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উঠত।

প্রধানত সমুদ্রের পানি শুকিয়ে সাধারণ লবণ তৈরি হয়। সমুদ্রে গড়ে ৩.৫ শতাংশ (ওজন) লবণ আছে। অর্থাৎ প্রতি এক হাজার ভাগে লবণের পরিমাণ হচ্ছে ৩৫%। %০ চিহ্নটির অর্থ প্রতি হাজার ভাগে (parts per thousand or per mil) খোলা সমুদ্রে লবণাক্ততা ৩৩—৩৭ পর্যন্ত হয়; তবে উপকূলের বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্য ২৮—৪০ পর্যন্ত হতে পারে। লবণাক্ত স্বাদুজলে (brackish) লবণাক্ততা ২৫ এবং অতি লবণাক্ত জলে (hypersaline) লবণাক্ততা ৪০ এর বেশি হয়। তৈরি লবণে যে কেবল সোডিয়াম ক্লোরাইড বা বিশুদ্ধ লবণ থাকে তা নয়, সমুদ্রের অন্যান্য দ্রবীভূত বস্তু এবং কিছু কিছু ভাসমান বস্তুও থাকে। সারণি-৫-এ সমুদ্রের পানির রাসায়নিক বিশ্লেষণের সঠিক ফলাফল বিবৃত করা হয়েছে।

সারণি ৫ : প্রতি এক হাজার ভাগে সামুদ্রিক লবণের উপাদান

মৌল	প্রতি হাজার ভাগে	
ক্লোরিন (Cl)	১৮.৯৮	
সোডিয়াম (Na)	১০.৫৬	
ম্যাগনেসিয়াম (Mg)	১.২৭	
সালফার (S)	০.৮৮	
ক্যালসিয়াম (Ca)	০.৪০	(সূত্র : Bearman G. ed. Seawater, 1989)
পটাসিয়াম (K)	০.৩৮	
ব্রোমিন (Br)	০.০৬৫	
কার্বন (C)	০.০২৮	
স্ট্রনসিয়াম (Sr)	০.০১৩	
বোরন (B)	০.০০৫	

গড় লবণাক্ততার প্রতি হাজার ভাগে এই ১০টি উপাদান আছে ৩৩.০ ভাগ। প্রতি হাজারের অবশিষ্ট দুইভাগে যে বহুসংখ্যক মৌল আছে তাদের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে ৪নং সারণিতে (প্রতি হাজারে মাত্র ৩৫ ভাগ লবণ এবং অবশিষ্ট ৯৬৫ ভাগ মিষ্টি জল আছে)। সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন গভীরতায় লবণাক্ততার পার্থক্য অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রের গতিময়তার অন্তর্নিহিত কারণ হওয়ায় সমুদ্র রসায়নবিদদের কাছে লবণাক্ততার পার্থক্য প্রধান গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন সমুদ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে লবণাক্ততা এবং লবণাক্ততার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ধর্ম থেকে অনুসন্ধান করা যায়।

সারণি ৬-এ সমুদ্রের পানিতে প্রধান আয়নগুলোর (তড়িৎপূর্ণ পরমাণু, স্থূলাণু) পরিমাণ (প্রতি ১ হাজার ভাগে) দেয়া হলো।

সারণি-৬ : সমুদ্রের পানিতে প্রতি এক হাজার ভাগে প্রধান আয়নগুলোর গড় গাঢ়ীভবনের পরিমাণ :

আয়ন	%০ ওজন	
ক্লোরাইড, Cl^-	১৮.৯৮০	ঋণাত্মক আয়ন (anions) = ২১.৮৬১%০
সালফেট, SO_4^{2-}	২.৬৪৯	
বাইকার্বনেট, HCO_3^- (হাইড্রোজেন কার্বনেট)	০.১৪০	
ব্রোমাইড, Br^-	০.০৬৫	
বোরেট, H_2BO_3^-	০.০২৬	
ফ্লোরাইড, F^-	০.০০১	ধনাত্মক আয়ন (cations) = ১২.৬২১%০
সোডিয়াম, Na^+	১০.৫৫৬	
ম্যাগনেসিয়াম, Mg^{2+}	১.২৭২	
ক্যালসিয়াম Ca^{2+}	০.৪০০	
পটাসিয়াম, K^+	০.৩৮০	
স্ট্রনসিয়াম, Sr^{2+}	০.০১৩	
সর্বমোট লবণাক্ততা = ৩৪.৪৮২%০		

(সূত্র : Seawater, Open Univ. England 1989)

ভূত্বকে বিভিন্ন প্রধান উপাদানের পরিমাণ হচ্ছে (প্রতি ১ হাজার ভাগে) সিলিকন ২৮.২, গ্র্যালুমিনিয়াম ৮.২, লৌহ ৫.৬, ক্যালসিয়াম ৪.২, সোডিয়াম ২.৪, পটাসিয়াম ২.৪, ম্যাগনেসিয়াম ২.০, টিটান ০.৬, ম্যাঙ্গানিজ ০.১, ফসফরাস ০.১। অথচ ৫নং সারণিতে দেখা যায় যে, সাগরের পানিতে দ্রবীভূত প্রধান উপাদানগুলো সিলিকন, গ্র্যালুমিনিয়াম বা লৌহ নহে। এর কারণ এরা পানিতে সহজে দ্রবীভূত হয় না। ভূত্বক ভেঙ্গে এরা যখন সাগরে নীত হয় তখন এরা দানাকারেই বালি বা

কাদামাটিতে পড়ে থাকে। অপর দিকে সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়াম খুব সহজে দ্রবীভূত হয় বলে সাগরের পানিতে এদের পরিমাণ বেশি।

সাগরের পানির গাঠনিক উপাদান সব সময়ই স্থির, বা ধ্রুব। এটা সমুদ্র বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা (The Constancy of Composition of Sea Water is an important Concept in Oceanography)।

সাগরের বিভিন্ন জায়গায় দ্রবীভূত আয়নের মোট পরিমাণ বিভিন্ন রকম হতে পারে, কিন্তু তাদের আপেক্ষিক সমানুপাত সব সময়েই ধ্রুব বা স্থির থাকে। অন্য কথায় যেকোনো বিশেষ আয়নের গাঢ়ত্ব (concentration) অন্য উপাদানগুলোর মোট পরিমাণের সঙ্গে স্থির অর্থাৎ ৩৪.৪৮ বা ৩৫‰ হবেই। ভিতরে এক একটির পরিমাণে হেরফের ঘটতে পারে।

সমুদ্রজলের স্থূল (মোট) রাসায়নিক উপাদান : প্রকৃতিতে বিরাজমান ৯২টি রাসায়নিক মৌলের সবকটিই সমুদ্রের পানিতে পাওয়া গেছে। সারণি - ৭ থেকে দেখা যাবে কি বিভিন্ন পরিমাণের গাঢ়ত্বেই না এসব মৌলগুলো দ্রবীভূত হয়ে আছে। তবে সবই দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে না, অধিকাংশই দানাকারে থাকে।

১। প্রধান উপাদান : সমুদ্র জলের প্রধান উপাদানগুলোর গড় গাঢ়ত্ব হচ্ছে প্রতি দশ লক্ষে ১টি (1 part per million or ppm) বা 1×10^{-6} ওজনে। এরাই সাগরের দ্রবীভূত লবণের ৯৯.৯%। ৬নং সারণিতে দেওয়া ১১টি মৌলই সবচেয়ে বেশি থাকে সমুদ্রে। তবে এ তালিকায় নাইট্রোজেন, অক্সিজেনকে 'গ্যাস' বলে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। (যদিও এরা বেশি পরিমাণেই আছে)। আবার সিলিকনও বেশ পরিমাণেই রয়েছে তবু এটি পুষ্টিকর দ্রব্য। অক্সিজেন ও সিলিকন বিশেষ করে শক্তিশালী অরক্ষণশীল যৌগ।

২। গৌণ এবং ট্রেস উপাদান : ওজনে প্রতি ১০০ কোটিতে ১টি (1 part per billion or ppb) মৌল থাকলে এমন পরিমাণকে গৌণ উপাদান বা ট্রেস (দাগ) উপাদান বলে। সারণিতে দ্রষ্টব্য স্টাইটানিয়ামের পরের সবগুলোই ট্রেস মৌল।

১১টি প্রধান মৌল পারস্পরিক সমানুপাত ঠিক রেখে চলে, তাই এরা রক্ষণশীলের মত ব্যবহার করে। অন্যদিকে গৌণ এবং ট্রেস উপাদানগুলো অরক্ষণশীলের মত ব্যবহার করে, কেননা জীব ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলো এদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাব বিস্তারের মাত্রার উপরও মৌলের রক্ষণশীলতা বা অরক্ষণশীলতা নির্ভর করে।

সারণি ৭-এ মৌলগুলোর যে তালিকা দেওয়া হলো তা মোটামুটি ধরনের। এটিই শেষ কথা নয়। বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে হিসাব করেছেন। বিভিন্ন উৎস ব্যবহার করেছেন। বিশেষকরে সূক্ষ্ম মৌলগুলোর (Trace elements) পরিমাণ বৈশ্বেশিক পদ্ধতির গুণগত উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। অধিকাংশ উপাদানই অরক্ষণশীল, তাদের গড় হিসাব এত অর্থ বহন করে না।

সারণি-৭ : সমুদ্র জলে রাসায়নিক মৌলের প্রাচুর্যতা

মৌল	চিহ্ন	গাঢ়ত্ব (mg l^{-1}) (Part per million ppm)	কিছু সম্ভাব্য দ্রবীভূত নমুনা	মোট পরিমাণ (টন)
ক্লোরিন	Cl	1.85×10^8	Cl^-	2.59×10^{16}
সোডিয়াম	Na	1.099×10^8	Na^+	1.82×10^{16}
ম্যাগনেসিয়াম	Mg	1.280×10^7	Mg^{2+}	1.91×10^{15}
সালফার/গন্ধক	S	8.05×10^2	SO_4^{2-} , Na_2SO_4	1.2×10^{15}
ক্যালসিয়াম	Ca	8.12×10^2	Ca^{2+}	5.85×10^{18}
পটাসিয়াম	K	0.80×10^2	K^+	5.02×10^{18}
ব্রোমিন	Br	৬৭	Br^-	8.86×10^{13}
কার্বন	C	২৮	HCO_3^- , CO_3^{2-} , CO_2	0.9×10^{13}
নাইট্রোজেন	N	১১.৫	N_2 gas, NO_3^- , NH_4^+	1.5×10^{13}
স্ট্রনসিয়াম	Sr	৮	Sr^{2+}	1.06×10^{13}
অক্সিজেন	O	৬	O_2 gas	9.80×10^{12}
বোরন	B	8.8	B(OH)_3 , B(OH)_4^- , H_2BO_3^-	5.82×10^{12}
সিলিকন	Si	২	Si(OH)_2	2.68×10^{12}
ফ্লোরিন	F	১.৩	F^- , MgF^+	1.92×10^{12}
আর্গন	Ar	০.৪৩	Ar gas	5.68×10^{11}
লিথিয়াম	Li	০.১৮	Li^+	2.08×10^{11}
রুবিডিয়াম	Rb	০.১২	Rb^+	1.58×10^{11}
ফসফরাস	P	6×10^{-2}	HPO_4^{2-} , PO_4^{3-} , H_2PO_4^-	9.80×10^{10}
আয়োডিন	I	6×10^{-2}	IO_3^- , I^-	9.80×10^{10}
বেরিয়াম	Ba	2×10^{-2}	Ba^{2+}	2.68×10^{10}
মোলিবডেনাম	Mo	1×10^{-2}	MoO_4^{2-}	1.02×10^{10}
আর্সেনিক	As	0.9×10^{-3}	HASO_4^{2-} , H_2AsO_4^-	8.88×10^9
ইউরেনিয়াম	U	0.2×10^{-3}	$\text{UO}_2(\text{CO}_3)_2^{4-}$	8.20×10^9
ভ্যানাডিয়াম	V	2.5×10^{-3}	H_2VO_4^- , HVO_4^{2-}	0.01×10^9
অ্যালুমিনিয়াম	Al	2×10^{-3}	Al(OH)_4^-	2.68×10^9
লৌহ	Fe	2×10^{-3}	Fe(OH)_2^+ , Fe(OH)_4^-	2.68×10^9
নিকেল	Ni	1.9×10^{-3}	Ni^{2+}	2.25×10^9
টাইটানিয়াম	Ti	1×10^{-3}	Ti(OH)_4	1.02×10^9
জিঙ্ক বা দস্তা	Zn	5×10^{-8}	ZnOH^+ , Zn^{2+} , ZnCO_3	6.61×10^8
সিজিয়াম	Cs	8×10^{-8}	Cs^+	5.28×10^8
ক্রোমিয়াম	Cr	0×10^{-8}	Cr(OH)_3 , CrO_4^{2-}	0.86×10^8
এন্টিমনি	Sb	2.8×10^{-8}	Sb(OH)_6^-	0.19×10^8

মৌল	চিহ্ন	গাঢ়ত্ব (mg l ⁻¹) (Part per million ppm)	কিছু সম্ভাব্য দ্রবীভূত নমুনা	মোট পরিমাণ (টন)
ক্রিপ্টন	Kr	2×10^{-8}	Kr gas	2.68×10^7
সেলেনিয়াম	Se	2×10^{-8}	SeO ₃ ²⁻	2.68×10^7
নিয়ন	Ne	1.2×10^{-8}	Ne gas	1.59×10^7
ক্যাডমিয়াম	Cd	1×10^{-8}	CdCl ₂	1.02×10^7
তামা	Cu	1×10^{-8}	CuCO ₃ , CuOH ⁺	1.02×10^7
টাংস্টেন	W	1×10^{-8}	WO ₄ ²⁻	1.02×10^7
জারমেনিয়াম	Ge	5×10^{-9}	Ge(OH) ₄	6.61×10^9
জেনন	Xe	5×10^{-9}	Xe gas	6.61×10^9
পারদ	Hg	3×10^{-9}	HgCl ₄ ²⁻ , HgCl ₂	3.99×10^9
জিরকোনিয়াম	Zr	3×10^{-9}	Zn (OH) ₄	3.99×10^9
বিসমাথ	Bi	2×10^{-9}	BiO ⁺ , Bi(OH) ₂ ⁺	2.68×10^9
নিওবিয়াম	Nb	1×10^{-9}	—	1.02×10^9
টিন	Sn	1×10^{-9}	SnO (OH) ₃ ⁻	1.02×10^9
থ্যালিয়াম	Tl	1×10^{-9}	Tl ⁺	1.02×10^9
থোরিয়াম	Th	1×10^{-9}	Th (OH) ₄	1.02×10^9
হাফনিয়াম	Hf	9×10^{-10}	—	9.25×10^9
হিলিয়াম	He	6.4×10^{-10}	He gas	8.99×10^9
বেরিলিয়াম	Be	5.6×10^{-10}	BeOH ⁺	9.80×10^9
স্বর্ণ	Au	8×10^{-10}	AuCl ₂ ⁻	5.29×10^9
রেনিয়াম	Re	8×10^{-10}	ReO ₄ ⁻	5.29×10^9
কোবাল্ট	Co	3×10^{-10}	Co ²⁺	3.99×10^9
লান্থানাম	La	3×10^{-10}	La (OH) ₃	3.99×10^9
নিওভামিয়াম	Nd	3×10^{-10}	Nd(OH) ₃	3.99×10^9
রূপা/সিলভার	Ag	2×10^{-10}	AgCl ₂ ⁻	2.68×10^9
টানটালাম	Ta	2×10^{-10}	—	2.68×10^9
গেলিয়াম	Ga	2×10^{-10}	Ga(OH) ₄ ⁻	2.68×10^9
ইট্রিয়াম	Y	1.3×10^{-10}	Y(OH) ₃	1.93×10^9
সিরিয়াম	Ce	1×10^{-10}	Ce(OH) ₃	1.02×10^9
ডাইস প্রোমিয়াম	Dy	9×10^{-11}	Dy(OH) ₃	1.19×10^9
ইরবিয়াম	Er	8×10^{-11}	Er(OH) ₃	1.6×10^9
ইটেরবিয়াম	Yb	8×10^{-11}	Yb(OH) ₃	1.06×10^9
গেডোলিনিয়াম	Gd	9×10^{-11}	Gd(OH) ₃	9.25×10^9
প্রাসেওডাইমিয়াম	Pr	6×10^{-11}	Pr(OH) ₃	9.93×10^9
স্কেনডিয়াম	Sc	6×10^{-11}	Sc(OH) ₃	9.93×10^9
সীসা	Pb	5×10^{-11}	PbCO ₃ , Pb(CO ₃) ₂ ²⁻	6.61×10^9

মৌল	চিহ্ন	গাঢ়ত্ব (mg l ⁻¹) (Part per million ppm)	কিছু সম্ভাব্য দ্রবীভূত নয়না	মোট পরিমাণ (টন)
হোলমিয়াম	Ho	2×10^{-9}	HO(OH) ₃	2.68×10^6
লুটেটিয়াম	Lu	2×10^{-9}	Lu(OH) ₃	2.68×10^6
থোলিয়াম	Tm	2×10^{-9}	Tm(OH) ₃	2.68×10^6
ইন্ডিয়াম	In	1×10^{-9}	In(OH) ₂ ⁺	1.32×10^6
টারবিয়াম	Tb	1×10^{-9}	Tb(OH) ₃	1.32×10^6
টেলুরিয়াম	Te	1×10^{-9}	Te(OH) ₆	1.32×10^6
সামারিয়াম	Sm	5×10^{-8}	Sm(OH) ₃	6.61×10^8
ইউরো নিয়াম	Eu	1×10^{-8}	Eu(OH) ₃	1.32×10^8
রেডিয়াম	Ra	1×10^{-11}	Ra ²⁺	৯২.৫
প্রোটাকটিনিয়াম	Pa	5×10^{-11}	--	৬৬.১
রেনডন	Rn	6×10^{-16}	Rn gas	9.93×10^{-8}
পোলোনিয়াম	Po	--	PoO ₃ ²⁻ , Po(OH) ₂	--

ভাসমান বস্তু : জৈব ও অজৈব উভয় প্রকার দ্রবীভূত বস্তু ছাড়াও সমুদ্রের সর্বত্র, বিশেষ করে উপকূলের কাছে প্রচুর পরিমাণে ভাসমান বস্তু দেখা যায়। এগুলো মূলত আসে স্থলভাগ থেকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর দ্রাব্য অংশ জলে দ্রবীভূত হয়। জলের প্রবাহে অদ্রাব্য বস্তু সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। অভিকর্ষের টানে এদের একটা বিরাট অংশ জলের তলায় ডুবে যায়। সূক্ষ্ম কণাগুলো সহজে থিতায় না। সমুদ্রের ভাসমান বস্তুর পরিমাণ বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন স্তরে এবং বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রকম। স্থলভাগ থেকে নিষ্কাশিত জল প্রবাহিত বাতাস এবং সমুদ্রস্রোতের শক্তি ও গতিপথ সমগ্র ব্যাপারটিকে প্রভাবিত করে।

ভাসমান বস্তুর দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে সমুদ্রের মৃত প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষয়প্রাপ্ত অবশিষ্টাংশ ও ধ্বংসাবশেষ। স্থলভাগের মত সমুদ্রেও সারা বছর ধরে জন্ম ও মৃত্যু ঘটে চলেছে। বিশাল সমুদ্রে প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি জীবের মৃত্যু হচ্ছে। মৃত্যুর পর অবশ্যজীবীভাবেই তাদের দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হচ্ছে এবং মহাকর্ষের টানে সমুদ্রের তলায় জমা হচ্ছে। দ্রাব্য অংশ সমুদ্রের তলায় যাবার পথে অথবা সমুদ্রের তলায় গিয়ে দ্রবীভূত হচ্ছে। বেশিরভাগ পদার্থ জলে ভাসতে থাকে। জলের উর্ধ্বচাপের ফলে তারা সহজে জলে ডুবে যেতে পারে না। ভাসমান পদার্থ সমুদ্রে যেন নাচতে থাকে। সমুদ্রের যে কোনো গভীরতায় তাদের দেখা যায়।

সমুদ্রে উচ্চাপাতও হয়ে থাকে। সাধারণভাবে যতটা কল্পনা করা যায়, পৃথিবীর বাইরে থেকে আগত এইসব বস্তুর পরিমাণ তার থেকেও অনেক বেশি।

সমুদ্রে দ্রবীভূত গ্যাস : সমুদ্রে দ্রবীভূত গ্যাসের মধ্যে অক্সিজেন সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। সমুদ্রের উপরিতল ও বায়ুস্তরের মধ্যে পারস্পরিক বিক্রিয়ার ফলে এই গ্যাস জমা হয়। বাতাস, স্রোত ও জলের অন্যান্য আবর্তিত গতি এই কাজে সাহায্য করে। জলে বসবাসকারী কোটি কোটি প্রাণী ও উদ্ভিদ সবসময় শ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন নিচ্ছে। অক্সিজেনের দ্বিতীয় উৎস ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন ও অন্যান্য সামুদ্রিক উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া। সমুদ্রের প্রাণী ও উদ্ভিদের শ্বাসক্রিয়া এবং সালোকসংশ্লেষ কিংবা বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন প্রকার বিক্রিয়ার ফলের উপর উদ্ভূত অক্সিজেনের সংযোজন, এই দুই বিপরীত প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল যে কোনো অঞ্চলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ সমান থাকে। সমুদ্রের উপরিতলের ১ লিটার জলে সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ দ্রবীভূত অক্সিজেনের আয়তন ১০ মিলিলিটার। যতই জলের তলায় যাওয়া যায়, সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীর ব্যবহারের ফলে অক্সিজেনের পরিমাণ ততই কমতে থাকে। আরও গভীর অন্ধকার স্তরে অক্সিজেনের ক্ষতিপূরণ হয় না, সেখানে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া কাজ করে না। যে স্তরে ব্যবহৃত অক্সিজেনের পরিমাণ উৎপাদিত অক্সিজেনের সমান হয়, সেই স্তরকে বলা হয় ক্ষতিপূরণকারী গভীরতা।

নাইট্রোজেন ও কার্বনডাই অক্সাইড : সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত অন্য দুটি গ্যাস। সমুদ্রপৃষ্ঠ ও বাতাসের মধ্যে ক্রমাগত সংঘাত ঘটছে, ফলে নাইট্রোজেন জলে দ্রবীভূত হচ্ছে। জীববিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে বায়ুমণ্ডলের ন্যায় সমুদ্রের জলেও নাইট্রোজেনের ব্যবহার খুব একটা বেশি নয়। সমুদ্রের জলে কার্বনডাই অক্সাইড গাঢ় হয় না, কেননা এই গ্যাস সবসময়ই উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার ফলে অপসারিত হচ্ছে। সমুদ্রে কার্বনডাই অক্সাইড থাকে প্রকৃত দ্রবীভূত CO_2 হিসেবে; স্বল্প পরিমাণে অভগ্ন কার্বনিক এসিড $\text{H}_2\text{C O}_3$ হিসাবে, ভগ্ন কার্বনিক এসিড HCO_3 হিসেবে, স্বল্পদ্রব্য কার্বনেট হিসেবে এবং অধিক দ্রব্য বাইকার্বনেট হিসেবে। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি ক্ষারীয় মৌল সমপরিমাণ স্থিত এসিডমূলক অপেক্ষা পরিমাণে অনেক বেশি থাকায় এই কার্বনেট এবং বাই কার্বনেট তৈরি সম্ভব হয়। অতিরিক্ত ক্ষার 'সংরক্ষিত ক্ষার' হিসেবে থাকে এবং কার্বনিক এসিডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উদ্ভিদের ব্যবহারের জন্য কার্বনডাই অক্সাইডের সংরক্ষণের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। ক্ষারের সঙ্গে কার্বন ডাই অক্সাইডের স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে যুক্ত হবার ক্ষমতা, সমুদ্রের জলে অম্ল, ও ক্ষারের সমতা বিধানে সাহায্য করে এবং সকল প্রকার জীবের বাঁচার জন্য সুবিধাজনক পরিবেশের সৃষ্টি করে।

১ মিটার সমুদ্রের জলের প্রকৃত দ্রবণে CO_2 -এর পরিমাণ এক ঘন সেন্টিমিটারের এক দশমাংশ। কিন্তু জলে মুক্ত অথবা যুক্ত কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ ৪৫—৫০ ঘন সেন্টিমিটার। তুলনায় মুক্ত অক্সিজেনের পরিমাণ ৫—১০ ঘন সেন্টিমিটার। এই অতিরিক্ত ক্ষারের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বাইকার্বনেট হিসেবে আছে। অস্থায়ী হওয়ায়, প্রয়োজনের সময় বাইকার্বনেট ভেঙে গিয়ে উদ্ভিদকে CO_2 যোগায়। সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাই অক্সাইড ও বিভিন্ন ক্ষারের মধ্যে সংযোজনের পরিমাণের পরিবর্তন

উদ্ভিদের কাছে ব্যাংকের আমানত, প্রয়োজনীয় CO_2 নিয়মিতভাবে জমা দেওয়া ও তোলা হয়। (Coker R.E. The Great and wide Sea).

স্থলভাগের মত সমুদ্রেরও তাপের প্রধান উৎস সূর্য। দিনের বেলায় সমুদ্রের উপরিতল সূর্যের তাপ টেনে নেয়। সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ এই উত্তাপ সমুদ্রের পরিবহণ ও সঞ্চালন পদ্ধতির সাহায্যে অন্য অংশ ও অন্য স্তরে ছড়িয়ে যায়। লবণাক্ততা, দ্রবীভূত গ্যাস এবং সমুদ্রের জলের রাসায়নিক ধর্মকে উত্তাপ প্রভাবিত করে। বস্তুত রাসায়নিক ধর্মের প্রতিটির সঙ্গে তাপের সরাসরি সম্পর্ক আছে। যেমন তাপ ও গ্যাসীয় উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক বিপরীত। তাপ বাড়লে দ্রবণে গ্যাসের পরিমাণ কমে। সুমেরু অঞ্চলের জলে তাই ক্রান্তীয় অঞ্চলের সমুদ্রের জল অপেক্ষা অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড অনেক বেশি থাকে। লবণাক্ততা কমে তাপের সঙ্গে। অবশ্য, দুটি বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই জটিল। যে কোনো সমুদ্রের জলের বিশেষত্ব এদের উপর নির্ভরশীল। একই অক্ষরেখায় দিনের একই সময় সমুদ্রের উপরিতলের তাপ মোটামুটিভাবে একই রকম। কিন্তু জলের গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা দ্রুত কমতে থাকে। স্বল্প পরিসর গভীরতার মধ্যে যে স্তর পর্যন্ত দ্রুত তাপ পরিবর্তন হয়, সেই স্তরকে বলা হয় থার্মোক্লাইন বা তাপনতিস্তর। থার্মোক্লাইনের নিচে তাপের তারতম্য খুব কম। রাসায়নিক ধর্মের বন্টন এবং ডুবোজাহাজ চালানোর কাজে থার্মোক্লাইনের গুরুত্ব অধিক। সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদ এবং ডুবোজাহাজে ভ্রমণরত মানুষের কাছেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

সমুদ্রের আর্থ-অবস্থা বজায় রাখার কাজে দ্রবীভূত বস্তুসমূহের এবং ভাসমান পদার্থেরও বন্টন অতীব প্রয়োজন। প্রাণের উপস্থিতি অনুপস্থিতি, অথবা প্রাচুর্য এর দ্বারা নির্ধারিত হয়। উদ্ভিদ ক্রমাগত উৎপাদনের ফলে সমুদ্রের উপরিতলের খাদ্যের ঘাটতি ঘটে। তীরভূমি থেকে আসা বস্তুসামগ্রী তীরবর্তী আবার জলের এই ঘাটতি পূরণ করে। অন্যান্য অঞ্চলে ঘূর্ণি, জলের উর্ধ্বগতি, অন্য স্থান থেকে আগত স্রোত এবং সমুদ্রের অন্যান্য স্বাভাবিক ব্যাপার এই অভাব পূর্ণ করে। কিন্তু সমুদ্রে এমন সব বিশাল অঞ্চল আছে যেখানে ঘাটতি পূরণ একেবারেই হয় না। সেইসব স্থানে প্রাণী উৎপাদন খুবই সামান্য। এগুলো সমুদ্রের মরুভূমি। মারগাসো সমুদ্র মরুভূমির মধ্যে বিখ্যাত। এখানে সমুদ্রস্রোত ও জীবসম্পদ নেই বললেই চলে।

ভাসমান পদার্থও সমুদ্রের উৎপাদনক্ষমতা ব্যাহত করে। এগুলো খুব বেশি থাকলে সূর্যরশ্মি জলে প্রবেশ করতে বাধা পায়। ফলে উদ্ভিদ তথা প্রাণী উৎপাদন হ্রাস পায়। খুব বেশি ভাসমান বস্তুকণা থাকলে জীবের শ্বাস-প্রশ্বাসেও বিঘ্ন ঘটে।

বর্তমানে সীমিত সংখ্যায় রাসায়নিক পদার্থ সমুদ্র থেকে তোলা হয়। এগুলোর মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বিমানপোত শিল্পে এটি অতি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল। পৃথিবীর সবকটি সমুদ্র থেকে ধাতুটি প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হচ্ছে। ব্রোমিনও প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা হচ্ছে। রঞ্জক শিল্পে, আলোকচিত্র শিল্পে, গ্যাসোলিনে ব্রোমিন প্রয়োজনীয়। সমুদ্রের আগাছা থেকে আয়োডিনও নিকাশন করা হচ্ছে।

যুগ যুগ ধরে স্থলভাগে বৃষ্টি পড়ছে, নদী দ্রাব্য খাদ্যদ্রব্য বহন করে সমুদ্রে নিয়ে ফেলছে, সমুদ্র সমৃদ্ধ হচ্ছে। সমুদ্র এইভাবেই পৃথিবীর প্রায় সব দ্রাব্য খাদ্যের অফুরন্ত আধার হয়ে উঠছে। সমুদ্রে কেবল যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশের মত পরিচিত খাদ্য আছে তা নয়, আয়োডিন, বোরন, ম্যাঙ্গানিজ, কপার জিংক প্রভৃতি ধাতু এবং প্রাণধারণের উপযোগী অন্যান্য ধাতুও রয়েছে। এইসব রয়েছে এমন পরিমাণে যে সমগ্র মানবজাতি যদি তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য সমুদ্র থেকে নেয় কিংবা তাদের সংগৃহীত সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য সমুদ্রে বিসর্জন দেয়, তাহলেও সমুদ্রের উপাদানে চোখে পড়ার মত পার্থক্য ধরা পড়বে না। সমুদ্রের উদ্ভিদ ও প্রাণীরা হলো সংগ্রহকারী ও ঘনীভবনকারী, এদের তীরে নিয়ে এলেও এরা স্থলভাগ থেকে যা নিয়েছে তার সামান্য অংশই স্থলভাগকে ফিরিয়ে দিতে পারে। পরিমাণগতভাবে বৃহত্তম হলেও গুণগতভাবে সমুদ্র পৃথিবীর সবরকম খাদ্যের উৎসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিখুঁত।

পুষ্টি উপাদান : (১) ফসফেট এবং নাইট্রেট গৌণ কিন্তু প্রয়োজনীয় উপাদান। সাগরের উপরিতলের পানি থেকে প্লাঙ্কটন সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে এটা জৈবকলা গঠনের জন্য সংগ্রহ করা হয়। যেখানে জৈব উৎপাদন খুব বেশি সেখানে ফসফেট ও নাইট্রেট সাগরপৃষ্ঠ জলে শেষ হয়ে যায়। এদেরকে জৈবসীমা উপাদান (biolimiting constituents) বলে; কারণ, এদের ভাণ্ডার শেষ হয়ে গেলে উৎপাদনও বন্ধ হয়ে পড়ে। জীবাণুগুলো (organisms) ভোগ্য হয়ে পড়ে বা মারা গেলে, তাদের দেহ বিশ্লেষিত হয়ে পুষ্টিকর উপাদানগুলো জলস্তম্ভে ফিরে আসে। মজার বিষয় হলো এই যে, সমুদ্র জলে এবং জৈব কলায় নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের (নাইট্রেট ও ফসফেট) অনুপাত ১৫ঃ১ সব সময়ই থাকে। সমুদ্রের পানি ও সমুদ্র জীব দেহেও কেন একই অনুপাতে এই দুই পুষ্টিকর উপাদান থাকে তা সমুদ্র জলীয় রসায়নের একটি রহস্য, এর জবাব আজও পাওয়া যায় নি। সিলিকাও এমনি একটি 'বাইওলিমিটিং' পুষ্টি উপাদান, কিন্তু এটা প্লাঙ্কটনের শরীরের শক্ত অংশ গঠনের জন্য ব্যবহৃত হয়। কংকাল থেকে এর অংশ আন্তে আন্তে দ্রবীভূত হয় এবং সমুদ্রতলে জমা হয়।

(২) সমুদ্রে কার্বন এত প্রচুর পরিমাণে রয়েছে যে তার গাঢ়ত্বের ওপরে জৈব উৎপাদনে এর অংশগ্রহণ খুব একটা প্রভাব বিস্তার করে না। কংকালের দেহ গঠনের জন্য ক্যালসিয়াম থেকে ক্যালসিয়াম কার্বনেট তৈরি হয়। কার্বনের মত এরও ভূমিকা কম। এই দুটো হচ্ছে 'বাইও-ইন্টারমিডিয়েট উপাদান'।

(৩) নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং আরগনের পরে কার্বনডাই অক্সাইড হচ্ছে সর্বাধিক দ্রবীভূত গ্যাস। এদের স্ব স্ব বায়ুমণ্ডলীয় আংশিক চাপের অনুপাতে এরা দ্রবীভূত হয়। পানির সঙ্গে মিলে CO_2 কার্বনিক এসিড বানায় যা বাইওকার্বনেটে এবং কার্বোনেটে আয়নে ভেঙ্গে যায়। এদের (গ্যাসের) গাঢ়ত্ব লেখা হয় ওজন বা আয়তন দিয়ে (mll^{-1}), সংখ্যার দিক দিয়ে এরা খুব একটা পার্থক্য বোঝায় না। কারণ গ্যাসের ঘনত্ব গাঢ় 1 gll^{-1} (প্রতি লিটারে ১ গ্রাম)। তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা বেড়ে গেলে গ্যাসের দ্রবণ ক্ষমতা কমে যায়। তবে চাপ বাড়লে দ্রাব্যতাও বাড়ে। ঘূর্ণন শ্রোতের বলে পানির বিভিন্ন স্তরে গ্যাসের বিক্রেপণ (diffusion) ঘটে।

(৪) সমুদ্রপৃষ্ঠ জলে অক্সিজেন অতি দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। সমুদ্রের আলোকাঞ্চল (photic zone) হচ্ছে এমন এক গভীরতা যে পর্যন্ত জীবকুল দ্বারা শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগে (সালোকসংশ্লেষে) অক্সিজেনের মাত্রা সমান থাকে। 'ক্ষতিক জোনের নিচে কয়েকশ' মিটার গভীরতায় অক্সিজেনের পরিমাণ কমে আসে। মেরু অঞ্চলের গভীর জলে অক্সিজেন বেশি থাকে; কেননা ঠাণ্ডা বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি।

(৫) সমুদ্রের গভীরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে CO_2 গাঢ়ত্ব বাড়তে থাকে। কেননা সালোকসংশ্লেষণের সময় CO_2 ব্যবহৃত হয়ে যায় আর প্রশ্বাসের সময় মুক্তি পায়। চাপে CO_2 এর দ্রাব্যতা বাড়ে। সমুদ্র জলের pH নিয়ন্ত্রণের জন্য (পানিতে অম্লতা বা ক্ষারত্বের মাপকাঠি হচ্ছে pH) CO_2 এর গাঢ়ত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সমুদ্রের উপরিতলের পানিতে অম্লত্ব কম হয় ($\text{pH}=8.0$ হয়) সমুদ্রের গভীরে অম্লত্ব বেশি। জৈব উৎপাদনের ফলে অনেক গৌণ গ্যাস সৃষ্টি হয়ে উপরিতলে জমা হয় এবং বায়ুমণ্ডলে চলে যায়।

(৬) বৃষ্টির জল হচ্ছে সমুদ্রজলের হালকা সংস্করণ। কেননা 'এরোসল' কর্তৃক সামুদ্রিক লবণগুলো আবহাওয়ায় চলে যায় এবং সেখানে বৃষ্টি গঠনের বীজ হিসেবে কাজ করে। নদীর জলে দ্রবীভূত লবণ আসে পার্বত্যাঞ্চল থেকে এবং এখানে ক্যালসিয়াম ও বাইওকার্বনেট আয়ন বেশি থাকে, আর ঐদিকে সমুদ্রজলে ও বৃষ্টির পানিতে সোডিয়াম ও ক্লোরাইড আয়ন বেশি থাকে। নদীতে Na ও Cl আয়ন সমুদ্র লবণ থেকে পাওয়া যায়। শিলা বিচূর্ণ ভবনের (rock weathering) কারণে সমুদ্রজলে সোডিয়াম চলে আসে। তবে ক্লোরাইড, ব্রোমাইট, সালফেট আসে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে। জলতাপীয় (Hydrothermal) তৎপরতার ফলেও সমুদ্র পর্যায়ের অতিরিক্ত মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ এসে ঢুকে।

(৭) সমুদ্র জলের চক্র ১০০০ বছর থেকে ১০ কোটি বছরে সমাপ্ত হয়। গাঢ়ত্ব এবং স্থিতিকালের মধ্যে সামান্য সম্পর্ক রয়েছে। সমুদ্রে জলের আবাসিক সময় হচ্ছে ৪ হাজার বছর এবং নড়ন-চড়ন (stirring, mixing) সময় হচ্ছে ৫০০ বছর।

(৮) আয়ন (দ্রবীভূত তড়িভাণ) রূপে সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত থাকে সব উপাদান। আয়নগুলো জল দ্বারা আবৃত (hydration sphere)। সব আয়ন জোড়া বাঁধে বা কমপ্লেক্স গঠন করে যেখানে পানি যোজন (hydration) কমবেশি একীভূত হয়ে যায়। জলে সবচেয়ে বেশি আয়ন জোড়া দেখা যায় ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এবং কার্বনেটের (MgSO_4 এবং MgCO_3)।

(৯) কিছু সামুদ্রিক জীবাণু তাদের দেহের খোলসের জন্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট ব্যবহার করে। তাদের মৃত্যুর পর তারা গভীর তলদেশে জমা হয়, সেখানে দেহের বিযুক্তি শুরু হয়। এই গভীর তলদেশের সীমাটিকে বলা হয় লাইসোক্লাইন (lysocline)। কার্বনেট ক্ষতি পূরণীয় গভীরতায় (CCD) কোনো ক্যালসিয়াম কার্বনেট থাকে না। CaCO_3 দুইরূপে থাকতে পারে, যথা কম সাধারণ এবং কম স্থিতিশীল হচ্ছে আরাগোনাইট (aragonite) আর বেশি পরিমাণে স্থিতিশীল হিসেবে ক্যালসাইট (calcite)। লাইসোক্লাইন এবং সিসিডি ক্যালসাইটের জন্য খুব গভীর হয়।

উপরিতলের চাইতে গভীর তলদেশে ক্যালসিয়ামের গাঢ়ত্ব খুব বেশি। কার্বনডাই অক্সাইডের ক্ষেত্রেও একই চিত্র; কেননা ক্যালসিয়াম কার্বনেট ভেঙ্গে বা জৈবকলার বিশ্লেষণের ফলে (ক্ষয় ও প্রস্থাসের সাথে) CO_2 বেরিয়ে আসে।

(১০) সমুদ্র জলে গৌণ ও সূক্ষ্ম মৌলগুলো খুব কম আবাসিক সময় পায়। তবে তাদের প্রজাতি সৃষ্টি (speciation) গুরুত্ব বহন করে। কেননা বেশ কিছু মৌলের একাধিক যোজনী অবস্থা থাকায় তারা একাধিক বস্তু হিসেবে বিরাজ করতে পারে। বিভিন্ন ধরনের বস্তুর বিভিন্ন রকমের দ্রাব্যতা হয়ে থাকে। বিজারন প্রক্রিয়ার ফলে কেউ কেউ তলানি হিসেবে জমা হয় অথবা অদ্রবীভূত অন্যান্য মৌলের কমপ্লেক্সের সঙ্গে সহ অধক্ষেপ (Co-precipitated) হয়। অনেকে জৈব প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। তারা সামুদ্রিক জীবাণু কলার সঙ্গে মিশে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে জীবদেহ আধিক্য তলানিতে টেস মৌলও বেশি থাকতে পারে। এদের কেউ বাইওলিমিটিং মাইক্রো পুষ্টিবস্তু; অন্যেরা বাইওইস্টারমিডিয়েট গুণাবলি প্রকাশ করে থাকে।

(১১) পৃথিবীর আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত সমুদ্র জলের উপাদান গঠনে কোনো তারতম্য ঘটেনি। এই চক্র অদ্যাবধি বহমান। তবে $\text{CO}_2 : \text{O}_2$ অনুপাত অন্য রকম ছিল। কার্বনেট বেশি ছিল আর সালফেট কম ছিল। লৌহ এবং ম্যাঙ্গানিজের গাঢ়ত্ব বেশি ছিল। সময়ের তাতে $\text{CO}_2 : \text{O}_2$ অনুপাত কমে এসেছে। যেহেতু কার্বন নির্দিষ্ট হয়ে গেল আর সালোক সংশ্লেষণের ফলে অক্সিজেন নির্গত হতে থাকলো।

সামুদ্রিক জীবকুল দ্বারা উৎপাদিত গ্যাস যেগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বায়ুমণ্ডলে চলে আসে ৩৮৮ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ব্যতিক্রম হলো সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2)। এটি অগুণ্যপাত ও শিল্প কারখানা থেকে নির্গত গ্যাস হিসেবে জারিত হয়ে SO_3 হয় এবং বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের (H_2O) সঙ্গে মিশে H_2SO_4 বা সালফিউরিক এসিড উৎপন্ন করে এবং বৃষ্টির আকারে পতিত হয়।

সারণি ৮ : বিশ্বব্যাপী সমুদ্র বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাস প্রবাহ

গ্যাস	মোট সামুদ্রিক প্রবাহ (g.y.r ⁻¹)	গ্যাস প্রবাহের দিক
সালফার ডাই অক্সাইড SO_2	1.5×10^{18}	বায়ুমণ্ডল-সাগর
নাইট্রাস অক্সাইড N_2O	1.2×10^{18}	সাগর-বায়ুমণ্ডল
কার্বন মনোক্সাইড CO	8.0×10^{17}	সাগর-বায়ুমণ্ডল
মিথেন CH_4	0.2×10^{12}	সাগর-বায়ুমণ্ডল
মিথাইল আয়ডাইড CH_3I	2.9×10^{11}	সাগর-বায়ুমণ্ডল
মিথাইল সালফাইড $(\text{CH}_3)_2\text{S}$	8.0×10^{17}	সাগর-বায়ু

(সূত্র : Gerry Bearman (1989) Sea water) :

ভূত্বকের গড় শিলা থেকে যে পরিমাণ সোডিয়াম এক লিটার সমুদ্র পানিতে প্রবেশ করে সেই শিলাখণ্ডটি কি অন্যান্য উপাদানগুলোতেও ঐ একই লিটারে চালান দিতে পারে? সোডিয়ামের জন্য দ্রবণের শতকরা হার হচ্ছে ৭৫। শিলাখণ্ডের কমপক্ষে ১০% মৌল বিচূর্ণ হয়ে সমুদ্র জলে চলে আসে।

$$\text{এখানে দ্রবণের শতকরা} = ১০০ \times \frac{\text{প্রতি লিটার সমুদ্র জলে, গ্রাঃ}}{\text{প্রতি ৬০০ গ্রাম শিলায়, গ্রাঃ}}$$

এই ফর্মুলা দিয়ে দ্রবণে শতকরা (Percentage in Solution) নির্ণয় করা হয়েছে।

সারণি ৯ : সমুদ্র জলের পদার্থ ও মহাদেশীয় ভূত্বকের শিলার তুলনা

মৌল	মহাদেশীয় ভূত্বকে		সমুদ্রজলে (g l^{-1})	দ্রবণে শতকরা
	%	৬০০গ্রাম শিলায়		
Na	২.৪	১৪.৪	১০.৭৬	৭৪.৭
K	২.১	১২.৬	০.৩৮৭	৩.১
Ca	৪.১	২৪.৬	০.৪১৩	১.৭
Mg	২.৩	১৩.৮	১.২৪৯	৯.৪
Sr	০.০৩৮	০.২৩	০.০০৮	৩.৫
Se	৫×১০^{-৬}	৩×১০^{-৫}	$১০^{-৭}$	০.৩
As	২×১০^{-৪}	১.২×১০^{-৩}	$১০^{-৬}$	০.০৮
Pb	১.২৫×১০^{-৩}	৭.৫×১০^{-৩}	$১০^{-৮}$	০.০০০১
Zn	৭×১০^{-৩}	৪.২×১০^{-২}	$১০^{-৭}$	০.০০০২
Cu	৫.৫×১০^{-৩}	৩.৩×১০^{-২}	$১০^{-৭}$	০.০০০৩
Co	২.৫×১০^{-৩}	১.৫×১০^{-২}	$১০^{-৮}$	০.০০০০৭
Cl	০.০১৩	০.০৭৮	১৯.৩৫০	২৪৮০০
S	০.০২৬	০.১৫৬	০.৮৮৫	৫৬৭
Br	০.০০০২৫	০.০০১৫	০.০৬৭	৪৪৭০
B	০.০০০৩	০.০০১৮	০.০০৪৬	২৫৬

(সূত্র : Gerry Bearman : Sea water , 1983)

সারণি ১০-এ নদী প্রবাহিত কিছু সাগর জলে দ্রবীভূত উপাদানের পরিমাণ এবং স্থিতি সময় দেয়া হল।

১১ সারণিতে মুখ্য কিছু সামুদ্রিক উপাদানের প্রকারগত বিবরণ দেয়া হলো)

সারণি ১০ : নদী প্রবাহ (River Flux) এবং আবাসিক কাল (সমুদ্রজলে কতিপয় দ্রবীভূত উপাদানের ক্ষেত্রে)। সূত্র- প্রাপ্ত।

উপাদান	নদীপ্রবাহ ($\times 10^6$ টন/ প্রতি বৎসর)	সমুদ্রে মোট পরিমাণ ($\times 10^{18}$ টন)	ক্রটিপূর্ণ	আবাসিক সময় ক্রটিশূন্য
Na ⁺	২.০৫	১৪৪	৭০.২	২১০
K ⁺	০.৭৫	৫	৬.৭	১০
Ca ²⁺	৪.৮৮	৬	১.২৩	১
Mg ²⁺	১.৩৩	১৯	১৪.৩	২২
Cl	২.৫৪	১৬১	১০৩	
Hco ₃ ⁻	১৮.৯৫	১.৯	০.১	০.১
SO ₄ ²⁻	৩.৬৪	৩৭	১০.২	১১
SiO ₂	৪.২৬	০.০৮	০.০২	
Fe	০.২২	০.০০০০১৪	০.০০০০০৬	
Mn	০.০০১	০.০০০০২	০.০০০২	
Cu	০.০০০৭	০.০০০০২১	০.০৩	
Co	০.০০১	০.০০০০১	০.০০০১	
Zn	০.০০০৭	০.০০০০৪২	০.০০৬	

সারণি ১১ মুখ্য কিছু সামুদ্রিক উপাদানের প্রকারগত বিবরণ (সূত্র প্রাপ্ত)

আয়ন	গাঢ়ত্ব (mol l ⁻¹)	মুক্ত আয়ন %	সালফেটের সঙ্গে %	বাই কার্বনেটের সঙ্গে (%)	কার্বনেটের সঙ্গে (%)	
Ca ²⁺	০.০১০৪	৯১	৮	১	০.২	
Mg ²⁺	০.০৫৪০	৮৭	১১	১	০.৩	
Na ⁺	০.৪৭৫২	৯৯	১.২	০.০০১	-	
K ⁺	০.০১০০	৯৯	১	-	-	
			Ca এর সঙ্গে (%)	Mg এর সঙ্গে (%)	Na এর সঙ্গে (%)	K এর সঙ্গে (%)
SO ₄ ²⁻	০.০২৮৪	৫৪	৩	২১.৫	২১	০.৫
HCO ₃ ⁻	০.০০২৩৮	৬৯	৪	১৯	৮	-
CO ₃ ²⁻	০.০০০২৬৯	৯	৭	৬৭	১৭	-

বঙ্গোপসাগরের রাসায়নিক সমুদ্র বিজ্ঞান

বর্তমান যুগে সীমিত সংখ্যার রাসায়নিক পদার্থ সমুদ্রের পানি থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লবণ, দুই তৃতীয়াংশ ম্যাগনেসিয়াম এবং অর্ধেক ব্রোমিন সমুদ্রের পানি থেকে সংগ্রহ করা হয়। বঙ্গোপসাগরের পানি বিশ্লেষণ করলে ঠিক এমন চিত্রটিই পাওয়া যাবে। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বঙ্গোপসাগরে পৃথিবীর পদার্থের পরিমাণ বাড়ে-কমে। এই সাগরে রাসায়নিক সমুদ্র বিজ্ঞানের কাজ 'জন মারি অভিযানের' সময় শুরু হয়। তারপর সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বেশ কিছু অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। কেবল IOE. অভিযানের সময় ১৯৬০-৬৫ সনে অনেক তথ্য পাওয়া যায় যা McGill D.A (1973) কর্তৃক Light and Nutrients in the Indian Ocean In : B Zeitzschel (ed), the Biology of "The Indian Ocean Springer Verlag, Berlin. 53-102 pp বিশদভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা দর্শক, গবেষণা এবং 'সাগর কন্যা', জাহাজে করে বঙ্গোপসাগরে রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ নির্ণয় ও পানির বিশ্লেষণ করেন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে। এতে তাঁরা রাসায়নিক পদার্থের বিতরণ, চিহ্ন এবং আন্তঃসম্পর্কসহ বঙ্গোপসাগরের জন্য অনন্য বৈশিষ্ট্যময় কিছু মজাদার তথ্যেরও সন্ধান লাভ করেছেন। রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলোর সাধারণ একটি বর্ণনা নিচে দেয়া হলো।

বঙ্গোপসাগরের পানির রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য : বঙ্গোপসাগরে পানির মন্থর সঞ্চালন (Sluggish circulation) এবং দুর্বলভাবে পুনরাবৃত্তির দরুন ১০০ মিটার থেকে ১০০০ মিটার গভীর পর্যন্ত স্বল্প পরিমাণের অক্সিজেনের একটি পুরুস্তর সারা এলাকায় বিস্তৃত রয়েছে। এই সাগরে প্রতি লিটার পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ মাত্র অর্ধমিলি লিটার বা ০.৫ মিঃ লিটার।

মৌসুমী বায়ুর চক্রগতির জন্য উত্তর ভারত মহাসাগরে পানির উর্ধ্ব প্রবাহের দরুন ফসফেট ফসফরাস উচ্চহারে এবং অক্সিজেন অল্পহারে পরিলক্ষিত হয়। ফসফেট ফসফরাসের ঘনমাত্রার (concentration) পরিমাণ ০.৪ মাইক্রোমোল/ প্রতি লিটারে এই রেঞ্জ থেকে ১ মাইক্রোমোল/লিটার। নাইট্রেটের পরিমাণও ফসফেটের মতই। সমুদ্র পৃষ্ঠের অল্প গভীরে এর পরিমাণ হয় প্রতি লিটারে ১ মাইক্রোমোল এবং ৩০০০-৪০০০ মিটার গভীর তলদেশে নাইট্রেটের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রতি লিটারে ৫০ মাইক্রোমোল।

তেলবাহী জাহাজ থেকে নিঃসরিত পেট্রোলিয়াম হাইড্রোকার্বনের পরিমাণ প্রতি বর্গমিটার সমুদ্র পৃষ্ঠে বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন রুটে ০ হতে ৬৯.৭৫ মিলিগ্রাম। এ পরিমাণ আরব সাগরে মাত্র ০-৬.০ mg/m⁻² আর ট্যাঙ্কার পথগুলোর ২০ মিটার গভীর পানিতে বঙ্গোপসাগরে ২৮.২ মাইক্রোগ্রাম প্রতি কিলোগ্রাম পানিতে। পুরো বঙ্গোপসাগরে দ্রবীভূত পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের পরিমাণ হচ্ছে ০.৪×১০^৬ টন। অন্যান্য দ্রবীভূত ভারী ধাতুর পরিমাণ হচ্ছে : তামা ০.০৮-৪৯.১, র্যাডমিয়াম ০.০১-১.৮৮, লোহা ০.১০-৯৬, ম্যাঙ্গানিজ ০.০৭-৮০, জিঙ্ক ০.৩-৪২.৪, নিকেল ০-১৬.৩, কোবালট ০-৭.৯ এবং সীসার পরিমাণ ০.০২-৭.৫ লিটার প্রতি

মাইক্রোগ্রামে সবার জন্য। বঙ্গোপসাগরের নদীর মোহনায় সবচেয়ে বেশি কোবাল্ট লক্ষ্য করা গেছে। সবচেয়ে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ পারদ (মারকারি) পাওয়া গেছে ১৩-১৮৭, অন্য পর্যবেক্ষণে ০-২০৪ মনোগ্রাম প্রতি লিটারে। যতই তলদেশে যাওয়া যায় ততই এর পরিমাণ কমতে থাকে।

সিরিকাট পাওয়া যায় সাগর পৃষ্ঠের জলরাশিতে সবচেয়ে বেশি। এন্টার্কটিকাতে এর পরিমাণ ৩৫-৭০ মিলিগ্রাম। প্রতি ঘনমিটার পানিতে, আর বঙ্গোপসাগরে ৩-৫ মিঃ গ্রাম এবং কোনো অবস্থাতেই ১০ মিঃ গ্রাঃ বেশি নয়। বঙ্গোপসাগরের রাসায়নিক পদার্থগুলির পরিমাণ ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। সারণি ১২-তে উত্তর বঙ্গোপসাগরের পানিতে ফসফরাসের বিতরণ চিত্র দৃষ্টব্য।

সারণি ১২. উত্তর বঙ্গোপসাগরে ফসফরাস ভগ্নাংশের ($\mu\text{g-atl}^{-1}$) বিতরণ (McGil D. A. 1968).

(১) সর্বমোট ফসফরাস

সাগর পৃষ্ঠ থেকে ৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত	০.৯০—১.৫২ গড়	(১.২৩)
৫০ — ২০০ মিঃ	১.৫২—২.৬৪	(২.০৬)
২০০ — ৫০০ মিঃ	২.৬৪—৪.৬০	(৩.০০)
৫০০ — ১০০০ মিঃ	২.৮৬—৩.২০	(২.৯৭)
১০০০ — ২০০০ মিঃ	২.৬২—৩.১৫	(২.৯০)
২০০০ মিটারের বেশি	২.৪১—৩.১৫	(২.৭৯)

(২) অজৈব ফসফেট

০ — ৫০ মিঃ	০.০২—০.৪৪	(০.১০৫)
৫০ — ২০০ মিঃ	০.২১—১.৭২	(১.১৫)
২০০ — ৫০০ মিঃ	২.৫১—২.৯১	(২.৭৩)
৫০০ — ১০০০ মিঃ	২.৭৬—৩.২২	(২.৯৩)
১০০০ — ২০০০ মিঃ	২.৬১—৩.১৯	(২.৯২)
২০০০ মিটারের বেশি	২.৪০—৩.০৮	(২.৬৮)

(৩) দ্রবীভূত জৈব ফসফরাস

০ — ৫০ মিঃ	০.৬৪—১.৬৩	(১.০৬)
৫০ — ২০০ মিঃ	০.৩৯—১.৮৭	(০.৯৮)
২০০ — ৫০০ মিঃ	০.০৭—১.৮৪	(০.৩৬)
৫০০ — ১০০০ মিঃ	০—০.১৬	(০.০২৫)
১০০০ — ২০০০ মিঃ	— ০	
২০০০ মিটারের বেশি	০—০.৩১	(০.০৯)

(৪) কণায়ুক্ত জৈব ফসফরাস

০ — ৫০ মিঃ	০.০৩—০.১৫	(০.০৫৫)
৫০ — ২০০ মিঃ	০ — ০.১২	(০.০৩)
২০০ — ৫০০ মিঃ	০ — ০.০৪	(০.০১)
৫০০ — ১০০০ মিঃ	০ — ০.০৫	(০.০০৫)
১০০০ — ২০০০ মিঃ	০ — ০.০৩	(০.০০৫)
২০০০ মিটারের বেশি	০ — ০.০৬	(০.০৩)

উত্তর বঙ্গোপসাগরের শুধু জৈব ফসফরাস সমুদ্র পৃষ্ঠের পানিতে বেশি পাওয়া গেছে যা ১০০০ মিটার গভীরতায় সামান্য।

দ্রবীভূত অক্সিজেন (Dissolved Oxygen)

লাফন্ড (LaFond E. C 1966) বঙ্গোপসাগরের কেন্দ্রস্থলে ৩০০ মিটার গভীর পর্যন্ত প্রতি লিটার পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ০.১ মিলিমিটার শনাক্ত করেছেন। উর্ধ্ব পানি প্রবাহের দরুন গভীর পানি যখন উপরে আসে তখন তাতে পৃষ্ঠদেশের পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে আসে।

ইভানেনকভ এবং তাঁর সহযোগীরা (Ivanenkov V. N. et-al 1964) “ভিভিজ” জাহাজে করে HOE এর সময় বঙ্গোপসাগরে দ্রবীভূত অক্সিজেনের যে পরিমাণ নির্ণয় করেন তা ১৩ নং সারণিতে দেয়া হলো।

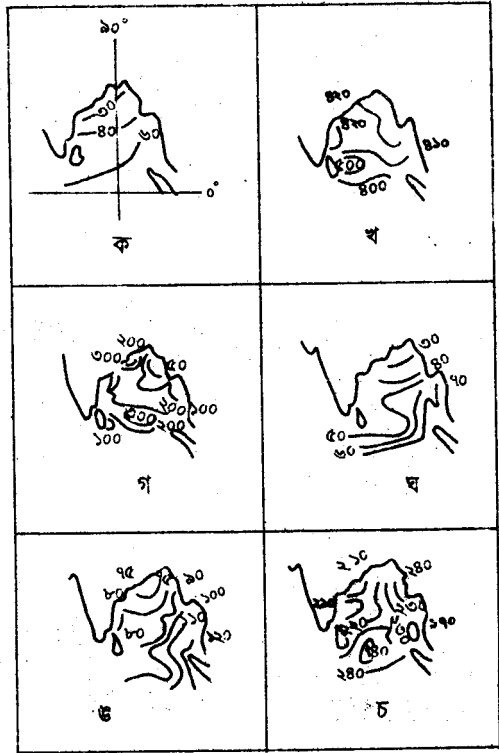
সারণি ১৩ : বিভিন্ন গভীরতায় দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ :

দিগন্তরাল গভীরতা মিটার	৩০.১. ১৯৬১ ২৬°০৫' অক্ষাংশ ৮৩.১৪' দ্রাঘিমাংশ		১৩.১১. ১৯৬১ ৯°.৩৭' . ৯০°৫৩'	
	Mkg. atom /liter	% দ্রবণতা	Mkg. atom /litre	% দ্রবণতা
০	৪১৯	১০১	৪০৯	১০২
১০	৪১৯	১০১	৪০৪	১০১
২৫	৪১২	১০১	৪০৫	১০১
৫০	৪০৬	১০০	৩৯৫	৯৯
৭৫	৮০	১৯	৪১১	১০৩
১০০	২১	৫	৩৪৩	৮৬
১২৫	২৬	৪	১৪২	৩৪
১৫০	১৪	৩	৫৪	১২
২০০	১৮	৪	৪০	৮
৩০০	২৩	৪	৪৯	৯
৪০০	২৬	৫	৫০	৯
৫০০	৩১	৬	৫৪	১০
৮০০	৬০	১০	৯৫	১৬
১০০০	৮৫	১৫	১১৫	১৯
১৫০০	১৫৫	২৫	১৭৭	২৮
২০০০	২১৫	৩৩	২২৯	৩৫
২৫০০	২৪৫	৩৭	২৬০	৩৯

মাদ্রাজ উপকূলে ১০০ মিটার গভীরতায় অক্সিজেনের পরিমাণ ৫০—৩০ (Mkg-atom/litre (১০-৬% দ্রবীভূত অক্সিজেন)। উত্তর বঙ্গোপসাগরে সর্বনিম্ন অক্সিজেন ৪০০—৫০০ (১৫০—৫০০-৬০০ মিটার পর্যন্ত) মিটার গভীরতায় পাওয়া যায় ২০—৪০ Mkg-atom/litre (৪-৭%), অথচ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অক্সিজেনের পরিমাণ উত্তরের দ্বিগুণ, প্রায় ৪০—৬০ Mkg-atom/litre (৮-১১%)। %বলতে এখানে বুঝায় অক্সিজেন দ্বারা পানিতে দ্রবীভূত হবার পর সংপৃক্ততার (Saturation) মাত্রা। Mkg এর ১০০০ ভাগের ১ ভাগ হচ্ছে মিলিলিটার (ml) (চিত্র ৪.১।

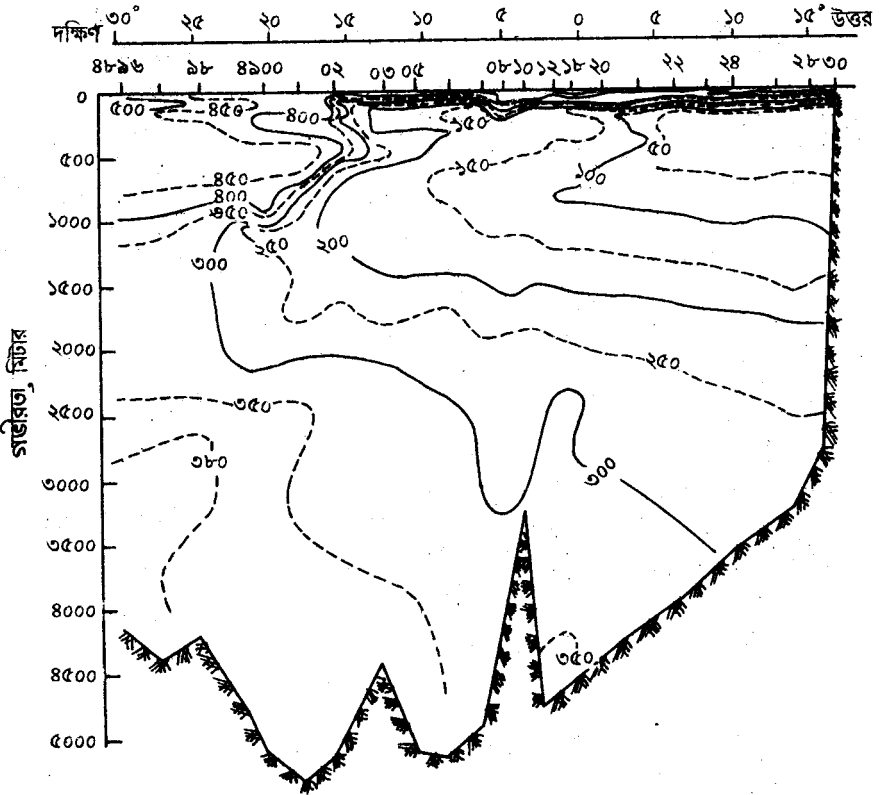
অক্সিজেনের উল্লম্ব বিতরণ

বঙ্গোপসাগরের ২০০০ মিটার গভীরতায় উত্তর-পশ্চিম উপকূলে ২১০—২২০, বার্মার উপকূলে ২৩০—২৪০ এবং দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ২৩০—২৪০ Mkg-at/litre (১৯৬০—৬১ সনে) গড়ে ২১০—২৪০ (৩৩—৩৬%) ইভানেনকভ কর্তৃক পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৫০—৭০০ মিটার গভীরতায় বঙ্গোপসাগরে ২০—৫০ মাংগ্রাঃ এটম/ লিটারে (Mkg-at/l) অক্সিজেন রেকর্ড করা হয়েছে। ১৯৬০-৬৫ সনে IOE পরিচালিত হবার সময় ভারতীয় জাহাজ INS KISTNA-তে বিজ্ঞানী গার্গ ও মুর্তী ১৯৬৩ সনে ভিসাখাপত্তম মাদ্রাজ উপকূল ধরে দক্ষিণ বার্মা উপকূল ভাগসহ মধ্য বঙ্গোপসাগরে অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ণয় করেন। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে (J. N. Garg & C. B. Murty) উপরের স্তরে ৪.০—৪.৪০ মিলিলিটার/লিটারে ২৭° সেলসিয়াস পানির তাপমাত্রায় অবলোকন করেন এবং ১৫০—৫০০ মিঃ



চিত্র ৪.১ : (ক) সর্বনিম্ন ঘনমাত্রার অক্সিজেনের বিতরণ
(খ) সমুদ্র পৃষ্ঠে অক্সিজেনের বিতরণ (গৈনেনকভ)
(গ) ১০০ মিটার গভীরে দ্রবীভূত অক্সিজেনের বিতরণ
(ঘ) ৬০০ মিটার গভীরে অক্সিজেনের বিতরণ
(ঙ) ১০০০ মিটার গভীরে অক্সিজেনের বিতরণ
(চ) ২০০০ মিটার গভীরে অক্সিজেনের বিতরণ।

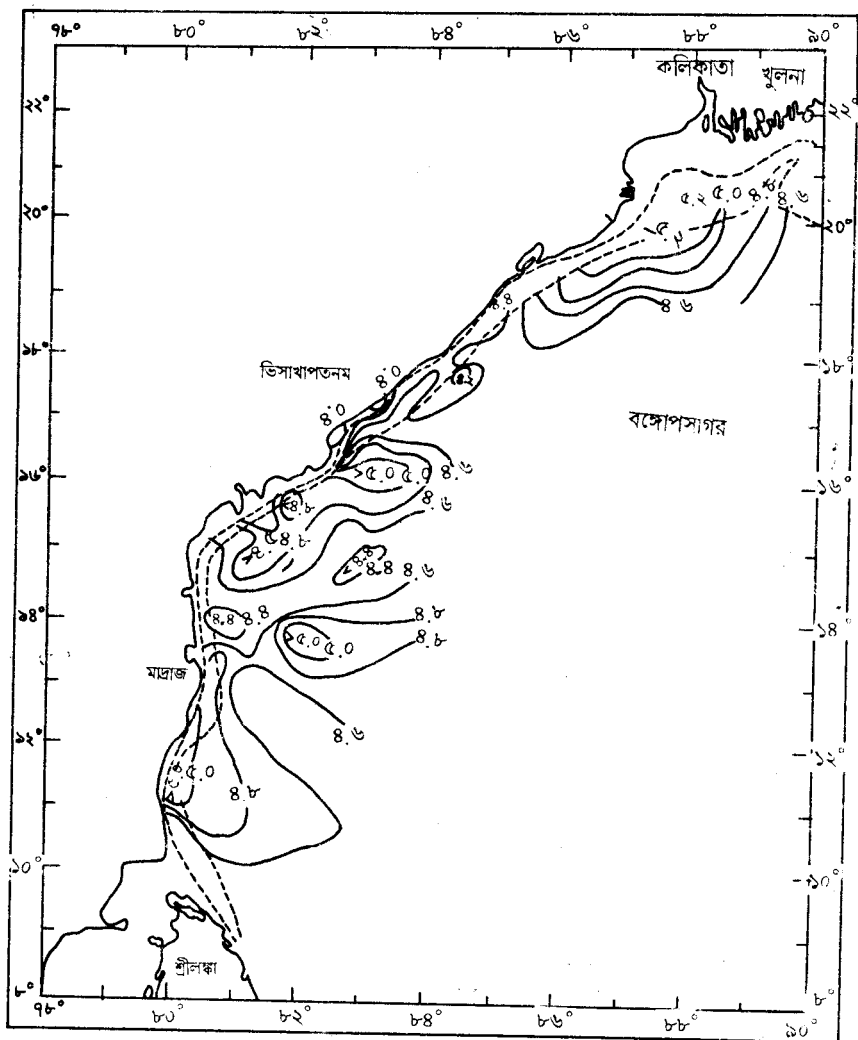
গভীরতায় এর পরিমাণ হয়েছিল ০.৫-১.০ ml/L.। বঙ্গোপসাগরের মধ্যভাগে ৮০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ৪.০-৪.৫০ ml/L. ২৬° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় লক্ষ্য করা গেছে। এই গভীরতার পর হঠাৎ করেই (৮০-১৩০-২০০ মিটার) ০.৫ ml/L অক্সিজেন দেখা গেছে। এ অঞ্চলের কোনো কোনো স্থানে ০.২৫ থেকে ০.৩-০.৫ ml/L অক্সিজেন ১০০-৪৫০ মিটার তলদেশে পাওয়া গেছে।



চিত্র ৪.২ : (ক) অক্সিজেনের উল্লম্ব বিতরণ (ভিসাখাপত্তম উপকূলে)।

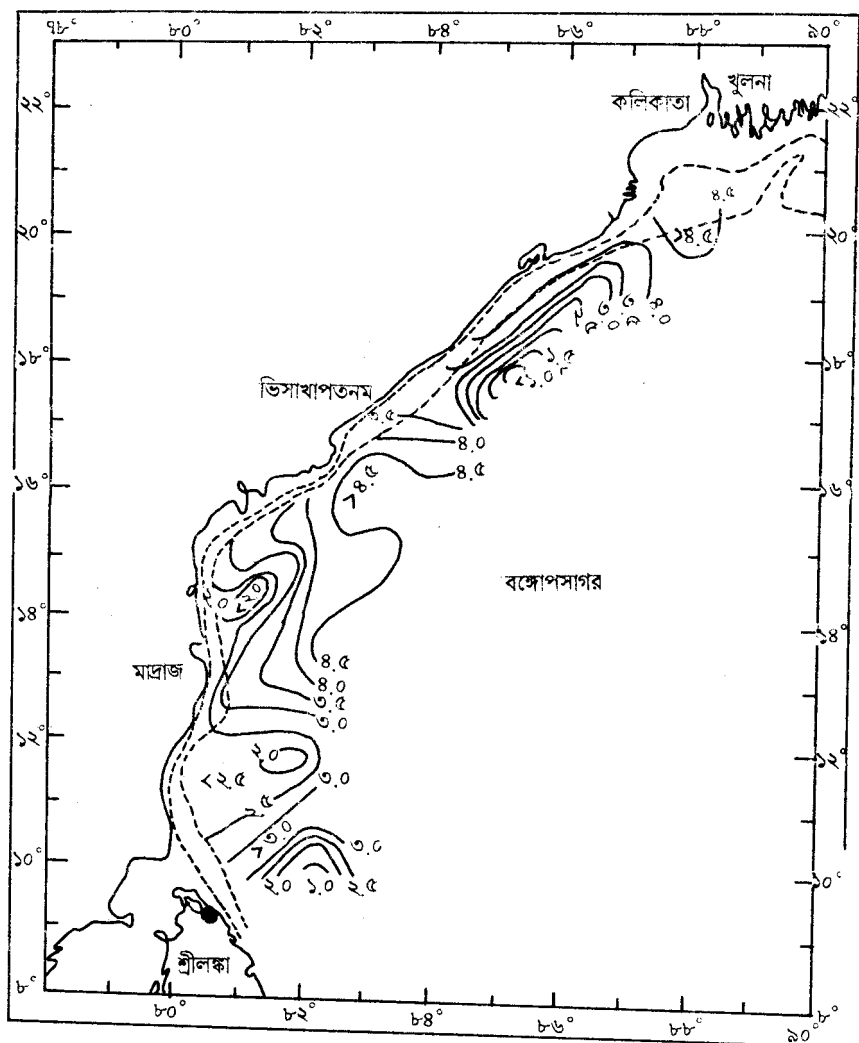
১৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত অক্সিজেনের বিতরণ সরাসরি পানির তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। ৪.০ থেকে ১.০ ml/L অক্সিজেনের ঘনত্বের হারের এই পরিবর্তন সমোষ্ণ স্তরের সঙ্গে তাপনতি স্তরের অবনতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে স্বল্পমাত্রার অক্সিজেন স্তরের

বেলায় তাপমাত্রার প্রভাব ছাড়াও পানির উল্লম্ব মিশ্রণ এ ক্ষেত্রে অনেকটা দায়ী। অক্সিজেনের স্বল্পতা এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের উদ্ভব এ স্তরে স্থানীয় উৎপাদনশীলতার জন্যও ঘটে থাকে। ভিরটিকির মতে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দরুন স্বল্প অক্সিজেনের স্তরে অক্সিজেনের চাহিদা পূরণ হয় এর অবস্থান এবং বিতরণ নির্ণিত হয় অক্সিজেন স্তরের আকার, সঞ্চালন, বিশেষ করে গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেনের ব্যবহার



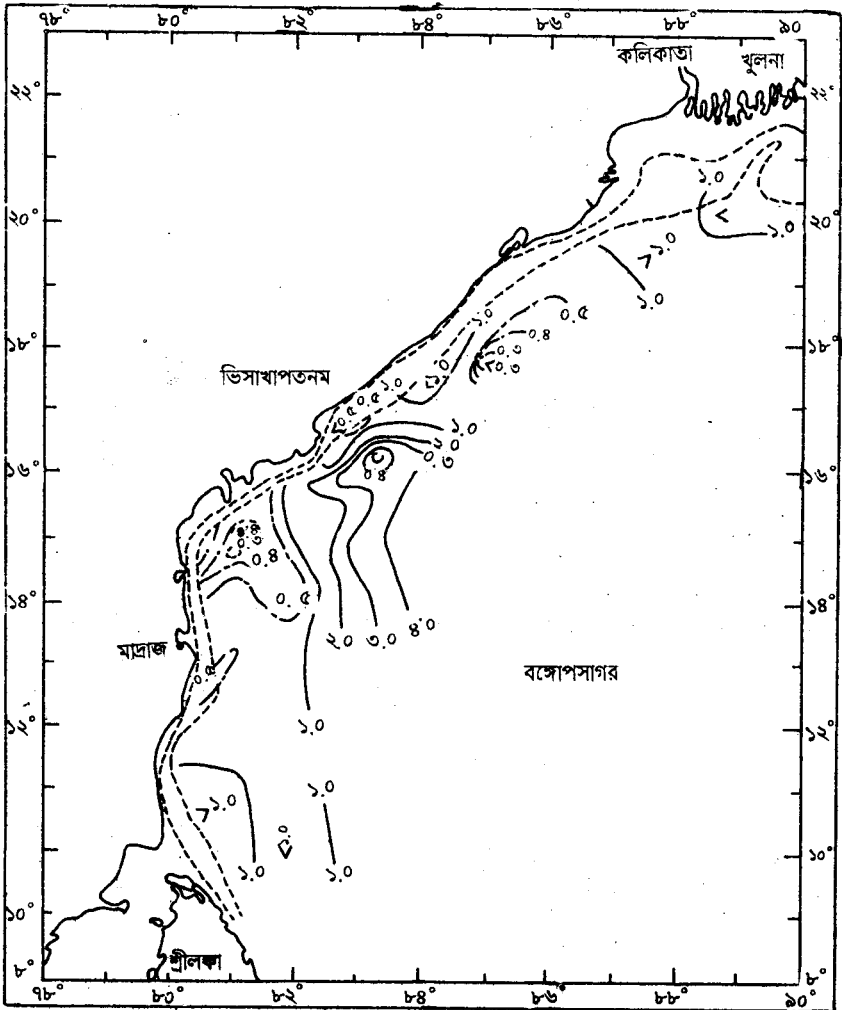
চিত্র ৪ ৩ : (ক) সমুদ্রপৃষ্ঠে দ্রবীভূত অক্সিজেনের বিতরণ (নাকভী) :

হঠাৎ করেই কমে আসার কারণটি দ্বারা। বিজ্ঞানীরা বিশেষ গভীরতায় পানি সঞ্চালনের উত্তর দিকে প্রবাহের ফলকেই বঙ্গোপসাগরের উত্তর দিকে স্বল্পমাত্রার অক্সিজেনের উপস্থিতির কারণ হিসেবে মনে করেন যা ভৌত সামুদ্রিক বিজ্ঞান অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে অক্সিজেনের পরিমাণ ০.৫ ml/L এরও কম।



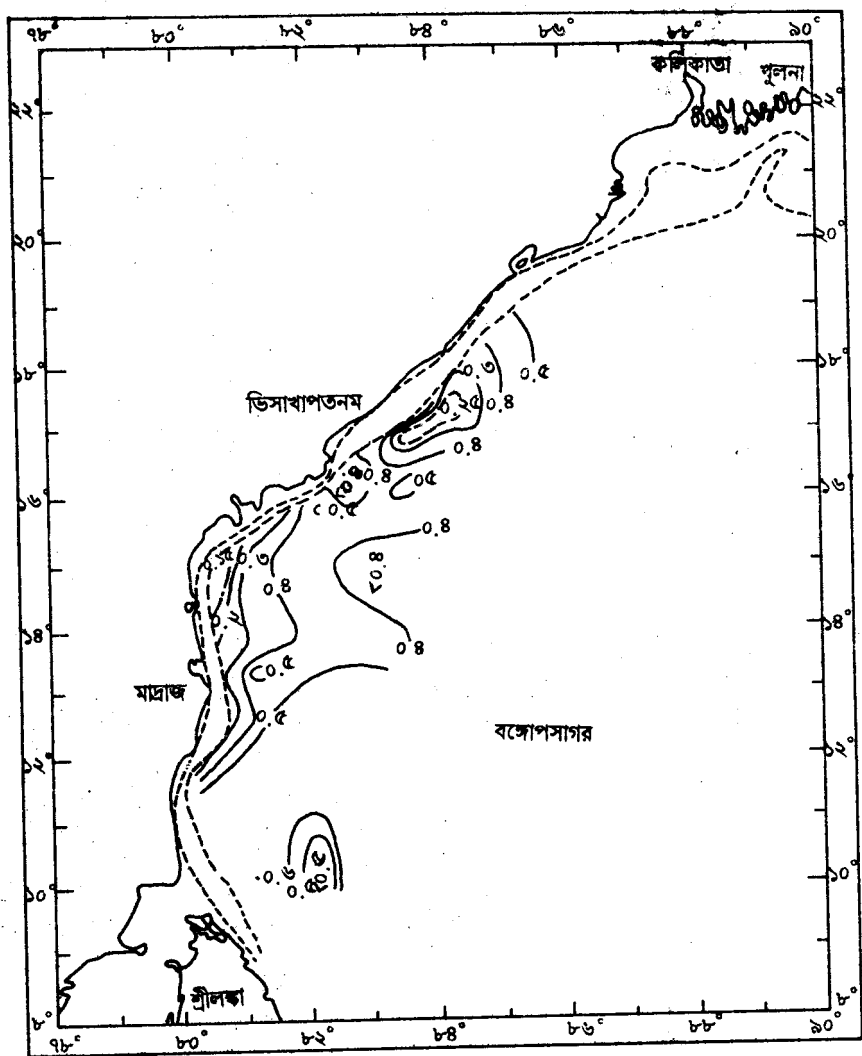
চিত্র ৪.৩ : (খ) ৫০ মিটার গভীরতায় দ্রবীভূত অক্সিজেনের বিতরণ।

HOE-এর পরে ১৯৭৬ সনে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে এবং সুন্দরবন থেকে দক্ষিণাঞ্চলে ভারতীয় বিজ্ঞানী S. W. A. Naqvi-এর দল 'আরভি গবেষণা' করে যে অনুসন্ধান চালান তাতে তাঁরা সমুদ্রপৃষ্ঠ তলে ৩.৯২ থেকে ৫.৬৯ ml/litre অক্সিজেন নির্ণয় করেন। আর ৫০ মিটার গভীরতায় ঐ হার ছিল ১.০ থেকে ৪.৫, ১০০ মিটার

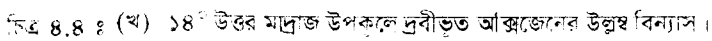
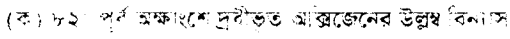


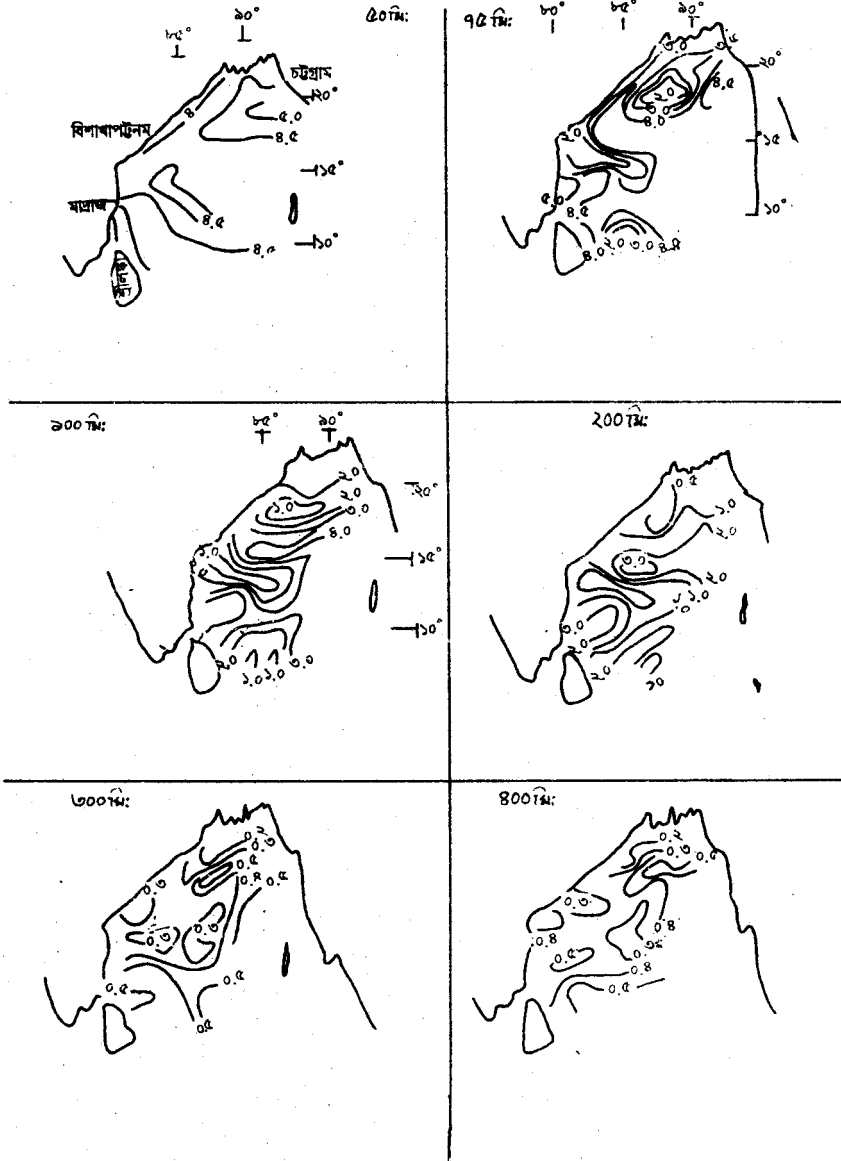
চিত্র ৪.৩ঃ (গ) ১০০ মিটার গভীরতায় দ্রবীভূত অক্সিজেনের বিতরণ।

গভীরতায় ০.৫ থেকে ৪.০ ml/l এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ৪.০ ml/l এর বেশি অক্সিজেনের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, পানির উর্ধ্ব ও নিম্ন প্রবাহ এসব তারতম্যের কারণ। ২০০ মিটার গভীরতায় স্টাডি অঞ্চলে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা গেছে মাত্র ০.৪ ml/l. অক্সিজেনের বিতরণের উল্লম্ব বিন্যাসে (চিত্র-৪.১ ক, খ, গ, ঘ) দুটি অক্সিজেন স্বল্পতা ১০০-২৫০ মিটার গভীরতায় ও ৪০০-৬০০ মিটার গভীরতায় দক্ষিণ-পশ্চিম



চিত্র ৪.৩ : (ঘ) ২০০ মিটার গভীরতায় দ্রবীভূত অক্সিজেনের বিতরণ।





চিত্র ৪.৫ : সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৫০, ৭৫, ১০০, ২০০, ৩০০ ও ৪০০ মিটার গভীরে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ (বাম থেকে ডান দিকে)

বঙ্গোপসাগরের (মাদ্রাজ থেকে উত্তরে তিসাখাপত্তম পর্যন্ত) লক্ষ্য করা গেছে, সেখানে উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাত্র ১টি স্বল্পতা পাওয়া গেছে। Wyrski (১৯৭১) এটার কারণ হিসেবে বলেছেন যে, উত্তর বঙ্গোপসাগরের জৈব পদার্থগুলোর জারনের ফলে সাগর পৃষ্ঠ থেকে নিচে ডুবে গিয়ে শাইক্লোক্লাইন স্তরে অর্থাৎ ঘনত্ব হঠাৎ যে স্তরে হ্রাস পায় এমন স্থানে জমা হয়। এ স্তরে অক্সিজেনের পরিমাণ জৈব পদার্থের সরবরাহের উপর সরাসরি নির্ভরশীল। শেষোক্তরা আবার জৈব উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভর করে। উপকূলীয় অঞ্চলে স্থলভাগ থেকে বাহিত জৈব পদার্থও এক্ষেত্রে স্বীয় অবদান রাখে। ৫০০ মিটার পর্যন্ত গভীরতায় অক্সিজেনের স্বল্পতার প্রধান কারণ হচ্ছে জৈব পদার্থের জারন ক্রিয়া। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে তুলনামূলকভাবে অধিক মাত্রায় অক্সিজেনের উপস্থিতির কারণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় পানি ভারত মহাসাগরে প্রবেশের ফলে এ পানিতে বেশি অক্সিজেন থাকে।

বঙ্গোপসাগরের উপরিতলে অক্সিজেন সংমিশ্রণভাবে থাকে এবং এখানে সম্পৃক্ততাও সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যায়। বিশেষকরে ফেব্রুয়ারি-মে মাসে মৌসুমী বায়ুর প্রাক্কালে। এ সময় সূর্য কিরণ বেশি হওয়ায় প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় পানির কয়েক মিটার গভীরে। পানির উর্ধ্ব প্রবাহের ফলে পৃষ্ঠদেশের অক্সিজেন ঘনত্ব সম্পৃক্ততার মাত্রা হিসেবে কম হতে পারে এবং থার্মোক্লাইন স্তরে হঠাৎ করে অক্সিজেন কমে যায়। ঘনত্বের বিশাল অবক্রমের দরুন এবং বঙ্গোপসাগরে অর্ধেকাংশ বদ্ধমুখ হওয়ার ফলে দিগন্তরাল আনুভূমিকতা সামান্য হয়। সেই সাথে উচ্চহারে জৈব পাদার্থের সরবরাহের দরুন বাংলাদেশের উপকূলভাগ নিকটবর্তী অংশে সাগরে অক্সিজেনের পরিমাণ কম হয়ে থাকে। ১৯৬১-১৯৮২ সাল পর্যন্ত গবেষণায় এ তত্ত্বগুলো জানা গেছে। আবার মধ্যবর্তী স্তরে ২০০-১০০০ মিটার গভীরতায় অক্সিজেন কমে সর্বনিম্ন সীমায় পৌঁছে যায় (০.২ MI/L নাইটেটের জীব রাসায়নিক হ্রাসের দরুন। ইভানেনপকভ (১৯৬১) সনে বঙ্গোপসাগরে হাইড্রোজেন সালফাইড পাবার যে দাবি করেছিলেন পরবর্তীতে কোনো গবেষকই তা শনাক্ত করতে পারেননি।

বঙ্গোপসাগরে ফসফরাস বিতরণ

রুশ বিজ্ঞানী ইভানেনপকভ (১৯৬৪) বঙ্গোপসাগরে ফসফরাসের ঘনত্ব (পরিমাণ) নির্ণয় করেছিলেন ৯৮৩ মিটার গভীরতা থেকে ১৫০০ মিটার পর্যন্ত। ফসফরাস পাওয়া যায় ১.৮৮—২.৪৫ Mkg-atom/litre. আর ৩০০০—৩৯০০ মিটার গভীরতায় পাওয়া যায় ২.১৮—২.৬৬ পর্যন্ত। HIOE এর অধীনে ভারতীয় বিজ্ঞানী রাও ভি.সি এবং রাও সত্যনারায়ণ ১৯১৩ সনে উত্তর বঙ্গোপসাগরে (চট্টগ্রাম অবধি) যে অনুসন্ধান চালান তাতে পুরা ফসফরাসের বিভিন্ন পরিমাণ তারা লিপিবদ্ধ করেন। ৫০ মিটার পর্যন্ত গভীরতায় গড় ফসফরাস ছিল ১.২৩ মাইক্রোগ্রাম-এটম প্রতি লিটারে ৫০—২০০ মিটার গভীরতায় ২.০৬, ২০০—৫০০ মিটারে ৩.০৯, ৫০০—১০০০ মিটারে ২.৯৭, ১০০০—২০০০ মিটারে ২.৯০, ২ কিলোমিটারের উপরে ২.৭৯ Mg-at/Litre। আর অজৈব ফসফেট লক্ষ্য করেন নিম্নরূপ : ৫০ মিটার পর্যন্ত গভীরতায় ০.১০৫, ২০০

মিটার পর্যন্ত ১.১৫, ৫০০ মিটার পর্যন্ত ২.৭৩, ১০০০ মিটার পর্যন্ত ২.৯৩, ২ কিলোমিটার পর্যন্ত ২.৯২, এর বেশি গভীরে ২.৬৮ মাইক্রোগ্রাম-এটম লিটার প্রতি পানিতে।

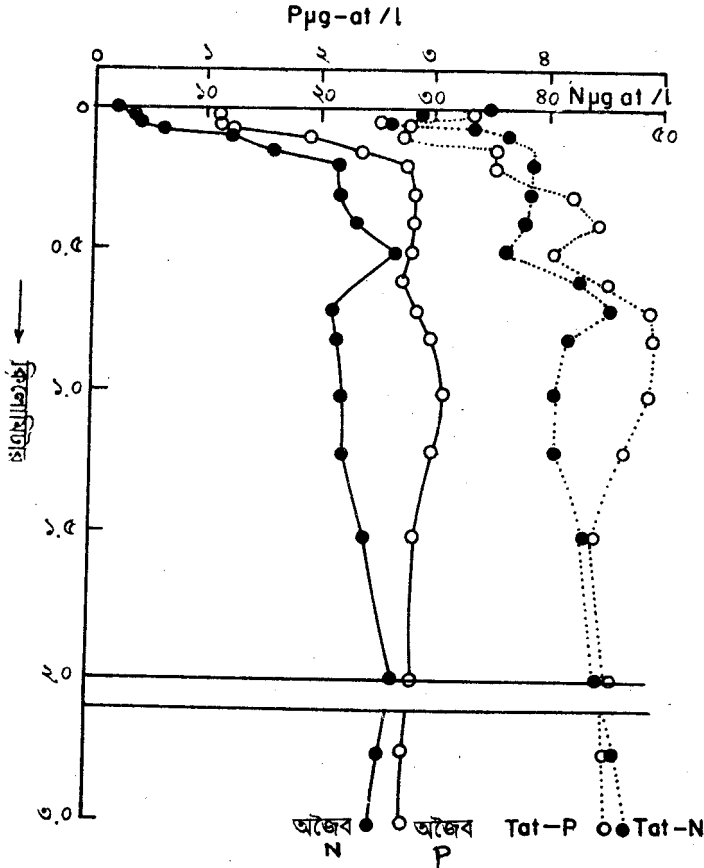
রুশ বিজ্ঞানী রাজানভ (Rozanov A.G 1964) বঙ্গোপসাগরে নিম্নলিখিত পরিমাণ ফসকেট নির্ণয় করেন :

সাগর উপরিতলের পানিতে $0.1 \mu\text{g-at p/L}$

সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে $2.9 \mu\text{g-at p/L}$

মোট জৈব ফসফরাস হচ্ছে $0.5 \mu\text{g-at p/L}$ (সাধারণত $0.2-0.3$)

সিলিকেটের পরিমাণ $180 \mu\text{g-at Si/L}$



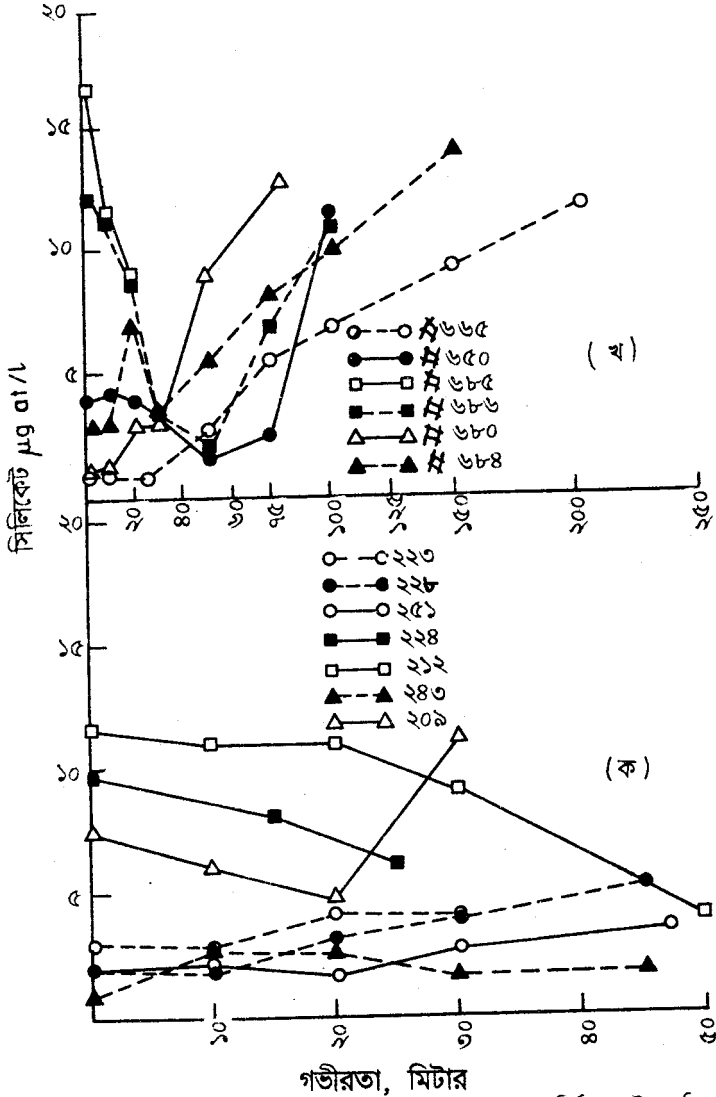
চিত্র ৪.৬ : ৩০০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত অজৈব নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের গড় মোট পরিমাণ (সেনগুপ্ত, ১৯৭৭)

দ্রবীভূত ফসফরাসের পরিমাণ ছিল ৫০ মিটার পর্যন্ত ১.০৬, ২০০ মিটার পর্যন্ত ০.৯৮, ৫০০ মিটার পর্যন্ত ০.৩৬, ১ কিলোমিটার পর্যন্ত ০.০২৫, ২ কিলোমিটারে শূন্য, আর এর বেশি গভীরতায় ০.০৯ $\mu\text{g-at/L}$ । আর কণাময় বা কণায়ুক্ত ফসফরাস পাওয়া যায় ৫০ মিটার পর্যন্ত ০.০৫৫, ২৮০ মিটার পর্যন্ত ০.০৩, ৫০০ মিটার পর্যন্ত ০.০১, ১ কিলোমিটার পর্যন্ত ০.০০৫, ২ কিলোমিটার পর্যন্ত ০.০০৫, এর বেশি গভীরতায় ০.০৩ $\mu\text{g-at/L}$ । এই উপাত্তগুলো থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তাহলো মার্চ-এপ্রিলে প্রাথমিক ফাইটো-প্লাঙ্কটন উৎপাদনের আগে ফসফরাসের পরিমাণ বেশি হয় এবং মে-জুলাই মাসে আবার বাড়ে যখন কূলে অজৈব ফসফেট কম থাকে। উল্লম্ব বিতরণ বিন্যাসে ফসফরাস সমুদ্র পৃষ্ঠদেশে কম হয় এবং ৫০০ মিটার পর্যন্ত বাড়তে থাকে। এরপর আবার কমে যায় ৩ গুণ পর্যন্ত। ১৯৬৮ সনে মুরতি এবং রেড্ডী সুন্দরবনের দক্ষিণ দিকে “অতলস্পর্শী মহাখাদে” (Swath of no ground) ফসফরাসের পরিমাণ নির্ণয় করেন সমুদ্রের তলানিতে। এখানে প্রাপ্ত ফসফরাস মাত্রাজ উপকূলের চাইতে বেশি ছিল। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র কর্তৃক আনীত তলানি/অবক্ষেপ এর কারণ বলে মনে করা হয়।

ফসফরাস অজৈব ফসফেট এবং জৈব ফসফরাস (দ্রবীভূত এবং কণায়ুক্ত) হিসেবে জৈব রাসায়নিক সঞ্চালনে সাগরে বর্তমান থাকে। হাইড্রোকেমিক্যাল স্টাডি অব দি সি প্রোগ্রামের অধীনে এসব গবেষণা পরিচালিত হয়। বিশ্বনাথন, আর এবং গাঙ্গুলী একে (১৯৬৮) ভারতীয় “কিসতনা” জাহাজে করে অনুসন্ধান চালান মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে। তাঁরা সমুদ্রপৃষ্ঠে ফসফরাস -ফসফেট নির্ণয় করেন ০.২৮ $\mu\text{g-at/L}$ -০.৩১ পর্যন্ত (দ্রবীভূত অক্সিজেন ছিল ৪.৫ মিলিমিটার প্রতি লিটারে), ৫০ মিটার পর্যন্ত গভীরতায় ফসফরাস ছিল ০.৩১—০.৩৫, ১০০ মিটার পর্যন্ত ০.৬৬০.৭০ (অক্সিজেন ১.৪ মিঃ লিঃ/ মিটার, ১৫০ মিটারে ০.৯৮—১.৬৬ (অক্সিজেন ০.৩), ২০০ মিটারে ১.৩১—১.৭৬ এবং ৫০০ মিটার পর্যন্ত গভীরতায় ২.২৬—২.৪৯ মাইক্রোগ্রাম এটম/লিটার দেখা যায় ১০০—৫০০ মিটার গভীরতায় দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে আসে আর ফসফরাসের পরিমাণ বাড়ে। জৈব পদার্থের জারন ক্রিয়ায় অক্সিজেন কমে গিয়ে ফসফেটের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

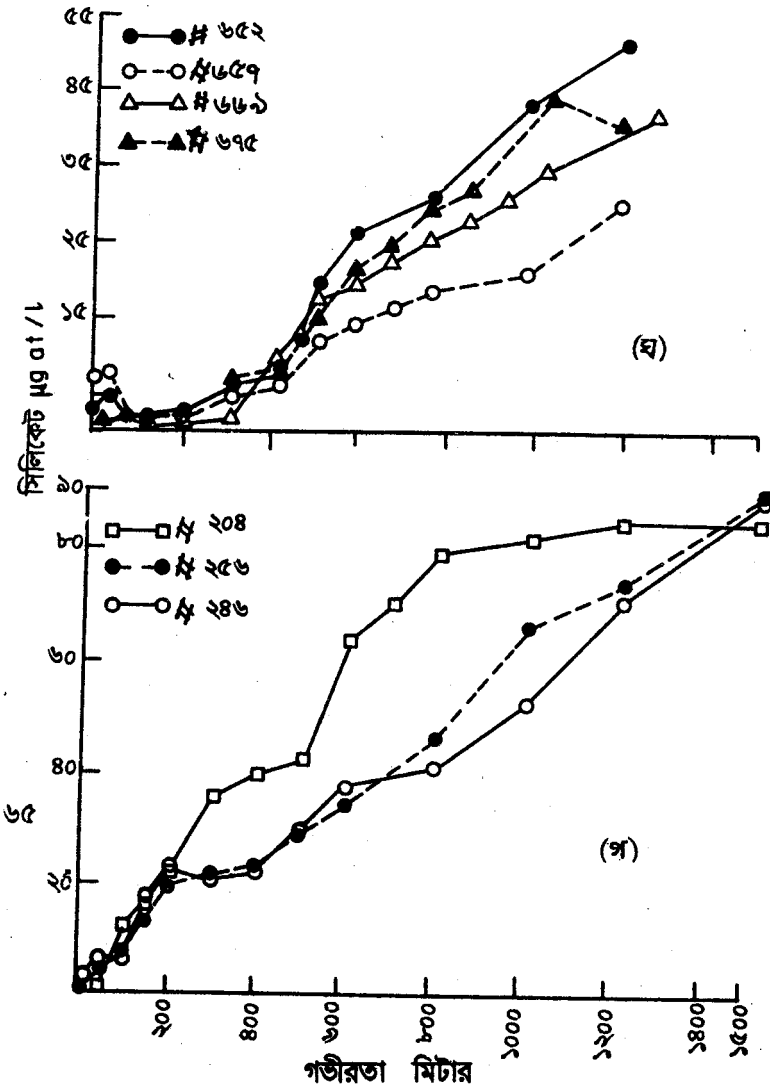
সেনগুপ্ত তাং ডে সুজা (১৯৭৭) সুন্দরবনের দক্ষিণ থেকে বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম উপকূল এলাকার সমুদ্রাঞ্চলে অজৈব ফসফেট এবং পূর্ণ ফসফরাস ও নাইট্রেট, নাইটাইট, এমোনিয়াসহ পূর্ণ নাইট্রোজেনের পরিমাণ নির্ণয় করেছিলেন। সাগরপৃষ্ঠে নাইট্রোজেন ৩৫.১ $\mu\text{g-at/litre}$ থেকে ২৫ মিটার গভীরতায় নেমে যায় ২৯.১ আর ফসফরাস বৃদ্ধি পায় ৩ থেকে ৩.৩৩ $\mu\text{g-at/litre}$ । গঙ্গা নদীবাহিত পলিতে হলদে বর্ণের জৈব সার যা বঙ্গোপসাগরে পতিত হয় এতে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন থাকে, ফসফরাস থাকে কম। সমুদ্র সমতল থেকে জৈব নাইট্রোজেন ৯৫ শতাংশ শুরু হয়ে ৩০০০ মিটারের মধ্যে ৪৭.৩ শতাংশে পৌঁছে যায়। অর্থাৎ বিভিন্ন গভীরতায় আস্তে আস্তে নাইট্রোজেনের সরবরাহ কমে আসে, অপর দিকে শূন্য

গভীরতায় জৈব ফসফরাস ৬১.২ শতাংশ থাকে, কিন্তু গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর পরিমাণ কমে গিয়ে (২৫ মিটারের পর) ৩০০০ মিটার সমুদ্র তলদেশে ফসফরাসের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮.৭ শতাংশ। বঙ্গোপসাগরে গড় সালোকসংশ্লেষিত উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে 163 ± 68 মিলিগ্রাম প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার জায়গায় প্রতি দিনে ($\text{mg. Cm}^{-2} \text{ day}^{-1}$) আর গড় অক্সিজেন ঘনত্ব হচ্ছে $1 \mu\text{l/litre}$ ($89.3 \mu\text{g-at/litre}$) ১০০-১০০০ মিটার গভীরতায়।



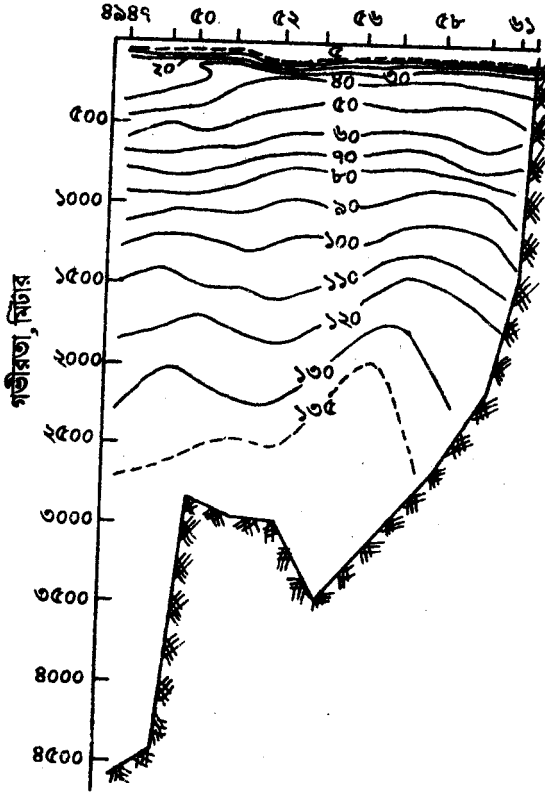
চিত্র ৪.৭ : সমুদ্রোপকূলে (ক) আরব সাগরে; (খ) বঙ্গোপসাগরে সিলিকেটের পরিমাণ।

বঙ্গোপসাগরে নাইট্রাইট এবং গ্রামোনিয়া পাওয়া যায় নি। অনুমান করা হয় ডিনাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়ার ফলে নাইট্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। আর $18.2 \mu\text{g-at/litre}$ নাইট্রেট আয়ন হারিয়ে যায় অন্যথায় $2.6 \mu\text{g/litre}$ গ্রামোনিয়া প্রস্তুত হতে পারত। ১০০—১২০০ মিটার গভীরতায় নাইট্রেট পাওয়া যায় $21.2 \mu\text{g-at/litre}$ অর্থাৎ হিসেব থেকে ৪০% কম। পরিতাপের বিষয় বাংলাদেশ উপকূলে দক্ষিণ দিকে ও পূর্ব দিকে টেকনাফ পর্যন্ত অঞ্চলে রাসায়নিক সমুদ্র বিজ্ঞানের উপাত্ত



চিত্র ৪.৭ঃ দূর সমুদ্রে (গ) আরব সাগর (ঘ) বঙ্গোপসাগর সিলিকেটের পরিমাণ।

অজ্ঞাত কারণে আজও সংগ্রহ করা হয়নি। এমনিতে পুরো সাগরের তথ্য ও উপাত্ত যথেষ্ট পরিমাণে হাতে নেই।



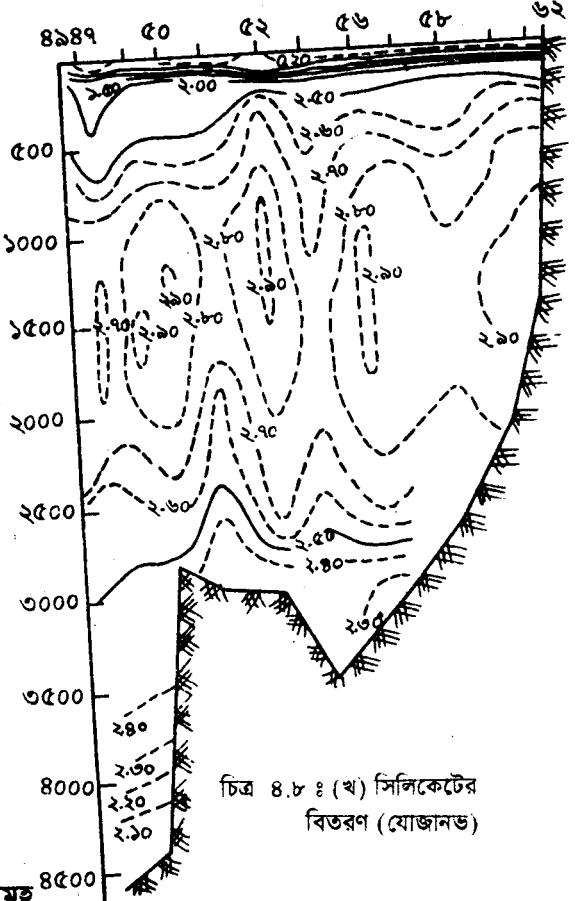
চিত্র ৪.৮ : (ক) ফসফেটের বিভরণ (রোজামভ)

বঙ্গোপসাগরে দ্রবীভূত সিলিকেটের বিভরণ

১৯৭৬-৭৭ সনে মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে রাজেন্দ্রান, রাজাগোপাল ও রেড্ডি শুধু সিলিকেটের পরিমাণ নির্ধারণ করেন সমুদ্রপৃষ্ঠের পানিতে ১ থেকে ৭.৫ $\mu\text{g-at/litre}$ । ২০-৫০ মিটার গভীরতায় এর পরিমাণ বেশ কমে যায় তবে ১৫০-২০০ মিটারে বেড়ে হয় ১৪-১৫ $\mu\text{g-at/litre}$ । মান্নার উপসাগর ও পকপ্রণালীতে সিলিকেটের পরিমাণ ছিল ৫-২০ $\mu\text{g-at/litre}$ । সমুদ্র পৃষ্ঠদেশে ৪.৯ থেকে ৯.৪ এবং ৬০ মিটার গভীরতায় ২৭.৫ $\mu\text{g-at/litre}$ সিলিকেটও লক্ষ্য করা গেছে। ২০-৫০ মিটার গভীরতায় আলোকিত অঞ্চলে (enphotic Zone) ০.১

$\mu\text{g-at/litre}$ সিলিকেট উপকূলবর্তী অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়েছে। ১০০০ মিটার গভীরে ৩০.৫ থেকে ৫৫ $\mu\text{g-at/litre}$ সিলিকেট রেকর্ড করা হয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগরের কম লবণাক্ততা থেকে অনুমান করা হয় গঙ্গাবাহিত সিলিকেটের পরিমাণ নগণ্য।

১৯৬৫ সনে শঙ্করনারায়ণ ও রেড্ডী বঙ্গোপসাগরের ভারতীয় এলাকায় সিলিকেটের পরিমাণ নির্ণয় করেন সমুদ্র সমতলে ০.১ থেকে ৪ $\mu\text{g-at/litre}$ । মধ্য অংশে কম এবং দক্ষিণ অংশে একটু বেশি পরিমাণ লক্ষ্য করা যায়। ২০০ মিটার গভীরতায় ২১ $\mu\text{g-at/litre}$ প্রতি সিলিকেট পাওয়া গেছে। রোজানভ (১৯৬৪) ১০০ মিঃ গভীরতায় ১০—১৫ $\mu\text{kg-atom/litre}$ এবং ৬০০ মিটার গভীরতায় সিলিকেট নির্ধারণ করেছেন ৮০—৯০ mkg-at/L এবং বঙ্গোপসাগরের জন্য সর্বোচ্চ সীমা ১৪০ $\mu\text{g-at Silicon}$ প্রতি লিটারে পেয়েছেন।



বঙ্গোপসাগরের পুষ্টিকর পদার্থসমূহ

পুষ্টিকর পদার্থ ফসফেট, নাইট্রেট এবং সিলিকেটের মধ্যে শেষোক্তটি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। রুশ বিজ্ঞানী কাবানভা (১৯৬৪) পুরো বঙ্গোপসাগরের (বাংলাদেশ সীমান্তসহ) প্রাথমিক উৎপাদনে খনিজ ফসফরাস, নাইট্রেট, নাইট্রিট এবং মোট ফসফরাস অতি বিশদভাবে নির্ণয় করেন এবং তা সারণিতে দেয়া হলো।

বঙ্গোপসাগরের উত্তর পশ্চিম অংশে পানিতে সালোক সংশ্লেষণের স্তরে নাইট্রিট পাওয়া গেছে যা এই এলাকায় প্রাপ্ত হাইড্রোজেন সালফাইডের সঙ্গে জড়িত আছে। উপসাগরে মাত্র ০.১৫ মিলিগ্রাম-এটম। ঘন মিটার ফসফেট লক্ষ্য করা গেছে, প্রায় শূন্যের কাছাকাছি। এত অল্প ফসফেটের দরুনই প্রাথমিক উৎপাদনে বঙ্গোপসাগরে তুলনামূলকভাবে খুবই কম।

সারণি-১৪ : বঙ্গোপসাগরে ফসফরাস ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ

স্থান	প্রত্যক্ষণ		ফসফরাস mg-at/m^2			নাইট্রোজেন mg-at/m^2		
	সমুদ্রপৃষ্ঠে 0 Mg/cm^2	পানিতে $0.5-1.0 \text{ mg/cm}^2$	মোট		ফসফেট ০ মিঃ	নাইট্রট		নাইট্রিট ৫০ মিঃ
			০ মিটার	৫০ মিটার		০ মিঃ	৫০ মিঃ	
শ্রীলঙ্কার উত্তরে	০.১	৩.৫	-	-	০.১৬	০.১৪	০.২	০.০১ (<)
মাদ্রাজ উপকূল	০.১	৬.০	০.১৩	০.৪৫	০.০৮	০.৩২	১.৬	০.২৬
ভিশাখাপত্তম	০.২	১১.৪	০.১০	০.১৯	-	০.২০	১.৩	০.০১
ওয়ালটেয়ার	১.২	৪৫.৮	০.৩২	০.৩২	০.১০	০.১৪	০.৩	০.০১
পুরী	০.৪	২৪.৪	-	-	০.০৮	০.০৭	০.২	০.০১
মধ্য বঙ্গোপসাগর	০.১	৩৭	-	-	০.১৯	০.৪১	০.৪	০.০১
দঃ বঙ্গোপসাগর	০.৫	৯.৩	০.২৫	০.৮৮	০.১৩	০.১৪	০.৫	০.০১
"	০.২	৮.১	০.৫১	০.৯০	০.১৩	০.১৮	১.৫	০.০১
" (মধ্য)	০.৬	১৭.৮	০.১৬	০.৪১	০.১২	০.১০	২.০	০.০১
মধ্য	০.১	৬.২	০.২৯	০.২৬	<০.০৫	০.০৭	১.২	০.০১
"	০.১	৩.৪	০.২৯	০.৩৩	০.০৭	০.০৭	০.৭	০.০১
কলিকাতা	০.৯	-	-	-	-	-	-	-
টেকনাফের								
" পশ্চিমে	০.৪	৪.৩	-	০.১৪	০.১১	০.৭০	৬.১	০.০১
" দক্ষিণে	০.২	২৯.২	-	-	০.১২	০.১৫	০.৬	০.০১

রোজানভ (১৯৬৪) এবং তাঁর সহযোগীরা বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন গভীরতায় (০—২৩৭৩ মিটার পর্যন্ত) অক্সিজেন ও নাইট্রেট এবং নাইট্রিট ১৯৬৩ সনের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে নির্ণয় করেন নিম্নরূপ :

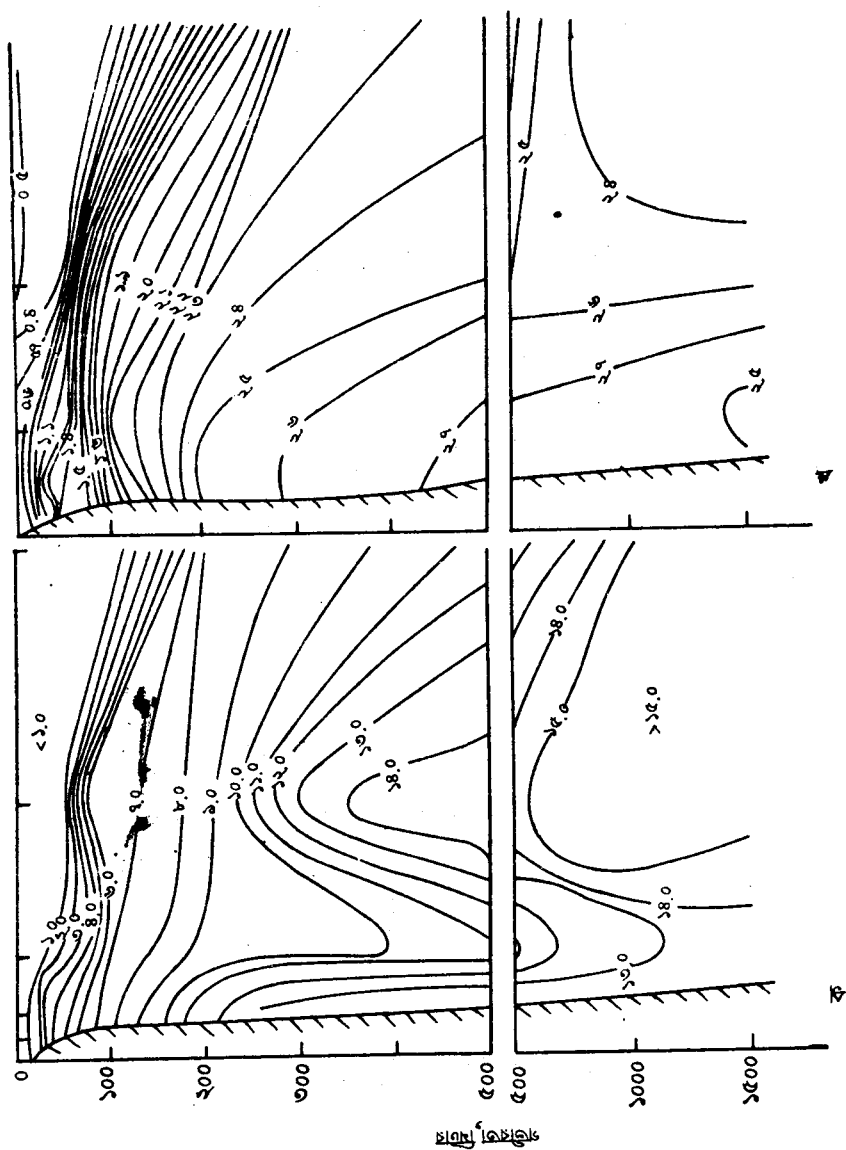
নাইট্রেট : বঙ্গোপসাগরের পৃষ্ঠদেশে নাইট্রেট NO_3 যথেষ্ট পরিমাণে আছে তবে নাইট্রিট প্রায় নেই বললেই চলে। আরব সাগরের তুলনায় উপসাগরে নাইট্রেট—নাইট্রিটের পরিমাণ বেশ কম। উপসাগর পৃষ্ঠে ১-১.৫ Mkg-at/L এবং পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নাইট্রেটের পরিমাণ ২.০ Mkg-at/litre , আর ১০০ মিটার গভীরতায় এর পরিমাণ ১৫, তবে ভারতের পূর্ব উপকূলে নাইট্রেট ১০—১৩ Mkg-at/L এ দাঁড়ায়। ৬০০ মিটার গভীরতায় মধ্য বঙ্গোপসাগরে নাইট্রেট ২২ Mkg-at/L , আর ভারত উপকূলে ২০ Mkg-at/L । বাংলাদেশ সন্নিহিত সাগর অংশে নাইট্রেটের পরিমাণ ২৩ Mkg-at/L ।

নাইট্রিট : উপসাগরের কেন্দ্রীয় অংশে নাইট্রিট (NO_2) ০.২৫ Mkg-at/L , দক্ষিণ অংশে ০.৫০ এবং উত্তর অংশে ১.০০ Mkg-at/L এর বেশি নয়। ভারতের উপকূলে ২০০-৫০০ মিটার, গভীরতায় নাইট্রিট ০.১০-০.২০ Mkg-at/L এবং হাইড্রোজেন সালফাইড ০.০৫ মিলিলিটার/লিটার পাওয়া গেছে। ($\text{Mkg} = \mu\text{g}$)

ফসফেট : রোজানভ (১৯৬৪) বঙ্গোপসাগরের পৃষ্ঠদেশে ফসফেট (PO_4) নির্ণয় করেন ০.১—০.২ Mkg-at/L । গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে (১৫০ মিটারে) ফসফেটের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ২.০ Mkg-at/L , সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ৮০০—২০০০ মিটার গভীরে প্রায় ২.৮ থেকে ২.৯ Mkg-at/L , তবে সাগরের তলদেশে এর পরিমাণ কিছুটা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ২.৩০ Mkg-at/L ।

জৈব ফসফরাস : রোজানভ বঙ্গোপসাগরের ০—২০০ মিটার গভীরতায় ভারত উপকূলে ফসফরাসের পরিমাণ নির্ণয় করেন গড়ে ০.২-০.৩ Mkg-at/L (০—৭৫ মিটারে)। ভারত উপকূলে ফসফরাস ছিল ০ মিটারে ০.১২, ১০ মিটারে ০.১৮, ২৫-৫০ মিটারে ০.৩৪, ১৫০ মিটারে ০.১০ এবং ২০০ মিটার গভীরতায় ০.১৩ Mkg-at/L । আর আন্দামান উপকূলে ২৫ মিটার পর্যন্ত গভীরতায় ফসফরাস রয়েছে ০.১৪, ৫০ মিটারে ০.১৮, ৭৫ মিটারে ০.১৩, ১৫০ মিটারে ০.০৭ এবং ২০০ মিটারে ০.০৬ Mkg-at/L ।

সিলিকেট নির্ধারিত হয় ১০০ মিটার গভীরতায় ২০ Mkg-at/L উত্তর বঙ্গোপসাগরে। মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ১০-১৫ Mkg-at/L (১০০ মিটারে)। ৬০০ মিটার গভীরে কেন্দ্রীয় বঙ্গোপসাগরে সিলিকেটের পরিমাণ ৮০-৯০ Mkg-at/litre । ১৯৭৬ সনের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ভিসাখাপত্তম ও মাদ্রাজ উপকূলে ভিসুজা (১৯৮১) ৭৫ মিটার গভীরতায় ফসফেট ফসফরাস নির্ধারণ করেন ০.২ থেকে ০.৫ $\mu\text{g-at/litre}$ আর নাইট্রেট-নাইট্রোজেনের পরিমাণ ছিল খুবই নগণ্য। অক্সিজেন ছিল সমুদ্রপৃষ্ঠে ৫ মিলিলিটার এবং ৫০ মিটার গভীরে ৩.৫ মিঃ লিঃ প্রতি লিটারে। এই অঞ্চলে পানির উর্ধ্বপ্রবাহ ও উচ্চ লবণাক্ততার মাত্রা ছিল। এখানে নাইট্রেট ও ফসফেটের অনুপাত (০ থেকে ৪.৪ এটম) ৭৫ মিটার গভীরতায় পাওয়া



চিত্র ৪.৯ : মাদ্রাজ উপকূলে (ক) নাইট্রেট (খ) ফসফেটের উল্লম্ব বিন্যাস।

গেছে, আর ১০০-১০০০ মিটারে এই অনুপাত ছিল ৬—৭। ফাইটোপ্লাঙ্কটন কর্তৃক ফসফেট ও নাইট্রেট নিঃশেষ হয়ে যায়। বঙ্গোপসাগরের উপরের স্তরের পানি বৃষ্টির পানি ও পানি নিষ্কাশনের দ্বারা পাতলা হয়ে যায়। সেই সাথে গভীর স্তর থেকে নাইট্রোজেন কম সরবরাহ হয়, অধিকন্তু এ স্তরে ডিনাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়া চলে। এসব ক্রিয়ার ফলেই নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের অনুপাত খুব কম হয়।

শঙ্কর নারায়ণ ও রেড্ডী (১৯৬৮) বঙ্গোপসাগরের উত্তর পশ্চিম অংশে ফসফেট, নাইট্রেট এবং সিলিকেট নির্ণয় করেন। এপ্রিলে ফসফরাস $0.৯৯ \mu\text{g-at/L}$, আর জুলাইতে তা বেড়ে দাঁড়ায় $৩.৪ \mu\text{g-at/L}$ গ্রীষ্মে উচ্চমাত্রার ফসফরাস আর অল্পমাত্রার অজৈব ফসফেট পরিলক্ষিত হয়েছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ তলে ফসফরাস কমই থাকে তবে গভীরতা বৃদ্ধি পেলে ৫০০ মিটার পর্যন্ত এর পরিমাণ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় যা ৫০০ মিটারের বেশি গভীরতায় দ্রুত কমে আসে। অজৈব ফসফেট ৬০০-৮০০ মিটারে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় আর নাইট্রেট বেশি দেখা গেছে ৩০০-৮০০ মিটারে।

মেকগিল (Mc Gill, ১৯৭৩) বঙ্গোপসাগরে পুষ্টিকর পদার্থের বিতরণের উপর মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন আর ভিরত্কি (Wyrski, ১৯৭১) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ এটলাসে এসব পদার্থের সুন্দর চিত্র প্রদান করেছেন বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন গভীরতায়।

বঙ্গোপসাগরের কার্বনডাই অক্সাইড পদ্ধতির বা শ্রেণীর বিতরণ

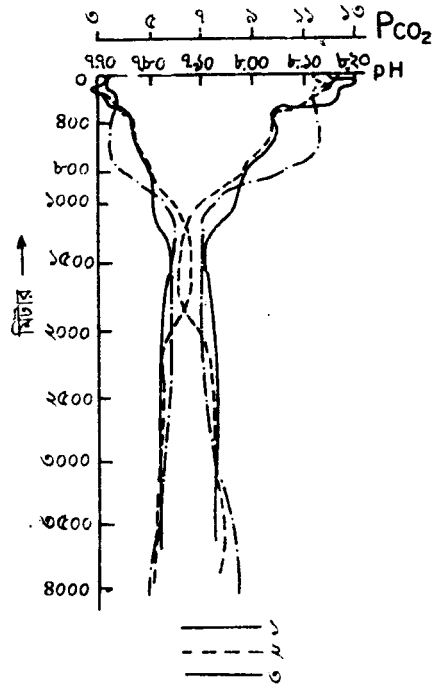
সোভিয়েত জাহাজ “ভিভিজি” করে রুশ বিজ্ঞানী ইভানেনকভ (১৯৬৪) সমগ্র বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে কার্বন ডাই অক্সাইডের দ্রবণের আংশিক চাপ, পানির পি-এইচ মাত্রা এবং ক্ষার ক্রোরিনের সহগের পরিমাণ নির্ণয় করেন। সমুদ্রপৃষ্ঠে PCO_2 এর পরিমাণ ছিল ৩.১ থেকে ৪.৩×10^{-8} এটম। সমুদ্র সমতলে বায়ুমণ্ডলে এর গড় মান কি ছিল $৩.২-৩.৪ \times 10^{-8}$ এটম। পুরো অঞ্চল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে হারিয়ে যায়। আর সমুদ্র পৃষ্ঠতলে হাইড্রোজেনের সূচক (pH) দাঁড়ায় $৮.১১-৮.১৯$ আর তলদেশে এই মান হয় $৭.৯০-৭.৯৭$ । বঙ্গোপসাগরে ক্ষার ক্রোরিনের সহগের (Coefficient) মাত্রা আবার সাগর বা কেন্দ্রীয় ভারত মহাসাগর থেকে বেশি। এই মাত্রা সমুদ্র পৃষ্ঠে ৩ মিটার গভীরতায় হয় $০.১২১-০.১২৭$, ১০০০ মিটার গভীরে দাঁড়ায় $০.১২৫-০.১২৭$ আর ২ কিলোমিটার গভীরে হয় $০.১২৯-০.১৩০$ । ক্ষার-ক্রোরিন সহগের এই উচ্চ মাত্রার কারণ হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের অনন্যতা-বাস্পীয়ভবনের চাইতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি।

১৯৮১ সনে অন্য একটি রুশ বিজ্ঞানী দল ‘একাডেমিক ভেরনাদস্কি’ জাহাজে করে বঙ্গোপসাগরের পানি কর্তৃক কার্বন ডাই অক্সাইডের বিনিময় আবহাওয়া মণ্ডলের সঙ্গে কেমন হারে হয় তা নিরূপণ করেন। তাঁরা বাংলাদেশ উপকূলসহ পুরো উত্তর বঙ্গোপসাগরে কার্বন ডাই অক্সাইডের আংশিক চাপ সমুদ্রপৃষ্ঠে পান $২০-৩০ \times 10^{-6}$ এটম। গঙ্গা নদীর মুখে প্রাপ্ত এই উপাত্ত অন্য গবেষকদের তুলনায় বেশি হওয়ার কারণকে তাঁরা ব্যাখ্যা করেন মৌসুমী বায়ু প্রবাহকে, দ্বিতীয়ত বায়ুমণ্ডল থেকে সমুদ্র

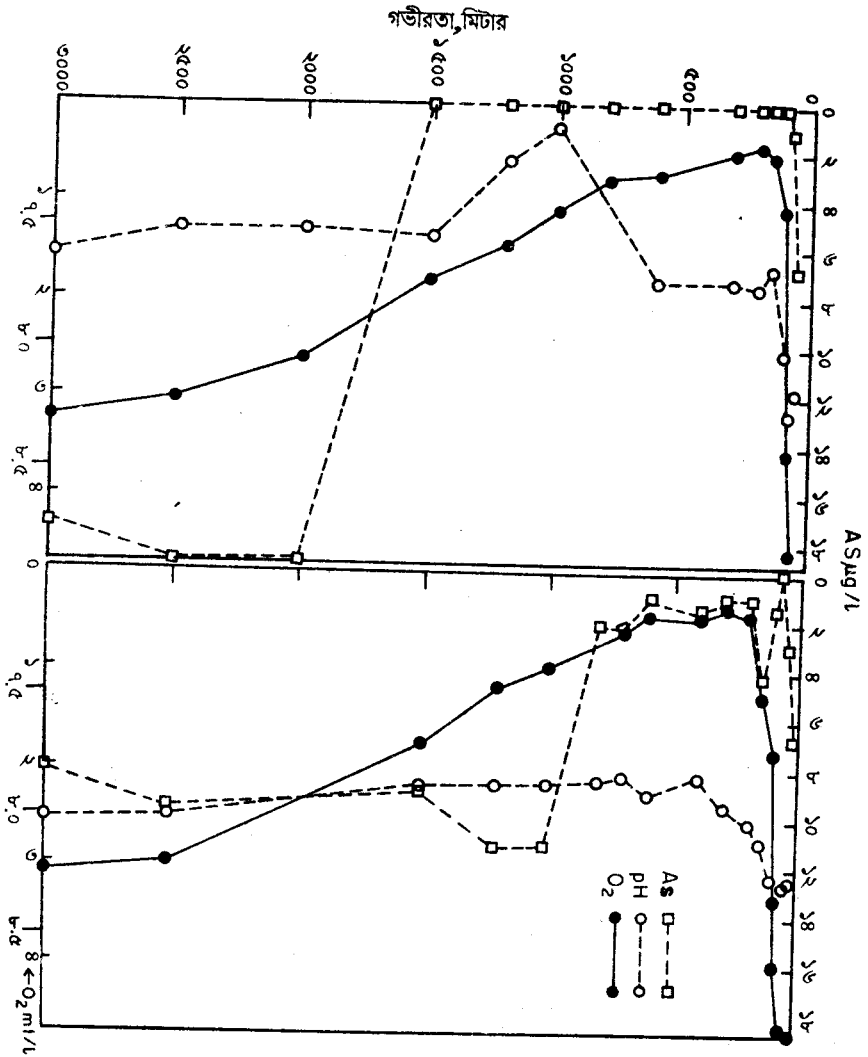
অভাস্তরে কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রবেশকে। তাঁরা তেজস্ক্রিয় বেড়ন-২২২ এর উল্লম্ব বিন্যাস (২০০ মিটার গভীরতা ৪০০ impulse/hour এবং সিজিয়াম-১৩৭ এর পরিমাণ (০.৫০০ মিটারে) করে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিবহনের দিক নির্ণয় করেন। উপসাগরের পৃষ্ঠদেশের পুরুত্ব ২৩-৫০ μm পাওয়া যায়, আর কার্বন ডাই অক্সাইড সমুদ্র থেকে বায়ুমণ্ডলের দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল $১.৫-৬.৮ \text{ (mmol/m}^2 \text{ day)}$ অর্থাৎ মিলিমোল প্রতি মিটার জায়গা থেকে প্রতি দিনে। ক্ষারত্বের মান যখন ক্লোরিনের সঙ্গে মিশে তখন এটা সাগর পানির রক্ষণশীল ধর্মে পরিণত হয়। বিশেষ ক্ষারত্ব দ্বারা এমন পরিবর্তন বুঝায় যা ক্যালসিয়াম অধঃক্ষেপে বা দ্রবণের দরুন ঘটে থাকে, এটা কিন্তু পানির মিশ্রণের ফলে স্বকীয় ভূ-রাসায়নিক কেলসিয়াম কার্বনেট পদ্ধতির বাইরে। কার্বন ডাই

অক্সাইডের চাপ বাড়তে থাকলে, গভীরতা বৃদ্ধি পেলে এবং তাপমাত্রা কমতে থাকলে কার্বনেটের দ্রবণীয়তা বৃদ্ধি পায়। যেহেতু গভীরতার সঙ্গে বিশেষ ক্ষারত্বের সম্পর্ক রয়েছে তাই এগুণকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন পানির প্রবাহকে সন্ধান করা যায়।

হাইড্রোজেন সালফাইডের সন্ধানঃ রুশ বিজ্ঞানী ইভানেনকভ ও রোজানভ (১৯৬১) বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পশ্চিম অংশে ৫০-৫০০ মিটার পর্যন্ত গভীরতায়, হাইড্রোজেন সালফাইডের সন্ধান পান, এর পরিমাণ ছিল ০.০৪-০.১০ মিলিমিটার প্রতি লিটার পানিতে। ১০০০ মিটার গভীরতায় এর পরিমাণ ছিল নগণ্য (০.০১)। এ স্তরে অক্সিজেন খুবই কম থাকে, নাইট্রেট ও খুব কম আর নাইট্রিট একটু বেশি থাকে। যেখানে বেশি হাইড্রোজেন সালফাইড সেখানে তত কম জীবকুল বা জুপ্লাকটন। বঙ্গোপসাগরের পানির এই মধ্যবর্তী স্তরে হাইড্রোজেন সালফাইডের আবির্ভাবের হেতু বুঝা যায় ৯৭-৯৮% অক্সিজেন হারানোর কারণের মাঝে। এ স্তরে বেশি পরিমাণে জৈব বস্তু প্রবেশ করে থাকে। কোনো কোনো অংশে হাইড্রোজেন সালফাইডের উৎস মুখে পেট্রোলিয়ামও পাওয়া গেছে। যদি এরা বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থান করে তখন হাইড্রোজেন সালফাইড এমনভাবে পানিতে প্রবেশ করে। মজার ব্যাপার হলো এই যে



চিত্র ৪.১০ : বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন গভীরতায় কার্বন ডাই অক্সাইডের চাপ, pH এর উল্লম্ব বিন্যাস।



চিত্র ৪.১১ : বঙ্গোপসাগরে
বিভিন্ন গভীরতায় আর্সেনিক,
(অক্সিজেন), pH এর উল্লম্ব
বিন্যাস।

ইভানেনকভের এই পাওয়া ফলাফল অর্থাৎ হাইড্রোজেন সালফাইডের আবিষ্কার আর কেউ প্রমাণ করতে পারেন নি।

আর্সেনিকের বিতরণ : বঙ্গোপসাগরে আর্সেনিক (As) বিষাক্ত পদার্থটিও রয়েছে। ১৯৭৫ সনের মার্চ-এপ্রিলে ফনডেকার (১৯৭৬) তা নির্ণয় করেন ১-১৮.৭৫ μg মাইক্রোগ্রাম প্রতি লিটারে, তবে গড়ে তা ছিল ২.৫৫ $\mu\text{g}/\text{liter}$ ভারত মহাসাগরে আর্সেনিকের গড় মান ৩ $\mu\text{g}/\text{liter}$ । বৃষ্টিপাত ও নদী বাহিত তলানির মাধ্যমে সমুদ্র পানিতে আর্সেনিক আসে। বঙ্গোপসাগরে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী বাহিত সুন্দর পলিকণার সঙ্গে আর্সেনিক বেশি আসে বলে এ উপসাগরে আর্সেনিকের মাত্রা আরব সাগর থেকে বেশি। আর্সেনেট (As^{5+}) এবং আর্সেনাইট (As^{3+}) এই দুইরূপের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে শেষোক্ত রূপটিই বেশি। সমুদ্র তলদেশে আর্সেনিক বেশি থাকে সমুদ্রপৃষ্ঠ-দেশের চাইতে।

পারদের উপস্থিতি: পৃথিবীর অন্যান্য মহাসাগরের তুলনায় ভারত মহাসাগরের মাছে পারদের পরিমাণ ২গুণ কম। সেইসাথে বঙ্গোপসাগরের মাছেও পারদের পরিমাণ খুবই নগণ্য। চিৎড়িতে যেখানে গড় ১০ $\mu\text{g}/\text{Kg}$ পারদ রয়েছে, সেখানে হাঙ্গরে ৪০, বাগদা চিৎড়িতে ৩৭।

বঙ্গোপসাগরের উপকূল ও অদূরবর্তী এলাকায় নগণ্য পরিমাণের ধাতুর শনাক্তকরণ
ভারতীয় বিজ্ঞানী ব্রাগাঙ্কা ও সানজিগেরী (১৯৮০) বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূল ধরে গঙ্গা (সাগরদ্বীপ), কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী নদীর মোহনায় কপার (Cu), লোহা (Fe), ম্যাঙ্গানিজ (Mn), দস্তা (Zn), কোবাল্ট (Co), এবং নিকেল (Ni) এর পরিমাণ নির্ধারণ করেন। লোহা ও দস্তা নদীমুখে সাগর পৃষ্ঠের পানিতে অন্য ধাতুগুলোর তুলনায় বেশি পাওয়া গেছে। লোহার বেলায় ০—১০ $\mu\text{g}/\text{liter}$ গড় মানের তুলনায় তারা পেয়েছেন ৬.৩—১৩১.৫ $\mu\text{g}/\text{liter}$ । নদীবাহিত পলির অবদান এর পেছনে রয়েছে। দ্রবীভূত ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া গেছে ১.৬—৪০.৮ $\mu\text{g}/\text{liter}$, দ্রবীভূত তামা (Cu) ছিল ৪.৯ $\mu\text{g}/\text{liter}$ । ১০০ মিটার গভীরেও বহু তামা কণা দেখা গেছে।

সামুদ্রিক জৈব বলয়ের সঙ্গে জিঙ্ক বা দস্তা (Zn) খুবই ক্রিয়া করে থাকে বলে এর পরিমাণ জানা বেশ প্রয়োজন। বঙ্গোপসাগরের গভীরতায় দস্তা বেশি, সমুদ্র পৃষ্ঠের তুলনায়। এটা দ্রবীভূত দস্তার বেলায়। আর অদ্রবীভূত দানাদার দস্তা সমুদ্র তলদেশে কম পাওয়া যায়। মনে হয় সামুদ্রিক জীব কর্তৃক দস্তার দানা গলধঃকরণই এর কারণ। বঙ্গোপসাগরে দস্তা পাওয়া গেছে ১—৫০ ($\mu\text{g}/\text{liter}$, কোবাল্টের উপস্থিতি একদম নগণ্য। নিকেল দেখা গেছে ১—১২.২ ($\mu\text{g}/\text{liter}$, (সারণি ১৫ দ্রষ্টব্য)।

ইউরেনিয়ামের পরিমাণ : ৮°N , $৭৬-৮৩^{\circ}\text{E}$ অঞ্চলে বঙ্গোপসাগরে ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে সাগর পৃষ্ঠে (বিশ্বনাথন শাহ, উননী, ১৯৬৮) ২.৩৩ থেকে ১.৫৬ $\mu\text{g}/\text{liter}$ আর ক্রোরিন পাওয়া গেছে গড়ে ২০ (g/L , রুশ বিজ্ঞানী শিশকীনা (১৯৬৪) মধ্য বঙ্গোপসাগরে ৩১০৩ মিটার গভীরতায় ১৯.২৩ gm/Kg ক্রোরিন নির্ণয় করেছেন। তিনি সমুদ্র পৃষ্ঠে পেয়েছেন ১৮.৯৩ (gm/kg ক্রোরিন। ক্রোরিনের পরিমাণ বেশি হলে ইউরেনিয়ামও বেশি থাকে।

সারণি ১৫ : ট্রেস মেটালের গাঢ়ত্ব দ্রবীভূত অবস্থায় (μg/liter) এবং কণাকার অবস্থায় (μg/gram)

গভীরতা	অবস্থান	তামা		সোদা		ম্যাঙ্গানিজ		দস্তা		নিকেল		কোবাল্ট	
		দ্রবীভূত	কণাকার	দ্রবীভূত	কণাকার	দ্রবীভূত	কণাকার	দ্রবীভূত	কণাকার	দ্রবীভূত	কণাকার	দ্রবীভূত	কণাকার
১০	সাগরতট	৪.৮	৭৭	১৯.০	-	২.০	২৮	৬.৭	৬৪৪	৪.০	৮১	২.০	-
১০	মহানদী	৫.৫	৮০	৪৭.০	২৭৯৬৫	৮.০	১০	৮.০	৭৯৬	৪.২	৮০	-	৪১
১০	ভিসাখা-												
	পদ্মা	৬.৮	১৯৭	১০১.৫	৪৫০৬	৩.৮	১০১	১৫.৩	২৮৫৩	১২.২	৭৪	৭.০	১৪৪
১০০		৭.২	১৭৬	৭০.৫	৪২৪০৮	৪.০	১১৫	৭.৯	২০৯৫	২.৫	-	-	১৬৩
১০	পোলাবরী	২.৮	১৪৩	৬১.০	১৫৯৪২	২৫.০	১৩৭	৭.৬	২৩৩৮	-	১১৫	৪.০	২৮
১০	কুখা	৬.২	১০৮	৬৯.০	৯৩৫৩	৩.৮	৬০	১৫.১	১৫৯৫	২.২	২৮	-	১৫১
১০	মাদ্রাজ	-	১৬১	-	১১৮০২	২২.৫	৪০১	-	২০৬৫	-	-	-	১১৩
১০০	"	-	৮৪	-	১১৮৪৯	৮.২	৯৯	-	১৫৬৪	-	-	-	২১৭
১৭৫	"	-	১৮৩	-	২৩২০৪	১.৮	-	-	২৪৭১	-	১৪৬	-	-
১০	হীনজা	২.৭	১০	১৫.৫	৫৩০৮	৫.৫	১০৮	৫.১	৯৬৪	৩.৫	-	-	৪১
১০০	"	৩.৩	১৬৯	১৭.৫	৮৩৬০	১.৬	১৯০	৪.৪	৬২১	৩.০	১৪	৫.২	১৩৪
৫০০	"	১০.৮	১৭০	৮.০	৬৭৩৫	৩.৭	২০৪	১৩.৬	২৮১৬	৪.৭	৫৩	১.৫	১০৭
১০০০	"	৩.০	৭১	২০.৫	২৫৮৬	২.৫	১১৩	৮.৫	৭৪২	৪.৪	-	১.৫	৫৩
৩০০০	"	৬.৭	৫৪	১০.৫	৩২৭১	৩.০	২৪৩	১৪.০	১০৭৩	৪.৭	-	-	২৩

সূত্র : Bragdon

ফ্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম এর বিতরণ : ভারতীয় বিজ্ঞানী আর সেনগুপ্ত (১৯৭৮) উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ফ্লোরাইড পেয়েছেন গড়ে 1.01 ± 0.01 mg/L এবং ফ্লোরাইড ক্লোরিন অনুপাত $(6.8 \pm 0.01) \times 10^{-4}$ । এ অঞ্চলে ক্যালসিয়াম ও ক্লোরিনের অনুপাত হচ্ছে 0.02228 ± 0.000005 এবং ক্যালসিয়াম পাওয়া গেছে গড়ে 832 ± 5 mg/l নদীর পানি রাশির জন্য এই উচ্চমাত্রার উপাত্ত বঙ্গোপসাগরে পরিলক্ষিত হয়েছে। উপসাগরে ম্যাগনেসিয়াম পাওয়া গেছে 1281 ± 18 mg/l আর ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরিন অনুপাত হচ্ছে 0.06631 ± 0.000003 (সারণি-দ্রষ্টব্য)।

সারণি ১৬ : বঙ্গোপসাগরের ফ্লোরাইড, ফ্লোরাইড : ক্লোরিন (অনুপাত) বিভিন্ন গভীরতায় উত্তর ও পশ্চিম উপকূলের উপাত্ত

এলাকা	০-১০০ মিটার		১০০-১০০০ মিঃ		১০০০-২০০০ মিঃ		২০০০-১৩০০০ মিঃ	
	ফ্লোরাইড	ফ্লোরাইড ক্লোরিন	ফ্লোরাইড	ফ্লোরাইড ক্লোরিন	ফ্লোরাইড	ফ্লোরাইড ক্লোরিন	ফ্লোরাইড	ফ্লোরাইড ক্লোরিন
	F	F/cl	F	F/cl	F	F/cl	F	F/cl
বঙ্গোপসাগর	১.৩১	৬.৬৮	১.৩২	৬.৭৭	১.৩২	৬.৭৮	১.৩৩	৬.৮৭
মান্নার উপসাগর	১.৩৩	৬.৯০	১.৩৫	৬.৯৬	১.৩৩	৬.৮৮	-	-
আরব সাগর	১.৩৪	৬.৯১	১.৩৭	৭.০২	-	-	-	-

সারা বিশ্বের নদীবাহিত জলে ফ্লোরাইডের গড় মাত্রা হচ্ছে $0.1-0.2$ mg/l (Livingstone, 1963) এবং ক্লোরিন। ক্লোরিন অনুপাত হচ্ছে অনেক বেশি, কেননা ক্লোরিনের মাত্রা খুব কম (2.10^{-2})। নদী যখন সাগরে মেশে তখন স্থিত কণাগুলো দ্বারা ফ্লোরাইড অপসারিত হয় (বাস্পীভবনও এ কাজে সহায়তা করে)। এ জন্য সাগর অভ্যন্তরের তুলনায় উপকূলে এর পরিমাণ কম হয়।

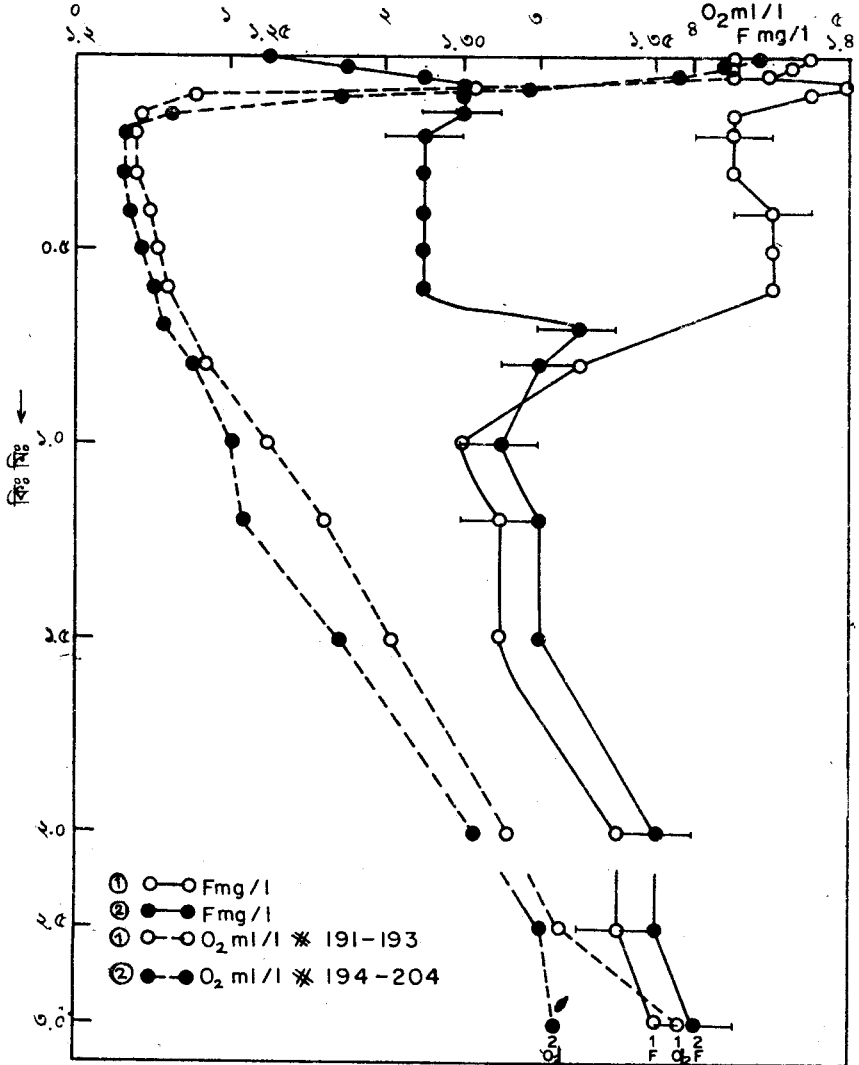
সারা বিশ্বের নদীগুলোর গড় লবণাক্ততা হচ্ছে 100 mg/l এবং ক্যালসিয়াম ও ক্লোরিনের অনুপাত হচ্ছে 6.3 (Hutchinson, 1957)। বঙ্গোপসাগরের পৃষ্ঠদেশের 25 মিটার গভীরতায় বার্ষিক লঘুকরণের হার হচ্ছে 5.5 শতাংশ। এ অঞ্চলে ক্যালসিয়ামের গড় মাত্রা 818 mg/l এবং ক্যালসিয়াম /ক্লোরিন অনুপাত 0.02285 । নদীগুলোর পানিই বঙ্গোপসাগরে ক্যালসিয়ামের উচ্চ মাত্রার কারণ।

ম্যাগনেসিয়াম হচ্ছে সমুদ্রের পানিতে প্রাপ্ত দ্বিতীয় বৃহত্তম মৌল। এটি জৈব উৎপাদনে অংশ নেয় না। বঙ্গোপসাগরের 500 মিটার গভীরে সবচেয়ে বেশি ম্যাগনেসিয়াম পাওয়া যায়, এটা 1280 mg/l। 2000 মিটার গভীরে এর পরিমাণ 1265 mg/l আরব সাগরে বা মান্নার উপসাগরে 150 মিটার গভীরতায় সবচেয়ে বেশি ম্যাগনেসিয়াম দেখা যায় (চিত্র ৪.১২-৪.১৬)।

বঙ্গোপসাগর : সমুদ্র বিজ্ঞান ২২

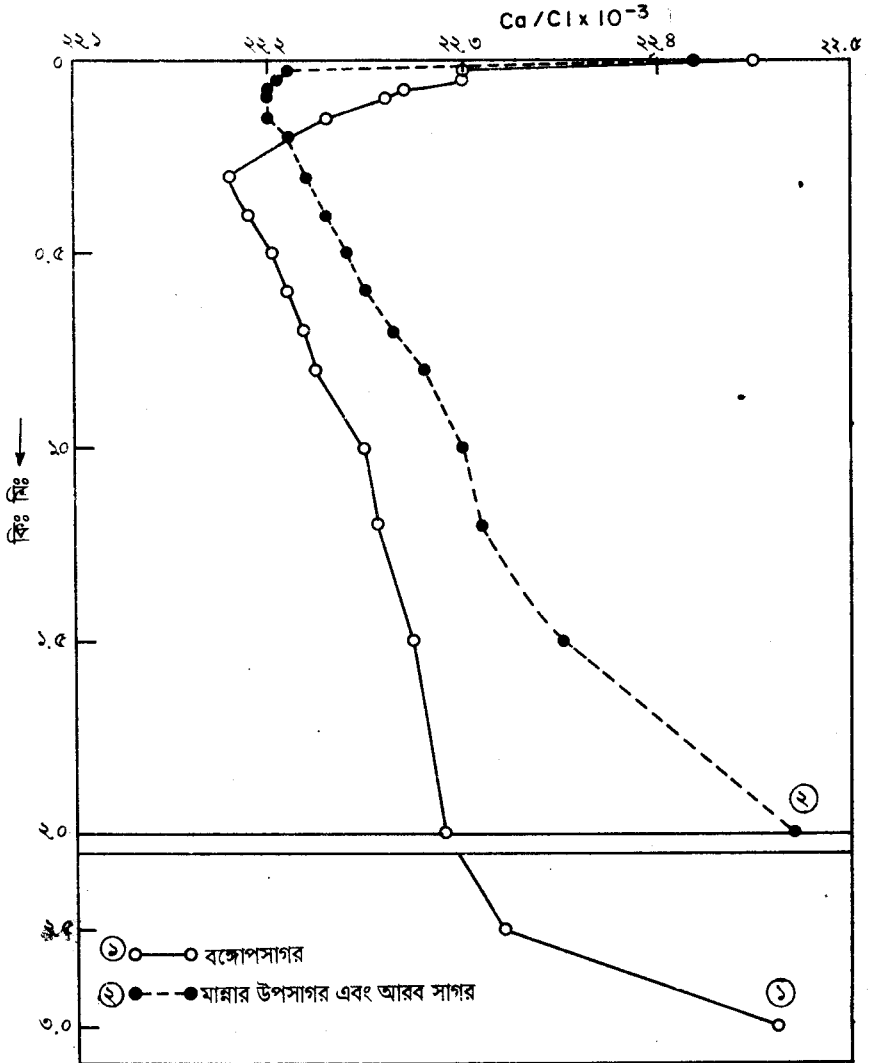


বাংলাদেশী বিজ্ঞানী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শফিউল্লাহ গঙ্গা-পদ্মা ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী বাহিত পানিতে জৈব কার্বনের পরিবহণ পদ্ধতি নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করছেন। শফিউল্লাহ (১৯৮৬, ক+খ), ১৯৮৯) উল্লেখ করেছেন যে, শুধু গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র দিয়ে (1.8৮×10^6) বর্গ কিলোমিটার নিষ্কাশন এলাকা সম্বলিত)



চিত্র ৪.১২ : বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন গভীরতায় ফ্লোরাইড (Mg/l) এর অক্সিজেনের (mc/l) বিতরণ

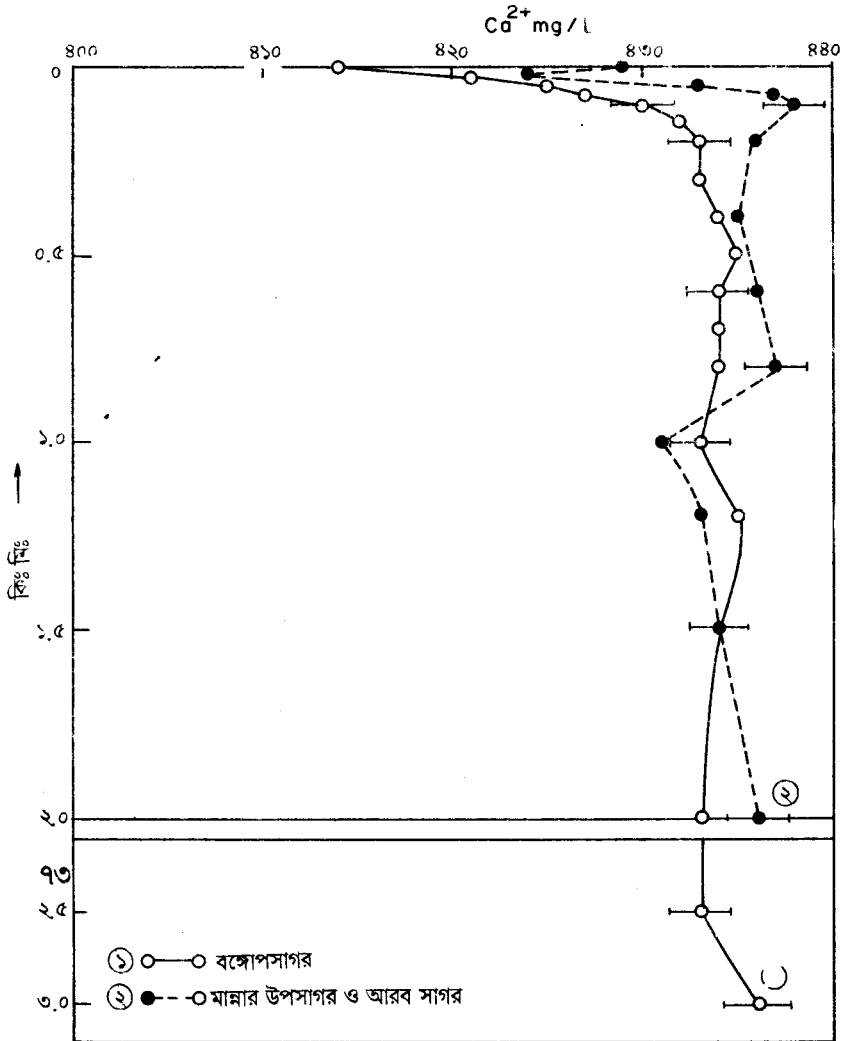
বার্ষিক ৯৭১ ঘন কিলোমিটার পানি বয়ে যায় সাথে ১৬৭০ মিলিয়ন টন তলানি নিয়ে। এ সময় স্থলভাগ থেকে জৈব পদার্থ দ্রবীভূত এবং দানাকার এই দুই-ই বঙ্গোপসাগরে চলে যায়, এদের পুষ্টিকর ক্ষমতা স্বল্প, তাই সমুদ্রের তলদেশে এরা তলানি হিসেবে সঞ্চিত হতে থাকে। দানাকার জৈব কার্বন (POC) এবং দ্রবীভূত জৈব কার্বন (DOC) দুই-ই জুলাই আগস্ট মাসে বেশি হারে নদী দিয়ে সাগরে ঢুকে। DOC এর পরিমাণ



চিত্র ৪.১৬

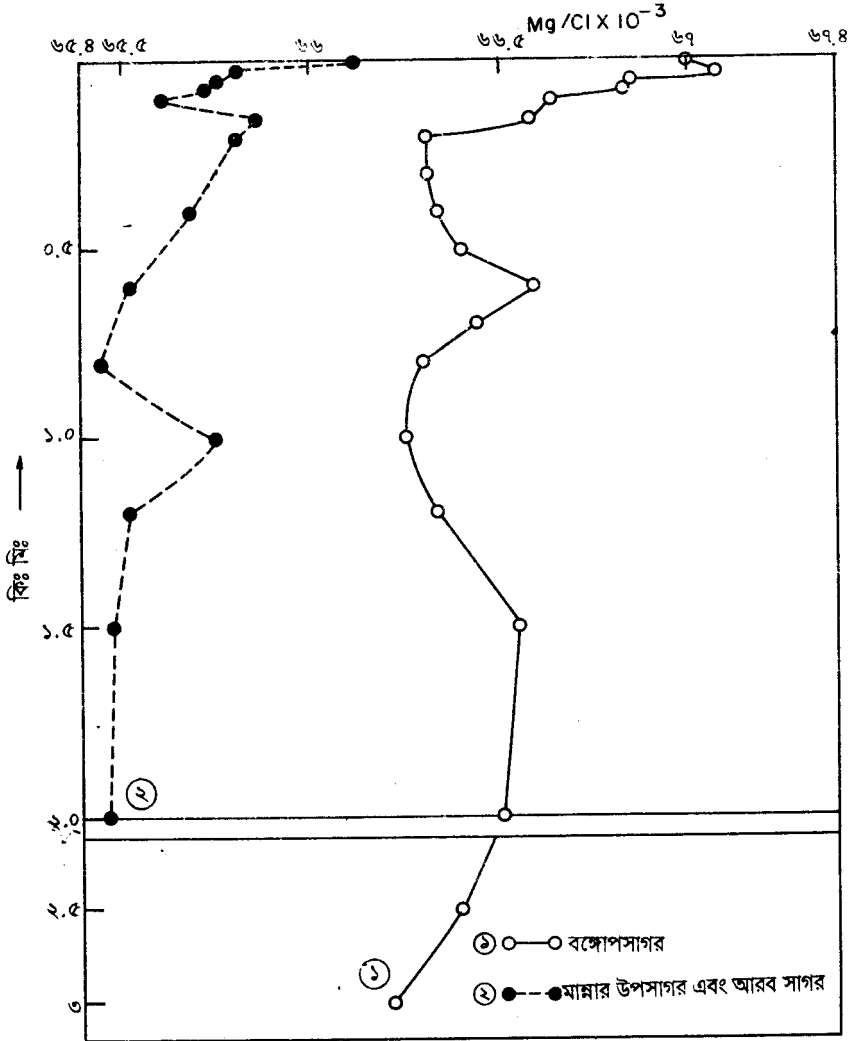
গড়ে ১.৩-৩.৮ (mgC/l)। গঙ্গা নদীর জন্য এবং ব্রহ্মপুত্রের জন্য ১.১-২.৯ (mgC/l) এসব জৈব পদার্থে চিনি এবং অ্যামাইনো এসিড ইত্যাদি জৈবিক বিক্রিয়ার স্বরূপ নিয়ে তিনি গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

শফিউল্লাহ (১৯৮৯) পদ্মা মেঘনার মোহনায় চরাঞ্চলের আশেপাশে বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক বিজ্ঞান গবেষণা চালান। তিনি হাতীয়ার সন্দীপ এলাকার কাছে দ্রবীভূত



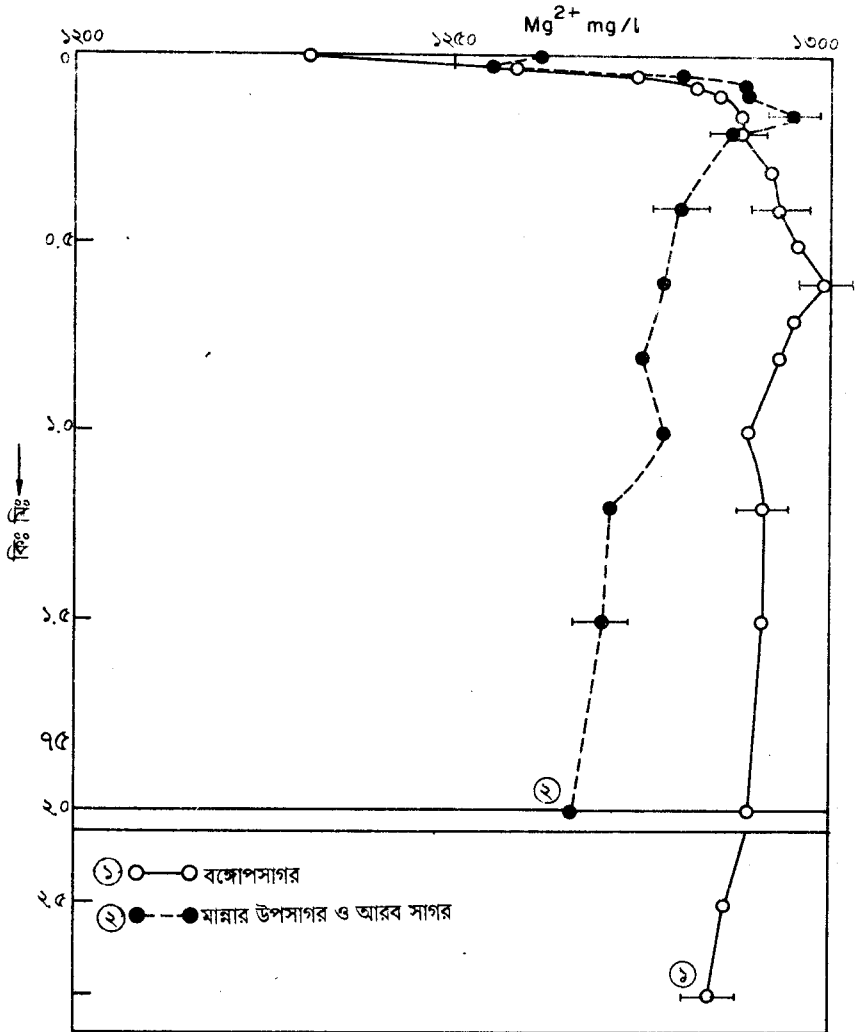
চিত্র ৪.১৪ : বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন গভীরতায় ক্যালসিয়ামের বিতরণ।

অক্সিজেন ৭.০৮-৯.৭৩ পি.পিএম (পার্ট পার মিলিয়ন) পানির ক্লোরিন ৬.৮৭ পি.পিএম থেকে ৯.১৪ পি.পিএম এবং রুদ্ধতা ২৮৯০-৩৪২০ পি.পিএ নির্ণয় করেন। এ অঞ্চলে পানির ক্ষারত্ব ১.১৮-১.৪৮ mg/liter লক্ষ্য করা গেছে। এই উপাত্তগুলো নদীতে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তবে POC ও PON (N-নাইট্রোজেন) নদীর তুলনায় কম। এসব জৈব (biota) রাসায়নিক, ভৌগোলিক ও জীববিজ্ঞান প্যারামিটার



চিত্র ৪.১৫ : বঙ্গোপসাগরে ম্যাগনেশিয়াম ও ক্লোরিনের অনুপাত।

দ্বারা বিবেচ্য। বাংলাদেশের মৃত্তিকার উর্বরতা বাড়ানোর জন্য এইসব বিক্রিয়ার স্বরূপ জানা অবশ্যই দরকারী। স্মর্তব্য এই যে, বাংলাদেশের নদীগুলো ১২.৬ মিলিয়ন টন জৈব কার্বন ও ২ মিলিয়ন টন অজৈব কার্বন বঙ্গোপসাগরে সপে দেয়। উপসাগরের জীবকুলের প্রতি এই গলানি (প্রবাহ (flow) কি প্রভাব বিস্তার করে তার আদ্যপান্ত জানা অত্যাবশ্যক।



চিত্র ৪.১৬ : বঙ্গোপসাগরে ম্যাগনেসিয়ামের গড় মাত্রা (mg/l)

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের নদীগুলোর দান

পাহাড় পর্বত শৃঙ্গ থেকে নদীগুলো জন্ম নিয়ে সাগরে পতিত হয়। পরে নদী পাথর, বালি আরও কত দ্রব্য বস্তু নিয়ে প্রবাহ সৃষ্টি করে সামনে এগিয়ে চলে। নদীবাহিত পানি সাগরের মহীসোপানে জমে গড়ে উঠে দ্বীপ, বদ্বীপ ইত্যাদি। আর সাগরের পানির রং, লবণাক্ততা, তাপমাত্রা ইত্যাদি গুণগত বৈশিষ্ট্যে আনে পরিবর্তন। সাগরস্রোত, জৈব উৎপাদন, সে সঙ্গে মৎসচারণক্ষেত্র ইত্যাদি অনেক কিছুর সঙ্গে যুক্ত থাকে নদী কর্তৃক বিসর্জিত তলানি বা অবক্ষেপ। তাই এই বিষয়ের উপর সম্যক ধারণা থাকা সমুদ্র বিজ্ঞানের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। এ সম্পর্কে অনেক বিজ্ঞানী (Meybeck 1979, Martin and Meybeck 1979, Marin and Whitfield, 1983) ইতিমধ্যে কাজ করেছেন।

সারাবিশ্বের নদীগুলি বাৎসরিক $39.8 \times 10^{12} \text{ m}^3 \text{ y}^{-1}$ পরিমাণ (Martin and whitefield, 1983) পানি সাগরগুলিতে বহন করে নিয়ে যায় আর এর মধ্যে ভারতীয় নদীগুলোর অংশ হচ্ছে $1.695 \times 10^{12} \text{ m}^3 \text{ y}^{-1}$ (Rao, 1975)। নদীগুলো $2.893 \times 10^{14} \text{ gy}^{-1}$ পরিমাণ ভাসমান বস্তু ভারতীয় নদীগুলি বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে বিসর্জন দেয় (Milliman and Meade, 1983)। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু নদী ছাড়াও গোদাবরী, কৃষ্ণা, মহানদী নর্মদা, কাবেরী ও তৃপ্তি নদী উপরোক্ত দুই সাগরে প্রবাহিত হয়ে পথ পরিক্রমা শেষ করে। বঙ্গোপসাগরে নদী বাহিত পানির পরিমাণ $126 \times 10^{10} \text{ m}^3 \text{ y}^{-1}$ যেখানে সবগুলো (৪৬টি) নদী বহন করে $160 \times 10^{10} \text{ m}^3 \text{ y}^{-1}$ পরিমাণ পানি (এখানে m = মিটার, y অর্থ প্রতি বৎসর)। বঙ্গোপসাগরে আরব সাগরের চাইতে ৪ গুণ বেশি মিঠা পানি প্রবেশ করে। এর অধিকাংশই মৌসুমী বায়ু প্রবাহের সময় ঘটে (Subramaniam, 1979; Rao 1915, UNESCO, 1971) মৌসুমী ঋতুতে ভারতীয় আবহাওয়া মণ্ডলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হয় প্রতি বর্গ মিটারে ৬ গ্রাম (Rangarajan and Mani, 1982)।

গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র নদীগুলো বহন করে ক্লোরাইট (Chlorite), ইলাইট (illite) এবং কাওলিনাইট (Kaolinite) খনিজ আর উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের নদীগুলো বহন করে মন্টমোরিলোনাইট (Montmorillonite)। জলবায়ুর প্রভাবে প্রস্তরাদির ক্ষয় বা (denudation এর হারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই নদীগুলোতে দ্রবীভূত বস্তুর চাইতে ৪ গুণ বেশি তলানি থাকে (সারণি ১৭ দ্রষ্টব্য)।

সারণি ১৭ : ভারতীয় নদীগুলোর সর্বমোট ভার (bed load) এবং নগ্নীভবনের হার

	রাসায়নিক	তলানি	মোট
ভার (Load) (10^8 kg yr^{-1})	২৮২	১২০৯	১৪৯১
নগ্নীভবনের হার ($10^8 \text{ kg km}^{-2} \text{ yr}^{-1}$)	৮.২১	৩২.৭	৪০.৯

সূত্রঃ (Subramaniam, 1979)

যেহেতু হিমালয় পর্বতে সবচেয়ে বেশি ক্ষয় হচ্ছে তাই গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র নদী বেশি বস্তু পাচ্ছে সাগরে নেবার জন্য। এই হারে জলবায়ুর প্রভাবে প্রস্তরাদির ক্ষয় বা নগ্নীভবন (denudation) চলতে থাকলে আগামী ৫০ লক্ষ বৎসরে হিমালয় পর্বত সমুদ্র সমতলের সমান হয়ে যাবে (Subramanian, 1978 ও 1979)। ভারতীয় উপমহাদেশের আয়তন যদিও বিশ্বের মাত্র ৭ শতাংশ তথাপি ৬ শতাংশ ভূমি ক্ষয় স্থলভাগ-সাগর সীমান্তে ঘটে এখানে। ভারতীয় নদীগুলো মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ বা Total dissolved solids- TDS বহন করে 155 mg dm^{-3} (Martin and Whitfield, 1983) মতান্তরে, 159 mg dm^{-3} (Subramanian 1979)। এই হার বিশ্বমানের চাইতে ২৫ শতাংশ বেশি। ছয়টি প্রধান নদী বঙ্গোপসাগরে যে বস্তুগুলো নিয়ে যায় তার আয়নিক গঠন দেয়া হলো ১৮ নং সারণিতে।

সারণি ১৮, নদীবাহিত প্রধান মৌলগুলোর প্রবাহ (10^{10} gy^{-1} বঙ্গোপসাগরে)

ক্ষয় মৌল ($\text{m}^3 \text{ y}^{-1}$)	৩৯.৩×১০ ^{১০} গঙ্গা	৬.০৯×১০ ^{১০} ব্রহ্মপুত্র	১০.৫×১০ ^{১০} গোদাবরী	৬.৮×১০ ^{১০} কৃষ্ণা	৬.৭×১০ ^{১০} মহানদী	২.১×১০ ^{১০} কাবেরী	১২৬×১০ ^{১০} মোট
Na ⁺	৩৯৫.৬*	১২৮.৮*	১৮২.০	২৩৪.০	৬৮.০	৪৬৮.৬*	১৪৭৭
K ⁺	১০৫.৬	১১৩.৮	২৭.০	১৮.০	১০.০	৪৪.১	৩১৮
Ca ²⁺	৯৯৮.০	৮৫৭.৭	২৭৪.০	১৩৬.০	৭০.০	৪৮৩.০	২৮১৯
Mg ²⁺	২৭৪.৭	২৩৩.৮	৬৪.০	৫২.০	৬৪.০	৭৭.৭	৭৬৬
Cl ⁻	১৯৫.০	৬৭.৮	১৫০.০	১৭৬.০	৯৮.০	১৯৯.৫	৮৮৯
SO ₄ ²⁻	৩৩৬.০	৬১৪.৮	১০৯.০	২১১.০	২১০.০	৬৩.০	১৫৪৩
HCO ₃ ⁻	৪৯৯৫.৯	৩৫৫৬.৩	১৩৮০.০	৯৭৭.০	৪১০.০	২৯৪.০	১১৬১৩
SiO ₄ ⁴⁻	৩২৪.৮	৪৭৪.০	২৩০.০	৯৫.০	৬.০	৩৮.১	১১৬৭
TDS	৭৬২৬.০	৬০৪৫.০	২৪৩৬.০	১৯১১.০	১০৩৯.০	৬৬৮.০	২০৭২৫

* UNESCO (1971)- 12 yr average discharge (1949-60) at Farakka. Sarin (1989).

** Meybeck (1979), SARIN et al-(1989).

*** Ramanathan (1979)

ভারতীয় নদীগুলোতে বিশ্বমানের তুলনায় কম সোডিয়াম আয়ন থাকে, তবে TDS বা দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ থাকে বেশি।

১৯ সারণিতে ফসফেট, নাইট্রেট, ইউরেনিয়াম ও রেডিয়াম নদীবাহিত হয়ে কি পরিমাণ বঙ্গোপসাগরে পতিত হচ্ছে তার উল্লেখ করা হলো (M.Dileep kumar et, al-1992)। কৃষ্ণা নদীতে ইউরেনিয়াম বেশি, $1.23-1.93 \text{ dpm dm}^{-3}$ (Sarin et al, 1985) বঙ্গোপসাগরে দ্রবীভূত ইউরেনিয়াম যাচ্ছে $1195 \times 10^6 \text{ g y}^{-1}$ (গ্রাম/বৎসর) আর ভারত মহাসাগরে হচ্ছে $8৮.২ \times 10^8 \text{ g y}^{-1}$ । বঙ্গোপসাগরে

আনীত বেরিয়াম প্রতি বৎসর হচ্ছে ৯০×১০^{১২} dpm. যার মান হচ্ছে বৎসর প্রতি ৪১ গ্রাম বেরিয়াম। পুরো গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র দিয়ে সর্বমোট ২.৭×১০ গ্রাম/বৎসর বেরিয়াম বঙ্গোপসাগরে যায়।

গঙ্গা নদী দিয়ে প্রতি বৎসর ১.২৪ দ্রবীভূত জৈব কার্বন এবং কণাকার জৈব কার্বন ০.২৮ ($১০^{১২}$ গ্রাম কার্বন বৎসর প্রতি) বঙ্গোপসাগরে নীত হয় (Ittekkot et.al, 1985)

সারণি ১৯. বঙ্গোপসাগরে নীত দ্রবীভূত পুষ্টিকর পদার্থ ইউরেনিয়াম এবং বেরিয়ামের প্রবাহ ($১০^৬$ গ্রাম (বৎসর))

নদী	ফসফেট	নাইট্রেট	ইউরেনিয়াম ($১০^৬$ গ্রাম/বৎসর)	২২৬ রেডিয়াম ($১০^{১০}$ dpm/বৎসর)
গঙ্গা	৪৫৯৮১	৫১০৯০	৭১১	২৭৫০
মহানদী	৩৯০০	১৬০০	১৭	-
গোদাবরী	-	-	৬৫	৪২০
নর্মদা	১৮৩২	৮৫৪৭	২১	৩৪০
কৃষ্ণা	-	-	৭৮	-
কাবেরী	১৭২২০	-	-	-
আশ্চি	-	-	৪	-
ব্রহ্মপুত্র	-	-	৩৮৪	৫৪৮০
সর্বমোট	৫১৭১৯	৬১২৭২	১২৮০	৮৯.৯

সূত্রঃ Sengupta et.al (1989) and Sarin et.al (1990) : N 10(1986) Sengupta and Upadhyay (1987); Borole et, al (1977), and Zingde et. al (1981); Sarin et.al (1985), Rajendran (1974) De Sona (1983) Ramanathan et.al (1988) and Sarin et.al. (1990)

In: M. Dileep kumar et.al.(1992) Oceanography of the 10 ed. B N Desai.

বর্তমান হিসাবে দ্রবীভূত বা ভাসমান ভারবাহী মৌল সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং সিলিকন ভারতীয় নদীগুলো দ্বারা ভারত মহাসাগরে নীত হয়, যথাক্রমে ২১.০, ৯.৭, ১৩.৬, ৪০৫ এবং ২২.০×১০^{১২} গ্রাম/বৎসর প্রতি। সারণি ২০-এ দেখা যাবে দ্রবীভূত মোট বস্তুর পরিমাণ এবং সারণি ১৮ তে দানাকার ধাতব পদার্থের প্রবাহ বঙ্গোপসাগরে কতটুকু।

বঙ্গোপসাগর : সমুদ্র বিজ্ঞান ২৩

সারণি ২০ : ভারত মহাসাগরে দ্রবীভূত বস্তুর মোট পরিমাণ

পরিমাণ (Parameter)	প্রসঙ্গের (Input) (১০ ^{১২} গ্রাম/ বৎসর)
প্রধান আয়ন (Na, K, Mg, Ca, Si)	২৬২.৩
পুষ্টিকর পদার্থ (PO ₄ , SO ₄ , NO ₃)	০.১১
দ্রবীভূত জৈব কার্বন	৩.৯৫
ইউরেনিয়াম	০.০০১৩
মোট:	২৬৬.৩৬১৩

সারণি : ২১ নদীবাহিত দানাকার ধাতব পদার্থের প্রবাহের বঙ্গোপসাগরে নীত পরিমাণ (১০^{১২} গ্রাম/বৎসর)

মৌল	গঙ্গা	নর্মদা	তাপ্তি	গোদাবরী	কৃষ্ণা	কাবেরী	মহানদী	মোট
অ্যালুমিনিয়াম	১.৫৩	০.৪২	০.০৬	০.৮১৩	০.০১৪	০.০০০১৯	০.০১২	২.৮৫
লৌহ	১.৭০	০.৩৮	০.০৬৩	০.৭২	০.০১৯	০.০৩৪	০.০৮	৩.০০
ম্যাঙ্গানিজ	০.০৩৫	০.০০৫৬	০.০০১	০.০২২	০.০০০৩	০.০০০৯	০.০০০৭	০.০৬৬
নিকেল	০.০০৫	০.০০০৩৫	০.০০০০৫	০.০০৫	০.০০০৩	-	০.০০০০১	০.০০৬
তামা	০.০০২	০.০০০৭১	০.০০০১১	০.০০০২	০.০০০০২	০.০০০০২	০.০০০০৮	০.০০৪
দস্তা	০.০০৪	০.০০০৬৩	০.০০০১২	০.০০০৬	০.০০০০৩	০.০০০০৯	০.০০০০৯	০.০০৫

এই হিসাবে নদী মোহনা ও নদীর সাগরে প্রবেশের আগের পথে ঝুলানো পলল (Suspended) বাদ দেয়া হয়েছে।

নর্মদা ও তাপ্তি নদীর উপাত্ত নেয়া হয়েছে (BOROLE ef. al (1982) এবং বাকি নদীর উপাত্ত পাওয়া গেছে Chakrapani and Subramaniam (1990)-থেকে। গঙ্গা ও গোদাবরী নদী সবচেয়ে বেশি ধাতু বহন করেছে সাগরে।

বঙ্গোপসাগরে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য

শুধু ভারতীয় জলভাগ বার্ষিক ৪.৪ ঘন কিলোমিটার আবাসিক বর্জ্য পদার্থ এবং ০.৪৪ ঘন কিলোমিটার শিল্প কারখানার বর্জ্য পদার্থ নদী বা অন্যান্য মাধ্যমে পায়। সাগরের পরিবেশ এর সুস্থতা রক্ষার্থে জানা দরকার কি পরিমাণ ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ বঙ্গোপসাগরে নীত হচ্ছে।

বঙ্গোপসাগরে অর্গানোক্লোরিন পেস্টিসাইড (DDT) নিম্নলিখিত হারে পাওয়া গেছে :

জুগ্য়াঙ্কটনে	৪.০	—	৫.৯ ppb (বিলিয়নে ১ অংশ)
মাছে	০.৩	—	৮.৬ ppb
তলানিতে	০.০৩২	—	৭২০.০

অন্যান্য জৈবক্লোরিন পেন্টিসাইড, যেমন γ — (HCH(lindane)) পাওয়া যায় ০.০১—০.২১ ppb, Al আলড্রিন (aldrin) ০.০১—০.৫ (ppL এবং ডাইয়েলড্রিন (dieldrin) ০—০.৫ ppb.

২২ সারণিতে এ সম্পর্কে বিশদ তথ্য দেয়া হলো।

সারণি ২২ : বঙ্গোপসাগরের (১২° উত্তর ৮০°৫৬' পূর্ব অক্ষাংশে)
জৈবক্লোরিনের গাঢ় মাত্রা নেনোগ্রাম (ngg⁻¹)

নমুনা	T-DDT	আলড্রিন (Aldrin)
জুগ্লাম্বটন, মাছ	৫.২	০.৬০
(ক) বয়ক (Decapterus Sp).	০.৩	০.০৫
(খ) অপ্রাণ বয়ক (Carangoides Sp)	৮.৬	০.৮০
তালানি	৭২.০	০.৫৩

সূত্র: (Shallaja 1992)

বঙ্গোপসাগরের পতিত নদীগুলোর ঝুলানো কনাদার বস্তুগুলোর সংখ্যা খুব বেশি (৮.০৮ mg⁻¹ অর্থাৎ প্রতি লিটারে ৮.০৮ সিলিগ্রাম) হওয়াতে উজানে কৃষি প্রধান বাংলাদেশে ও ভারতের কৃষকদের পর্যাপ্ত পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহারের দরুন বঙ্গোপসাগরে আরব সাগরের তুলনায় বেশি ডিডিটি জমা হচ্ছে। উপরি উক্ত হিসাবগুলো মোটামুটিভাবে করা হয়েছে। এদের মধ্যে বহু অমীমাংশিত বিষয় রয়েছে, যেমন ধাতুর পদার্থগুলো গঠন ও প্রকৃতি বহুলাংশে নির্ণীত হয়নি। টেমোরাল বায়ুসংক্রান্ত ও স্থানগত বিভিন্নতা, পরিমাণগত পরিবহণ, বন্যার সময় প্রবাহ, জোয়ারভাটার সময়ে প্রবাহ ইত্যাদির উপাত্ত হাতে নেই। গঙ্গা নদীর স্বাভাবিক ও বন্যা সময়ে প্রবাহের হারের মধ্যে পার্থক্য ৩ গুণ। বন্যার সময়ে ২দিন, সর্বোচ্চ ৭দিন পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে ঐ দুই তিন দিনেই সারা বৎসরের ক্ষরণ নদী দিয়ে চলে গেছে বঙ্গোপসাগরে।

দূর্ভাগ্যের বিষয়, গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বা মেঘনা নদী ছাড়া ফেনী, কর্ণফুলী ও কক্সবাজার, বার্মা অঞ্চলের নদীগুলোর উপর কোনো গবেষণা হয় নি, তাই এই নদীগুলোও কি পরিমাণে পলি ও অন্যান্য দ্রব্য বঙ্গোপসাগরে বহন করে তা জানা না থাকতে এ ব্যাপারে সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে না।

অবিশ্যতে কাজের ব্যাপারে কিছু সুপারিশ : একই কাজের জন্য বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করার সময় বিভিন্ন স্থানের নমুনা নিতে হবে বিভিন্ন দলের সাহায্যে। উপাত্তের গুণগত দিক ঠিক রাখতে হবে। তা ছাড়া, যা করতে হবে :

- ১। নদীর উৎসের গঠন এবং জলনিকাশের বিভিন্নতার দিকে নজর দেয়া,
- ২। নদীর প্রবাহের সময় গঠনগত পরিবর্তন

- ৩। পুরো অংশের তলানির নমুনা সংগ্রহ, ও ঝুলান (Suspended) বস্তুগুলোর বিভিন্নতা ও গঠন অব্বেষণ
- ৪। নদীর ভূসংস্থান বা স্থানবিবরণ সংস্থান (Topogrophy) এবং প্রস্থচ্ছেদ ও তাদের বহনের উপর প্রভাবের বিভিন্নতা যাচাই।
- ৫। খাঁড়িতে মিশ্রণের ধরন, সঙ্গে পার্শ্বসঞ্চালন
- ৬। স্বল্প লবণাক্ততা অঞ্চলে মৌলগুলোর আচরণ ব্যবহার
- ৭। খাঁড়িতে এদের আচরণ এবং দ্রব্যগুলোর অপসারণ
- ৮। খাঁড়ির (estuaries) মাধ্যমে নদী থেকে সাগরে উপকরণাদির প্রবাহের পরিমাণ নির্ণয় করা।

পুষ্টিকর পদার্থের উৎস : বঙ্গোপসাগর

ব্রয়েকার, টগবেইলার এবং টাকাহাসি (১৯৮০) তাঁদের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে "The Bay of Bengal-A major nutrient source for the deep Indian Ocean" এ উল্লেখ করেন যে, ভারত মহাসাগরের গভীর তলদেশে দ্রুতীভূত অক্সিজেন এবং পুষ্টিকর পদার্থের উৎস হচ্ছে বঙ্গোপসাগর। GEOSECS প্রোগ্রামের অধীনে তাঁরা মাদ্রাজের পূর্ব দিকে মধ্য বঙ্গোপসাগরে অনুসন্ধান চালান এবং সোজা অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত চলে যান নমুনা সংগ্রহ করতে। মধ্য বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে পুষ্টিকর পদার্থের গাঢ়মাত্রা অত্যধিক এবং অক্সিজেন কম।

এতে বোঝা যায় যে শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ এবং শক্ত দ্রব্যের দ্রবণ এখানে বেঙ্গল ফ্যানের তলদেশের মিশ্র স্তরে খুব দ্রুতহারে ঘটছে। এতে অতিরিক্ত পুষ্টি জোগান হয় এবং অক্সিজেন স্বল্পতা সৃষ্টি হয়। সারণি ২৩ এ গবেষণার ফলাফল দেয়া হলো।

সারণি-২৩ : বঙ্গোপসাগরের গভীর তলদেশের জলের বৈশিষ্ট্য (১২° উত্তর এবং ৮৪.৫° পূর্ব অক্ষাংশ, গভীরতা ৩৩২৫ মিটার)

গভীরতা (মিটার)	তাপমাত্রার $\theta (0^\circ\text{C})$	লবণাঙ্ক (‰)	আইসো- পিকনাল $\sigma_t (‰)$	অক্সিজেন নাইট্রেট কনসেন্ট্রেশন $\text{O}_2 \quad \text{NO}_3 \quad \text{PO}_4$ ($\mu\text{mole/kg}$)			কার্বন ডাই- অক্সাইড CO_2	ক্ষার Alk ($\mu\text{eq/kg}$)	সিলিকেট SiO_2 ($\mu\text{mole/kg}$)	রেডন ^{222}Ra (dpm/ 100 kg)
৩১৮৭	১.২৬২	৩৪.৭২৭	৪৫.৯৩৭	১৪৯	৩৫.১	২.৪৫	২৩৪২	২৪২৫	১৪৬.৮	৩০.০
৩২৫০	১.২২৪	৩৪.৭২৫	৪৫.৯৪১	১৪৯	৩৫.৮	২.৪৫	২৩৬১	২৪৪৮	১৫৩.৮	৪০.৫
৩৩০৬	১.২২৪	৩৪.৭২৫	৪৫.৯৪২	১৪৪	৩৫.৫	২.৪৪	২৩৫২	২৪৩৭	১৫৩.২	৪২.৫

(সূত্র: (Broecken, et. al 1980))

নিরক্ষীয় রেখার উত্তরে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের সীমানায় মেক প্রদেশের আবর্তনীয় গভীর পানিতে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট পুষ্টিকর পদার্থ ভুবে থাকে এবং দ্রবীভূত অক্সিজেনের উৎস এই স্থানটি। এটা আইসোপ্যাকনাল উপরিতলের বিশেষণের (diffusion) সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল।

রাসায়নিক উপাত্ত থেকে দেখা গেছে প্রতিটি জৈব কার্বন মৌল জারিত হয়ে ১.৫ মোল ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে দ্রবীভূত করবে এবং প্রতিটি ক্যালসিয়াম কার্বনেট মোলের জন্য ১ মোল সিলিকা দ্রবণে যাবে। নাইট্রেট ও ফসফেট অতিরিক্ত পাওয়া গেছে রেড কিস্টু অনুপাতের (O_2 ; NO_3 ; $PO_4 = 135 : 15 : 1$) চাইতে দুই-তৃতীয়াংশ বেশি করে।

পঞ্চম অধ্যায়

বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক ভূ-বিজ্ঞান (Geological Oceanography of the Bay of Bengal)

সমুদ্রের উৎপত্তি রহস্য

ভূতাত্ত্বিকেরা মনে করেন পৃথিবীর সমুদ্রের বয়স তিনশত কোটি বছর এবং পৃথিবীর বয়স চারশত ষাট কোটি বছর। বহুকাল ধরে পৃথিবী ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে সমুদ্র তৈরি হয়। যতদিন পৃথিবীপৃষ্ঠের উত্তাপ 100° সেলসিয়াসের বেশি ছিল, পানি বাষ্প হয়ে ঘন মেঘের আবরণে শিশু পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছিল; পৃথিবীপৃষ্ঠ আরও ঠাণ্ডা হলে বাতাসের জলকণা ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়, পানি নিচু জায়গায় জমা হতে থাকে এবং পানিতে দ্রবীভূত পদার্থগুলিকে নিজের সঙ্গে বয়ে নিয়ে যায়; পৃথিবীর প্রস্তরময় অংশ তখনও খুব গরম থাকায় এই পানি বাষ্পীভূত হয়ে আবার পরিবেশে মেশে। এই চক্রাকার পদ্ধতি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলতে থাকে; এর ফলে আদি সমুদ্রগুলির উৎপত্তি হয়। সারা বছর ধরে অসংখ্য প্রবাহমান নদী সমুদ্রে এসে পড়ে এবং সঙ্গে নিয়ে আসে প্রচুর পারিমাণে দ্রবীভূত লবণ। আস্তে আস্তে এইভাবে সমুদ্রের লবণাক্ততা বাড়তে থাকে।

আদি পৃথিবী ছিল অতিশয় তপ্ত জলন্ত অগ্নিকুণ্ড সদৃশ যা জন্মমূহূর্তেই জলীয় বাষ্প বিশিষ্ট আবহমণ্ডলকে বন্দি করতে পেরেছিল। কোটি কোটি বছর ধরে তাপ হারাতে হারাতে পৃথিবী যখন যথেষ্ট শীতল হয়ে উঠল, তখন সঞ্চালনের ফলে ভূপৃষ্ঠের কোনো কোনো স্থান বসে গেল এবং যেসব জায়গায় শক্ত শিলাস্তর গঠিত হয়েছিল সেগুলি ভূপৃষ্ঠ ভেদ করে উপরের দিকে উঁচু হয়ে উঠল। তার আগে অবশ্য শীতল হতে হতে, পৃথিবীর উপরিভাগটায় পুরু ও শক্ত একটা আন্তরণ বা ভূত্বকের সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমানে ভূত্বক মাত্র চল্লিশ মাইল পুরু। ভূত্বকের নিচে অভ্যন্তরভাগ উত্তপ্ত, তরল, অশান্তই রয়ে গেছে। সেখানে অধিক ঘনভূয়ুজ ধাতু পাথর প্রচণ্ড তাপমাত্রায় তরল অবস্থাতেই বিরাজ করছে। প্রাথমিক অবস্থায় ভূত্বকটা বেশি পুরু না হওয়ায় অভ্যন্তরস্থ অস্থির তরল ভূপৃষ্ঠ ভেদ করে অগ্ন্যুৎপাতের আকারে বাইরে বেরিয়ে এসে জমে পাথরে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং সৃষ্টি হয়েছিল আগ্নেয় পাহাড়। আবহমণ্ডল ঠাণ্ডা হয়ে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘ-তার পরে বৃষ্টি ঝরল অঝোর ধারায় লক্ষ লক্ষ বছর। পৃথিবীব্যাপী সৃষ্টি হয়েছিল মহাসমুদ্রের। ভূপৃষ্ঠের কিছু কিছু ফাটল দিয়ে পানি ভূগর্ভে নামতে থাকে। ফলে অভ্যন্তরের প্রবল উষ্ণতায় সেগুলি বাষ্প পরিণত হয়ে অভ্যন্তরকে আরও অস্থির করে তোলে এবং প্রচণ্ডভাবে বাষ্প চাপ দিতে থাকে। এখানে সেখানে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি

মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ভেতরের লাভাস্রোত উপরে এসে শীতল হয়ে শক্ত পাথরে পরিণত হতে হতে জলের উপর মাথা চাড়া দিয়ে উঠে এবং এভাবেই প্রথম ভাঙা আত্মপ্রকাশ করে। কোটি কোটি বছর কেটে যাবার পর ভূগর্ভস্থ তরল লাভা স্রোতের আকারে উপরে বেরিয়ে আসায় পার্শ্বস্থ এলাকা বসে যায় এবং সৃষ্টি হয় গভীর খাত। পৃথিবীর উপরিভাগটি আর সমতল রইল না। নিচু জায়গাগুলো জলমগ্ন হয়ে থাকলো এবং উঁচু পাহাড়গুলো জলের উপরে বা জলে নিমজ্জিত অবস্থায় থাকলো।

এখন থেকে দু'শ' কোটি বছর আগে ডাক্তার আবির্ভাব অর্থাৎ স্থলভাগ একটা সুবৃহৎ দ্বীপের মত মহাসমুদ্রের মাঝখানেই জেগে উঠেছিল। মূল স্থলভাগটি কোনো এক ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ছিন্নভিন্ন হয়ে ছোট বড় অনেকগুলো স্থলভাগে (মহাদেশ) বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ায় মহাসমুদ্রের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে। স্থলভাগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলেই দুই স্থলভাগের মধ্যে ব্যবধান রচনা করলো জল। আর মধ্যবর্তী জলভাগসমূহই এক একটি মহাসাগর। আদি মহাসমুদ্রের গভীরতা তখন কম ছিল। ধীরে ধীরে আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত থেকে পাহাড় পর্বতের জন্ম হতে থাকলে একদিকে যেমন এদের শীর্ষদেশ ক্রমান্বয়ে উঁচু হতে থাকে অপর দিকে তেমনিই সমুদ্রের তলদেশ বসে যেতে আরম্ভ করে। আবার একটি বিরাট জলভাগের চারদিকে ঘিরেও ডাক্তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এক কথায় স্থলভাগ যতই উঁচু ও বিস্তৃত হয়েছিল ততই গভীরতা বেড়েছিল সমুদ্রের।

সমস্ত মহাসমুদ্রের জলই পরস্পরের সঙ্গে অবিশ্লিষ্ট এবং এদের মধ্যে জল এবং জীব ও জড় পদার্থের অবাধ বিনিময় হয়। কিন্তু অবস্থান বিশেষও প্রতিবেশী স্থলভূমির সঙ্গে সম্বন্ধানুযায়ী প্রতিটি মহাসাগর, সাগর তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। বঙ্গোপসাগর, আন্দামান সাগর ভারত মহাসাগরেরই প্রান্তীয় জলরাশি। উপসাগর, সাগর প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য এবং এদের সংলগ্ন মহাসাগরের বৈশিষ্ট্য একই হয়।

সৃষ্টির শুরু থেকেই বিশ্বের সমস্ত জিনিসের মতই মহাদেশগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে ধীর গতিতে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এ ব্যাপারটি প্রথম লক্ষ্য করেন বাইখানক নামে এক বৈজ্ঞানিক ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে। এটিকে জার্মান বৈজ্ঞানিক ওয়েগনার বা ভাগনার (Wegner) বৈজ্ঞানিক তত্ত্বরূপে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম উপস্থাপিত করেন। পরবর্তীকালে ডুটয়েট (Du Toit) এ তত্ত্বটির ভুলত্রুটি সংশোধন করেন। রাশিয়ান ভূ-বিজ্ঞানীরা এ তত্ত্বটি মেনে নিয়েছেন। আজ থেকে সাড়ে সাইক্লিস কোটি বছর আগে ডেভোনিয়ান যুগে পৃথিবীর মহাদেশগুলো এক বিরাট মহাদেশ বা প্যানজিয়া হয়ে অবস্থান করছিল আর তার চারিদিকে ছিল নীল সমুদ্র প্যানথালমী। এ প্রাগৈতিহাসিক মহাদেশ একদিন ভেঙ্গে গিয়ে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে একে অন্যের থেকে দূরে সরে যায়। সিলুরিয়ান থেকে ইয়োসিন যুগ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলি পরস্পর থেকে আরও দূরে চলে যায়। প্রাইস্টোসিন যুগে বা ১৫ লক্ষ বছর আগে মহাদেশগুলো আজকের অবস্থায় আসে। পৃথিবীর ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাসে বিচ্ছিন্ন যুগের আবহাওয়ার মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায়।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, ত্রিশ কোটি বছর আগে কার্বোনিকেরাস যুগের প্রথমে ভারতবর্ষ অবস্থান করতো দক্ষিণ মেরুর কাছে যার স্বাক্ষর আছে সে যুগের শিলার বৃকে। মার্কিন বিজ্ঞানী ব্রজ হিজিন IIOE -এর অধীনে Deep Sea Drilling Project-এ কাজ করেছেন; তিনি প্রমাণ করেছেন, ভারতবর্ষ গত ১০ কোটি বছর ধরে ক্রমশ ৩৭০০ মাইল উত্তরে সরে গেছে। এখন প্রশ্ন এই মহাদেশগুলো সরে কি করে?

মহাদেশগুলো সিয়াল নামে হাল্কা পাথরে তৈরি বলে সেগুলো ভাসছে। এ সিয়াল শিলা, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদিতে তৈরি হাল্কা যৌগিক পাদার্থ দ্বারা তৈরি। সিয়ালের চেয়ে ভারী হচ্ছে শিমা পাথর যা সমুদ্রের তলায় থাকে। শিমা সিলিকন, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ ইত্যাদিতে তৈরি ভারী যৌগিক পদার্থ। এটি তরলও নয়, কঠিনও নয়। সমুদ্র ভারি চালে চলে না। তদুপরি রয়েছে পানির চাপ। ওয়েগনার বলেছেন যে, মহাদেশগুলোর বিঘুবরেখায়ুখী গতির জন্যই আল্পস ও হিমালয় পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে। তটদেশে প্রতিহত হয়ে সমুদ্র যেমন ঢেউ সৃষ্টি করে, তেমনি এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশ বিঘুবরেখার দিকে চলবার সময় ঘর্ষণের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত হিমালয় ও আল্পস পর্বতকে। টার্সিয়ারী যুগে বা দুই কোটি বছর পূর্বে এভাবেই উত্তর আমেরিকার রকি ও দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতের সৃষ্টি হয়েছিল। যেসব পর্বত শ্রেণী ভূতাত্ত্বিক বিচারে সমসাময়িক এবং একই শ্রেণীর শিলায় তৈরি, সেগুলোকে মহাসাগরের উভয় তীরে মুখোমুখি অবস্থায় পাওয়া গেছে। সে অবস্থায় সেগুলোকে দেখে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, কোনোকালে তারা একই পর্বতশ্রেণীভুক্ত ছিল কিন্তু মহাদেশগুলি ভেসে সরে যাওয়ায় মহাসাগরের দু'পারে দু'অংশ চলে গেছে।

মহাদেশগুলোর সঞ্জনশীলতার স্বপক্ষে প্রাণীতাত্ত্বিক প্রমাণও রয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার কিছু জাতের প্রাণী ও মাছের মধ্যে রয়েছে অদ্ভুত মিল। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরাও ওয়েগনারকে সমর্থন করেছেন। উত্তর আমেরিকার কিছু উদ্ভিদের গ্রীনল্যান্ডে চিহ্ন পাওয়া গেছে। গ্রীনল্যান্ডের সন্নিবেজ গাছ হিমালয়েও দেখা যায়।

বিশ কোটি বছর আগে পৃথিবীর বৃহত্তম তুষার যুগ বিস্তার লাভ করেছিল দক্ষিণ মেরু থেকে। প্রাচীন হিমবাহ দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশকে উত্তরে নিরক্ষীয় অঞ্চল পর্যন্ত বরফে ঢেকে ফেলেছিল ও সেই সঙ্গে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষও তুষারাবৃত হয়ে পড়েছিল যার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে পাললিক শিলার স্তরে। কিন্তু এই হিমবাহের নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যতাপের বাধার জন্যই পৌছার কথা নয়। তাই ওয়েগনার বলেন যে, এন্টার্কটিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া একত্রে দক্ষিণ মেরুতে ছিল তখন (গভোয়ানা মহাদেশে)। গাণ্ডোয়ানার এক উদ্ভিদ 'গ্লোসোপটরিস' এর জীবাশ্ম মিলেছে এসব দেশগুলোতে।

প্রাচীন যুগে হিমবাহ যখন গলে যায় তখন সেই বিরাট ভূখণ্ড ঘুরতে ঘুরতে উত্তর দিকে ভেসে চলে। ভারতবর্ষ ভূখণ্ডটি ভাসমান অবস্থায় ক্রান্তীয় অঞ্চলে, বর্তমান এশিয়া মহাদেশের উত্তরাংশ আঙ্গারা ভূখণ্ডের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সেখানেই হিমালয়ের সৃষ্টি করে।

মহাদেশীয় সমুদ্রগণশীলতার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নবাবিষ্কৃত জীবাশ্ম চুম্বকত্ব। স্থলভাগের শিলা উপাদানে থাকে গলিত লোহ বা জলযুক্ত পাললিক শিলা কণা, যার মধ্যে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত আনুবীক্ষণিক জং ধরা লৌহ কণিকা বা আয়রন অক্সাইড সহজেই আবর্তন করতে পারে। এই শিলার উপাদান জটিল হবার আগেই এই লৌহ কণিকাগুলি কম্পাস যন্ত্রের কাটার মত উত্তর দিক নির্দেশ করে নিজেদের স্থান গ্রহণ করে। জীবাশ্মস্থিত চুম্বকত্ব প্রাপ্ত জং ধরা লৌহকণিকা রূপ কম্পাস যন্ত্রের নির্দেশ থেকে তারা বলতে পারেন যে, ঐ শিলা বা শিলাস্তর প্রথম যখন সেখানে সঞ্চিত হয়েছিল, তখন সেখানের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ কত ছিল। এর ফলে দেখা গেছে, পৃথিবীর উত্তর দিক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দিকে নির্দেশিত হয়েছে। কিন্তু পৃথিবী হলো একটি ভালো জাইরোস্কোপ, যা একটি স্থির কোণে আবর্তন করছে। ফলে এর মেরু নির্দেশের অর্থ এই নয় যে, উত্তর মেরু স্থান পরিবর্তন করেছে। কিন্তু তার পরিবর্তে যেসব মহাদেশে এসব শিলা জমা হয়েছে, সেগুলিই ভূ-পৃষ্ঠের ওপর স্থান পরিবর্তন করে বেড়াচ্ছে।

ভারতীয় শিলা পরীক্ষার দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাত কোটি বছর আগে ভারত নিরক্ষরেখার দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। তেমনি দক্ষিণ আফ্রিকার শিলা দেখেও প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ গত ত্রিশ কোটি বছর ধরে দক্ষিণ মেরুর ওপর দিয়ে ভেসে গেছে।

তাহলে মহাদেশগুলির ভৌগোলিক স্থান বদলের কারণ কি? বিজ্ঞানীরা বলেন, এর কারণ হলো পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ বল, যেটা মহাদেশগুলিকে বিষুবরেখার দিকে আকর্ষিত করে। কেউ বলেন, মহাদেশগুলি জোয়ারভাটার টানে পশ্চিমে ধাবমান। ঐ গতির ফলে পৃথিবীর অন্তঃস্থলের তাপ নির্গত হচ্ছে এবং পৃথিবী ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা ও সঙ্কুচিত হয়ে ভাসমান করছে মহাদেশগুলিকে। অনেকে মনে করেন পরিবহণ প্রবাহ বা তাপপ্রবাহ মহাদেশগুলিকে ভাসমান রাখে। পরিবহণ প্রবাহের উৎপত্তি হয়েছে পৃথিবীর কেন্দ্রের তেজস্ক্রিয়তা থেকে। কেন্দ্র থেকে সৃষ্টি হয়ে তারপর পৃথিবীর নিচের শিলাস্তরের নিচের দুই হাজার মাইল পুরু স্তরের মধ্য দিয়ে বৃত্তাকারে প্রবাহিত হয়ে একটি পূর্ণ আবর্ত সৃষ্টি করে। পরে এটি আবার কেন্দ্রে ফিরে আসে।

অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানী মহলে আর একটি মতবাদ গড়ে উঠেছে। জে. টি. উইলসনের মতে কেন্দ্রীয় একটি ভূখন্ডের ক্রিয়াকরণে মহাদেশ তৈরি হয়। তেজস্ক্রিয় পদ্ধতিতে দেখা গেছে যে, মহাদেশের কেন্দ্রের পাথরের বয়স বেশি আর প্রান্তভাগে কম। তার মানে মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে সৃষ্টি হয়।

সমুদ্রের বয়স নিয়েও বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা মত। কিন্তু ব্রুস হিজিন (Bruce Heezen) মনে করেন, সবকটি সমুদ্রের বয়স সমান, কেউ কারো চেয়ে প্রাচীন নয়, আর এটি হলো তিনশো কোটি বছর। কেননা, তার বৃকে প্রথম প্রাণস্পন্দন শোনা গেছে প্রাক-কেন্দ্রিয়ান যুগে। সেই শিশু সমুদ্রে যার আয়তন ছিল আজকের মহাসমুদ্রের শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ। জেলী ফিস আবির্ভূত হয় এককোষী অ্যামিবা। এই জেলীর মত থকথকে জীবটিই হল সকল সামুদ্রিক প্রাণীর আদিতম নিদর্শন।

সারণি ২৪ : (ক) ভূতাত্ত্বিক সময় স্কেল (Geological Time Scale)

বঙ্গোপসাগর : সমুদ্র বিজ্ঞান

সেনোজায়িক এরা
(নব্যজীবায যুগ)
ফানেরোজায়িক
(দৃশ্যমান)

মেনোজায়িক
(মধ্যজীবায)

পালেয়জায়িক
(প্রত্ন জাটিন,
পূরাজীবায)

প্রোটেরোজায়িক
(পরাজীবায)

প্রাক-কেমব্রিয়ান

হোলসিন যুগ গ্রাইটসিন যুগ কোয়াটার্টারি কাল (নিভজিন) গ্রাইটসিন যুগ মাইতসিন যুগ টারশিয়ালী কাল ভিকটোরিয়ান যুগ ইভসিন যুগ প্যালিওসিন যুগ	বর্তমান যুগ — ২ লক্ষ বছর ৭ লক্ষ বছর থেকে — ১০ লক্ষ (১৮ লক্ষ বছর পর্যন্ত) ১৮ লক্ষ — ১ কোটি বা ২ কোটি ৫০ লক্ষ বছর পর্যন্ত ১৮ লক্ষ — ২ কোটি ৬০ লক্ষ — ৬ কোটি ৫০ লক্ষ — ৬ কোটি ২ কোটি ৬০ লক্ষ — ৩ কোটি ৩ কোটি ৮০ লক্ষ — ৫ কোটি ৫ কোটি ৫০ লক্ষ — ৬ কোটি	(৫ লক্ষ, ১০ লক্ষ বছর পর্যন্ত) মানুষের আবির্ভাব, জলপানী ও বর্তমান সামুদ্রিক জন্তুর বিকাশ
---	--	--

প্যালিওজিন	৬ কোটি ৫০ লক্ষ বছর — ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ বছর ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ বছর — ১৮ কোটি বছর ১৮ কোটি —	সরীসৃপ (ডাইনোসর প্রাণ) এর রাজত্ব, উচ্চ শ্রেণীর সামুদ্রিক অমেদগজী প্রাণী
ক্রিটেশাস কাল জুরাসিক কাল ট্রায়াসিক কাল	২৩ কোটি — ২৬ কোটি বছর ২৮ কোটি — ৩৪ কোটি ৫০ লক্ষ বছর ৩৪ কোটি ৫০ লক্ষ বছর — ৩৬ কোটি ৫০ লক্ষ বছর	প্রথম সরীসৃপ প্রথম মেসোডন্ডী উভচর
পার্মিয়ান কাল কার্বনিকেরাস কাল ডেভোনিয়ান কাল	৩৬ কোটি ৫০ লক্ষ বছর — ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ বছর ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ বছর — ৫০ কোটি ৫০ কোটি — ৫৭ কোটি বছর	প্রথম মেসোডন্ডী মাছ, শামুক আদিম অমেদগজীর জীবাশ্ম (হাইড্রা)
সিলুরিয়ান কাল ডেভোনিয়ান কাল কেমব্রিয়ান কাল (নির্দিষ্ট)	৫৭ কোটি — ৬০ কোটি বছর ৬০ কোটি — ১৬০ কোটি বছর ১৬০ কোটি — ২৫০ কোটি বছর (জোলাকিন)	পরাজীবিদের উদ্ভব, বিকাশ অম্লোপাতের শীর্ষকাল আহ্নার তৎপরতা
ডেভিয়ান এরা হারিসিয়ান এরা প্রাথমিক প্রোটেরোজায়িক এরা	২৫০ কোটি — ৪৬০ কোটি বছর	ম্যানগ্রীর অবলুপ্ত অম্লোপাত, শাভা, উল্লারন ম্যানমা গাদ
আকিয়ান বা আদিম		

- ৩টি ভৌগোলিক কাল :
- (১) আকিয়ান বা আদিম
 - (২) প্রোটেরোজায়িক বা পরাজীবায
 - (৩) ফানেরোজায়িক বা দৃশ্যমান

২৫০ কোটি বছর থেকে পৃথিবী সৃষ্টি পর্যন্ত সময়।
৫৭ কোটি বছর থেকে ২৫০ কোটি বছর পর্যন্ত সময়।
০ কোটি বছর থেকে ৫৭ কোটি বছর পর্যন্ত সময়।

সারণি ২৪ : (খ) ভূতাত্ত্বীয় কাল- বিভাগ ও বাংলাদেশ

মহাযুগ (Era)	যুগ (Period)	অধিযুগ (Epoch)	বয়স (কোটি বছর)	প্রাণী	বৈশিষ্ট্য ও বাংলাদেশের উদাহরণ
(৪) নবজীবীয় (সেনোজোয়িক)	(গ) কোয়াটারনারি	গ২ : হলোসিন	বর্তমান-৫/১০ লক্ষ	মানুষের যুগ	সর্বশেষ হিময়ালের আবির্ভাব ও সমাধি নবপল্লী যুগের মানব সভ্যতার আবির্ভাব। পল্লব নিয় সমতল ভূমি ও পলি গঠিত। ৪ টি হিমযুগ।
	(খ) নিওজিন বা উর্ধ্বটারশিয়রী	খ১ : প্রায়োসিন খ২ : মায়োসিন	০.১ বা ১০ লক্ষ ০.৮ (৮০ লক্ষ) ২.৫	স্তন্যপায়ীদের বিকাশ	মানুষের আবির্ভাব। বাংলাদেশের বরেন্দ্র, মধুপুর, লালমাই চত্বরের উৎপত্তি।
	(ক) প্যালিওজিন বা নিম্নটারশিয়রী	ক৩ : ডিলিগোসিন ক২ : ইয়োসিন ক১ : প্যালিওসিন	৩.৮ ৬.৫ ৮.০	সামুদ্রিক জন্তুর বিকাশ	হিমালয়সহ অন্য পর্বতমালায় উৎপত্তি। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উৎপত্তি। জরীভূত শিলা গঠিত, কাল মাটির সৃষ্টি। শিপেটের চুনা পাথর এই যুগে সৃষ্টি হয়।
(৩) মধ্যজীবীয় (মেসোজোয়িক)	(গ) ক্রিটেশাস (খ) জুরাসিক (ক) ট্রায়াসিক	-	১৪.০ ২০.০ ২৪.০	সরীসৃপদের যুগ (ডাইনোসর প্রধান)	মহাদেশসমূহের সর্বাধিক নিমজ্জন। কেরা-মিনিফেরা নামক সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল থেকে বড়িমাটির অবক্ষেপ সৃষ্টি। বাংলাদেশের বড়ি মাটির উৎপত্তি ঘটে এই সময়ে।
(২) পুরাজীবীয় (পেগিয়োজোয়িক)	(চ) পার্মিয়ান (ঙ) কার্বনিফেরাস (ছ) ডেভনিয়ান (গ) সেলুরিয়ান (খ) অর্ডেভিসিয়ান (ক) কেম্ব্রিয়ান-(সন্ধিকর্ণ)	ডু : পেনসিলভ্যানিয়ান ডু : মিসিসিপিয়ান	২৯.০ ৩৫.০ ৪১.০ ৪৪.৫ ৫০.৫ ৫৭.৫	সামুদ্রিক ক্ষুদ্র প্রাণী ও উদ্ভিদের যুগ	অসারোহপাদক যুগ। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাংলাদেশেরও মূলভাগ জলমগ্ন হয়ে পড়ে এবং স্থানীয় গাছপালা থেকে কমলায় রূপান্তর ঘটে। বাংলাদেশে এই প্রকার কমলার স্তর কয়েক হাজার মিটার ডু-অভ্যন্তরে অবস্থান করছে।
(১) প্রাক কেম্ব্রিয়ান (প্রোটেরোজোয়িক) পরাজীবীয়	(খ) নব প্রাককেম্ব্রিয়ান (অ্যালগং কিয়ান) (ক) পুরা প্রাককেম্ব্রিয়ান (অক্কিয়ান)	খ৩ : ডেভিয়ান খ২ : রাইফিয়ান খ১ : প্রারম্ভিক - প্রোটেরোজোয়িক	৬০.০ ১৬০.০০ ২৫০.০০ ৬০০.০০ থেকে ৪৬০.০০	প্রাথমিক জীবন আদিম যুগ	তালানি ও পর্বত গঠিত হয়। আগ্নেয় শিলা, বিভিন্ন খনিজ পদার্থের তালানি বা শিলাপৃষ্ঠ গঠন। ম্যাগমীয় অবক্ষেপ। অগ্ন্যুৎপাত, লাভা উদ্ভাবরণ। রাজশাহী বিভাগে ২০০-৪০০ মিটার গভীরে পলির নিচে প্রাচীনতম কঠিন আগ্নেয় রূপান্তরিত শিলার অবস্থান। দক্ষিণ দিকে পলির স্তর গভীর হওয়ায় শিলার অবস্থান আরো গভীরে।

তারপর ক্রিস্টিয়ান যুগে (সন্ধিক্ষণে) এল হাইড্রার মত এককোষী প্রাণী। এলো আঠারো ইঞ্চি লম্বা টিলোবাইট।

অর্ডোভিসিয়ান যুগে আবির্ভূত হলো অমেরুদণ্ডী সামুদ্রিক প্রাণী বা শামুক। এরপর সিলুরিয়ান যুগে মেরুদণ্ডী প্রাণী মাছের আবির্ভাব ঘটে।

এমনি করে কেটে গেছে একের পর একটি যুগ। চলে গেছে কোটি কোটি বছর। রঙ্গমঞ্চে সর্বশেষ আবির্ভূত হলো মানুষ। ২৪ নং সারণিটি লক্ষ্য করলে পুরো ভূতাত্ত্বিক সময়কালটির সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা জন্মাবে।

সমুদ্রের ভূতাত্ত্বিক ও ভৌতিক বৈশিষ্ট্য : সমুদ্রের তলা

সমুদ্রতল স্থলভাগেরই অবিচ্ছিন্ন অংশ, কিন্তু অনন্তকাল ধরে পানিতে নিমজ্জিত অবস্থায় আছে। গত ৫০ বৎসরে সমুদ্রতল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যথেষ্ট বেড়েছে। ইকো সাউণ্ডার নামে যন্ত্রের সাহায্যে এটা সম্ভব হয়েছে। চলমান জাহাজ থেকে শব্দের প্রতিধ্বনি ঘটানো হয় শব্দস্পন্দন সমুদ্রের উপর থেকে তলদেশে যেয়ে বাঁধা পেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে উপরে, সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাফ কাগজে সমুদ্রের গভীরতা লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। এসব চিত্র থেকে স্থলভাগের মানচিত্রের মত সমুদ্রতলের ত্রি-মাত্রিক মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ইকোসাউণ্ডার সমুদ্রতলে সোজাসুজি চলে যায়। আর সোনার (Sonar) নামে অন্য একটি যন্ত্র সামনে ও পাশ থেকেও তা করতে পারে। যন্ত্রটি মৎস্যজীবী ও নৌজাহাজ উভয়ের কাছেই প্রয়োজনীয়। জাহাজের কাছে মাছের ঝাঁক বা ডুবোজাহাজ থাকলে সোনারের সাহায্যে তা সঠিকভাবেই ধরা যায়।

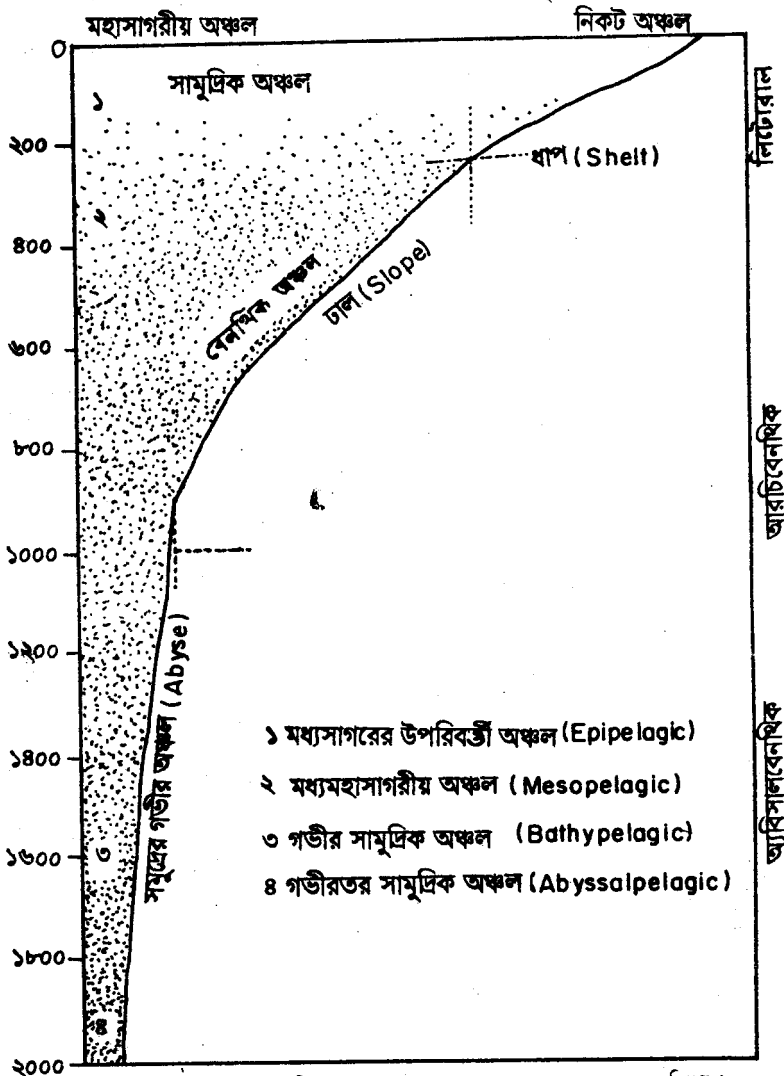
সমুদ্রের পানিতে ঢাকা সম্পূর্ণ জমিটাকেই কিন্তু সমুদ্রের তলা (bottom or Floor) বলা হয় না। সমুদ্র তলদেশের বিভিন্ন স্থানের গভীরতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। সমুদ্রের বিভিন্ন স্থানের গভীরতার এই তারতম্যের জন্য এর তলদেশের ভূমিরূপকে নিম্নলিখিত চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা :

১. মহাসাগরের উপরিবর্তী অঞ্চল (Epipelagic) মহীসোপান বা মহাদেশিক তাক বা ধাপ (Continental Shelf)।
২. মধ্যমহাসাগরীয় অঞ্চল (Mesopelagic) - মহীঢাল বা মহাদেশিক ঢাল (Continental Slope)।
৩. গভীর সামুদ্রিক অঞ্চল (Bathypelagic)
৪. গভীরতর সামুদ্রিক অঞ্চল (Abyssal-pelagic)

মহীসোপান : মহাদেশীয় সোপানকে সমুদ্র ও স্থলভাগের সীমানা বলা হয়। মহাদেশের স্থলভাগের কিছু অংশ সমুদ্র পানির নিচে বিস্তৃত আছে। এখানে পানিরশি বেষণ অল্প গভীর থাকে মোটামুটি হাজার ফুট পর্যন্ত। মহাদেশের উপকূলের ঐরূপ ক্রমনিম্ন নিমজ্জিত অংশকে মহীসোপান বলে। এই অংশ ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে ঢালু হয়ে যায় (এক ডিগ্রীর কম কৌণিকভাবে)। মহাদেশীয় ভূখণ্ডের শেষ প্রান্ত বা সীমা (কিণারা) হচ্ছে মহীসোপান।

মহীসোপানের সবচাইতে উপরের অংশকে উপকূলীয় ঢালু বলে। এটি তটদেশীয় অঞ্চল ও কিনুক অঞ্চল নামে দুইভাগে বিভক্ত। সমুদ্রতটের সোপানগুলি তটদেশীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। জোয়ারের পানি সমুদ্র তীরের যতদূর পর্যন্ত যায় ততটুকু অংশকে (দুই মাইল প্রশস্ত) সমুদ্রতট বলে। পৃথিবীর সমুদ্রতটের আয়তন ৬০০০০ বর্গমাইল।

তটদেশীয় অঞ্চলের পর মহীসোপানের প্রান্ত পর্যন্ত কিনুক অঞ্চল। এখানে সমুদ্রতরঙ্গ সর্বাধিক ক্রিয়াশীল। বিশ্বের এককোটি বর্গমাইল এর অন্তর্গত। মহীসোপান সব সময়ই স্থলভাগের প্রভাবে প্রভাবিত হয় এবং নদী ও বৃষ্টির জলে বয়ে আনা পুষ্টির

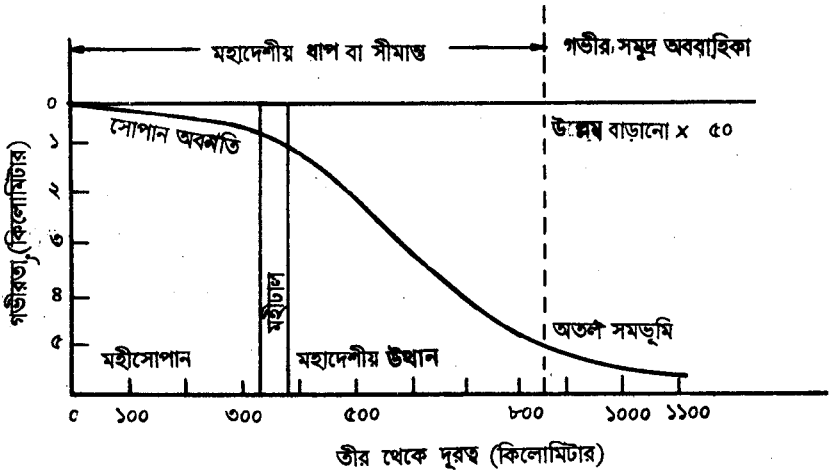


চিত্র ৫.১ : (ক) সমুদ্রের তলদেশ ও জলের বিভাগ

খাদ্যে সমৃদ্ধ থাকে। মহাদেশীয় ধাপের সর্বাধিক গভীরতা ২০০ মিটার হওয়ায় এখানে প্রচুর পরিমাণে সূর্যালোক প্রবেশ করে। সোপানের প্রস্থ বিভিন্ন তীরে বিভিন্ন। গুজরাটে তীর থেকে ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত মহীসোপান অথচ মাদ্রাজে ৫ কিলোমিটারও নয়। মহীসোপান জীবিত সম্পদে সমৃদ্ধ। প্রচুর খাদ্য ও সূর্যালোক পেয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণী এখানে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশের মহীসোপান গড়ে ২২০ মিটার সমোন্নতি লাইন (Contom) পর্যন্ত আয়তন হয় ২৭০০০ বর্গমাইল। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র নদী মোহনায় মহীসোপান হচ্ছে ৬০—১৪০ মাইল প্রশস্ত আর গঙ্গা চূড়া উপকূলীয় অঞ্চলে ৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত এটা মাত্র ৩০-৮০ মাইল হয়। বাংলাদেশের তটরেখা ৩৫০ নটিক্যাল মাইল। বঙ্গোপসাগরের আয়তন ৮,৫০,০০০ বর্গমাইলের মধ্যে ২০০ মিটার গভীরতায় বাংলাদেশের মহীসোপানের আয়তন হবে ২,০২,০০০ বর্গমাইল। ৫০ মিটার গভীরতায় মহীসোপান বাংলাদেশের জন্য ১৪০০০ বর্গমাইল। মহীসোপানগুলি মৎস্যচারণ ক্ষেত্র ছাড়াও পাললিক শিলার স্তরে তেল মজুদের সম্ভাবনার জন্য বিখ্যাত।

মহীঢাল : মহীসোপানের পরবর্তী অংশ যা খাড়া ঢালু অবস্থায় গভীর সমুদ্রে নেমে যায় তাকে মহীঢাল বলে। মহীসোপান অতিক্রম করার পর সমুদ্রের দিকে হঠাৎ জলের গভীরতা খুব বেড়ে যায়। এই বিশাল অঞ্চলকে বলা হয় মহীঢাল। অঞ্চলটি খাড়া এবং এই খাড়া ঢাল এত অধিক যে তা কখনও দুই থেকে পাঁচ ডিগ্রি কৌণিকভাবে আবার কখনও বা সম্পূর্ণ খাড়া অবস্থায় সমুদ্রতলে নেমে যায়। এখানে উদ্ভিদ ও প্রাণী খুব বেশি দেখা যায় না এবং ক্রমশ অতল গভীরতর অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়েছে। মহীঢাল প্রত্যেক জায়গায় সংকীর্ণ এবং নিচের দিকে মালভূমি ও খাদে



চিত্র ৫.১ : (খ) ভূ-কম্পীয় মহাদেশীয় কিনারা

অধ্যুষিত। সাধারণত উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল ও ভারত মহাসাগরের কোনো কোনো অংশে এই মালভূমিগুলি দেখা যায়। পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও মহীচাল গভীর খাদে মিশে গেছে। মিলে যাওয়া কখনও হঠাৎই হয়েছে। কখনও বা আস্তে আস্তে হয়েছে।

মহীচালের গভীরতা ছয়শত ফুট হতে (মহীসোপানের) সমুদ্রের তলদেশে বার হাজার ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। অধিক খাড়া হওয়ার জন্য এটি বেশি প্রশস্ত হয় না। এটি গড়ে মাত্র ১০—২০ মাইল প্রশস্ত হয়। মহাদেশীয় ভূখন্ডের পর্বতময় উপকূলের সরাসরি নিচে সমুদ্রে মহীচাল থাকলে তারা খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়। আবার এরূপ মহীচালের পরপরই সমুদ্রতলে গভীরখাত থাকলে উক্ত খাতের নিম্নদেশ হতে স্থলভাগ পর্বত চূড়ার শীর্ষদেশ পর্যন্ত এক বিশাল সুউচ্চ দেয়ালের সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ আমেরিকার অ্যাণ্ডিজ পর্বত এবং তৎসংলগ্ন মহীচাল এবং গভীর সমুদ্রের খাত একত্রে এরূপ একটি অবস্থার সৃষ্টি করেছে। অ্যাণ্ডিজ পর্বত চূড়া থেকে আটাকামা খাতের তলদেশ পর্যন্ত দূরত্ব মাত্র আট মাইল।

মহীচালের উপরিভাগ সমান নয়, বন্ধুর। এখানে স্থলভাগের পার্বত্য উপত্যাকাগুলির ন্যায় অসংখ্য অন্তঃসাগরীয় গিরিখাত অবস্থান করে।

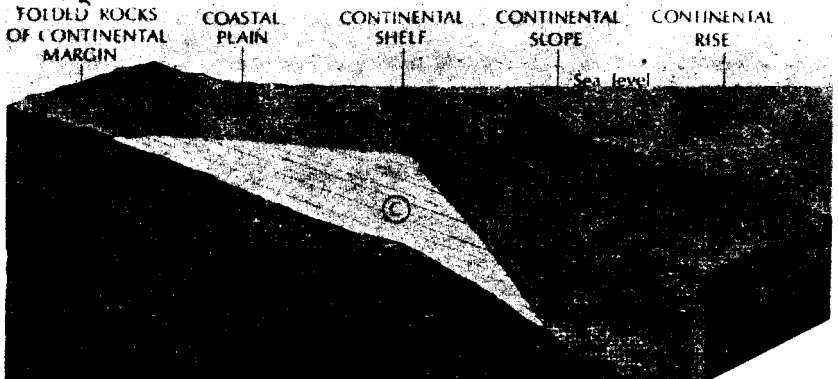
বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া স্থলভাগের পদার্থগুলি মহীচালে সঞ্চিত হতে পারে না। এর ঢাল কিছুটা মৃদু হলে এবং কোন নদী সরাসরি মহীচাল পর্যন্ত প্রবাহিত হলে সেখানে কিছুটা বালি সঞ্চিত হবার সুযোগ পায়। অন্যথায় মহীচালে কেবল জলজ উদ্ভিদ এবং জলজন্তুর দেহাবশেষ প্রভৃতি সঞ্চিত হয়। বঙ্গোপসাগরের উত্তর দিকে মহীচাল ১ কিলোমিটারের বেশি হয় না। বঙ্গোপসাগরের তলদেশটি আস্তে মহীচালে উঠে আসে এখানে অভিক্ষেপণের নিমজ্জন উপর থেকে নিচে নামার সময় ১৫—১০° ডিগ্রি থেকে ২—১° ডিগ্রিতে কমে আসে।

গভীর সমুদ্রের সমভূমি ৪ মহাসাগরের তলদেশে বিস্তীর্ণ প্রায় সমতল অংশকে গভীর সমুদ্রের সমভূমি বলে। মহীচালের পরপরই গভীর সমুদ্রের সমভূমি বিস্তৃত। এর গভীরতা মোটামুটি ৪ কিলোমিটার থেকে ৬ কিলোমিটার পর্যন্ত। প্রকৃতপক্ষে এটি সমতল নয় স্থলভাগের সমভূমির মত। গভীর সমুদ্রের সমভূমির মাঝে মাঝে বহু জলমগ্ন মালভূমির মত উঁচু জায়গা রয়েছে। কোথাও অতি দীর্ঘ অথচ অনুন্নত পর্বতশ্রেণী রয়েছে। যেমন আটলান্টিকের মধ্যস্থান দিয়ে বিস্তৃত সুদীর্ঘ মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা। বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ সীমান্তে ভারত মহাসাগরে রয়েছে ৯০° পূর্ব শৈলশিরা। বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রের সমভূমি ২ কিলোমিটার থেকে ৪ কিলোমিটারের মত।

সমুদ্রের গভীর অঞ্চল বা সমুদ্রগর্ভ প্রকৃতপক্ষে বৈচিত্র্যের সমাহার। এখানে আছে অতলাস্ত সমভূমি, পাহাড়, দ্বীপ, উচ্চভূমি, সমুদ্রপর্বত, খাড়াই অঞ্চল এবং সবার উপরে বিশাল রোমাঞ্চ জাগানো মধ্যমহাসাগরীয় শৈলশিরা। গভীর অঞ্চল সমগ্র সামুদ্রিক

প্রধান খাদগুলির বাইরের দিকের ধারগুলি সমুদ্রের দিকে উঁচু হতে দেখা যায়। প্রায়ই এসব শৈলশিরার উপর দ্বীপগুলিকে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে অবিচ্ছিন্ন দ্বীপপুঞ্জ তাদের তলায় অবিচ্ছিন্ন শৈলশিরার অবস্থিতিকেই প্রমাণ করে। এইসব দ্বীপকে বলা হয় দ্বীপ বলয়। বলয়গুলি প্রায়ই বিরাট আগ্নেয়গিরির পাদপীঠ। প্রধান খাদগুলির নিকটবর্তী দ্বীপ বলয় ও মহাদেশে অনেক সক্রিয় আগ্নেয়গিরি দেখা যায়। স্থলভাগে বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপের উপর যেমন নানাবিধ বাহ্যিক প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ সর্বদা ক্রিয়াশীল থেকে অনবরত এর পরিবর্তন সাধন করছে, সমুদ্রতলের ভূমিরূপের সেরূপ পরিবর্তন সম্ভব নয়। গভীর সমুদ্রের সমভূমিতে কেবল বিশেষ ধরনের সামুদ্রিক অবক্ষেপণের ফলে স্তরীভূত শিলা সৃষ্টি হয়। অবশ্য নদীবাহিত পলি সেখানে আদৌ সঞ্চিত হতে পারে না। তাই বলে সেখানকার শিলা অধিক শক্ত প্রকৃতির নয়। সেখানে এক প্রকার সূক্ষ্ম সামুদ্রিক পলি, সিল্কাকামি বা সিল্ক মল সঞ্চিত হয়। এইগুলি অতি সূক্ষ্ম সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃতদেহ হতে সৃষ্টি। তাছাড়া সমুদ্র তলদেশের আগ্নেয়গিরিগুলি হতে উৎক্ষিপ্ত নানা প্রকার পদার্থ ও সূক্ষ্ম ভস্ম প্রভৃতিও গভীর সমুদ্রের সমভূমিতে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়। আগ্নেয়গিরিজাত এই সমস্ত সূক্ষ্ম পদার্থ সিল্ক কদমের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে স্তরে স্তরে জমাট বেঁধে পাললিক শিলার সৃষ্টি করে।

গভীর সমুদ্র খাত : সমুদ্রের তলায় অতি গভীর এবং অতি দীর্ঘ খাদ বা উপত্যকা থাকে যেগুলিকে গভীর সমুদ্রখাত বলে। গভীর সমুদ্রখাতগুলি সাধারণত সমুদ্রতলের এক প্রান্তে এবং আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলেই অধিক দেখা যায়। এই খাতগুলি অল্প পরিসর জায়গা জুড়ে থাকে। এদের গভীরতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ছয় কিলোমিটারের অধিক। সমুদ্র উপকূলের বিকট ভঙ্গিল পর্বত থাকলে তার নিকটবর্তী সমুদ্র তলে অধিক খাত থাকে। খাতগুলি খাড়া ঢাল বিশিষ্ট হয়। সমুদ্র তলের ১১টি গভীর সমুদ্রখাত ৪ মাইলের নিচে, ৫টি ৫ মাইলের নিচে আর ৪১টি ৩ মাইলের নিচে গভীরে রয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা খাত পৃথিবীর মধ্যে গভীরতম (৩৫,৯৫৮ ফুট, মিটারে ১১০৩৫) গভীর। ভারত মহাসাগরে সাগরখাদ ৭২৫২ মিটার বা ২৪৪৪২ ফুট গভীর।



চিত্র ৫.১ : (ঘ) মহাদেশীয় কিনারার সন্নিহিতে বিরাট জলাধার বা অববাহিকার বিকাশ

বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃতদেহের সাথে লোহিত কদম নামক এক প্রকার সামুদ্রিক পলি গভীর সমুদ্র খাতগুলিতে সঞ্চিত হয়।

সাগরের সত্যিকারের 'তলা' পৃথিবীর মোট বিস্তারের অর্ধেকের বেশি। সাগরের তলার উপরের স্তর পলি বা কাদার স্তর সচবাচর মাইলখানেক বা প্রায় দু' কিলোমিটার পুরু। স্থান বিশেষে এটা অনেক বেশি পুরু হতে পারে। এর নিচে এক বা দেড় মাইল পুরু লাভা পাথরের স্তর এবং এর নিচে সাগরের সত্যিকার তলদেশ। মহাসাগরের তলায় কি পরিমাণ বস্তু জমা হচ্ছে তার একটা ধারণা এখানে দেয়া যেতে পারে। নদীগুলো সাগরের বুকে কঠিন (অদ্রাব্য) পদার্থ, অর্থাৎ পলি ইত্যাদি ঢালছে বছরে ২-৩ হাজার কোটি টন এবং দ্রবণীয় পদার্থ (লবণ ইত্যাদি) ঢালছে বছরে চারশো কোটি টন।

পৃথিবীর সমস্ত সাগর এবং মহাসাগরের ভিতর সব চাইতে পুরু পলির স্তর জমছে বঙ্গোপসাগরের নিচে। এই পলি মূলত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা (বাংলাদেশ) ও ইরাবতীর (বার্মা) অবদান। এই অঞ্চলে পলিমাটি ও পলিপাথর সমবেতভাবে দশ কিলোমিটার পুরু। এ ছাড়াও মানুষের নিক্ষিপ্ত অনেক আবর্জানাই শেষ পর্যন্ত সাগরে গিয়ে জমা হয়। কেবল নিউইয়র্ক শহরের বর্জিত আবর্জানাই বছরে এক কোটি টন জমছে আটলান্টিকের তলায়।

এবার সমুদ্রের তলার কয়েকটি বিশেষ রূপ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

(ক) **অন্তঃসাগরীয় গিরিখাত বা খাদ (Submarine Canyon) :** প্রায়শই মহীসোপান ও মহীতালের সঙ্গে কিছু কিছু অংশ থাকে যাদের বলা হয় গভীর গিরিখাত। এগুলির অবস্থান মালভূমি বা খাদের মত উপকূলের সঙ্গে সমান্তরাল নয়, বরং বলা যায় লম্বালম্বি। সোপানের কোনো কোনো স্থান থেকে আরম্ভ হয়ে এগুলি ঢাল বরাবর আঁকাবাঁকা হয়ে সমুদ্রতলে মিশে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব উপকূলে অনেকগুলি জলে নিমজ্জিত এই রকম গিরিখাত দেখা যায়। অন্যান্য গিরিখাতগুলি কঙ্গো, সিন্ধু ও গঙ্গা নদী এবং দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার অদূরে অবস্থিত। গাঙ্গেয় গিরিখাত বা অতলম্পর্শী মহীখাদ বঙ্গোপসাগরে শত শত কিলোমিটার বিস্তৃত।

পৃথিবীর উপরে যে খাদ বা উপত্যকা তা সাধারণত নদীর বা জল প্রবাহের ঘর্ষণে তৈরি। নদী যখনই সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, তখনই তার স্রোতের ধার লোপ পায়। শেপার্ড বলেন, আদিম যুগে সমুদ্রে জলের পরিমাণ ছিল খুবই কম। এখনকার জলমগ্ন অনেক জায়গা তখন শুকনো ছিল। সে সময়ে নদী স্রোতে এসব খাদ তৈরি হয়েছিল। অনেক পরে সাগরের জল বেড়ে গেলে, ওগুলো গভীর জলের নিচে চলে যায়। কিন্তু এই ধারণা প্রমাণিত হয়নি, কারণ সমুদ্রে অল্প জল থাকায় যুগটা এক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি যে, ঐ সময়ের মধ্যে কঠিন পাথরের বুকে অত গভীর খাদ নদীর পক্ষে তৈরি করা সম্ভব। তাছাড়া ঐ রকম খাদ সমুদ্রের যে কোনো গভীরতায় লক্ষ্য করা গেছে।

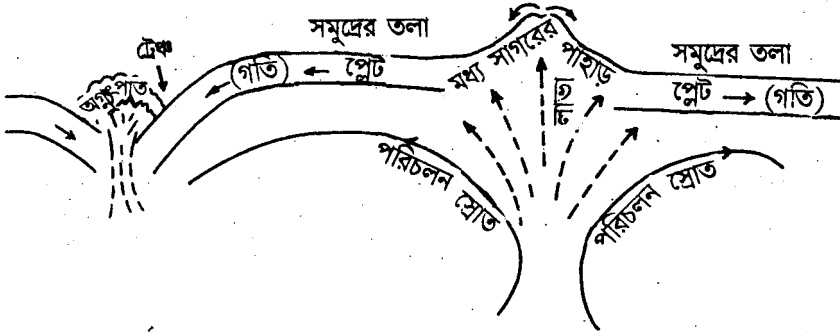
বর্তমানে এই গভীর খাদের অস্তিত্বের জন্য দায়ী করা হয় সমুদ্রের স্রোতকে (ড্যালির মতবাদ)। সাগরের উপরে নিচে নানা ধরনের স্রোত থাকে যেগুলি সাগরের স্থির জলরাশির ভিতরে গতিময় জলের নদী। সমুদ্রের একেবারে তলায় এক জাতীয়

মাটি ঘেঁষা স্রোত থাকে। এটা ঘনতর জলের স্রোত। মহাদেশের বুক ধুয়ে জলের স্রোত যখন সমুদ্রে পড়ে, তখন সূক্ষ্ম পলিবাহী জলধারা মহীদাল বেয়ে একেবারে তলায় চলে যায়। সেখানে স্রোতের বেগ ঘন্টায় ষাট মাইল পর্যন্তও হয়। এই ময়লা স্রোত (turbidity current) দীর্ঘকালের চেষ্টায় সমুদ্রের বুক গভীর খাদ সৃষ্টি করতে পারে, পৃথিবীর উপরে নদীগুলো যেমন করে। সাগর তলায় খাদের দু'ধরনের দেখাল একদম খাড়া হয়ে থাকে। বাহামা অঞ্চলের সমুদ্রে তিন মাইল গভীর একটি খাদ রয়েছে। এই ধরনের খাদ ২৫/৩০ মাইল থেকে ২০০ মাইল পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। বহু অন্তঃসাগরীয় গিরিখাত পরবর্তীকালে নদীর গভীরে সামুদ্রিক উপদ্বীপ (deeps Sea fans) যেমন (Bengal deep sea fan)-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

(খ) মধ্যসাগরীয় শৈলশিরা বা পাহাড় (mid-ocean ridge) : এ এক ধারাবাহিক পর্বতমালা, যা প্রায় সমস্ত মহাসাগরের মধ্য দিয়েই একেবেকে ঘুরে গেছে। সাড়ে সাইত্রিশ হাজার মাইল বা ষাট হাজার কিলোমিটার লম্বা এই পাহাড়ের কোনো তুলনা কোনো মহাদেশের বুক নেই। এ পাহাড় প্রায় সম্পূর্ণই সাগরের পানির নিচে লুকানো। কেবল এক আধ জায়গায় জল ফুড়ে পার হয়ে এসেছে। ছোট্ট দ্বীপ সেন্ট হেলেনার, সেন্টপল, অ্যাসেনসন এবং অ্যাজোরস এ রকম উদাহরণ। আইসল্যান্ড আসলে ঐ পাহাড়ের এক ক্ষয়িত চূড়া। শৈলশিরা সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের অববাহিকাকে পূর্ব ও পশ্চিম দু'টি ভাগে ভাগ করেছে এমনভাবে যে, পূর্ব ও পশ্চিমভাগের উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং শৈলশিরার তলদেশের জলরাশি কখনও মিশে যায় না। দু'টি বিভিন্ন মহাসাগরের অববাহিকার মত সম্পূর্ণ আলাদা থাকে। সমুদ্রতল থেকে গড়ে ১৬০০ মিটার উঁচুতে উঠে গেছে এই প্রাচীর।

মধ্যসাগরীয় শৈলশিরা ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরেও ছড়িয়ে আছে। ভারত মহাসাগরে ছড়িয়ে থাকা এর অংশকে বলা হয়, কার্লবার্গ শৈলশিরা (গঠন 'ওয়াই' অক্ষরের মত শাখাযুক্ত)। এর সূচনা হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে এবং দক্ষিণ আরব সাগরকে দু'ভাগে ভাগ করে এটি সোজা উত্তর দিকে বিস্তৃত হয়েছে। একটি অংশ আরব ও আফ্রিকা এবং অন্য অংশ গুজরাট ও পাকিস্তানের উপকূলে ছড়িয়ে আছে। প্রশান্ত মহাসাগরে এ পাহাড় অনেক নিচু ও মসৃণ। তাছাড়া, ঠিক মাঝখানেও নয়। এ জন্য প্রশান্ত মহাসাগরের ক্ষেত্রে এ শৈলশিরা ridge-এর বদলে rise নামে পরিচিত। আমেরিকায় এটি ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলের দিকে ঘুরে গেছে এবং দক্ষিণ সীমায় এটি দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে ঘিরে থাকা আটলান্টিক শৈলশিরার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের ৯০° পূর্ব শৈলশিরা অতি বিখ্যাত যা গত ১১০০ এর সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই শৈলশিরার উত্তরে এবং ৮৫° পূর্ব শৈলশিরার মধ্যকার অংশটির দু'দিকেই ৮ কিলোমিটার পুরু অবক্ষেপ জমা আছে বঙ্গোপসাগরের অতলে। বেঙ্গল গভীর সামুদ্রিক ফ্যান সিস্টেমের সক্রিয় ফ্যান উপত্যকা এই দুই শৈলশিরার মাঝেই অবস্থিত। ৯০° ডিগ্রী পূর্ব শৈলশিরাটি বঙ্গোপসাগরের গঠনের শুরু থেকেই ছিল।

(গ) গহ্বর (Trench) : সাগরের তলায় অনেক জায়গায় কিছু অতি গভীর গর্ত বা ট্রেঞ্চ আছে যাদের প্রকৃতি 'খাদ' থেকে একদম আলাদা। এরা জলস্রোতের ঘর্ষণে সৃষ্টি হয়না। এসব গহ্বরের ভিতরেই মহাসাগরের গভীরতম বিন্দুগুলি দেখা যায়। অনেক ট্রেঞ্চের দৈর্ঘ্য ৭০০ কিলোমিটারেরও হয়। এগুলির বৈশিষ্ট্য হলো এরা সাগরের শুধু সীমান্ত অঞ্চলে থাকে।



চিত্র ৫.২ : সমুদ্রের তলদেশের ট্রেঞ্চ অঞ্চলের গঠন প্রক্রিয়া।

ট্রেঞ্চগুলো নিজেরাই গভীর শুধু নয়, এদের তাৎপর্যও খুব গভীর। মধ্যসাগরীয় পাহাড়ের কোলে পৃথিবীর গভীর থেকে শিলারাশি উঠে আসে ক্রমাগত, কিন্তু একতরফা ভিতর থেকে লাভা বের হয়ে আসতে পারে না। তাহলে পৃথিবী ফাঁপা হয়ে যাবে এবং ক্রমশ ফুলতে থাকবে। অতএব ভিতরের লাভা যেমন ক্রমাগত সাগরের তলায় উঠে আসে, সাগরের তলার শিলাস্তরও ক্রমাগত পৃথিবীর গভীরে ঢুকে যেতে থাকে। ট্রেঞ্চগুলি হচ্ছে সেই জায়গা যেখান দিয়ে প্লেট নিম্নমুখী হয়ে ঢুকে যাচ্ছে পৃথিবীর গভীরে।

ট্রেঞ্চের আশেপাশের ছোটখাট চিপিশুলো আন্তে আন্তে ঝুঁকে পড়েছে ট্রেঞ্চের দিকে। এই সময়ে প্লেটের কঠিন শিলা দেহের অনেক ভাংচুর হয়; আর সেই ফাটল দিয়ে আগ্নেয়গিরির ধর্ম প্রকাশ পেতে পারে। ভূমিকম্প হওয়া তো খুবই সম্ভব। বন্ধুত ট্রেঞ্চ অঞ্চলগুলো বিশেষভাবেই ভূমিকম্প ও অগ্ন্যাৎপাতের অঞ্চল হিসেবে পরিচিত।

সাগরের তলার অজস্র উঁচু নিচু ভাজে খাজে আর বিস্তীর্ণ সমতলে কোথায় কত রহস্য এখনও লুকিয়ে আছে তার হিসাব নেই। এ প্রসঙ্গে বলা যায় 'বরিশাল গান' এর অনাবিক্ত রহস্যের কথা। এক সময়ে বরিশালের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থেকে মাঝে মাঝে কামান গর্জনের মতো একটা জোরালো শব্দ ভেসে আসতো, বিশেষত ঝড় বৃষ্টির সময়ে। বছর চল্লিশেক আগে শেষবার এই আওয়াজ শোনা গেছে। সুন্দরবনের ইতিহাস খ্যাত লেখক আঃ জলিল তার বইয়ে এর কথা উল্লেখ করেছেন। চেম্বার্স বিশ্বকোষের পুরানো সংস্করণে এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' উপন্যাসে এর বর্ণনা আছে এ রকমঃ তখন চারিদিক ঝাপাইয়া ঝড় শুরু হইয়া গিয়াছে।

হাজার হাজার ফনা তুলিয়া তেঁতুলিয়ার জলডাঙ্গা পাড়ের উপর দিয়ে আসিয়া ছোবল মারিতেছে, চর ইসমাইলের নারিকেল আর সুপারির বন দিকদিগন্তব্যাপী এই উৎসবের বিরটি আয়োজনে যোগ দিয়াছে। দক্ষিণ হইতে একটা অস্বাভাবিক শব্দ (ঝড়ো বাতাসকে থর থর করিয়া কাঁপাইয়া দিয়া ভাসিয়া গেল, বরিশাল গান গর্জন করিতেছে।

সাগর তলার দুস্থিত (Unstable) কোনো জমি মাঝে মাঝে সরে যাওয়ার ফলে ঐ আওয়াজের উৎপত্তি এই রকম ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল। আব্দুল জলিল রচিত 'সুন্দরবনের ইতিহাস' (আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬) গ্রন্থের ২৮-৩২ সংখ্যক পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'অতলম্পর্শ ও বরিশাল কামান' উপ-অধ্যায়ের বর্ণনা অনেটা নিম্নরূপ।

অতলম্পর্শ : ফার্গুসন ও বিভারিজ সাহেবের মতে বঙ্গোপসাগরের মালঞ্চ মোহনা ও রায়মঙ্গল হতে দক্ষিণ দিকে (21° - 22° অক্ষাংশে) তীর থেকে ১৫ মাইল দক্ষিণে অতলতলের (Swatch of no ground) অবস্থান। এ স্থানের চারিদিকের জলের গভীরতা ৫০/৬০ ফুট, তবে অতলম্পর্শের গভীরতা ১৮০০ ফুট। এখানের কয়েক মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে ৭০০ ও ১০০০ ফুট নিম্নে মাটি পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরের পূর্বে পশ্চিম দিক হতে বিপরীতমুখী স্রোতের সংঘাতের জন্য ঐ স্থানে আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে, তাই এখানে কোন মাটি জমতে পারে না। সুন্দরবনকে ভূপৃষ্ঠের তলদেশ হতে মাটি অবিরত অল্প অল্প ধুয়ে স্রোতের গতি অনুযায়ী ঐ অতলতলের গহ্বরে পড়ছে। এভাবে মাটি সরে যেতে যেতে হয়ত বহুদিন পরে জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগের অতিরিক্ত ভার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমিকে কোথাও বসিয়ে দিয়ে যায়। জমি নিচু হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ জল প্রাবনে সেই স্থান জলমগ্ন হয় আবার সেই জল পলির সাথে মিশে ধীরে ধীরে জমির উচ্চতা সম্পাদন করে। অতলম্পর্শের দরুন এভাবে মাঝে মাঝে সুন্দরবনের উত্থান ও অবনমন হয়। এডামস উইলিয়ামস এ সম্পর্কে বলেছেন যে, অতলতল বঙ্গোপসাগরের অতি প্রাচীনকালীন মূল তলদেশ এবং এখানে বহুকাল যাবত গঙ্গার পলিমাটি জমতে পারে নি।

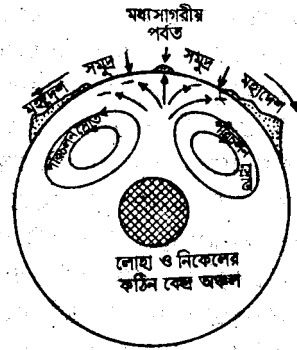
বরিশাল কামান : সুন্দরবন অঞ্চলে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মাঝে মাঝে দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব কোণ হতে কামানের আওয়াজের ন্যায় এক প্রকার গুরুগম্ভীর শব্দ শোনা যায়। বরিশালের লোকেরা একে 'গায়েবী আওয়াজ' আর ইংরেজরা Barisal Guns বলে আখ্যায়িত করেছে। এ সম্পর্কে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে। যেমন বারনের লঙ্কা রাজধানী তোরণের শব্দ বা ঈমাম মেহেদীর আগমন বার্তা কামানের শব্দ ইত্যাদি। এ শব্দ এত দূর থেকে আসে যে, সাধারণের গোচরীভূত কোন শব্দ ঐ ধরনের হতে পারে না। কোনো কোনো গবেষক বলেন, বঙ্গোপসাগরের অতল তল হতে এ শব্দ উথিত হয়। বর্ষকালে বা প্রবল বারিপাতের পর যেহেতু এ শব্দ শোনা যায়, তখন জলপ্রবাহের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে। এরূপ অনুমান করা যায়। এই আওয়াজ যেহেতু খুলনা জেলার দক্ষিণ-পূর্ব ও বরিশালের ঠিক দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে শোনা যায় আর অতলম্পর্শ খুলনার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত, মাঝে দূরত্ব একশত মাইল,

তাই এই দুইয়ের মাঝে কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। Manual of the Geography of India এর লেখক Fergusson এবং History of Bakergang এর লেখক Beveridge ও History of the Rivers of the Gangetic Delta 1750—1918-এর লেখক Williams Adams এ অঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধানের পর তাঁদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। বাগেরহাট, পটুয়াখালী ও পিরোজপুর হতেও এই শব্দ শ্রুত হত। পরপর তিনটি আওয়াজ হতো এবং দিনের বেলা ও রাত্রেও এ শব্দ শোনা যেত। ভাটার সময় সমুদ্রে চল্লিশ হাত উচু ঢেউ উঠতো এবং অনুরূপ দু'টি ঢেউয়ের সংঘর্ষের ফলে ঐরূপ আওয়াজ শোনা যেত।

বর্তমানে ঐরূপ আওয়াজ সচরাচর শোনা যায় না। ভোলা, পটুয়াখালির দক্ষিণাঞ্চলের চর মমতাজ, আভারচর, কুকরী মুকরী স্থানে ১৯৬০ বর্ষকালে ঐরূপ শব্দ শোনা যায়। কেউ কেউ বলেন, এই ভীষণ শব্দ গভীর সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতের জন্য হয়ে থাকে। যখন ভীমবেগে প্রবাহিত তরঙ্গে তরঙ্গে আঘাত লাগে, তখন জলোচ্ছ্বাস প্রথমে উর্ধ্বমুখী হয়ে উঠে, পরে ভীষণ বেগে নিম্নে পতিত হয়। এ ধরনের পতনকালে যে ভীষণ শব্দ হয়, তাই 'বরিশাল কামান।' এই শব্দটি সাগরের বিভিন্ন দিক থেকে শ্রুত হয়। বিভারিজ সাহেব বহু গবেষণার পর স্থির করেছেন যে, এটা বায়ুমণ্ডলের কোনো বৈদ্যুতিক ব্যাপার হতে সম্ভূত। কেউ কেউ আবার ইন্দো-বার্মা রেঙ্গুনের পর্বত শ্রেণী আরাকানের উপকূলে মাটির তলদেশে আগ্নেয়গিরি শ্রেণীর (চট্টগ্রামের 'চন্দ্রনাথ পাহাড় ও যুক্ত) অগ্ন্যাদগমের সঙ্গে 'বরিশাল গানের' সম্বন্ধ খুঁজে পাবার প্রয়াস পান। এ সম্পর্কে আরও বৈজ্ঞানিক গবেষণা আবশ্যিক। স্থানীয় লোকে একে বলে সর ও বান ডাকা। এ শব্দ অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার সময় অত্যধিক হয়। ঢেউ অকস্মাৎ সুউচ্চ হয়ে চরভূমিতে আঘাত হেনে ভীষণ শব্দ করে। সমুদ্রের গভীর তলদেশের নিম্নস্থ মৃত্তিকার মধ্য দিয়ে কোনো সম্পর্ক এই অতলস্পর্শী মহীখাদ ও বরিশাল গানের মধ্যে আছে কি না তা নিয়ে অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসু পাঠক গবেষণা করতে পারেন। এটি সাগরের এক রোমাঞ্চকর রহস্য।

(ঘ) সমুদ্রতলের বিস্তৃতি ও তার তলদেশের উচ্চতা : ষাটের দশকে সমুদ্রতলের বিস্তৃতি সংক্রান্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর স্বপক্ষে হেস (Hess) প্রামাণ্য যুক্তি দেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হচ্ছে সমুদ্রতলে মধ্যমহাসাগরীয় শৈলশিয়ার অস্তিত্ব আবিষ্কার। দেখা গেছে সাগরের নিচে অন্যান্য জায়গার তুলনায় এ পাহাড়ের কোলে জমির উচ্চতা বেশি। এখানে যেন পৃথিবীর গভীরতর স্তর থেকে বেশি উত্তাপ বের হয়ে আসছে। এ ছাড়া, আরো দেখা যায়, সাগরের তলায় পলির স্তর সর্বত্র সমান পুরু নয়। আলোচ্য পাহাড় শ্রেণীর আশেপাশে পলির স্তর কম পুরু; কিন্তু পাহাড় থেকে দূরে সাগরের উপকূলের কাছে, পলির স্তর অনেক বেশি গভীর। মনে হয় যেন পাহাড়ের দু'ধারের ঠিক সংলগ্ন জমি দূরবর্তী জমির তুলনায় কম প্রাচীন; তাই বেশি পলি জমার সময় পায়নি। এ রকম প্রাথমিক কিছু পর্যবেক্ষণ থেকে ধীরে ধীরে বোঝা যায় এ পাহাড় শ্রেণীর অস্তিত্বের গভীর তাৎপর্যের বিষয়টি।

এই শৈলশিরার অক্ষ বরাবর উপ-তাকা বর্তমান এবং অসংখ্য আড় ফাটল (Transverse fractures) দ্বারা শৈলশিরা স্থানচ্যুত হয়ে অগ্রসর হয়েছে। আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এসব আড় ফাটলের পথে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রগুলো বিন্যস্ত হয়ে আছে। সুতরাং মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশিরার তলদেশ বরাবর স্থানে আচ্ছাদনে (Mantle) শিলার উপ-রিভাগ গলে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বের হয়ে আসে। এই কারণেই বার বার ব্যাসল্ট উপাদান বিশিষ্ট ম্যাগমা উৎক্ষিপ্ত হয়ে



চিত্র ৫.৩ : সমুদ্রতলের বিস্তৃতি ও তলদেশের উৎস্রতা

সঞ্চিত হবার ফলেই শৈলশিরার উদ্ভব হচ্ছে। এভাবে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে উৎক্ষিপ্ত ব্যাসল্ট ম্যাগমার সাহায্যে নতুন সমুদ্রতল তৈরি হচ্ছে। তা শৈলশিরার কেন্দ্রীয় খাত হতে উভয় দিকে বিস্তৃতি লাভ করছে। সমুদ্রতলের এ বিস্তৃতির হার প্রতি বৎসর মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার।

ভেগনারের তত্ত্ব ছাড়াও আধুনিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে ব্যাপারটি বোঝানো যেতে পারে। সবারই জানা যে, সৃষ্টির আদিকালে পৃথিবী তরল অবস্থায় ছিল। তাপ বিকিরণ করে পৃথিবীর উপরটা সবার আগে ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত চেহারা নিলেও ভিতরে একটা তরল অঞ্চল এখনও রয়ে গিয়েছে, ভূকম্পনঘটিত পরীক্ষায় যার অস্তিত্ব ধরা পড়ে। পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি একটি কঠিন গোলক, যার ব্যাসার্ধ ১৩০০ কিলোমিটার বা ৮০০ মাইল আর একেবারে উপরের কঠিন অংশটি ২০০-২৫০ কিঃমিঃ বা ১২৫-১৫০ মাইল পুরু। এই দুই প্রান্তের ভিতরে প্রায় ৪৮০০ কিঃ মিঃ (৩০০০ মাইল) গভীর অঞ্চলটিকে মোটামুটি 'তরল' মনে করা হয়।

এ তরল অঞ্চলে সর্বদাই বইছে বৃত্তাকার 'পরিচলন স্রোত' (Convection Current, চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই 'তরল' পদার্থটি আমাদের পরিচিত তরল বস্তুর মত নয়। অতিরিক্ত চাপ আর তাপে কঠিন জিনিসেরই এক জাতীয় 'তরলতা' (Fluidity) দেখা যায়। সাগরের তলায় পানি এবং লাভা পাথরের আবরণের নিচেই আসল তলদেশ। এই জমিটা কঠিন ব্যাসল্ট পাথরের, যে পাথর পৃথিবীর ত্বকের মূল উপাদান। আর মহাদেশের প্রধান উপাদান গ্রানাইট পাথর, ব্যাসল্টের তুলনায় হালকা এবং কম কঠিন। মহাদেশগুলি ব্যাসল্টের স্তরের উপরেই বসে আছে। পরিচলন স্রোতটি আসলে বইছে সাগর তলারও অনেক নিচে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাগর তলার ব্যাসল্ট জমি কেমন করে চলমান তা ছবি দেখলে মোটামুটি স্পষ্ট হবে।

দুটি স্রোত বৃত্তের মধ্য অঞ্চলে গরম লাভা উপরে ঠেলে উঠে এবং এখানেই তৈরি হয় মধ্য সাগরের পর্বত। সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে এই মধ্য সাগরীয় পর্বতের কোলেই পৃথিবীর গভীর থেকে গলিত লাভা আস্তে আস্তে ঠেলে বের হয় বেলুনাকারে।

উদগত নতুন লাভা উপরে আসতে আসতেই জমে যায়। এই নবাগত শিলারশিকে জায়গা দিতে গিয়ে পর্বতের দু'ধারে সমুদ্র তলা সরে যেতে থাকে। এ ভাবে সাগরের তলায় ব্যাসন্টের স্তর সতত চলমান। মহাদেশগুলি যেন এ ব্যাসন্ট ত্বকের উপরে ছোটখাট গ্র্যানাইটের স্থূপ। সুতরাং তারাও চলমান এবং এই কারণেই মধ্যসাগরের পর্বতের দু'ধারের জমি সব সময়েই দূরবর্তী জমির তুলনায় নতুন। এ ভাবে সাগরের গোটা তলদেশই ক্রমশ নতুন হয়ে চলে। যাকে বলা হয় 'সাগর তলার বিস্তার' (Sea Floor Spreading)। ব্যাসন্টের ৮০-১০০ কিলোমিটারের মতো পুরু স্তরকে বলা হয় 'প্লেট'। এ প্লেটও চলমান উপরোক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে। সমগ্র পৃথিবীর এই ব্যাসন্টের ত্বকে অনেকগুলো খণ্ডখণ্ড ছোট বড় প্লেট রয়েছে। এক একটি প্লেটের গতির অভিমুখ এক এক রকম। অনেক ক্ষেত্রে একটি মহাদেশ একাধিক প্লেটের উপরে বসে আছে। সে ক্ষেত্রে, মহাদেশটি এসব প্লেটের বিভাগ রেখা বরাবর টুকরো হয়ে যাবে। ক্যালিফোর্নিয়ার বিস্তৃত ভূখণ্ড আমেরিকা মহাদেশ ছেড়ে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে আর সৌদী আরব এশিয়া থেকে আর্থশিক বিচ্ছিন্ন হয়ে মাঝখানে পারস্য উপসাগর তৈরি করছে। আবার উন্টোটাও হয়। যেমন ভারত এসে জুড়ে বসেছে হিমালয় গড়েছে।

সমুদ্রতলের যে সত্য সত্যই বিস্তৃতি ঘটছে তার স্বপক্ষে বেশ কিছু প্রমাণের মধ্যে চুম্বকীয় বৈপরীত্য অন্যতম। সমুদ্রতলের শিলার চুম্বকীয় বৈপরীত্যের (Magnetic anomaly) মধ্যে একটি প্রতিসম সম্পর্ক আছে এবং এ ধরনের সম্পর্ক মহাসাগরীয় শৈলশিরার উভয় দিকের শিলার মধ্যে উপস্থিত। শৈলশিরার নিম্নবর্তী স্থান হতে উৎক্ষিপ্ত লাভার সাহায্যে উৎপন্ন নতুন সমুদ্রতল উভয় দিকে বিস্তৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে যখন শীতল হয় তখন এর চুম্বকত্ব ঘটে আর এ চুম্বকত্ব পৃথিবীর তদানিন্তন চুম্বকীয় মেরুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। যদিও শৈলশিরার উভয় দিকে চুম্বকীয় মেরু বর্তমান মেরু অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ দেখা গেছে, তবু বিপরীতটাও দেখা গেছে। স্থলভাগের শিলার মধ্যেও চুম্বকীয় বৈপরীত্য লক্ষ্য করা গেছে। গত ৩৫ লাখ বৎসর সময়ের মধ্যে ৩টি এবং ৭ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসরের মধ্যে ১৭১টি চুম্বকীয় বৈপরীত্য রেকর্ড করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমান মেরুর অবস্থান মাত্র ৭ লক্ষ বৎসর পূর্ব হতে শুরু হয়েছে।

সবচাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, শৈলশিরা হতে সর্বাধিক দূরে অবস্থিত চুম্বকত্ব প্রাণ্ড শিলার বয়স শৈলশিলার নিকটবর্তী চুম্বকত্বপ্রাণ্ড শিলার বয়সের চাইতে বেশি হয়। অর্থাৎ প্রমাণিত হচ্ছে যে, নতুন সমুদ্রতল সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তা উভয় দিকে প্রসারিত বা বিস্তৃত হচ্ছে। আরো লক্ষণীয় যে, মহাসাগরীয় শৈলশিরা হতে উভয় দিকে যত দূরত্ব বাড়ে অবক্ষেপণের পুরুত্ব ততই বাড়তে থাকে। এখানে দূরে বহু সময় ধরে পলল সঞ্চিত হতে থাকে। এখানে প্রশ্ন জাগে সমুদ্রতল বিস্তৃত হতে হতে কতদূর যাচ্ছে বা এর শেষ কোথায়?

এর জবাব আগেই দেয়া হয়েছে। দেখা গেছে, সমুদ্রতলে ১৫ কোটি বছরের চাইতে প্রাচীন শিলা বা কোনো জীবাশ্ম নেই। সবচেয়ে চাক্ষুষ্যকর তথ্য এই যে, সমুদ্রবক্ষে দ্বীপবলয় ও সুগভীর মহাসাগরীয় খাতগুলি হচ্ছে সে এলাকাসমূহ যেখানে

অগ্রসরমান প্রাচীন ব্যাসল্টজাত ভূত্বক এসে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এ ভূত্বক অদৃশ্য হয়ে একেবারে মিলিয়ে যাচ্ছে না বরং উপরিউক্ত এলাকায় এসে তা নিম্নবর্তী আচ্ছাদন শিলার (Mantle) মধ্যে কয়েক শত কিলোমিটার অবধি নিমজ্জিত হচ্ছে। এখানে এসে তাপের আধিক্যের কারণে নিমজ্জমান ভূত্বক গলে যাচ্ছে। সে জন্য ২০—৩০ কোটি বৎসরের মধ্যে পুরাতন সমুদ্রতল নিমজ্জিত হয়ে (বৎসরে ১-২ সেঃ মিঃ বিস্তৃতির হার ধরে) আবার নতুন সমুদ্রতলের উদ্ভব হচ্ছে চক্রাকারে। এভাবে চলছে সুদূর অতীতকাল থেকে বারবার নতুন নতুন সমুদ্রতলের উদ্ভব ও বিস্তার প্রক্রিয়া।

বাংলাদেশ ভূখণ্ডের বয়স

বাংলাদেশের ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ দেশের মূল ভিত্তি পৃথিবীর প্রাচীনতম যুগে এবং এ দেশের উপরিভাগে দৃশ্যমান ভূ-উপাদানের বয়সও কোথাও কোথাও কয়েক কোটি বছর। আবার এ কথাও ঠিক যে বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে যে বিস্তীর্ণ নিম্ন সমতল ভূমি তার গঠন শুরু হয়েছিল মাত্র ২০-২৫ হাজার বছর আগে।

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন অধিযুগের নাম আর্কিয়ান, যা বয়সের হিসেবে ২৫০ কোটি বছরের প্রাচীন। এই আর্কিয়ান অধিযুগের পাথরের দেখা মিলেছে বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন পশ্চিম বাংলার পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বাকুড়া ও বীরভূম জেলায়। পরবর্তী ভূতাত্ত্বিক কালের নাম প্রোটেরোজোয়িক অধিযুগ। এ সময়ের বিস্তার ২৫০ থেকে ৫৭ কোটি। এ সময়ের পাথরের দেখা মিলেছে পশ্চিম বঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে। প্রাক-ক্যামব্রিয়ান (৬০ কোটি) মহাযুগে দৃশ্যমান কোনো প্রাচীন ভূমিরূপ না থাকলেও রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুরে খননকার্য পরিচালনাকালে ১৮৩-৩০৫ মিটার নিচে গ্রানাইট ও ডোলোরাইট জাতীয় প্রাচীন শিলার নমুনা মেলে। তবে উত্তরে শিলং মালভূমি (খাসিয়া-জৈন্তিয়া, গারো, কপিলি ও মিকির ব্লক) অঞ্চলে প্রাচীন সিলিকা জাতীয় শিলার চাকা অন্তঃজ আগ্নেয়শিলার নমুনা পাওয়া যায়।

প্রাচীন মহাযুগে (৬০-৫০ কোটি) বাংলাদেশের পশ্চিমে উচ্চভূমির নিচে ক্যামব্রিয়ান, ওর্ডোভিসিয়ান, সিলুরিয়ান, ডেভোনিয়ান ও কার্বোনিফেরাস আমলের শিলাস্তূপ পাওয়া যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে, পেলিয়োজোয়িক মহাযুগে উত্তরভাগের কিছু অংশ বাদে বাংলাদেশের সমুদ্রতলায় নিমজ্জিত ছিল না। পশ্চিমের উথিত ভূমির সন্নিহিতে একাধিক খাত ও বহু চ্যুতি রেখার অবস্থান জানা গেছে। বাংলাদেশের জামালগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চল উল্লেখ্য। প্রাগৈতিহাসিক গাভোয়ানা সময়ে এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল এক বিশাল অরণ্য। আর রিমঝিম বৃষ্টিতে ভরে থাকত বছরের বেশির ভাগ সময়। অরণ্যানীর গাছপালা হ্রদ বা নদীর জলের নিচে স্তরে স্তরে জমা পড়ে কালক্রমে তৈরি হয়েছে কয়লা। উদ্ভিদ থেকে কয়লায় রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন মৃদু নাতিশীতোষ্ণ থেকে মৃদু গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়া, আর মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত। পরবর্তী ভূতাত্ত্বিক অধিযুগটির নাম পুরাজীবীয় (Palaeozoic) (৫৭-২৪ কোটি বছর)। এ

সময়ের শিলার দেখা মিলেছে দার্জিলিং পর্বত শ্রেণীতে আর দক্ষিণ পশ্চিম অংশে। এ যুগের নিম্ন গণ্ডোয়ানা শ্রেণীর পাথরের মধ্যে কয়লা পাওয়া গেছে। এ মধ্য মহাযুগ (২৩ কোটি) ভূ-আন্দোলন, অসংখ্য অগ্ন্যুৎপাত ও ভূপৃষ্ঠে আঞ্চলিক বন্ধুরতা সৃষ্টির যুগ বলে চিহ্নিত। বিহারের রাজমহল পাহাড়ে আগ্নেয়গিরির লাভার চিহ্ন মেলে, যা বাংলাদেশের রাজশাহী-বগুড়া অঞ্চলেও বিস্তৃত। আসামের মালভূমিও এ সময়ে উত্থিত হয়, যার নিম্নভাগে সিলেটের বিক্ষিপ্ত উর্মিশ্রেণী বিন্যস্ত। এ জাতীয় মহিজন প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপ জুরাসিক (১৩ কোটি ৫০ লাখ - ১৮ কোটি) এবং ক্রিটেসাস (৬ কোটি ৫০ লাখ - ১৩ কোটি ৫০ লাখ) কালে ঘটে বলে অনুমান করা হয়।

মধ্যজীবীয় (Mesozoic) অধিযুগে যে শিলাস্তরের মিলেছে তার আনুমানিক বয়সসীমা ২৩ কোটি থেকে ১০ কোটি। এ সময়ের শিলাস্তরের দেখা মিলেছে বীরভূম জেলায়। পরবর্তী নবজীবীয় (Cenozoic) অধিযুগের টারশিয়ারী (Tertiary) যুগের (৬ কোটি - ১৬ লক্ষ) পাথরের মধ্যেই তিল তিল করে জমেছে পেট্রোলিয়াম। এ সময়ের মধ্যে হিমালয় পর্বতও জেগে ওঠে সমুদ্রের তলা থেকে। এ নব মহাযুগে সমগ্র ভারতে ভূমি বিবর্তনে ব্যাপক ওলট-পালট হয়েছে। এ যুগেই বাংলাদেশ আসাম সাগরে নিমজ্জিত হয় এবং অসংখ্য নিম্ন জলা, হ্রদ ও গিরিখাত এ সময়েই সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের মহীঢাল এলাকার বেলে পাথর ও কার্বন যুক্ত শঙ্খ শিলার সম্ভবন শুরু হয়। যার মধ্যে তুরা বা চেরা বেলে পাথর বিশেষ উল্লেখ্য। ক্রিটেসাস থেকে মায়োসিস (১৩ কোটি ৫০ লাখ - ৬ কোটি ৫০ লাখ) কালের মধ্যে অনুমান কয়েক বার বঙ্গখাতের উত্থান ও অবনমন ঘটে। রাজশাহী ও বগুড়ার প্রাচীন তুরা বেলে পাথর পরীক্ষা করে বোঝা যায়, প্যালিওসিনকালে (১৮-৬০ লক্ষ) বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মহাদেশীয় ভূখণ্ড ছিল। মায়োসিস যুগে (৬০ লক্ষ-২ কোটি ৬০ লক্ষ) ভূ-অবনমনের ফলে অপর বিরাট অংশ সমুদ্রে (বঙ্গোপসাগরে) নিমজ্জিত হয়। এ সময় সিলেটের টেকেরহাট চুনা পাথর সৃষ্টিকারী 'প্রবাল' জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণীর জন্ম হয়। ইয়োসিস যুগে (৩ কোটি ৮০ লক্ষ - ৫ কোটি ৫০ লাখ) কলিকাতা থেকে ময়মনসিংহ বরাবর একটি কবজা বলয় (Hinge Belt) সৃষ্টি করে, যা নাগা পাহাড়ের ডকি চ্যুতির ন্যায় চ্যুতি সৃষ্টি করে।

মধ্যজীবীয় অধিযুগের শেষ ভাগে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যে আগ্নেয়গিরির অগ্নিময় উচ্ছাস ঘটেছিল তার অকাটা প্রমাণ পাওয়া গেছে পাথরের শরীরে। এই অগ্ন্যুৎপাত ছড়িয়ে পড়েছিল বিহার, বাংলাদেশের সিলেট ও আসামের ভূখণ্ডেও। রাজমহল পর্বতে যে কালচে সবুজ রঙের ব্যাসল্ট ও ব্যাসল্ট জাতীয় পাথর রয়েছে তার উৎপত্তি প্রাগৈতিহাসিক আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসা গলন্ত লাভা জমে। এ পাথরের স্তরে রয়েছে বেশ কয়েকটি পাললিক শিলার স্তর। যেমন, ধূসর রঙের কাদা পাথর, শেল, কার্বনযুক্ত শেল ও নানারকম বালি পাথর যা ঝিল বা হ্রদের জলে পলি জমে জমে তৈরি হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। মালদহ জেলাতে কয়লার ড্রিলিং করে পাওয়া ট্রাপ পাথরের ফাঁকে অবস্থিত পাললিক শিলাস্তরে আবিষ্কৃত হয়েছে 'ওয়েলট্রিচিয়া' নামে একটি ফুলের ফসিল (অজিত পাল ও শেখর ঘোষ, ১৯৮৫)। এ ফুলটির বয়স ১৪ কোটি বছর।

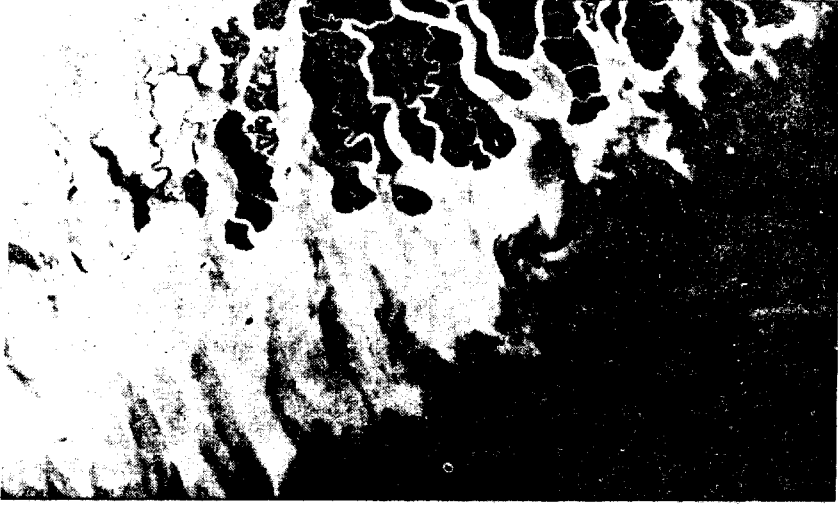
সিলেট ট্র্যাপের বিস্তৃতি মেঘালয়ের দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের সীমানা থেকে আসামের শিলচর জেলা পর্যন্ত। বিজ্ঞানীদের হিসেবে এই ট্র্যাপ পাথরের উপরের অংশের বয়স সাড়ে বার কোটি বছর। যার অর্থ দাঁড়ায় বিহার-বাংলা-আসামের এ অঞ্চলে আগ্নেয়গিরি বলসে উঠেছিল ১০ কোটি ৮০ লক্ষ থেকে ১২ কোটি ৮০ লক্ষ বছরের কোনো এক সময়। গরম ফুটন্ত লাভা জুড়োতে জুড়োতে এসে গেল টারশিয়ারী যুগ। ২ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ বছর। টারশিয়ারী যুগে বাংলাদেশের বহু অংশই ডুবে গিয়েছিল সমুদ্রের প্রাবন আর জলোচ্ছ্বাসে। তাই এদেশের অনেক জায়গায় এ যুগের সমুদ্রজাত পাললিক শিলান্তর পাওয়া যায়। ভূ-বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই শিলান্তরের মধ্যেই রয়েছে পেট্রোলিয়াম। তবে এ শিলান্তর ঢাকা পড়ে আছে মাটির নিচে। পশ্চিমবাংলার ড্রিলিংয়ের নমুনা দেখে বোঝা যায় যে, সাড়ে ৫ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত পেট্রোলিয়াম মিলবে না, দরকার তার চেয়েও বেশি গভীরে ড্রিলিং করা। ভারত সুন্দরবনের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের অগভীর হালকা নীল জলেও ড্রিলিং করে তেল পায়নি। তবে আশা আছে, পাওয়া যাবে। সেটা শুধুই সময়ের ব্যাপার। কেননা বাংলাদেশের সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও ভোলা জেলাতে পেট্রোলিয়াম না হোক, পাওয়া গেছে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস। সিলেটের হরিপুর তেল ক্ষেত্রেও সামান্য পরিমাণে হলোও পেট্রোলিয়াম পাওয়া গেছে। দিনাজপুর-রংপুর সীমান্তেও তেল প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রচুর। পাশেই ভারতীয়রা পেয়েছে।

বাংলাদেশে টারশিয়ারী যুগে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে ১ কিলোমিটার থেকে ৮ কিলোমিটার পুরু সমুদ্রজাত পাললিক শিলান্তর গঠিত হয়েছে। শ্রীহট্টের চুনা পাথরের বয়স প্রায় ৪ কোটি বছর। বাংলাদেশের ফরিদপুর, জামালগঞ্জ, পাঁচপুকুরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে নিচু জাতের পীট কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব টারশিয়ারী যুগের পাললিক শিলান্তর।

বাংলাদেশের বরেন্দ্র, মধুপুর, লালমাই অঞ্চলের রাঙামাটির জন্য ঘন বাদামী ও লাল রঙের ল্যাটেরাইট (Laterite) পাথর থেকে। ভূবিজ্ঞানীদের মতে, এই ল্যাটেরাইট পাথরের স্তর কোয়াটারনারি ও টারশিয়ারী যুগের (৮ থেকে ২৫ লক্ষ বছরের মধ্যে)। মাইওসিন যুগে (টারশিয়ারী অধিযুগে) ১ কোটি ২০ লক্ষ বছর থেকে ৭ কোটি বছরের মধ্যে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উৎপত্তি, স্তরীভূত শীলান্ন গঠিত; কাদামাটির সৃষ্টি ও সিলেটের চুনা পাথর এলাকা গঠিত হয়।

বাংলাদেশের খড়িমাটির উৎপত্তি সম্ভবত মধ্যজীবীয় যুগে (১৩ কোটি থেকে ২০ কোটি বছরের মধ্যে)। পুরাজীবীয় যুগে (২৬—৫০ কোটি) পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাংলাদেশেরও মূলভাগ জলমগ্ন হয়ে পড়ে এবং স্থানীয় উদ্ভিদ থেকে কয়লার রূপান্তর ঘটে। বাংলাদেশে এ প্রকার কয়লার স্তর কয়েক হাজার ফুট ভূ-অভ্যন্তরে অবস্থান করছে। প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও রাজশাহী অঞ্চলে ৫০০-১০০০ ফুট পলির নিচ প্রাচীনতম কঠিন আগ্নেয় শিলা রূপান্তরিত শিলাপৃষ্ঠে অবস্থান নেয়।

বাংলাদেশের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ জায়গায় গত ২০ হাজার বছর ধরে নদীবাহিত পলি ও সামুদ্রিক পলিতে গড়ে উঠেছে পলি সমভূমি। এ পলি সমভূমির মধ্যে রয়েছে প্রাচীন পলিমাটি (Olden Alluvium) ও নবীন পলিমাটি। এদের মধ্যে প্রাচীন পলিমাটির বয়স ১০-২০ হাজার বছরের মধ্যে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই দক্ষিণ বঙ্গের মোহনা অঞ্চলে নদীর পলিমাটি ও সাগরের বালিতে তৈরি হচ্ছে নিত্যনতুন দ্বীপ, জনপদ। সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাপ্ত নিকৃষ্টমানের জ্বালানি কয়লা পিট কয়লার বয়স ছয় থেকে সাড়ে সাত হাজার বছরের মধ্যেই।



চিত্র ৫.৪ : গঙ্গা ও তার শাখা নদীগুলি কিভাবে নদীর মোহনায় পলিমাটি এনে ফেলছে তা উপগ্রহ থেকে তোলা ছবিতে ধরা পড়েছে।

সুন্দরবনের দক্ষিণে নবীন পলিমাটিতে যে দ্বীপগুলি গঠিত হয়ে জলের ওপর জেগে উঠছে, তাদের গঠনপ্রক্রিয়া ও বয়স সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে 'জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'র সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে (অতনু গোস্বামী ও পার্থ চক্রবর্তী, ১৯৮৭)। বকখালি থেকে ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে জম্বু দ্বীপ আর ১৩ কিলোমিটার দূরে চুকসার দ্বীপের অবস্থান। এ দুইটি দ্বীপের মাটির ও গাছের কার্বন ডেটিং এ দেখা গেছে দুটি দ্বীপের বয়সই ৬ হাজার বছরের চেয়ে কম। জম্বু দ্বীপে এখন জনবসতি হয়েছে। আর জোয়ারের সময় ডুবে থাকে বলে চুকসার দ্বীপে জনবসতি গড়ে উঠতে পারেনি। হুগলী নদীর মোহনায় যেসব নতুন দ্বীপ গড়ে উঠেছে, তার প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার জন্য সুন্দরবন অঞ্চলে লবনাস্থ অরণ্যের (Mangrove Forest) অবদান অনেকখানি। নদীর মোহনায় নদী বাহিত পলিমাটি এ সব গাছের শিকড় ও কাণ্ডকে ঘিরেই প্রথমে জমতে শুরু করে। জমতে জমতে এক সময় পানির মাথা ছাড়িয়ে দ্বীপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এসব দ্বীপ পঞ্চাশ বা একশো বছর পরে বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।

বাংলাদেশের জলভাগের গঠন : হিমালয় পার্বত্যমালা সৃষ্টি হওয়ার পর ব্যালান্স সৃষ্টির জন্য সিন্ধু গঙ্গাখাতের বিপরীতে আরাকান-ইয়োমা-সুমাট্রা আর্ক সৃষ্টি হয়। আরাকান-ইয়োমা উত্থানের ফলে (ওলিগোসিন কালে ৩৬-১৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে) বার্মাখাত থেকে বঙ্গখাত আলাদা হয়ে যায়। এ সময় চট্টগ্রামে পাহাড়ী খাদ সৃষ্টি হয় এবং বাংলাদেশের ভূমির ব্যাপক উৎপত্তি ঘটে। নিম্নভাগগুলি সিল্ট পাথর, শেল ও বেলে পাথরে ভরাট হতে থাকে। আরাকান-ইয়োমা-সুমাট্রা পর্বত শিরার উত্থান বঙ্গোপসাগর সৃষ্টি হওয়ার পেছনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। ২৫-১৩ মিলিয়ন বছর আগে মায়োসিনকালে বঙ্গখাতের মধ্যে আন্দোলন ঘটে। ফলে ত্রিপুরা-চট্টগ্রামভঙ্গিল বলয় আরো উৎক্ষিপ্ত হয় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবনমনের ফলে সমুদ্রে তলিয়ে যায়। একালে সুরমা ও তিপাম সিরিজের এ পলল সর্বাধিক ৬১০ মিটার বা ২০০০ ফুট পর্যন্ত জমা হয়। নিম্ন মায়োসিনকালে সৃজনী আন্দোলন ঘটার ফলশ্রুতি হিসেবে পার্বত্য অঞ্চলের নদীবাহিত পলল স্তূপ দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে যায়। এরা প্রধানত ডুপিটলা জাতীয় বেলে পাথর, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা পাহাড়ী এলাকার ক্ষয়িত পলল। এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বছর আগে প্লাইস্টোসিনকালে বঙ্গখাতে (Bengal Basin) আবার এক উত্থান ঘটে, ফলে মধুপুর গড়, ও বরেন্দ্র অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। একে প্লায়োসিন চত্বর বলে। এখানে অধিক ভূগর্ভে অনুসন্ধান ও গবেষণার দরকার রয়েছে প্রাচীন যুগের জলবায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণী সংক্রান্ত রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য।

টারশিয়ারী মহাকালের মাঝামাঝি সময়ে উত্তর-পূর্ব ভারত এর অংশ বিশেষে এক ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। মেদিনীপুর থেকে ময়মনসিংহের দুর্গাপুর পর্যন্ত বৃত্তচাপ সদৃশ রেখার দক্ষিণ পূর্বাংশ উপদ্বীপীয় ভারত-এর স্থিতিশীল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমুদ্র সমতলের নিচে চলে যায়। অপর দিকে শিলং মালভূমি এবং রাজমহল পাহাড় স্থিতিশীল ভূখণ্ডের অংশরূপে বিরাজ করতে থাকে। কিন্তু মধ্যবর্তী স্থানচ্যুতির আকারে অবনমিত হয়ে রাজমহল-গারো ছেদের সৃষ্টি হয়। এর ফলে সিন্ধু নদ ব্যতীত সমগ্র শিবালিক নদীমালার (হিমালয়) গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ বিপরীতমুখে রাজমহল গারো ছেদ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হতে আরম্ভ করে। রাজমহল-গারো ছেদ দিয়ে প্রবাহিত শিবালিক নদীমালার প্রধান দুটো স্রোতধারা গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত।

বঙ্গ অববাহিকা বা বঙ্গখাত পৃথিবীর বৃহত্তম ভূ-অধঃভাজগুলোর মধ্যে অন্যতম। পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বের প্রান্তস্থ পাহাড়ি অংশ বাদ দিলে বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থান গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও অন্যান্য স্রোতধারা কর্তৃক আচ্ছাদিত কোয়াটারনারী মহাকালের পলল দ্বারা আচ্ছাদিত। টারশারী মহাকাল থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত ক্রমাগত ভূগঠনকার্য চলার ফলে এ সকল পললে বিভিন্ন মাত্রায় চ্যুতি, ভাজ, উত্থান এবং অবনমন ঘটেছে। অন্ত্রোক্রোটেসাস এবং ইওসিনকালে আরাকান ইয়োমা পর্বত শিরা উত্থিত হবার ফলে ব্রহ্ম-অববাহিকা থেকে বঙ্গ অববাহিকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং মধ্য-মাইওসিনকাল থেকে আরম্ভ করে টারশারী মহাকালের শেষাংশে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূ-আন্দোলনের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের অন্যান্য টারশারী

পাহাড়সমূহের উত্থান পর্ব সম্পূর্ণ হয়। এ সকল উত্থানকার্য চলাকালীন নদীবাহিত পলল দ্বারা বঙ্গ অববাহিকার পূরণ কার্য দ্রুত সমাধা হয়ে আসছিল। ইয়োসিনকালের পর (৩ কোটি ৮০ লক্ষ) সমুদ্রের (বঙ্গোপসাগর) পশ্চাদপসারণ আরম্ভ হয় এবং প্রাইওসিন (১৮-৬০ লক্ষ) কাল থেকে এ সকল অঞ্চলে সামুদ্রিক অবক্ষেপ দৃষ্টিগোচর হয়।

‘বাঙালির ইতিহাস : আদি পর্ব’ গ্রন্থে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, “বাংলার দক্ষিণ সীমায় বঙ্গোপসাগর এবং তাহারই তট ঘিরিয়া চব্বিশ পরগণা-খুলনা-বরিশাল-ফরিদপুর-ঢাকা-ত্রিপুরার দক্ষিণতম প্রান্ত (অর্থাৎ চাঁদপুর), নোয়াখালী-চট্টগ্রামের সমতট ভূমির সবুজ বনময় অথবা শস্যশ্যামল আন্তরণ। এই আন্তরণ অসংখ্য ক্ষুদ্রবৃহৎ নদ-নদী খাটিখাড়ি খাল-নালা-বিল জলা-হাওড় (হায়র=সায়র=সাগর) ইত্যাদিতে সমাচ্ছন্ন। এই জেলাগুলির অধিকাংশ নিম্নভূমি ক্রমশ গড়িয়া উঠিয়াছে অসংখ্য নদনদী পলিমাটি এবং সাগর গর্ভ তাড়িত বালুকারাশির সমন্বয়ে, ঐতিহাসিককালে এবং বোধহয় কতকটা ঐতিহাসিক কালেও।”

বাংলাদেশে জনবসতির প্রারম্ভিককাল : আমরা জানি যে প্রাইস্টোসিন (১০ লক্ষ বছর আগে) যুগের প্রারম্ভে জলবায়ু খুবই ঠাণ্ডা ছিল, ফলে ভূ-ভাগের অনেকাংশ ছিল বরফাচ্ছন্ন। তখন বঙ্গোপসাগরের পানি তল অনেক নিচে নেমে যায়। সাগরতলের অনেকাংশ ছিল শুষ্ক আর বঙ্গ ভূখণ্ড বঙ্গোপসাগরের অনেকাংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। কালক্রমে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটতে থাকে, জলবায়ু শীতল ও শুষ্ক হয়ে ক্রমে ক্রমে উষ্ণ ও আর্দ্রতর হয় আর অধিক বৃষ্টিপাত ও বরফ গলার ফলে বঙ্গোপসাগরের পানি-তল ক্রমে উপরে উঠতে থাকে। এটা ক্রমে এতটা উপরে উঠে যে, হিমালয়, পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত সবটাই পানিতে নিমগ্ন হয়। আজও প্রাইস্টোসিন যুগের লাল পলি অঞ্চল আমরা বরিন্দ-মধুপুরে দেখতে পাই।

পাঁচ লক্ষ বছর ধরে বাংলাদেশ নিমগ্ন থাকার পর নদী-নালা দ্বারা বাহিত পলি, মাটি, কাঁকর, বালি প্রভৃতি জমে জমে বাংলাদেশের ভূভাগ সৃষ্ট হয়। সুতরাং সমুদ্র গর্ভ হতে ভূমি জেগে উঠতে যদি আরও ২ থেকে আড়াই লাখ বছর লেগে গিয়ে থাকে তাহলে বাংলাদেশের জন্ম মোটামুটি ২ থেকে ৩ লাখ বছর বলে ধরে নেয়া যায়। গারো রাজমহলের দক্ষিণ ভাগের বয়স পঞ্চাশ হাজার বছরের বেশি হবে না।

ইয়াল-কেব্রিজ অভিযানের ফলাফলে দেখা যায় যে, উপমহাদেশের অনেক স্থানেই বরফ যুগের মধ্যবর্তী সময়ে লোকবসতি ছিল, বিশেষ করে হিমালয়ের পাদদেশ, দক্ষিণ ভারতের ও ভারতের পূর্ব উপকূলে, কিন্তু বাংলাদেশের কোথাও এই জনবসতির চিহ্নের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে পশ্চিম বাংলার তাম্রলিঙ্গ অঞ্চলে তিন লক্ষ বছর আগের প্রস্তর কুঠার পাওয়া গেছে এবং দশ হাজার বছর আগের জনবসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড়ে মনুষ্য ব্যবহৃত পাথরের হাতিয়ার যা পাওয়া যায় ১৯৮৯ সনে তা থেকে অনুমিত হয় এখানে মানব বসতি ছিল ১০ থেকে ২০ হাজার বছর আগে। খুব সম্ভবত লালমাই পাহাড়ের পাদদেশ ছিল তখন জলমগ্ন। সমগ্র গাঙ্গেয় অববাহিকায় ১০ হাজার বছর আগে কোনো জনবসতি ছিল না।

বাংলাদেশে খুব সম্ভবত আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে জনবসতি শুরু হয়। দ্রাবিড় অস্ট্রেলীয়-মঙ্গোলীয় জাতের লোকেরা এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। পুণ্ডবর্ধন এলাকায় মহাভারতের যুদ্ধের সময় (খৃষ্টপূর্ব ১৪০০ সালে) বাসুদেব রাজা কুরুদের পক্ষে ছিলেন। বাংলার রাজা জয়সেন ঐ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। আর্যরা খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে পুরো বাংলাদেশ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।

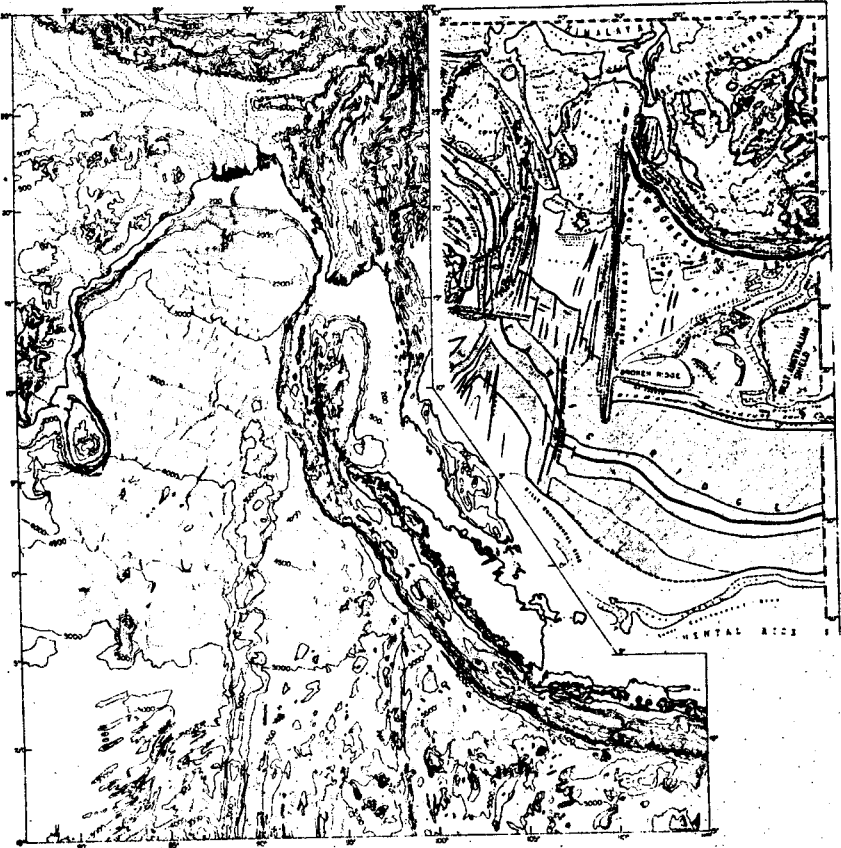
পৃথিবীর অনেক স্থানেই খৃষ্টপূর্ব ৩১০০ সালের দিকে এক মহাপ্লাবন ঘটে। ভারতও এ প্লাবন হতে বাদ যায়নি। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম এবং বদ্বীপ অঞ্চলের অন্যত্র মাটির নিচে বড় বড় প্রস্তর ও উপল খণ্ডের এক বিরাট স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। এ প্লাবনের সঙ্গে তার যোগ আছে। এ হতে প্রমাণিত হয় যে, প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বেও বদ্বীপ অঞ্চল সাগরগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ জেমস ফারগুসন পূর্ব ভারতের প্রাচীন নগরীর এক গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, আজকের ব্রহ্মপুত্র নদীর অববাহিকার মতই ৫০০০ বছর আগে গঙ্গার নদীর অববাহিকাও ছিল তেমনি স্যাঁতস্যাঁতে জঙ্গলাকীর্ণ ও মনুষ্যবাসের অনুপযোগী। আমরা দেখতে পাচ্ছি উত্তর ভারতে শহরগুলি ক্রমে ক্রমে পূর্ব দিকে কিভাবে গড়ে উঠে : দিল্লীর পরে প্রয়াগ বা এলাহাবাদ, এলাহাবাদের পরে পালিবোহরা বা পাটলিপুত্র বা পাটনা, পাটনার পরে মুর্শিদাবাদ এবং সর্বশেষে ঢাকা।

তিন হাজার বছর আগে গঙ্গা নদীর বিভিন্ন শাখা বদ্বীপ অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়ে সাগরে পড়ত। আর এটা উল্লেখযোগ্য যে খৃষ্টপূর্ব ৩০০ সালে গঙ্গা নদীর মূল ধারা বর্তমান পদ্মা ধারাই অনুসরণ করত-হুগলী নদীর ধারা নয়। আর তখনকার দিনে গঙ্গা যদি রাজ্যের পূর্ব সীমা নির্ধারণ করত গঙ্গা নদীর পূর্ব ধারাটি। অনাদিকাল হতেই বাংলাদেশের নদীনালা ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়েই বাংলাদেশের ভূমি গঠন কাজে নিয়োজিত ছিল। আর কতবার এ সব নদীনালা যে গতি পরিবর্তন করেছে তার হিসাব নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তখনকার দিনে পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে চারটি নদী যথা গঙ্গা, কালিন্দী, ভাগীরথী ও মহানন্দা বয়ে যেত। কালিন্দী ও ভাগীরথীর মধ্য দিয়ে গঙ্গা নদী বয়ে যেত। হয়ত তারও পূর্বে গঙ্গা নদী আরও উত্তর দিয়ে পাণ্ডুয়ার দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ঢাকা জেলার সোনারগাঁওয়ের নিকট দিয়ে বঙ্গোপসাগরে চলে যেত। নদীর তীরে মানুষ বসতি স্থাপন করত, তাই নদীর গতিপথ পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের বাসস্থানও বদলাতে হত।

বঙ্গোপসাগরের ভূতত্ত্ব ও ভূতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশ (Geology and Tectonic evolution of the Bay of Bengal)

ভূতাত্ত্বিক দিক দিয়ে বঙ্গোপসাগরের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি বর্তমানে সর্বজনস্বীকৃত পৃথিবীর ভূত্বকের ভূভাগীয় সম্প্রবাহ (Continental Drift) এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বঙ্গোপসাগরের বিস্তৃতি বিশেষ করে বিগত ৩ কোটি বছরের ভিতর খুবই উল্লেখযোগ্যভাবে এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতিকে প্রভাবিত করেছে। হিমালয় ও আরাকান-চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা পাটকই পর্বত শ্রেণীর সৃষ্টিও বঙ্গোপসাগরের ক্রমবর্ধন ও ভূত্বকে চাপ

সৃষ্টির সাথে জড়িত। এই সমুদ্রের আকৃতি অনেকটা ইংরেজি ইউ (U) এর মত। আবার তলদেশ সমুদ্রের দিকে থেকে ক্রমশ দক্ষিণ দিকে ঢালু। উত্তর-পূর্ব অংশে অর্থাৎ বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণে ২০০ মিটারের চেয়ে অগভীর প্রায় ৩০ হাজার বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত মহাদেশীয় সেপান রয়েছে। তারপর প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ১.৫ মিটার ঢালু হয়ে সিংহলের কাছে এর গভীরতা বেড়ে প্রায় ৪০০০ মিটার দাঁড়িয়েছে। এরপর বঙ্গোপসাগর মিশে গেছে ভারত মহাসাগরের সাথে। বস্তুত বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগরেরই একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের দিকে এটি উন্মুক্ত। উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে মাঝখান বরাবর ঢাল প্রায় বিভিন্ন অংশের মধ্যে সঙ্গতিপূর্ণ। গভীরতার পরিমাণ ২০০০ থেকে ৪০০০ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ।



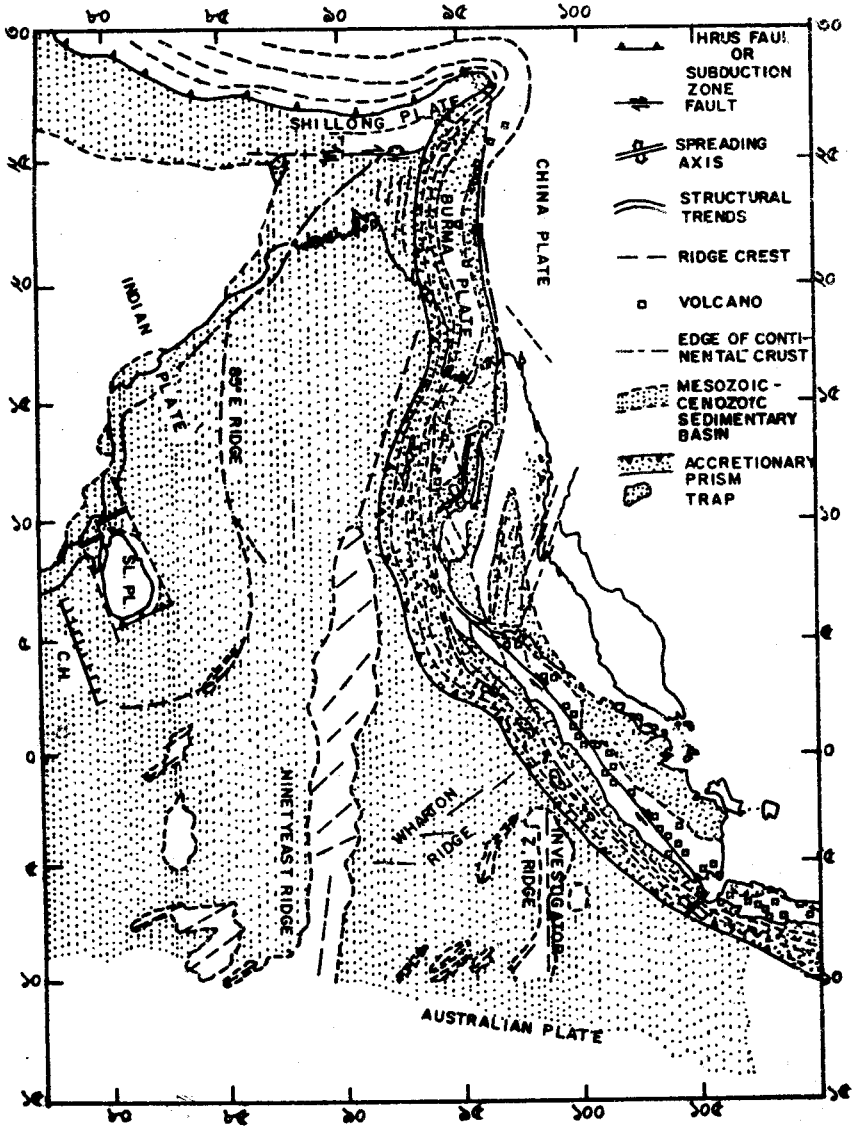
চিত্র ৫৫ : বঙ্গোপসাগরের ভূমিরূপ।

সমুদ্রের তলদেশের আকৃতি ও প্রকৃতি থেকে বোঝা যায় যে, বঙ্গোপসাগরের তলদেশ দীর্ঘদিন যাবত ভূগাঠনিক দিক থেকে স্থিতিশীল রয়েছে। ভূ-আন্দোলনে সৃষ্ট বৃহদাকার ভূমিরূপ এখানকার উচ্চহারের পললায়নের ফলে ঢাকা পড়ে গেছে। বাংলাদেশের নদীগুলো থেকে ২.৪ বিলিয়ন টন পলি ও ভারতের নদীগুলো কর্তৃক এর অর্ধেক পরিমাণ পলি বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে। বঙ্গোপসাগরে তলদেশীয় ভূ-প্রকৃতি প্রায় সমতল। শুধু উত্তর দিক ব্যতীত তার সব দিকেই মহীসোপান খুবই অল্প বিস্তৃত



চিত্র ৫.৬ : (ক) বঙ্গোপসাগরের ভূপ্রাকৃতিক গঠন।

এবং বেশ ঢালু। প্রায় গোলকার মহীসোপানের প্রান্ত বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম দিকে ১৩০ থেকে ১৮০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত ও এখানে সর্বাধিক ঢাল প্রায় ৪.৫ ডিগ্রি। উত্তর ও উত্তর পূর্ব দিকে মহীসোপান বেশ প্রশস্ত যেখানে প্রচুর পরিমাণে নদীবাহিত পলি এসে



প্রতি বৎসর জমা হয়। এই বিরাট পরিমাণের পলি উপকূলে বিভিন্ন চর ও অগভীর সমুদ্রের সৃষ্টি করেছে, যা উপকূল থেকে প্রায় ৯০—২১০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এর মধ্যে ৪৫—১২০ কিলোমিটার পর্যন্ত অঞ্চলের গভীরতা ৫০ মিটারেরও নিচে। পূর্ব ভারতের অঙ্গ উপকূলে মহীসোপান প্রায় ৪০ কিলোমিটার প্রশস্ত। বঙ্গোপসাগরের তলদেশের ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ৯০° পূর্ব শৈলশিরা বাংলা গভীর সামুদ্রিক উপবদ্বীপ, নিকোবর ফ্যান, অতলস্পর্শী মহাখাদ, বার্মা খাদ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গোপসাগরের ভূমিরূপ থেকে দেখা যায় যে, এই সাগরের মাঝখান দিয়ে একটি শৈলশিলা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা বরাবর বিস্তৃত। এ শৈলশিরা ১৫° উত্তর অক্ষাংশ থেকে আরম্ভ করে ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত নিকোবর ফ্যান অবস্থিত। বেঙ্গল ডীপ সী ফ্যান ২০° উত্তর অক্ষাংশ থেকে শুরু হয়ে ৭° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১০০০ কিলোমিটার প্রশস্ত। প্রায় ৫০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ। ৯০° পূর্ব শৈলশিরার পশ্চিমে বেঙ্গল ফ্যান ও পূর্বে বঙ্গোপসাগরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূপ্রাকৃতিক ও ভূমিরূপ বৈশিষ্ট্য হলো গঙ্গা গিরিখাদ বা অতলস্পর্শী মহাখাদ নামে বিশেষভাবে পরিচিত। এটি একটি অত্যন্ত খাড়া তীরবিশিষ্ট সামুদ্রিক গিরিখাদ যা উত্তর পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রশস্ত ও গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ থেকে মাত্র ২৪ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত।

ভারত মহাসাগরের চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের পরিমাপ থেকে দেখা গেছে মহাসাগরের মেঝে প্রতি বৎসর দুই সেন্টিমিটার করে প্রসারিত হচ্ছে এবং হিসাবে দেখা গেছে সাগরটির বয়স ১০ কোটি বছর। আর বঙ্গোপসাগরের তলদেশে ১.৫ থেকে ২.৫ কিলোমিটার তলানি সঞ্চিত হয়েছে। গঙ্গা মোচকে (Cone) সাগরের তলদেশে ১২ কিলোমিটার উচ্চতাবিশিষ্ট তলানি স্তর গত তিন কোটি বৎসর ধরে সঞ্চিত হয়েছে। ১৯৭২-৭৩ সনে বিজ্ঞানীরা Deep Sea Drilling Project (DSDP)-এ ৫৮টি স্থানে গর্ত করে তলানি সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করেছেন। এতে ভারত মহাসাগর তথা বঙ্গোপসাগরের ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস জানা সহজতর হয়েছে। তলানি, পানি বিদ্যা ও আবহবিদ্যা সম্পর্কিত ভারত মহাসাগরের গর্ত ১৫ কোটি বছরের কথা জানা সম্ভবপর হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের জনুর ইতিহাস ভারত মহাসাগরের জনুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস

ভারতীয় ভূখণ্ডে তিনটি স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক বিভাগ খুব সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। যথা, (ক) দক্ষিণ ভারতের উপদ্বীপ (খ) উত্তর ভারতের হিমালয় পর্বতাঞ্চল এবং (গ) উভয়ের মধ্যবর্তী সিন্ধু গাঙ্গেয় সমভূমি। ভৌগোলিক প্রকৃতিতে এই তিন বিভাগের মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য আছে। ভূগাঠনিক বিচারে ভারতীয় উপদ্বীপ একটি ক্রেটন অর্থাৎ সুস্থিত একটি ভূখণ্ড। প্রাক-কেন্দ্রিয়ান উত্তরকালে (৩৬০ কোটি বৎসর আগে) এই অঞ্চল কোনো গিরিজনি বা বিপর্যয় দ্বারা আক্রান্ত হয় নি। তবে চূড়ান্ত এবং অবনমন (Subsidence) অনেক স্থানেই ঘটেছিল। আসামের মালভূমি অঞ্চল এবং সিকির পর্বত

উপদ্বীপ ভারতেরই উত্তরাংশ। অনুমান করা হয় যে, ভারতীয় উপদ্বীপের উত্তর প্রান্ত উত্তরাগত পেষণের ফলে নিম্নমুখে বলিত (folded) হয়ে সিন্ধু গাঙ্গেয় ভূমির (বাংলাদেশসহ) অধঃস্তর রচনা করেছে। উপদ্বীপের উত্তর প্রান্ত বিস্তৃত হয়ে হিমালয়ের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে মিলিত হয়েছে। হিমালয় পর্বতমালার বিস্তৃতি পশ্চিমে সিন্ধু উপত্যকা হতে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পর্যন্ত ১৫০০ মাইল লম্বা। পশ্চিম প্রান্তস্থ শাখাগুলি অধিকাংশই পাকিস্তানের এবং পূর্ব প্রান্তস্থ শাখাগুলি অধিকাংশই বর্মার অন্তর্গত। পাঞ্জাবে, সিন্ধু, বেলুচিস্তান থেকে আসাম, আরাকান ও বর্মার মধ্য দিয়ে মালয় পর্যন্ত বিস্তৃত। তিব্বতের মালভূমি, কারাকোরাম পর্বত, কৈলাস ও লাডাক পর্বত, জলসকর ও পির পঞ্জল পর্বত ইত্যাদিও হিমালয়ের অন্তর্গত। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে প্রধান নদীগুলি হলো সিন্ধু, বিপালা, বিতজ্জা, শতদ্রু, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, রামগঙ্গা, কালি, কর্ণালী, গণ্ডক, কোশী, মহানন্দা, ব্রহ্মপুত্র, সুবর্ণসিরি, তিস্তা, যমুনা, মেঘনা, সুরমা, ইরাওয়ালদী চিন্দুইন, সিতাং এবং সালউইন। গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র সবচেয়ে বড় নদী। হিমালয় পর্বত মাত্র পুরাজীবীয়কালে (৮ কোটি বছর আগে) সমুদ্রতলের উপর পর্বতাকারে উত্থিত হয়ে স্থলরূপ লাভ করেছে। কেউ যদি বাংলাদেশের গাঙ্গেয় সমভূমি হতে উত্তর দিকে হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালে আরোহণ করেন, তবে প্রথমে তিনি পাবেন সিবালিক স্তর, তারপর গণ্ডোয়ানা স্তর, তারপর বস্ত্রা শ্রেণী, তারপর আর্কিয়ান যুগের ডালিং ও দার্জিলিং শ্রেণী। এই ব্যতিক্রান্ত অনুক্রমের কারণ হলো তিন চারটি সংঘর্ষের প্রভাব। হিমালয়ের উত্তর প্রান্ত অবতল এবং দক্ষিণপ্রান্ত উত্তল। এর সম্ভাব্য কারণ হলো প্রধানত উত্তর বা উত্তর পূর্ব দিক হতে আগত ভূশক্তির দ্বারা দক্ষিণের সুস্থিত উপদ্বীপ ভূখণ্ডের গাঙ্গে পিষ্ট পললস্তর হতেই হিমালয়ের অভ্যুত্থান ঘটে। হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত একটি ভূগাঠনিক রেখা যা সিন্ধু নদীর ও সাংপো নদীর উপত্যকার উর্ধ্বাংশ বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত একটি অস্থিত বলয় বলে পরিচিত (সিউচার রেখা), এ রেখা বরাবর ১৪ কোটি বছর আগে ক্রিটেসাস যুগে উত্তরগামী ভারতীয় উপদ্বীপ ভূখণ্ডের সঙ্গে এশীয় (তিব্বতীয়) ভূখণ্ডের সংঘর্ষ হয়েছিল।

হিমালয়ের দক্ষিণে যে বিরাট সমতলভূমি পাঞ্জাব, উত্তর রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, উত্তর বিহার, বাংলাদেশ (অবিভক্ত) প্রধানত এই কয়টি স্থানের উপর বিস্তৃত। তা সিন্ধু এবং গঙ্গা নদী ও তাদের শাখাপ্রশাখা দ্বারা পরিবাহিত পলিমাটিতে গঠিত। এর নামই সিন্ধু গাঙ্গেয় সমভূমি। কোয়াটারনারি যুগের (১০ লাখ) বেলে পাথর, কাদা পাথর, পলিমাটি দ্বারা এই সমভূমির উপরিদেশ গঠিত। সিন্ধু গাঙ্গেয় খাতের ভিতর খনিজ তৈলাদির মূল্যবান সঞ্চয় থাকতে পারে তবে ৮ কিলোমিটার পর্যন্ত পুরুস্তর পলিমাটি দ্বারা আবৃত বলে এখনও তা আবিস্কৃত হয়নি, তত্ত্বগতভাবে যদিও তা উজ্জ্বলজনক।

পুরাজীবীয়কালে (কেম্ব্রিয়ান যুগে ৬০ কোটি বৎসর আগে থেকে শুরু করে পার্সিয়ান যুগ পর্যন্ত অর্থাৎ ২৯ কোটি বছর পূর্ব পর্যন্ত) ভারত ছিল এন্টার্কটিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মিলে একত্রে ‘গণ্ডোয়ানা’ মহাদেশের অন্তর্গত। আর এদিকে তিব্বত, দক্ষিণ চীন, ইন্দোচীন, কাম্পিয়ান ও কম্বোজসাগরের দু’শ’ মাইল দক্ষিণ দিয়ে (ককেশাস পর্বতের ঢাল

দিয়ে) অবস্থিত ছিল টেথিস মহাসমুদ্র। এ মহাসাগর সমগ্র মধ্যজীবীয় অধিযুগ (২৪—১৪ কোটি বছর) ব্যাপী অক্ষুণ্ণ ছিল। টেথিস মহাসমুদ্র এই সময় বিরাট কলেবর লাভ করেছিল। পশ্চিমে এটি এশিয়া মাইনর, পারস্য ও দক্ষিণ ইউরোপের মধ্য দিয়ে আল্পস অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্বে দক্ষিণ চীন, তিব্বত সীমান্ত ও ইন্দোচিনকে বেষ্টিত করে ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়ে সম্ভবত তদানিন্তন ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের সাথে যুক্ত হয়েছিল। এসব অঞ্চলে সদৃশ জীবাশ্মকুলের উপস্থিতির দ্বারা টেথিসের এই দীর্ঘ বিস্তৃতি সমর্থিত হয়েছে। হিমালয় বা উত্তর ভারতের কোনো চিহ্ন ছিল না। উপদ্বীপ ভারতের দুই পার্শ্বস্থ সমুদ্রকূল ট্রায়াসিকেও (২৪ কোটি বছর আগে) গঠিত হয়নি, অর্থাৎ আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগর তখন অজ্ঞাত। তবে উপদ্বীপের পূর্ব উপকূল খুব সম্ভবত জুরাসিকের শেষে বা ক্রীটেশাসের প্রথম দিকে (১৪ কোটি বছর আগে) গঠিত হয়।

২১ কোটি বছর আগে গণ্ডোয়ানাভ্যাণ্ড মহাদেশ ভাঙ্গা শুরু হয়, ভারত ভূখণ্ড ৮ কোটি বৎসর আগে টেথিস মহাসাগরের দিকে যাত্রা শুরু করে ৫ কোটি বৎসর আগে ইউরেশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ প্রান্তের সঙ্গে ধাক্কা খায়। পূর্ব টেথিস মহাসাগরও ৩ কোটি বৎসর আগে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়, জন্ম হয় বঙ্গোপসাগরের। গণ্ডোয়ানাভ্যাণ্ডের অংশগুলো যখন পরস্পর থেকে আলাদা হতে শুরু করে দেয় তখন নতুন সমুদ্রতল গঠিত হতে থাকে। পরে যা বর্তমানকালের ভারত মহাসাগরের রূপ ধারণ করে। ৯ থেকে ৮ কোটি বৎসর আগে ভারত ভূখণ্ড প্রতি বৎসর ৬ সেঃ মিঃ করে উত্তর দিকে যাত্রা আরম্ভ করে তারপর সাড়ে ছয় কোটি বৎসরের সময় গতি বেড়ে হয় ৭/৮ সেন্টিমিটার বৎসর প্রতি এবং ৫ কোটি ৩০ লাখ বছরের গতি ১৮/১৯ সেঃ মিটার বৎসর প্রতি দাঁড়ায়। তারপর গতিবেগ কমে যায়। ৫২-৪৮ মিলিয়ন বৎসরের সময় ৯০° পূর্ব শৈলশিরায় কোনো গতিই ছিল না। ইউরেশিয়া প্লেটের সঙ্গে ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রথম সংঘর্ষ হয় এ সময়। গতিবেগ ২ সেন্টিমিটার বার্ষিকে নেমে এসে বর্তমানে ০.৫ সেঃ মিঃ এ পৌছেছে। পাঁচকোটি বৎসর পূর্বে হিমালয় মাথা তুলে দাঁড়ায়, যা আগেই বিবৃত হয়েছে। ১৪ কোটি বৎসর আগে জন্ম প্রক্রিয়া শুরু হয়ে ৩.৮ কোটি বৎসর সময়ে বেঙ্গল ফ্যানের গঠন ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়।

ক্রীটেশাস উত্তর (১৪ কোটি বছরের পর) সংঘর্ষের ফলে বঙ্গোপসাগরের সর্বো-উত্তরাংশটি আসাম এবং বার্মা উপসাগরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। আসাম উপসাগরে পশ্চিম বাংলার বেশ কিছু অংশ পুরো বাংলাদেশ-দক্ষিণে সেন্টমার্টিন দ্বীপসহ, তবে দিনাজপুর ঢাল বাদে এবং শিলং মালভূমি বাদে আসাম এইসব অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ছিল। আজকের বঙ্গোপসাগরের অস্তিত্ব তখনও ছিল না। ভারত মহাসাগরের সন্ধীর্ণ প্রণালী দ্বারা উপসাগর দ্বয়ে পানি সরবরাহ হতো। ইয়োসিন যুগের ধাক্কার ফলে, আসাম সমুদ্র দক্ষিণ দিকে সরে যায়। আড়াই কোটি বৎসর আগে ভারত ভূখণ্ড বার্মা আর্ক বা বার্মা দ্বীপবলয়ের সঙ্গে তৃতীয়বারের মত ধাক্কা খায়। চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টের পাহাড় শ্রেণীর তখন জন্ম হয়েছিল এ ধাক্কা। এবার বার্মা উপসাগরও অদৃশ্য হয়ে যায়, বঙ্গোপসাগর পূর্ণ অবয়ব নিয়ে এ সময় পুরোপুরিভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ক্রিটেশাস যুগের শুরুতে

আগ্নেয়োচ্ছ্বাস বিহারের সাওতাল পরগণায় রাজমহল অঞ্চলে এবং আসামের স্থানে স্থানে তবল বেসল্ট লাভার (সিলেট ট্যাপ) বিস্তীর্ণ উদগীরণ দেখা যায়। এ যুগের একাধিক পর্যায়ে সমুদ্রোচ্ছ্বাস বিভিন্ন দিক হতে ভারতীয় ভূখণ্ডের উপকূলপ্রান্তকে জলমগ্ন করেছিল। পূর্ব উপকূল এবং বঙ্গোপসাগরের উৎপত্তি ক্রীস্টেসাসের গোড়াতেই শুরু হয়েছিল একথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। ক্রিটেসাস সমুদ্রোচ্ছ্বাসের চিহ্ন আসাম মালভূমিতে এবং পশ্চিম বঙ্গ ও সংলগ্ন অঞ্চলে লক্ষ্য করা গেছে। এ সময়ে টেথিস বলয়ে সমুদ্র সংকোচন দেখা যায়। তিব্বতের মহাদেশীয় অঞ্চলের সাথে সংঘর্ষের ফলে অধোগমের (Underthrusting) এবং অধোগামীতার (Subduction) প্রভাবে ভারতীয় খণ্ডের উত্তর প্রান্ত এবং তৎসংলগ্ন সমুদ্রবক্ষ তিব্বতীয় বা এশীয় খণ্ডের অধঃস্তরে ক্রমাগত বিলীন হতে থাকে। এ দুই ভূখণ্ডের মধ্যের সংঘর্ষ রেখাকেই (ভূগাঠনিক বিভেদ রেখা) সিন্ধু সিউচার বলে। এটা হিমালয়ের উত্তরে সিন্ধু ও সাংপো নদীর উপত্যকা বরাবর বিস্তৃত।

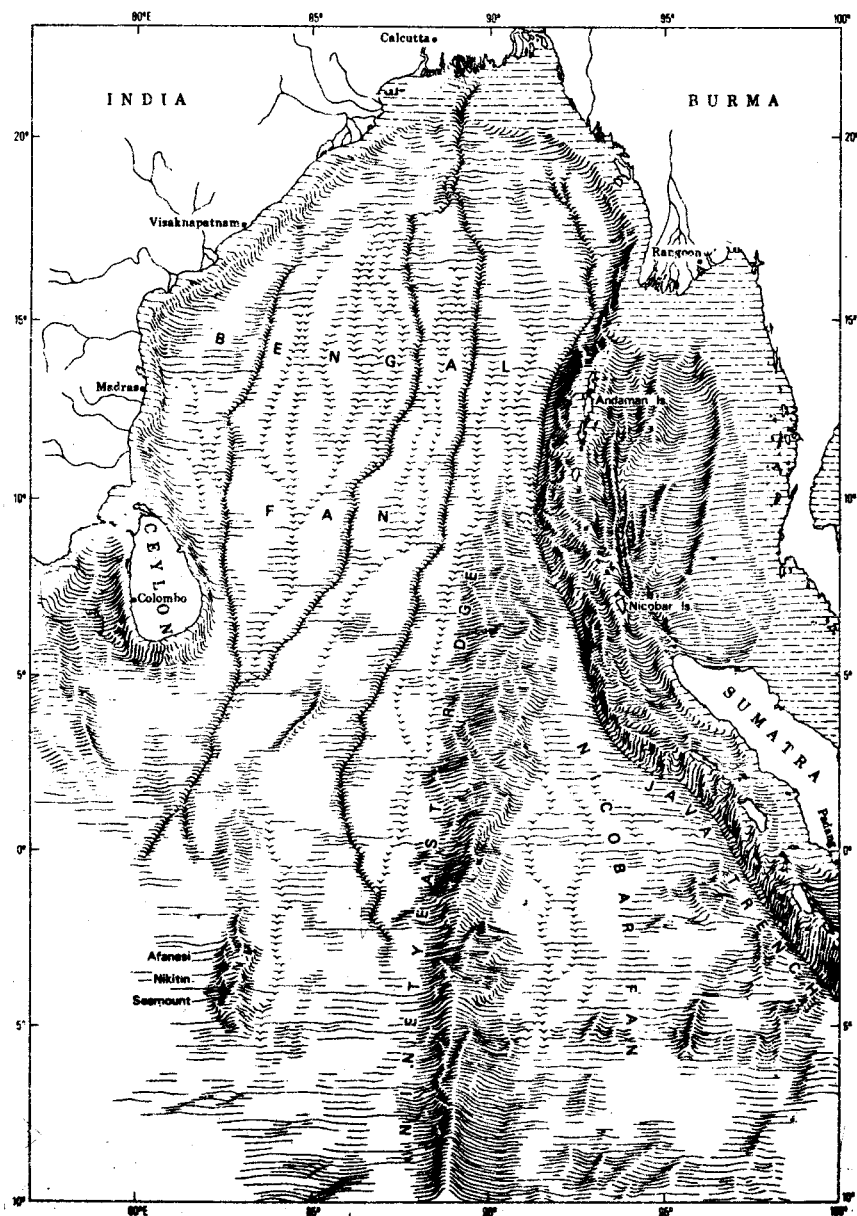
বঙ্গোপসাগরের তলদেশের গঠন

১৯৭৭ সনে কালিফোর্নিয়ার ক্রীপস্ ওসেনোগ্রাফিক ইনস্টিটিউট প্রফেসর জোসেফ করের (Curry) নেতৃত্বে বঙ্গোপসাগরে অনুসন্ধান চালায়। এতে ৬.৫ K Hz তলদেশ ভেদকারী প্রতিধ্বনি ভূ-কম্পনীয় প্রতিফলন (Scismic reflection), চুম্বকতত্ত্ব ও অভিকর্ষ সম্পর্কিত উপাত্ত সংগ্রহ করে বঙ্গোপসাগরের তলদেশের গঠন নিরূপণ করা হয়।

এতে মুরড টেলিমিটারিং, দীর্ঘ প্রতিসরিত লাইনের রেকডিং-এর জন্য বুওর (Recording buoys for longer refraction lines), স্বাধীনভাবে সঞ্চরমান নৌ সনোবুয়ো (Free drifting navy sonobuoys), এয়ারগান সমেত এবং বিস্ফোরক শব্দ উৎসাদির পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। (Sonar হচ্ছে জলের অভ্যন্তরে বস্তুর অবস্থান শব্দ তরঙ্গ সাহায্যে নির্ণয় যন্ত্র সরঞ্জাম আর Buoy হচ্ছে বয়া বা জলপথে ভাসমান পথ নির্দেশিকা বিশেষ)।

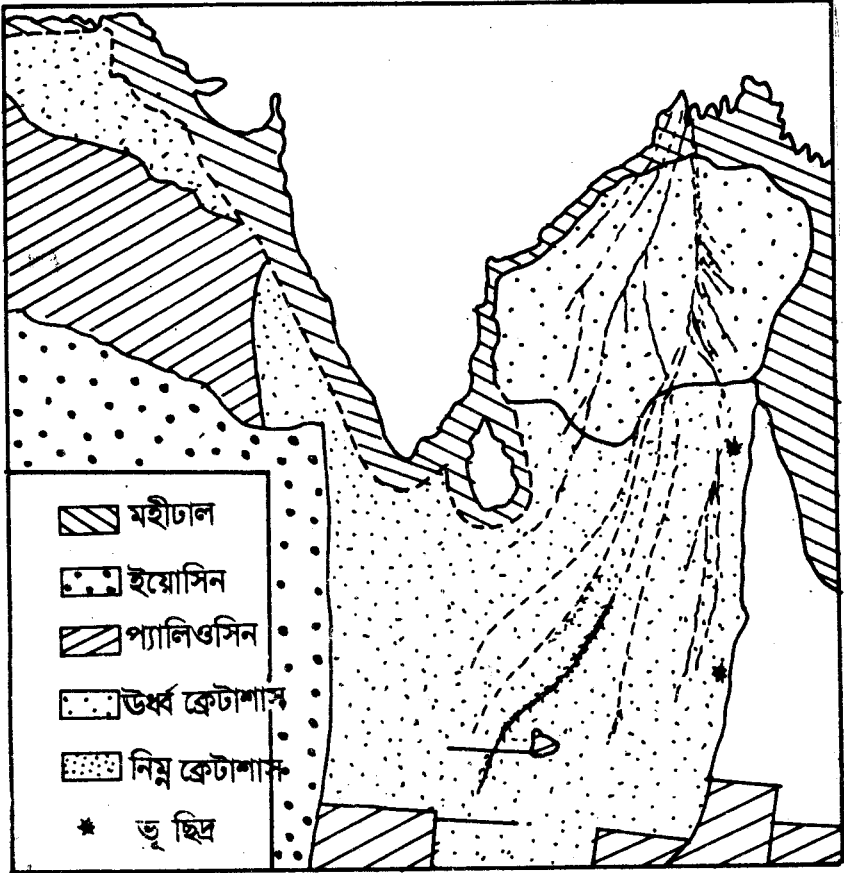
বঙ্গোপসাগরে কোনো চুম্বকীয় বিচ্যুতি ধরা পড়েনি, তাঁর কারণ হয়ত এই যে, ক্রীটেসাস যুগের সময় চুম্বক ক্ষেত্র শান্ত ছিল, আর এ সময়ে বঙ্গোপসাগর গঠিত হওয়া শুরু করেছিল, দ্বিতীয়ত ১০/১২ কিলোমিটার পুরু তলানি স্তর বঙ্গোপসাগরের তলদেশে জমা আছে, যার ফলে সমুদ্রের তলদেশ অন্যান্য সাগরের তুলনায় শান্ত, কোনো আগ্নেয়গিরি নেই। তবে পার্শ্ববর্তী আন্দামান সাগর ও নিকোবর ফ্যানে চুম্বকীয় বিচ্যুতি রয়েছে। শাস্ত্রী ও তাঁর সহযোগিরা (১৯৭৩) ভারতের কাবেরী বেসিনের ভূস্তরীয় গঠন নির্ণয় করেছেন। এ স্তরে সবচেয়ে পুরাতন সামুদ্রিক পাথর হচ্ছে প্রবাল প্রাচীরের চূনাপাথর, বালি পাথর এবং আলবিয়ান যুগের কালো কর্দম শিলা।

কাবেরী অববাহিকার মহীসোপান বা মহীঢাল সম্পর্কে বেশি কিছু জানা নেই। তবে ভূকম্পনীয় প্রতিফলনের উপাত্ত থেকে অনুমান করা যায় যে, ঢালের তলানির স্তরের বহিঃস্থ শিলা (out cropping) রয়েছে, তাছাড়া ঢালে পুরাতন তলানিও জমা আছে যা



চিত্র : ৫.৭ (ক) বাংলা উপবর্ধীপ (Fan) এর বর্তমান ভূমিরূপ ও প্রণালী

বেঙ্গল ফ্যানের নতুন তলানির নিচে চাপা পড়ে যায়। মহীতালের অল্প একটু নিচেই তলানির চিহ্ন দেখা যায় যা সম্ভবত সীমারেখার স্রোতের (Contour current) প্রভাবে গঠিত হয়েছে।



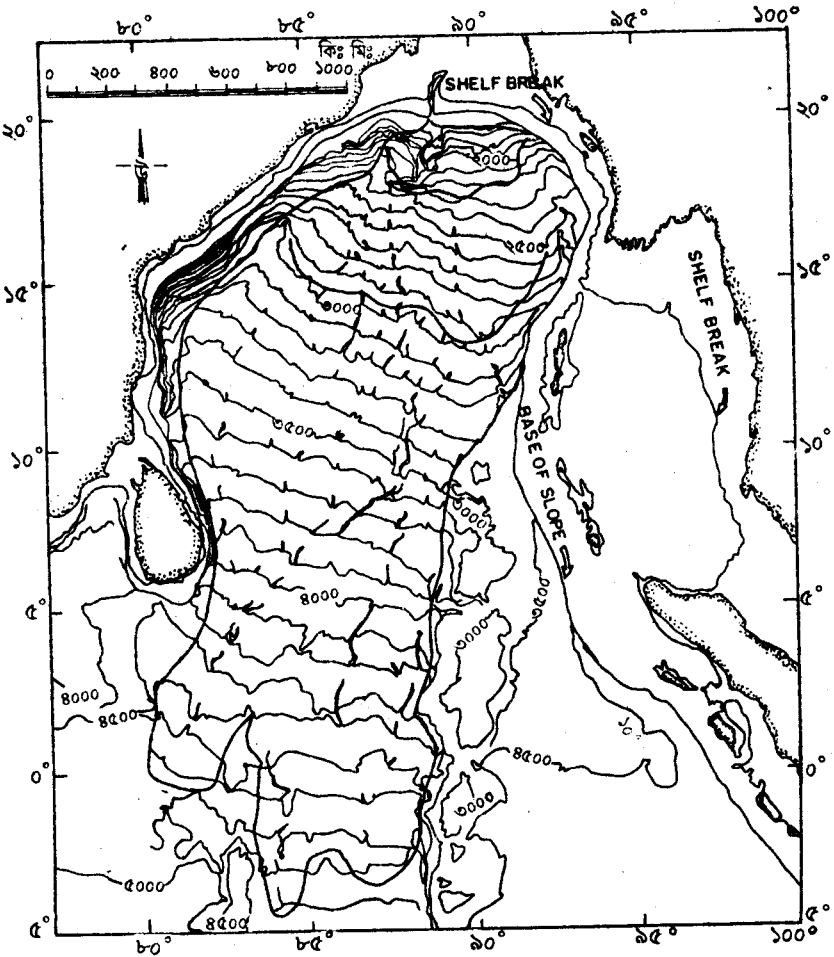
চিত্রঃ ৫.৭ (খ) ভারত মহাসাগরের সমুদ্রতলের ভূ-বৈচিত্র্য।

বেঙ্গল ফ্যান : বেঙ্গল ফ্যানের (উপবদ্বীপ) এবং বেঙ্গল মহীখাতের (Seosynclinal) সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এটি অবক্ষেপ দ্বারা পূর্ণ। বাংলা মহীখাত শুয়ে আছে ভারতীয় মহাদেশের ঢালে এবং নব্বই পূর্ব শৈলশিরার মাঝখানে সুস্তা গহ্বরের বহিঃস্থ কিনারায়। এই পুরু ভরাট পদার্থ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে ৮৫° পূর্ব, উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত একটি ক্রমবর্ধমান শৈলশিরা দ্বারা। এই শৈলশিরার দু'দিকে ৫ কিলোমিটার তলানি রয়েছে। বর্তমানকালে বেঙ্গল ফ্যানের ঘূর্ণিজলের স্রোত

প্রবাহ এই ৮৫° পূর্ব শৈলশিরার পূর্ব দিক দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু অতীতে তা সারা উপবর্ধীপ এলাকা জুড়েই প্রবাহিত হতো। ক্রমাগত পূর্ব দিকে যেতে যেতে তলানি সঞ্চয় কমে আসে ৯০° পূর্ব শৈলশিরা পর্যন্ত। এ শৈলশিরার কোনো বহিঃপ্রকাশ এ দ্রাঘিমাংশে লক্ষ্য করা যায় না, কেবল তীক্ষ্ণ কিছু ক্রমাবনতির ঢালের চিহ্ন ছাড়া যা পূর্ব দিকে সুগভীর হয়ে শেষ হয়। এখানে সবচেয়ে প্রাচীন তলানি হচ্ছে কাম্পোনিয়ন প্রস্তর (Campanian Chert) যা অজীবান্ন ডোলারেনাইট (dolarenite) চার্ট (Chart) ও সিলিকেট ও চক জাতীয় পাথরের নিচে চাপা পড়ে আছে। এগুলোকে মগ্নচূড়-জল (Shallow-water), উপহ্রদ (lagoon) অথবা মহীসোপানীয় তলানি নামে অভিহিত করা হয়। বেঙ্গল ফ্যানের আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সন্নিহিত এলাকায় তলানি অঞ্চলে ভাঁজ উর্ধ্বপ্রবাহ এবং চ্যুতি/স্থলন (faulting) রয়েছে মহীচালের একদম গোড়ায় এবং শৈলশিরার উপরের দিকেও। নব্বই ডিগ্রি পূর্ব শৈলশিরার এক বাহুতে ৩ কিলোমিটার অধঃক্ষেপ রয়েছে যা মহাসাগরীয় ভূ-ত্বক এবং দ্বিতীয় স্তরের উপাদানের ভাঁজের উপরে অবস্থিত। প্রাইওসিন-কোয়ার্টারনামী যুগে বঙ্গোপসাগরের সংযোগের এবং দুটি অসঙ্গতিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা পুরো বঙ্গোপসাগর ধরে জুড়ে আছে তার স্বাক্ষর এই নব্বই ডিগ্রি পূর্ব শৈলশিরাতে দেখতে পাওয়া যাবে। অসঙ্গতি দু'টি হচ্ছে মাইওসিন যুগের শুরুতে এবং ইয়োসিনের গোড়াতে তলানির রূপ, আর অলিগোসিন যুগের অসঙ্গতিটি ধরা যায়নি এখানে। তবে উত্তর বঙ্গোপসাগরে তা ধরা গেছে। মাদ্রাজের পালার বেসিন হচ্ছে ভারত মহাদেশীয় কিনারা পূর্ব দিকে ১৩° অক্ষাংশ থেকে উত্তর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের মহীচাল পর্যন্ত বিস্তৃত। সর্বপ্রাচীন সাগরীয় তলানি এখানে যা পাওয়া গেছে তা হচ্ছে ক্রীটেসাস যুগের শুরুর দিকের, ছুচাল, ধূসর এবং সবুজাভ কামি/জৈব শিলা (Shales) (যা জিপসাম-মৃত্তিকা ও বালি পাথরের সংমিশ্রণে গঠিত), লৌহপ্রস্তর এবং চুনাপাথর ইত্যাদি ধরনের পাথর তলানি পার্মিয়ান গ্যাঙ্গোয়ানা মহাদেশীয় তলানির উপরে অবস্থিত স্তরে রয়েছে। এদেরকে মগ্নচূড়া সমুদ্রীয় উৎসের বলে নামকরণ করা হয়ে থাকে। কিছু তলানির শাখা মহীচাল বেয়ে সমুদ্রের দিকে নেমে যায় যা কেবল গভীর সামুদ্রিক ফ্যানের পশ্চিম কিনারার নিচে জমা হতে থাকে। মহীচালের নিচের দিকে মহাসাগরীয় ভূত্বকের সন্ধান পাওয়া যায়, যা পূর্ব দিকে প্রসারিত অংশে অপেক্ষাকৃত কম বয়সের বলে মনে হয় এবং এখানেও রয়েছে দ্বিতীয় একটি তলানি স্তর যা ক্রীটেসাস যুগের প্রারম্ভে গঠিত হয়েছে। এ তলানিতে রয়েছে স্তরীভূত নিঃসারী (interbedded volcanics) এবং উদভেদী প্রস্তরপাত (Sills), (মহীচালের গোড়াতে)।

নব্বই ডিগ্রি পূর্ব শৈলশিরার উত্তর দিকের অংশ এবং ৮৫° পূর্ব শৈলশিরার মধ্যকার অংশটিতে দু'দিকেই ৮ কিলোমিটার পুরু তলানি জমা আছে বঙ্গোপসাগরের অতলে। বেঙ্গল গভীর সামুদ্রিক ফ্যান সিস্টেমের সক্রিয় ফ্যান উপত্যকা এই দুই শৈলশিরার মাঝেই নিহিত। টারসিয়ারী যুগের প্রথম দিকেই এ স্থলে তলানি জমা শুরু হয়েছিল। নব্বই ডিগ্রি পূর্ব শৈলশিরাটি বঙ্গোপসাগরের গঠনের প্রারম্ভ থেকেই ছিল। ভারত ভূখণ্ড যখন গ্যাঙ্গোয়ানালাও থেকে উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করে তখন একটি উষ্ণ প্রসবন সৃষ্টি

হয়, দ্বিতীয়ত এটি বঙ্গোপসাগরের শিলামণ্ডল বা অশুমণ্ডলের (lithosphere) সঙ্গে জড়িত; এগুলো হচ্ছে নব্বই ডিমি পূর্ব শৈলশিরার বৈশিষ্ট্য। এই শৈলশিরার বিভিন্ন স্তরে যেসব তলানি দেখা যায় তা থেকে বোঝা যায় যে, আসল শৈলশিরার ভূত্বক আরো পূর্বদিকে কোথাও অবস্থিত, যা ভৌগোলিক অতীত সময় থেকেই অবনমিত হচ্ছে। যেহেতু এই শিলামণ্ডলীয় প্রেটিটি সুগভীর টেক্সের বা খাতের দিকেই চলে গেছে দ্রুতহারে, অন্যদিকে শৈলশিরার পশ্চিম পার্শ্বে এই অবনমনের হার খুব কম। আগ্নেয় শিলার দ্বিতীয় একটি স্তর শৈলশিরার ২ কিঃ মিঃ পূর্বে দেখা গেছে।



চিত্র ৫.৮ : বঙ্গাল ফানের সমোন্নতি (contour) চার্ট।

মহাসাগরীয় ভূত্বক বা নব্বই ডিগ্রি পূর্ব শৈলশিয়ার চূড়াটি আন্দামান ও নিকোবর শৈলশিয়ার ঢালুতে নমিত হয়েছে (dips)। এর থেকে উত্তর দিকে গেলে দেখা যাবে বেঙ্গল ফ্যানের পুরু তলানির স্তরগুলোকে তাদের ভাঁজ ও বিচ্যুতিসহ। এখানে রয়েছে বহু উর্ধ্বভাঁজ (anticlines) যা আন্দামান নিকোবর শৈলশিয়ার মহীসোপান পর্যন্ত বিস্তৃত। এসব ভাঁজ প্রতিবন্ধক (Barrier) হিসেবে কাজ করে এবং ঘূর্ণিস্রোত প্রবাহের একটি বেসিনও গঠন করে। গোদাবরী-কঙ্গো বেসিন থেকে শুরু করে 19° উত্তর থেকে পূর্বদিকে বার্মার রেঙ্গুন ও বাসেইন নগরীর পশ্চিম দিকে মহাদেশীয় সীমারেখা পর্যন্ত উপসাগরের তলায় মধ্য জুরাসিক যুগের আধা লবণাক্ত বালি পাথর (brackish sandstones) তলানি রয়েছে, যার উপরে নিওকমানিয়ান উপদ্বীপের কর্দম শিলা এবং বারেমীয়ান সামুদ্রিক অগ্রগতির বালি প্রস্তর (marine transgressive sandstone) বিরাজমান। এখানেও পূর্বের মতো মহীঢাল থেকে উদ্ভূত স্তর বেঙ্গল ফ্যান তলানির নিচে ঢালের ঠিক পাদদেশেই সঞ্চিত হয়েছে। এ এলাকায় 85° ও 90° পূর্ব শৈলশিরা তত বিকশিত নয়, এখানে ৭.৫ কিলোমিটার তলানি সঞ্চিত আছে। নব্বই-পূর্ব শৈলশিরা এখানেও বেশি করে অবনমিত আছে এবং পূর্ব দিকে কাত হয়ে রয়েছে। বঙ্গোপসাগরের পূর্ব সীমানায় অবস্থিত এ এলাকার গঠনপ্রণালী বেশ জটিল। উত্তম স্তরায়িত পদার্থ পূর্ব দিকে বিস্তৃত এবং এখানেই বৃহৎ পরিমাণে ওলিষ্টোস্ট্রোমে (olistostrome) দেখা যায়। এ এছাড়া অগ্নেয়গিরির কর্দমা বা কর্দম শিলাও লক্ষ্য করা গেছে। অগ্নেয়গিরির কর্দমা মাটি পশ্চিম বার্মার উপকূলভাগে বহুকাল থেকেই দেখা গেছে।

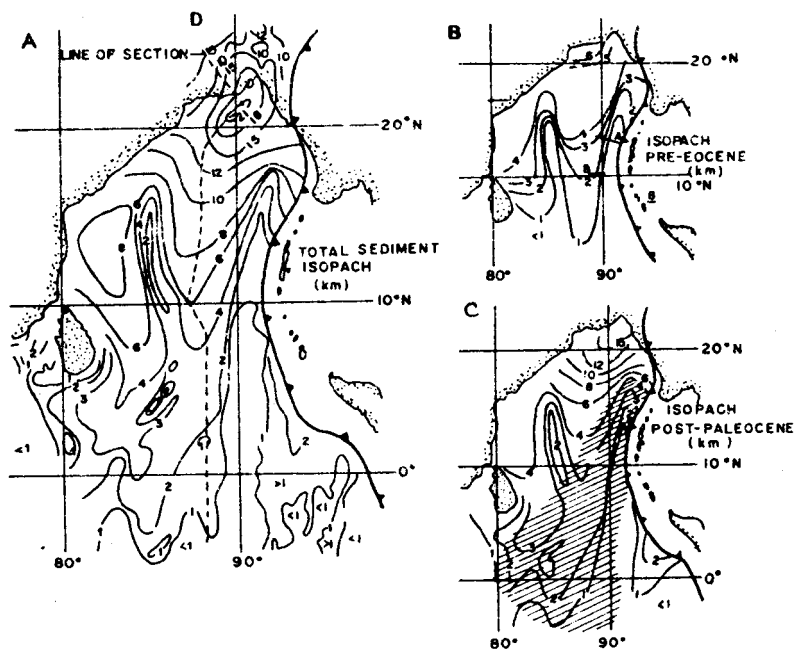
বাংলাদেশ মহাদেশীয় সোপানে বা মহীসোপানে অবস্থিত ভূকম্পনীয় প্রতিসরণ স্টেশন থেকে গৃহীত উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে অঞ্চলটি আয়তনে বেশ বড় এবং এখানে রয়েছে তলানীর উঁচু পুরুত্ব। বেঙ্গল ফ্যান এবং বেঙ্গল গভীর সামুদ্রিক ফ্যানের সম্মিলিত অঞ্চল এটি যা দৈর্ঘ্যে ৪০০০ কিঃমিঃ, এখানে সর্বোচ্চ তলানি উচ্চতা হচ্ছে ১৬ কিঃ মিঃ বা ১০ মাইল। এর তলাকার ভূত্বকের গঠন অনির্ণীত অবস্থায় রয়েছে। অতলম্পর্শী মহাখাদের পূর্বদিকে অবস্থিত ভূকম্পনীয় লাইনটি অবস্থিত। এখানে মহাসাগরীয় দ্বিতীয় স্তর এই তলানি স্তরের নিচে অবস্থিত। দক্ষিণ দিকে ক্রমাগতসরমান বেঙ্গল গভীর সামুদ্রিক ফ্যানের সীমানা 9° দক্ষিণ পর্যন্ত প্রসারিত। বাংলাদেশ উপকূলের ভূতাত্ত্বিক গঠনের নতুন নতুন উপাত্ত তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান প্রোগ্রামের অধীনে পাওয়া গেছে যা অপ্রকাশিত রয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য সহজলভ্য নয়। বেঙ্গল ডীপ-সী-ফানে রয়েছে অনিয়মিত তলদেশের উপরিস্তর যা হয়ত প্যালিওসিন-য়োসিন (Paleocene-eocene) এবং মাইওসিন গোড়ার (upper miocene) দিককার সংঘর্ষ রেখা। বেঙ্গল মহীখাতে মোট তলানি পুরুত্বের সমবেধ রেখার (Isopachs) ১টি হচ্ছে প্রাক ইয়োসিন (Pre-Eocene) যুগের তলানি অপরটি পোস্ট প্যালিয়সিন (Post Paleocene) যুগের তলানি। প্রফেসর কারীর (১৯৭৪) Deep Sea Drilling Project (DSDP)-এর অনুসন্ধান কাজের সময় তা জানা গেছে। বঙ্গোপসাগরের উত্তর দিক থেকে শুরু করে বেঙ্গল বেসিন এবং আসাম উপত্যকার দিকে গেলে উপসাগরের

১০ কিলোমিটার পুরু তলানির চাইতেও বেশি পরিমাণ পুরু তলানির সন্ধান মেলে। এ স্থলে মহীখাতের তলানি মহীসোপানের চাইতে বেশি হয়। এ ক্ষেত্রের দু'টি সমবেধ (isopach) ম্যাপ থেকে জানা যায়, 'প্রি-ফ্যান' কালে ভারত মহাদেশীয় ঢালের সমান্তরালে মহাদেশীয় উত্থান ধরনের তলানি জমা হয়েছিল বিপুল পরিমাণে এবং এটা হয়েছিল এশিয়া ভূখণ্ডের সঙ্গে ভারতের সংঘর্ষের আগে। আর সংঘর্ষের পরে যখন প্রথম বারের মত বঙ্গোপসাগর তার রূপ পরিগ্রহণ করা শুরু করে, তখনই বেঙ্গল গভীর সামুদ্রিক ফ্যানও স্বীয় গঠন রূপ শুরু করে। ভূ-বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন যে, ৯০° পূর্ব শৈলশিরা ও রাজমহলের ট্রোপে বা শিলা সোপানের সঙ্গে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত কেরগুলেন উষ্ণ কেন্দ্রের ক্ষারীয় আগ্নেয়শিলার মিল অপূর্ব। সাড়ে দশ কোটি বৎসর আগে থেকে ১৩ কোটি বৎসর পর্যন্ত সময়ে এই রাজমহল ট্রোপ গঠিত হয়েছিল বর্তমানে যা আরাকান ইয়োমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সময়ের মধ্যে ১৫০০ কিঃ মিঃ নতুন ভারত মহাসাগর তৈরি হয়েছে এবং ২৫০০ কিঃ মিঃ নতুন মহাসাগরীয় ভূত্বক বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ১০ লক্ষ বৎসরে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র নদীবাহিত পলিমাটির অধিকাংশটুকুই ব্যয় হয়েছে বাংলা উপদ্বীপ ও উপকূলভাগ উন্নত করার কাজে, বাকি সামান্য অংশ শুধু বেঙ্গল ফ্যানে প্রবেশ করেছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার লা-জোলাস্থিত 'স্ক্রিপস ইনস্টিটিউশন অফ ওসেনোগ্রাফি'র বঙ্গোপসাগর বিষয়ক বিশেষজ্ঞ প্রফেসর জোসেফ কারে ১৯৯১ সনের আগস্ট মাসে বক্ষ্যমান নিবন্ধকারের সঙ্গে পত্রালাপে জানান যে, ১৯৭৪—১৯৮৫ সনে করা বেঙ্গল ফ্যানে অবক্ষিপের মাত্রার মূল্যায়ন তিনি বর্তমানে আরও নতুন উপাত্ত পাবার পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্মূল্যায়ন করেছেন এবং এ সম্পর্কিত তাঁর একটি প্রবন্ধের স্যাঁলে কপি লেখককে পাঠান। এটা হচ্ছে "Possible greenschist metamorphism at the base of a 22 Km sediment section, Bay of Bengal", In Press, GEOLOGY, revised 18 July 1991. এখানে পূর্বে আলোচিত প্রফেসর কারের তথ্যাবলীর পূর্বব্যাখ্যা (reintepretation) করা হলো তাঁর সাম্প্রতিক পূর্ণ মূল্যায়ন অবলম্বনে।

ইদানীংকালে পাওয়া বঙ্গোপসাগরের ভূকম্পীয় প্রতিসরণ এবং প্রতিফলনীয় উপাত্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ মহীখাতের নিচে ২২ কিলোমিটার পুরু অবক্ষিপের স্তর রয়েছে। নিম্ন ইওসিন যুগের অসম স্তরের সংশোধিত পারস্পর্য বা পারস্পরিক সম্বন্ধ (Correlation) (ভারত-এশিয়া সংঘর্ষের সময়) এই অংশকে ক্রিটেসাস এবং প্যালিওসিন যুগে ভারতের মহাদেশীয় উত্থানের দরুন ৬ কিলোমিটার পুরু স্তরকে আরও ১৬ কিলোমিটার বেঙ্গল ফ্যান-এর অবক্ষিপ ও পাথর দ্বারা আবৃত করেছে। এই অতিরিক্ত অবক্ষিপ এসেছে মূলত সংঘর্ষণের ফলে এ অঞ্চল যে উত্তীর্ণ হয় তারই ফলে ভূখণ্ডের ক্ষয়জনিত পাওয়া মাল মশলা থেকে। খুবই গভীরে নিহিত মহাদেশীয় উত্থানের স্তরে চাপ ও তাপমাত্রার অবস্থা সবুজ সিস্টপর্বের (Green Schist) বিভিন্ন রূপের (facies) রূপান্তরের ক্ষেত্রে রয়ে গেছে। এসব ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত মেটা-অবক্ষিপীয় পাথরের গতি ও ঘনত্ব, প্রতিসরণীয় উপাত্ত এবং ভারসাম্যবাদীয় (isostatic) হিসাবের

সঙ্গে মিলে যায়। ১৯৮২ সালে প্রফেসর কাবে (Curry) হিসেব কষে ১৬ কিলোমিটার পুরো অবক্ষেপ পেয়েছিলেন। পরে Brune and Singh (1986) খেয়াল করলেন যে, বঙ্গোপসাগরের রেলিই (Rayleigh) এবং লাভ (Love) টেউগুলো ভারতের ভূকম্পীয় স্টেশনগুলোর দিকে আসারকালে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে তারা এর কারণ হিসেবে সন্দেহ করেন, যে অবক্ষেপের স্তরের নিচে ভূত্বক অবস্থিত তার দূরত্ব ২৫—৩৫ কিলোমিটার হবে। Brune and Priestly (1989) একধাপ এগিয়ে গিয়ে অনুমান করেন যে, এই গভীর অবক্ষেপের নিচে তাপমাত্রা ও চাপের বলয়ই অবনমীয় প্লেটের অস্বাভাবিক গঠনের কারণ। পরবর্তী কালে ব্রানে লক্ষ্য করেন যে, S_n টেউ (উঁচু মাত্রার স্পর্শক বা পীড়ন) (Shean) টেউয়ের দশা (বঙ্গোপসাগর অতিক্রমকালে নিচু বারে শক্তি হ্রাস পায়। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে এই পুরু অবক্ষেপ তলের নিচে উপর আচ্ছাদনটি (mantle) গরম নয়। এইসব নতুন গবেষণালব্ধ তথ্য জানার পর কারে তাঁর দেড় দশক ধরে করা হিসেবের পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। আগের পাওয়া অসম স্তর (unconformity) আরো নিচে যাবে। বর্তমান সিদ্ধান্তের আলোকে বঙ্গোপসাগরের ঘোলাটে অংশটিকে দুই অংশে বিভক্ত করা যায়, যথা : (১) প্রাক সংঘর্ষ বিভাগ, যা ভারতের চতুর্দিকে মহাদেশীয় উত্থানের জন্য ঘটেছিল এবং (২) সংঘর্ষ পরবর্তী বিভাগ, এটা শুধুই বেঙ্গল ফ্যানের জন্য প্রযোজ্য। এটির উৎস সাগরের উত্তরাংশে।



চিত্র ৫.৯ : বঙ্গোপসাগরের মোট অবক্ষেপ গুরুত্বের সমাবেশ চিত্র।

Emmel-Curray (1981) তাঁদের Dynamic events near the upper and mid-fan boundary of the Bengal Fan' প্রবন্ধে লিখেন যে, বঙ্গোপসাগরের অতলস্পর্শী মহীখাদের খাল ধরে 0.5° ডিগ্রি দক্ষিণে অগ্রসর হলে দেখা যায় (এখানেই উচ্চ থেকে মধ্য ফ্যানের শুরু হয়) যে, খালের একটি পাড় (Levee) ভাঙ্গা যেটা সম্ভবত শেষ বরফ যুগের সময়ে সংঘটিত হয়েছিল। পাড় ভাঙ্গার ফলে ঘন স্রোতের একটি অংশ উত্তর-পশ্চিম দিকে বেঙ্গল ফ্যানের নিচু এলাকাতে চলে গেছে। সক্রিয় উপত্যকায় ভ্রাসকৃত প্রবাহের দরুন এর ভূগাঠনিক চেহারা বদলে গেছে। তাছাড়া উঁচু ফ্যান উপত্যকা নিচু ছোট মধ্যমজাতের উপত্যকায় পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে উঁচু ও নিচু ফ্যানের সীমারেখাও বদলে গেছে। ঘোলাটে স্রোতের দ্বারাই পাড় ভাঙ্গার কাজটি হয়েছে। উপরোক্ত গবেষকদ্বয় অন্য এক তথ্য দেন যে, নিম্ন বেঙ্গল ফানে প্রণালীহরণ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে শ্রীলংকার ঠিক পূর্ব দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে। পশ্চিম শাখার এবং ভারতীয় উপত্যকার মধ্যে প্রবাহিত সক্রিয় উপত্যকা আড়াআড়িভাবে তাদের প্রবাহকে হরণ করে নিয়েছে।

বঙ্গোপসাগরের তলদেশে জলবিদ্যাগত বিশেষত্ব (Hydrography of the bottom of the Bay of Bengal)

উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত সুমাত্রা, নিকোবর ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিম ধার বরাবর ইন্দোনেশীয় খাত নামক সমুদ্র তলদেশের গভীর খাতে (Canyon) বা ফাটল যার সর্বোচ্চ গভীরতা ৪৫০০ মিটার পর্যন্ত। এই ইন্দোনেশীয় খাতের উত্তরের অপেক্ষকৃত অগভীর অংশ বা কল্পবাজার-চট্টগ্রাম উপকূল বরাবর মোটামুটি দক্ষিণ পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত বার্মা ট্রেঞ্চ নামে পরিচিত। বঙ্গোপসাগরের ফ্যানের পৃষ্ঠদেশকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় : উপরের ফ্যান, এখানে উপত্যকার অবনমনের হার ২.৩৯ মিটার প্রতি কিঃ মিঃ এবং ফ্যানের অবনতি হচ্ছে ৫.৭ মিঃ/কিঃ মিঃ; মধ্য ফানে উপত্যকার অবনতি হচ্ছে গড়ে ১.৬৮ মিটার/কিঃ মিঃ এবং নিম্ন ফ্যান, যেখানে কিলোমিটার প্রতি ১ মিটার অবনমন হয়। ২২৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত উর্ধ্ব ফ্যানের এবং ২৯০০ মিটার পর্যন্ত নিম্ন ফ্যানের সীমানা। বেঙ্গল ফানে ৩ ধরনের উপত্যকা রয়েছে, ১ম টি সরাসরি মহাখাদের সঙ্গে যুক্ত, ৫০ কিঃ মিঃ প্রশস্ত এবং ১০০ মিঃ গভীর।

এছাড়া মহাদেশীয় সোপানের অগভীর উপকূলভাগের মাঝামাঝি উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত 'অতলস্পর্শী খাদ' রয়েছে। Swatch of no Ground নামে বিখ্যাত একটি ভূতাত্ত্বিক ফাটল, এটির দু'পাশ বেশ খাঁড়া, কিন্তু তলদেশ বেশ সমতল। ৭০০ ফাদম সমগভীর রেখায় এর প্রস্থ ১২ কিলোমিটার। এটি উড়িষ্যা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু এবং সিংহলের পূর্ব উপকূল ঘেঁষে ভারত মহাসাগরের গভীরতর ভূতাত্ত্বিক ফাটলগুলোর সাথে মিশে গেছে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদী প্রবাহের সাথে পলি মাটির এক বিরাট অংশ কয়েক বছর পরপর এই গভীর নদী সদৃশ খাত দিয়ে শক্তিশালী কর্দমস্রোতের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের অনেক দক্ষিণে সিংহল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

এ গভীর অন্তঃপ্রবাহের দুপাশে বদ্বীপের নদীর পলি মাটিতে সৃষ্ট উঁচু পাড় (Natural Levee) দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়াও ভারতের অঙ্ক উপকূলে ১৯৬৩ সালে আবিষ্কৃত অঙ্ক, মহাদেবান ও কুম্ভা খাদ বা Canyon গুলোর আকৃতি ৭০০ ফ্যাদম সমগভীর রেখায় “ভি” (V) অক্ষরের মতো। ‘ইন্দোনেশীয়-বার্মা ট্রেঞ্চ এবং অতলস্পর্শী মহাখাদ’ এ দুটি ভূতাত্ত্বিক বিশেষত্ব আরো উত্তরে বিস্তৃত হয়ে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গকে মোটামুটিভাবে উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তৃত অনেকগুলো ফাটলে ভাগ করে ফেলেছে। এই ফাটল বা (Fault) গুলোর ভেতর দিয়েই ভাগিরথী, গঙ্গা, যমুনা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, সুরমা, কুশিয়ারা, করতোয়া, পুনর্ভবা, আত্রাই, ধলেশ্বরী ও অন্যান্য নদীগুলোর জল প্রবাহিত হচ্ছে। বস্তুত বঙ্গোপসাগরের ধীর বিস্তৃতির সাথে সাথে এই ফাটলগুলোর পরিবর্তন ঘটে এবং এর ফল হিসেবে শাখা নদীগুলোর মুখে বালির চরের বিস্তার ঘটে। অবশেষে নদীগুলোরও গতি এক খাত থেকে অন্যখাতে পরিবর্তিত হয়। যেমনটি হয়েছে প্রায় দেড়শ’ বছর আগে তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর। তাছাড়া কক্সবাজারের উপকূল বরাবর কুতুবদিয়া, মাতার বাড়ি ও মহেশখালী দ্বীপগুলো আসলে পূর্বোক্ত ‘বার্মা ট্রেঞ্চের’ প্রভাবে উপকূলীয় পর্বত-শ্রেণী থেকে খসে আসা অংশ মাত্র। বার্মার আকিয়ারের উপকূলে অগণিত দ্বীপের সৃষ্টিও একই কারণে। পূর্ব-প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের সাম্প্রতিক বিস্তৃতির কারণে সৃষ্ট বক্র চাপের (Bending Moment) জন্য চট্টগ্রাম-ত্রিপুরার উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পর্বতশ্রেণীতে গোমতী, ফেনী, কর্ণফুলী, শঙ্খ ও মাতামুহুরী নদী প্রবাহের মতো পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত অস্বাভাবিক ফাটলগুলো সৃষ্টি হয়েছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে বসন্তকালের পর থেকেই বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্ব কোণের জলের উচ্চতা বাড়তে থাকে যার ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের জলের উচ্চতা কমে যায় এবং সেখানে স্বাভাবিক নিয়মে গভীরতর অংশ থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি রাসায়নিক পদার্থ সমৃদ্ধ জলের উর্ধ্বগমন হয়। আর শরৎকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর আগমনের সাথে সাথে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের জলের উচ্চতা কমে যায় এবং বার্মা ট্রেঞ্চের ও অতলস্পর্শ খাদের উত্তর পার্শ্বে জলের উর্ধ্বগমন হয়। তাই সুন্দরবনের দক্ষিণে দুবতলার টেঞ্চের কাছে এবং কক্সবাজারের কাছে সোনাদিয়া দ্বীপে শীতকালে প্রাক্কটন সমৃদ্ধ জলে প্রচুর সামুদ্রিক মাছ ধরা পড়ে। বঙ্গোপসাগরের অন্যান্য অংশের জলে অত প্রাক্কটন জন্মাবার জৈবরাসায়নিক কারণ না থাকায় সেসব জায়গায় সামুদ্রিক মাছ অনেক কম পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরে জলের উচ্চতার তারতম্য চট্টগ্রামে ১.৩ মিটার এবং মদ্রাজ উপকূলে ১.৫ মিটার। ঋতুগত জলের উচ্চতার এমন তারতম্য পৃথিবীর আর কোথাও নেই। ফানেলের মত আকৃতি ও উত্তরাংশের গভীরতা ক্রমশ কমে আসার পরিপ্রেক্ষিতে এখানকার জোয়ারভাটার বিশেষ উচ্চতার তফাৎ (Range of tide), জলরাশির দোলন (Seiche) এবং উপর ও নিচের জলের ঘনত্বের পার্থক্যের জন্য “ঘনত্ব স্রোত” (Density Current) বা অন্তঃসলীলা ঢেউ (internal waves) পরিলক্ষিত হয়। সমুদ্রের ঢেউ চক্রাকারে উপকূলে আঘাত হানলে ঢেউশক্তির উপকূলের সমান্তরাল প্রবাহ যে স্রোতের সৃষ্টি করে তাকে বলা হয়

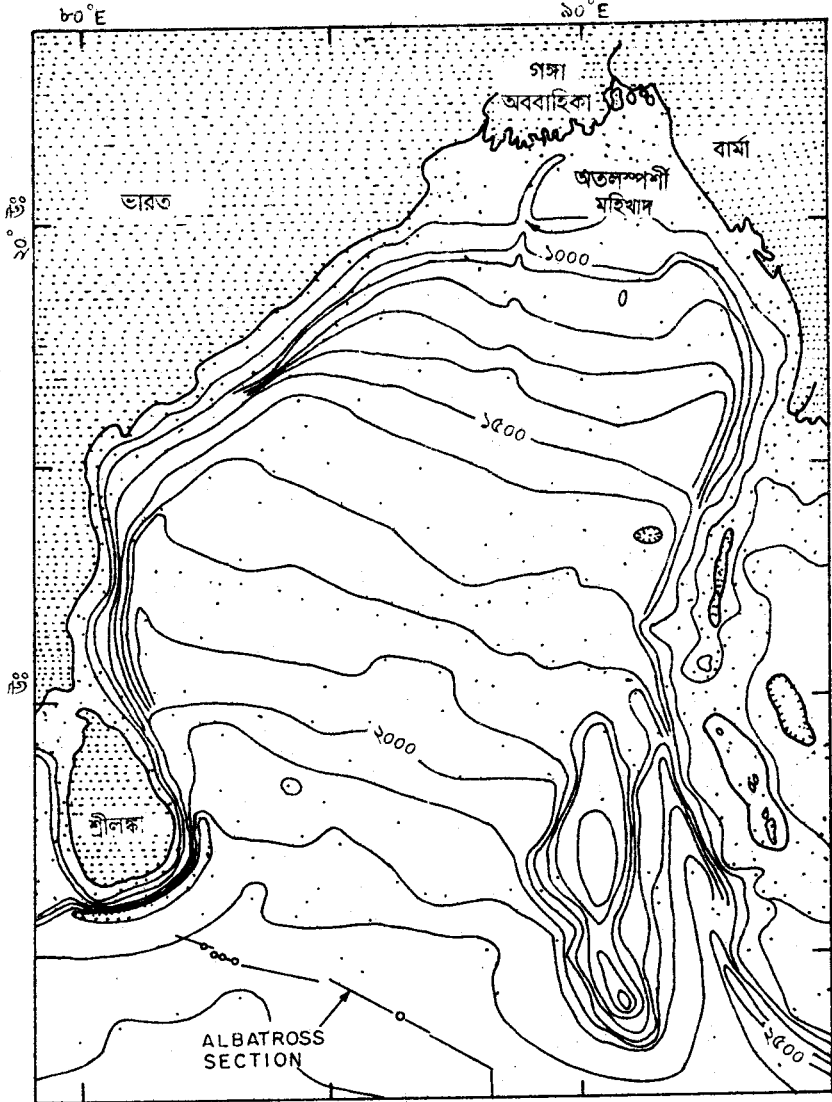
উপকূলবর্তী স্রোত (Littoral Drift)। পলিমাটি বহনকারী নদীগুলো যেখানে সমুদ্রে মেশে সেখান থেকে এই স্রোত বালি সংগ্রহ করে ও যেখানে স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হয় সেখানে বালি জমে উঠে। বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম উপকূলের ধার দিয়ে মাদ্রাজের দক্ষিণ সীমা থেকে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় সমুদ্রোপকূল আর বঙ্গোপসাগরের পূর্বাংশে টেকনাফ থেকে কক্সবাজার অবধি এই উপকূলবর্তী স্রোত দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। এর ফলে বঙ্গোপসাগরের উল্লিখিত দুই প্রান্তের উপকূলে সৃষ্টি হয়েছে নিম্নত বেলাভূমির ও চিহ্না হ্রদের মত অগভীর জলরাশির। মাদ্রাজ বন্দরের ব্রেক ওয়াটারের ফলে যেমন এই ব্রেকওয়াটারের দক্ষিণে জমে উঠেছে প্রচুর বালি আবার এই বন্দরের উত্তর পার্শ্বে বালির অভাবে এই স্রোত তার ক্ষুধা মেটাবার জন্য ভেঙ্গে নিচ্ছে উপকূলভাগ। বিসাখাপত্তম ও চট্টগ্রাম বন্দরের মুখে অগভীর বালির ভূবোচর সৃষ্টির সাথেও এই স্রোতের সম্পর্ক রয়েছে। সেজন্য পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের বন্দর উন্নয়নের ব্যাপারে এই উপকূলবর্তী স্রোত সম্পর্কে সৃষ্ট জ্ঞান দরকার। তবে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ঠিক দক্ষিণ অংশে সামুদ্রিক ডেউ সমান্তরালভাবে সাধারণত আঘাত হানে এবং সেজন্য এই অঞ্চলে এই উপকূলবর্তী স্রোতের অস্তিত্ব নেই। এ অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন বালুকাবেলার সৃষ্টি যেমন পশর নদীর পূর্ব পার্শ্বে দূবলা দ্বীপে বা পটুয়াখালি জেলার কুয়াকাটায় সামুদ্রিক ডেউয়ের প্রাতিসরণের ফলে হয়েছে বলে মনে করা হয়। অধ্যাপক জোশেফ কারী (১৯৯১) তার সর্বশেষ নিবন্ধে জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশ মহীসোপানের নিচে ২২ কিলোমিটার পুরু তলানি স্তর রয়েছে। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত মার্কিন বিজ্ঞানীরা তাদের প্রাপ্ত ফলাফল ১৯৬০—৬৫ সনে পরিচালিত RCE এবং তারপরে ১৯৬৮, ১৯৭১, ১৯৭৩, ১৯৭৭ সনের ভূতাত্ত্বিক উপাত্তগুলোর বিশ্লেষণ করেছেন। এখন শুধু দরকার সেতিয়েত বিজ্ঞানী, ভারতীয় বিজ্ঞানী ও মার্কিনী বিজ্ঞানীদের লব্ধ ফলাফলগুলো বিশ্লেষণ করে একটি সর্বসম্মত ঐকমত্য সিদ্ধান্তে পৌছানো।

বঙ্গোপসাগর ও বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের সমুদ্রতলে একটি বৈচিত্র্য অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক। (চিত্র দৃষ্টব্য)। গঙ্গার মহীখাত বঙ্গোপসাগরের তল বরাবর অসংখ্য শাখা নদীতে যেন বিভক্ত হয়ে এই দক্ষিণাঞ্চলের মহাসাগরীয় সমভূমিতে এসে শেষ হয়েছে। সুন্দরবন ও কলকাতায় মাঝে মধ্যে যেসব ভূকম্পনের উৎপত্তি ঘটে, অনেকের ধারণা গঙ্গার এই মহীখাতে সঞ্চিত পললে ধস নামাই (Stump) তার কারণ। দু'তিন লক্ষ বছর আগেও গঙ্গার নদীখাতের চেহারা আজকের মতো সুস্পষ্ট ছিল কি না সন্দেহ। হিমালয়ে গঙ্গার উৎপত্তি, আর স্বয়ং হিমালয়ের উত্থান পাঁচ ছয় কোটি বছর আগে। এ থেকে অনুমান করতে হয় যে, বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগরের অর্ধেকটা জুড়ে যে নদীখাত পাওয়া যায়, সম্ভবত তা গঙ্গার পূর্ববর্তী কোনো নদীর মহীখাত। নদীখাত কত সুপ্রাচীন এ থেকে বোঝা যাবে না। প্রসঙ্গত দামোদর ও মহানদী এই নদী দুটিই তরুণ অবস্থায় ছিল প্রায় আঠার থেকে বাইশ কোটি বছর আগে। ওদিকে চ্যাতোজলাক্ষা দ্বীপ মালভূমি এবং নব্বই ডিগ্রি পূর্ব শৈলশিরা, দুটিই মহাসাগরীয় ভূত্বকে ফাটল দিয়ে উৎপন্ন লাভায় তৈরি।

আগেই বলা হয়েছে সিয়াল (Silicon = Aluminium = SiAl) বা সিম (Silicon + Magnesium = SiMa) এর ভিত্তিতে ভূভাগীয় ও মহাসাগরীয় ভূপৃষ্ঠকে আলাদা করা যায়। তার ভিত্তিতে শীলংকার দক্ষিণে যে নিরক্ষীয় সমভূমি রয়েছে তা অবশ্যই মহাসাগরীয় ভূপৃষ্ঠ, কারণ তা সিমায় তৈরি। কিন্তু ওখানের বৈশিষ্ট্য হলো, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি বন্ধুরতাবিহীন সমভূমি। এ ধরনের সমভূমি শুধু ভূভাগীয় ভূপৃষ্ঠে সমভূমিকরণ (Peneplanation) প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হতে পারে। অঞ্চলটি হয়ত প্রকৃত সিম বা সিয়াল ও সিমার অন্তর্বর্তী ঘনত্বের অ্যাঙ্গেসাইট জাতীয় শিলায় তৈরি। অনেকে সাগরতলের এ ধরনের সিয়ালীয় ভূপৃষ্ঠকে অনুভূভাগ বা microcontinent আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং আলোচ্য সমভূমিটিও অনুভূভাগ হতে পারে এবং সাময়িকভাবে তা গভীর সমুদ্র তলে থাকতে পারে। বরং যেটা হতে পারে তা অনেকটা এরকম-বঙ্গোপসাগর থেকে এই সমভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত মহীখাতগুলো আসলে এই সমভূমি থেকে উত্তরে প্রবাহিত কতকগুলো নদীর খাত (চিত্র দ্রষ্টব্য)। দক্ষিণাঞ্চলের (১০° অক্ষাংশ) শাখা খাতগুলো অতীতে উপনদী ছিল, উত্তরে এগিয়ে একটি মূলখাতে পরিণত হয়েছিল এবং গিয়ে পড়েছিল বঙ্গোপসাগরের উত্তর তটরেখা ছাড়িয়ে উত্তর-পূর্ব কোনো সাগরে। এই সাগরে সঞ্চিত পলল বর্তমানে নাগা-পাটকোই শ্রেণীরূপে আসাম ভূখণ্ড ও ব্রহ্ম দেশের মাঝে রয়েছে। লক্ষণীয় যে, দামোদর ও মহানদী অনেক প্রাচীনতম নদী হলেও তা অনুরূপ মহীখাত বঙ্গোপসাগর গর্ভে সৃষ্টি করেনি, আলোচ্য মহীখাত সৃষ্টির কারণ গঙ্গার প্রবাহ এ কথা মনে করা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রচলিত ধারণা যে গঙ্গার মোহনায় পলল সমৃদ্ধ জলে বেগবান প্রবাহে এই খাতগুলো ঘন জলের স্রোতের ফলে উৎপন্ন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই খাতগুলো প্রকৃত মোহনা ছাড়িয়ে প্রায় ৩০০০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত দক্ষিণে প্রসারিত। এ যুগের সবচেয়ে প্রশস্ত নদীপ্রবাহ আমাজনেও সাগরগর্ভে কাটা মহীখাত এত দূর পর্যন্ত প্রসারিত নয়। আমাজন নদীর প্রাচীনত্ব ও গঙ্গার চেয়ে অনেক বেশি।

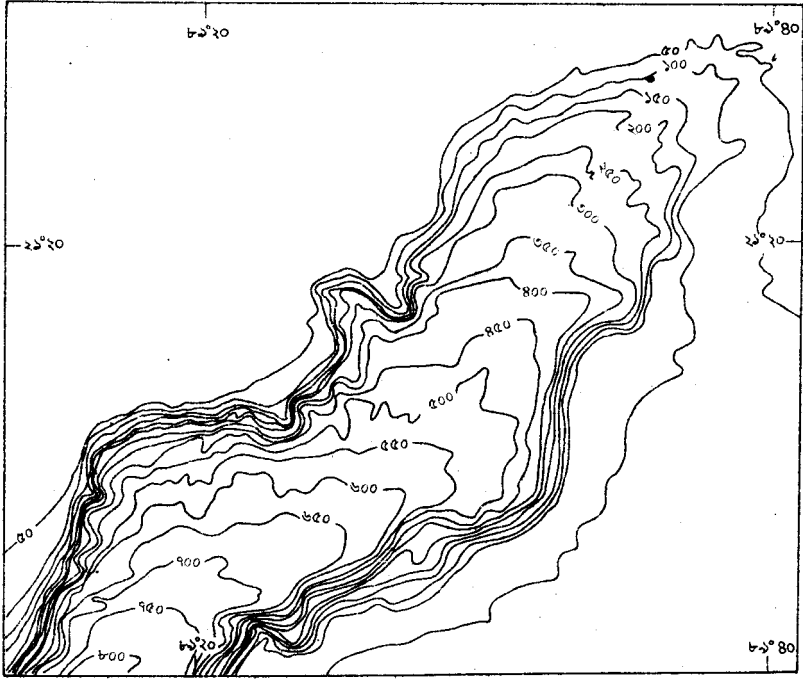
বঙ্গোপসাগরের অতলস্পর্শী মহীখাদ (Swatch of no Grounds) : নিমগ্ন মহাগহ্বর (Swatch of no Ground) হচ্ছে বালি তীরের মধ্যবর্তী নালী দিয়ে বয়ে যাওয়া জলপ্রবাহ। সাগরতলের আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে ৫ মাইল দূরত্বের ব্যবধানে ২০৪ ফুট হতে ১৩৮০ ফুট (৩৪—২৩০ ফাদম) গভীরতায় সৃষ্ট গর্তকে বলা হয় নিমগ্ন মহাগহ্বর। একে আবার গভীর খাতও বলা হয়। নিম্ন মহাগহ্বরের রয়েছে V-আকৃতির আড়াআড়ি পার্শ্বচিত্র এবং উপ-প্রণালী। অধিকাংশ মহীখাত ভূখণ্ডের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীপথের সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে প্রবাহিত। নিমগ্ন মহাগহ্বর গঠনে সামুদ্রিক স্রোতের ঘূর্ণন প্রক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপর নিমগ্ন গহ্বর থেকেও স্রোতের ঘূর্ণন প্রক্রিয়া উদ্ভূত হয় এবং তা ভূপৃষ্ঠের গঠন নিয়ন্ত্রণ করে। বঙ্গভূমি হতে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র বাহিত তলানিসমূহ স্রোতের ঘূর্ণন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিমগ্ন মহাগহ্বরের প্রভাবে গভীর সমুদ্রে নীত হয়। বাংলাদেশের সমুদ্রতলের ঢাল ধীরে ধীরে বাড়ে কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য সমুদ্রতলের ঢাল অপেক্ষাকৃত হঠাৎ করে বাড়ে। পৃথিবীর অন্যান্য খাদের মতো 'ভি' আকৃতির না হয়ে এটি কেন 'ইউ' আকৃতির হয়েছে এটাই রহস্যময়।

প্রাচীনকালে রশির সাহায্যে এই অংশের পানির গভীরতা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি বলেই অনুসন্ধানকারীরা এর নামকরণ করেন তলবিহীন খাদ বা অতলম্পর্শ। ইংরেজরা ১৮৮৫ সালে এর অবস্থান সম্পর্কে প্রথম অবগত হন। ডেনমার্কের গভীর সমুদ্র



চিত্র ৫.১০ : বঙ্গোপসাগরের অতলম্পর্শী মহিখাদ

অনুসন্ধানকারী জাহাজ HMS গ্যালাসিয়া ১৯৫০—১৯৫২ সাল পর্যন্ত অতলম্পর্শ এলাকায় জরিপ পরিচালনা করে (Killerich 1958)। লায়ড (১৯৫৭) দেখতে পান যে এ মহীখাদটি ৮ নটিকেল মাইল প্রশস্ত এবং প্রায় ১২৮০ মিটার (৭০০ ফাদম) গভীর (চিত্র-৫.১০)। এ খাদ মহীসোপানের সমতল অংশকে ৬ থেকে ৭৩১ মিটার গভীরে কেটে ভাগ করেছে। এখানে ২৪১.৫ অনুপাতে খাদ দেখা যায়। তবে তলদেশ মোটামুটি সমান। অনেক দূর পর্যন্ত প্রশস্ততা একই রকমের। এরপর আরও ১১ কিলোমিটার দক্ষিণে গভীরতা ১০০ ফাদম।



চিত্র ৫.১১ : অতলম্পর্শী মহীখাদের সমোন্নতি (গভীরতা মাপক) চার্ট।

অতলম্পর্শী মহীখাদের কাঠামোগত বিবরণ : সুন্দরবনের অদূরে মহীসোপান এলাকাকে দ্বিখণ্ডিত করে সাগরতলায় সৃষ্টি হয়েছে এই গভীর মহীখাদ। দুবলা দ্বীপ থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত এটি। সমুদ্রের গভীরের দিকে প্রায় ২০০০ কিলোমিটার বা ১২৪০ মাইল পর্যন্ত এটি বিস্তৃত। উত্তর প্রান্তে মাথার দিকে মহীখাদের গভীরতা প্রায় ১৮—৫৪ মিটার এবং মহীসোপানকে কর্তন করেছে প্রায় ৯০০ মিটার (৩০০০ ফুট)। এর পার্শ্বচাল অত্যন্ত খাড়া। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপের দক্ষিণ দিকের অগভীর মহীসোপান (উপকূল থেকে মাত্র সাড়ে নয় কিলোমিটার দক্ষিণে) হতে আরম্ভ হয়ে মহীচালকে অতিক্রম করে এটি গভীর সমুদ্রে মিলে গিয়েছে। এ ক্যানিয়নের

তলদেশ অপেক্ষাকৃত সমতল এবং ১০—১২ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রশস্ত। নদীবাহিত পলির বৃহদাংশই এ খাদ দিয়ে গভীর সমুদ্রের দিকে চলে যায়, তাই বঙ্গোপসাগরের উপকূলে বদ্বীপের পরিবর্ধন ও নতুন চর অঞ্চলের সংযোজন তেমন লক্ষণীয় নয়। ভূকম্পনীয় তরঙ্গ চিত্র থেকে আভাস পাওয়া গেছে এ খাদে বিপুল পরিমাণে পলি সঞ্চয়ের।

বাংলাদেশের মূল ভূখন্ডের কাছাকাছি উপকূলভাগে সুন্দরবন থেকে টেকনাফ পর্যন্ত পানির গভীরতা ১০ মিটার দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এর পরেই ২০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত একটি স্পষ্ট সোপান তৈরি করে মেঘনা অববাহিকা থেকে মাতামুহুরী অববাহিকা পর্যন্ত ক্রমশ ৫০ থেকে ১০০ এবং এরপরে ২০০ মিটার গভীরতা দেখা যায় যা প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। এখান থেকে মোটামুটি ৮ কিলোমিটার দূরত্বের ব্যবধানে পানির গভীরতা ৭০ মিটার থেকে ৫৫০ মিটারে উন্নীত হয়েছে। অতলস্পর্শের কয়েকটি শাখা বিস্তৃত রয়েছে। মূল ভূখণ্ড থেকে সমুদ্রের দিকে এসব সংযোগ খাদ পশুর নদী ও দুবলা দ্বীপকে ঘিরে অবস্থিত। সাগরমুখী পশুর নদী এবং দুবলা দ্বীপের মাঝখানে নিমগ্ন মহাগহ্বরের অনেকগুলো শাখানদী রয়েছে। দুবলার পূর্ব দিকে মেঘনা অববাহিকার নদীগুলো দক্ষিণ-পশ্চিম দিকানিমুখী এবং পশুর নদীর পশ্চিমে গাঙ্গেয় অববাহিকায় হুগলী ইত্যাদি নদী দক্ষিণ পূর্বমুখী হয়ে অতল বরাবর বঙ্গোপসাগরের দিকে ধাবিত হয়েছে। এই দুইটি শাখানদী এ অঞ্চলে গতিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। অতলস্পর্শের মাথার দিককার অংশ প্রায় ৫ কিলোমিটার প্রশস্ত যা মোহনা অঞ্চলের যে কোনো নদীর প্রশস্ততার সাথে তুলনীয়। মহীসোপানের সমতল অংশ উত্তর-পূর্ব দিক থেকে শুরু করে প্রায় ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি নালার মতো অংশই অতলস্পর্শের দেহকাণ্ড। প্রথম ৭৫ কিঃ মিঃ মধ্যে তলার প্রশস্ততা ১০ থেকে ১২ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের শেষ অংশে তলদেশ ৪৫ কিলোমিটার প্রশস্ত বলে জানা যায়। পৃথিবীব্যাপী নিমগ্ন মহাসাগরগুলো স্রোতের ঘূর্ণন চক্র দ্বারা কতিত হয়েছে বা বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশে কতিত হয়ে পরে তা জলে নিমজ্জিত হয়েছে।

বঙ্গোপসাগরের অতলস্পর্শের উৎপত্তি : পলি কাদাময় ঘোলা পানির খরস্রোতের প্রভাবে বা পৃথিবী জলমগ্ন হবার আগে নৈসর্গিক কারণে মহীখাদ সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা জানা যায় না। বঙ্গোপসাগরের অতলস্পর্শের উৎপত্তি নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। ল্যাফও এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করেছেন। যথা (ক) অবনমিত সমুদ্র সমতল (lowered sea level), হয়ত খাদটির উপরের সমতলটি, সমুদ্রের যখন উচ্চতা কম ছিল হিমবাহ যুগের সময় তখনই আলাদা হয়ে যায়। বৃষ্টিপাত ও স্থলভাগের পানি নিষ্কাশনের ফলে হিমালয়ের মতো বিরাট পর্বতের পলিমাটি এবং তৎকর্তৃক সমুদ্র তীর ক্ষয় এসবের ফলেই খাদটি হয়তো সেকালে গঠিত হয়েছিলো। (খ) বিচ্যুতি (fault) : এ অঞ্চলে অতলস্পর্শের উত্তরে আসাম মালভূমি অঞ্চলে ভূমি গঠনগত বিচ্যুতি রয়েছে। জলচুনা নদী রংপুর এবং যমুনা হয়ে মধুপুর জঙ্গলের নিচ দিয়ে বরিশাল পর্যন্ত তার ভূস্তর বিচ্যুতি রেখা প্রসারিত করেছে। এ কারণটির স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। (গ) তলানি সঞ্চয় : (sedimentation) : মহাদেবান ও রা * (১৯৫৪)



চিত্র ৫.১২ঃ অতলস্পর্শী মহীখাদের (ক্যামেরা ফটো)

সনে এ তত্ত্বের স্বপক্ষে প্রমাণ হাজির করেন। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদী বৎসরে 8×10^{11} ঘন মিটার পানি বঙ্গোপসাগরে বিসর্জন দেয়, সাথে ৪ বিলিয়ন ঘন মিটার তলানি নিয়ে। এ পরিমাণ তলানি নিয়ে বঙ্গোপসাগরের পুরো দেহটি ২ মিঃ মিঃ পুরু আস্তরণে ঢেকে দেয়া সম্ভব। কিন্তু সাগরের সর্বত্র এক রকম সমবিতরণ ঘটে না। সিওয়েল (১৯৩৭) জানিয়েছেন যে, বাংলা মহাসোপানের সমুদ্রমুখী কিনারা সমুদ্রের দিকে ৪০ বৎসরে ১ মাইল করে বর্ধিত হচ্ছে। (ঘ) ঘোলাটে স্রোতের প্রভাব : তলানি সঞ্চয়নের ফলে ধস (Slump) নামে, তাতে মহীখাদের মাথা সময়ে সময়ে বদলে যায় এবং বিপুল পরিমাণের তলানি মহীখাল বেয়ে গভীর সমুদ্রে নীত হয়। উত্তর গোলার্ধে করিগুলির (Corialis) সূত্রানুসারে তলানি মহীখাদের ডানদিকে সঞ্চিত হতে থাকে। বঙ্গোপসাগরের অতলস্পর্শী মহীখাদটির ডান দিক বামদিকের চেয়ে ৯০ ফ্যাদম বেশি উঁচু। ডেইট (Dietz ১৯৫৩)-এর মতে অতলস্পর্শীর এই বিপুল পরিমাণ তলানিই শ্রীলংকার পূর্ব পাশে উঁচু পাড় বিশিষ্ট চ্যানেল তৈরি করেছে (lived Channels)। অতল স্পর্শীর ঘোলাটে স্রোত প্রবাহ ১০০০ মাইল দক্ষিণ পর্যন্ত আস্তে আস্তে চলে গেছে। (ঙ) কেউ কেউ বলেন, সাগরপৃষ্ঠের স্রোত প্রবাহ এবং উল্লস স্রোত প্রবাহ ও বঙ্গোপসাগরের এই অতলস্পর্শী মহীখাদের সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে। অতলস্পর্শের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদগুলো হলো (ক) লয়েডের তত্ত্ব, (খ) ফাণ্ডসনের তত্ত্ব, (গ) ওল্ডহামের স্পিড, (ঘ) উইলিয়ামের প্রকাশ, (ঙ) হিরনের সিদ্ধান্ত, (চ) কস্কের সিদ্ধান্ত এবং (ছ) চৌধুরী তত্ত্ব। ১৮৩৮ সনে লয়েড তার তত্ত্বে বলেন যে, বিপরীত স্রোতের কারণে দুটি বড় স্রোতের মধ্যবর্তী মহাগহ্বরটি সৃষ্টি হয়েছে। দুটি বড় স্রোত হচ্ছে হুগলী নদীর স্রোত এবং মেঘনা নদীর স্রোত পরস্পর বিপরীতমুখী ধাবিত হচ্ছে। ১৯৩৭ সালে হিরন অনুমান করেন যে, নিম্নগু মহাগহ্বরের গঠিত হয়েছে নদী দ্বারা বাহিত কর্দম এবং পলি সঞ্চয়নের ফলে। নদীর জলের বহির্গমন মুখের উভয় পাশ ধরে এই সঞ্চয় ঘটে, কেননা জল প্রবাহের সমুদ্র স্রোতের অন্তঃগমন পথে নদীর বহির্গমন পথে তা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এমনটি হলেও প্রত্যেকটি বড় নদীই মহীখাদের সৃষ্টি করতে পারবে।

চৌধুরী প্রকল্প বা তত্ত্ব : বাংলাদেশের প্রখ্যাত প্রয়াত ভূগোল বিজ্ঞানী অধ্যাপক এম আই চৌধুরীর মতে প্রাইস্টোসিন (১০ লক্ষ বছর আগে) যুগের শুরুতে বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশের অধিকাংশ এলাকা শুষ্ক ভূমি ছিল এবং বর্তমানে যে এলাকা মহাগহ্বরের রূপে দখল করে আছে, সেটি ছিল একটি খাল। গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র নদী দুটি বঙ্গোপসাগরে পতিত হওয়ার আগে পরস্পর মিলিত হয়েছিল, বর্তমানে (গঙ্গা) পদ্মা মেঘনার সঙ্গমস্থলের কাছাকাছি। এদের মিলিত জলধারা তারপর দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হয়ে মহাগহ্বরের প্রবেশ পথের দিকে বইতে শুরু করে এবং সেখানে একটি বড় মোহনার সৃষ্টি করে। এই মোহনায় খরস্রোতের প্রভাবে খাদটি গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। তারপর আবহাওয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন (শীতল প্রাইস্টোসিন যুগের শুরুতে) হয়ে ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে পানির উচ্চতা বাড়তে থাকে, মোহনা উত্তর দিকে সরে সঙ্গমস্থল প্রসারিত হয় ও গভীরতর রূপ নেয় এবং এর ফলে সৈকত বড় চ্যুতির দ্বারা প্রভাবিত

হয়ে পড়ে। কিন্তু ১৯৭২ সালে আহমদ জানান যে, মহীখাতের দিক গাঙ্গেয় বদ্বীপের অবস্থানের দিকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। গঙ্গা ও তার উপ-নদীর প্রবাহের দিক হলো উত্তর-পশ্চিম হতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অথবা উত্তর হতে দক্ষিণে, অন্যদিকে মহীখাত উত্তর-পূর্ব হতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বিস্তৃত। এসব কোনো যুক্তিই অতলস্পর্শের উৎপত্তি, অবয়ব ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিতে পারেনি। এজন্য দরকার ভূতাত্ত্বিক, প্রত্নটোষকবিদ্যা ও পলিবিদ্যার চর্চা ও সর্বোপরি ব্যাপক সমুদ্রতাত্ত্বিক জরিপ। লিথোস্ট্র্যাটিক প্রেটের তথ্য অনুসন্ধান করে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে জানার জন্য আরও গবেষণার প্রয়োজন।

যাই হোক, অতলস্পর্শী খাদের উপস্থিতি, জোয়ার ভাটা, পললের গতিবিধি ও অবক্ষেপণ, পানির গতি প্রকৃতি ও ভূমিরূপের উপর প্রভাব বিস্তার করে। গঙ্গা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র নদী বাহিত পলি মাটির স্রোত প্রবাহ বঙ্গোপসাগরের তলদেশে অগভীর খাতের সৃষ্টি করে শিরা উপশিবার আকারে জালের বেটনী নির্মাণ করেছে, যাকে বেঙ্গল ফ্যান (Bengal Fan) বলা হয়। পৃথিবীর কোনো সমুদ্রে আর এমন কোন অঞ্চল নেই যেখানে নদীবাহিত তলানি দ্বারা সমুদ্র তলদেশ বঙ্গোপসাগরের মত এতটা প্রভাবিত হয়।

বঙ্গোপসাগর তথা বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থনৈতিক এলাকার (Exclusive Economic zone) মধ্যে অবস্থিত এই মহীখাদ “অতলস্পর্শ” একাধারে আমাদের সামুদ্রিক মাৎস্য সম্পদের জন্য একটি অভয় জলাধর ব্যবস্থা করেছে। দেশী-বিদেশী (ভারত, বার্মা ও থাই) জাহাজ দ্বারা অপরিবর্তিতভাবে মৎস্য আহরণ করার ফলে জালের তাড়া খেয়ে মৎস্যকুল যখন অতলস্পর্শের কাছাকাছি চলে আসে তখনই তারা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পায় এই মহাখাদে। এর তলদেশ অসমতল ও গভীর বিধায় টলারের সাহায্যে তলদেশের মৎস্য আহরণ প্রায় অসম্ভব। আর মাছ তাই নির্বিঘ্নে এখানে বসবাস করতে পারে। তাছাড়া উপকূলের কাছাকাছি হলেও প্রায় মহাসাগরের মতো গভীর পরিবেশ থাকার জন্য এখানে মহাসাগরীয় পেলাজিক (উপরিতলে বসবাসকারী) মাছের যথেষ্ট আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে টুনা ও নানা প্রজাতির হাঙরের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে বাংলাদেশে এই দুটি মূল্যবান সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের জন্য কোনো বিশেষ প্রচেষ্টা আজও নেয়া হয়নি। কে জানে হয়তো অতলস্পর্শ মহীখাদে লুকিয়ে আছে মূল্যবান খনিজ (ম্যাঙ্গানিজ) পদার্থের আকরিক গুটি (nodule)। তবে এই মহীখাদের উপস্থিতির কারণে মহাসাগরে সৃষ্ট ঝড়-ঝঞ্ঝা এইপথ বেয়ে বাংলাদেশ মূল ভূখন্ডের দিকে অতি সহজেই আঘাত হানতে সক্ষম হয়। তাছাড়া গত ২০০ বছরে কোনো নতুন দ্বীপের উত্থান ঘটেনি এখানে। নিব্বুম দ্বীপ শুধু জেগেছে, কয়েকটি দ্বীপের আকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। খুব সম্ভবত অতলস্পর্শী মহাখাদ কর্তৃক সব তলানি দূর মহাসাগরে নীত হবার ফলেই নতুন দ্বীপ জাগছে না। তবে দক্ষিণ তালপট্টা এর ব্যতিক্রমও বটে। এসবের কারণ জানার জন্য হলেও বঙ্গোপসাগরের মধ্যে অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত।

বঙ্গোপসাগরের উপকূলভাগের আকৃতি তত্ত্ব ও তলদেশের ভূ-সংস্থান তত্ত্ব

বঙ্গোপসাগরের তলদেশের মেঝেটি প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত : মহাদেশীয় প্রান্ত বা কিনারা এবং সাগর পরিবাহ ক্ষেত্র বা অববাহিকা। মহাদেশীয় প্রান্তের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সমুদ্র সৈকত ভূমি এবং উপকূলবর্তী অঞ্চল, মহীসোপান, মহীঢাল এবং মহাদেশীয় উত্থান ভূমি বা সীমান্ত দেশ।

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার বিস্তৃতি ১১০০০ মাইল। ভৌগোলিক সীমা $20^{\circ}25'$ — $23^{\circ}2'$ উত্তর অক্ষাংশ এবং $88^{\circ}55'$ — 92° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালি, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও দূরবর্তী দ্বীপাঞ্চল অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র এলাকা ক্রমশ ঢালু সমভূমি সমতল থেকে গড়ে ১৫ ফুট উঁচু এবং পশ্চাতে গঙ্গা-মাতামুহুরী-প্লাবন জোয়ার ভূমি অঞ্চল। তটরেখার দৈর্ঘ্য ৪৭৫ মাইল। উপকূলীয় ভূমিরূপ টারসিয়ারী উপকূল অঞ্চল হচ্ছে- চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশ, কক্সবাজার খাড়া পাহাড়ী উপকূল, মহেশখালী দ্বীপ ও সেন্টমার্টিনস দ্বীপ। টারসিয়ারী ভঙ্গিল পর্বতের নিম্নগু আদি শিলার উপর সাম্প্রতিক পাললিক শিলা স্থপীকৃত হয়েছে। পর্বত পাদদেশীয় পলল সমভূমি হচ্ছে নিয়োজিন ভঙ্গিল পর্বতের পশ্চিমে সরু বলয়, চট্টগ্রামের উপকূলব্যাপী বিস্তৃত অঞ্চল। আর সাম্প্রতিক যুগের পুরাতন পললের উপর স্থপীকৃত গঙ্গা-মেঘনা-যমুনা নদী বাহিত সঞ্চয়ন খাত অঞ্চল হচ্ছে বদ্বীপীয় প্লাবন সমভূমি। জলাভূমি-খুলনা জেলার উপর পশ্চিমাংশে ৪৮০ বর্গমাইল নিম্নভূমি। উপকূলীয় বালির সৈকত হচ্ছে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও খুলনার মধ্যভাগে উপকূল ভাগ। সৃজনী পটভূমির আওতায় উৎপত্তিগতভাবে উপকূলীয় জেলাগুলো বঙ্গ অগ্রখাত মধ্যভাগে অবস্থিত, যার পূর্বে টারসিয়ারী ভঙ্গিল পর্বত ও পশ্চিমে কবজা বলয়। একদিকে যখন হিমালয় আরাকান পর্বতশ্রেণী সৃষ্টি হয় অন্যদিকে বঙ্গখাতে পীট শিলার প্রায় ১৫ কিলোমিটার অবনমন ঘটে। একই সময় বঙ্গখাতের মধ্যে আরও কিছু ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়, যেমন (১) ফরিদপুরের নিম্নাঞ্চল, (২) বরিশাল-চাঁদপুরে উচ্চভূমি, (৩) হাতিয়া নিম্নভূমি, (৪) পশ্চিমা ভাঁজখাত। এসব মহীখাতের তলায় প্যালিয়োজিন ও নিয়োজিন তলানি জমা আছে। পীট শিলাস্তরের নমুনা পাওয়া গেছে মূলাদী, পটুয়াখালী, কাসিমপুর, সন্দ্বীপ, বানাবাদ, শাহবাজপুর, চর জব্বার, কুতুবদিয়া, সীতাকুন্ড, জলদি, মহেশখালি, ইলাহীনালা ও সেন্টমার্টিনস।

ভূস্তর বিন্যাস (Stratigraphy) : কক্সবাজার, সীতাকুন্ড, মহেশখালিতে মায়েসিন শিলা ভূপৃষ্ঠে দৃশ্যমান। তবে সেন্টমার্টিনস, ইলাহীনালাতে মায়েপ্লায়েসিন পাললিক স্তর পাওয়া গেছে। উপকূলীয় ব্যাপক এলাকা জুড়ে সাম্প্রতিক পলল স্তরের সন্ধান মেলে (৩০০-৫০০ ফিট) তবু পীট শিলা ৬-১৫ কিঃমিঃ নিচে, নিয়োজিন শিলাস্তর ১২০০০-১৫,৫০০ ফুট গভীরে আছে। শক্ত প্রায়োসিন স্তরের গভীরতা ২৩০০ ফুট পর্যন্ত, তবে জীবশাভাগ যৎসামান্য।

১। সাম্প্রতিক (৩০০-৫০০ ফুট) পলল সঞ্চয়ন : এতে বেলে, সল্ট, কাদার, বালিয়াড়ী স্থপ ও সৈকত বালি চরা শিলাস্তর থাকে। কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিনস দ্বীপের প্রান্তিক অঞ্চলে তা দেখা যায়।

২। প্রাইস্টোসিন (১৬০-৭০০ ফুট) ধাপ : এতে মিহি কণাবিশিষ্ট আধা জমাট বালি পাথরের ফাঁকে কাদা স্তর থাকে। সেন্টমার্টিনের তলে যে খাত আছে তা স্বল্প সামুদ্রিক জলে নিমগ্ন ছিল।

৩। মায়োপ্রাইস্টোসিন (ডুপি-টিলা ৩০০০ ফুট) : এতে মধ্যম কণাবিশিষ্ট বেলেপাথর শেল ও নুড়ি যা মহাদেশীয় নদীপ্রান্তের নমুনায় খুঁজে পাওয়া যায়।

৪। প্রায়োসিন (৭০০-৫৬২০ ফুট) : এতে ওপরের স্তরে বালিস্তর ও নিচে আঠালা নরম শঙ্খযুক্ত বালি কাদা স্তর রয়েছে। প্রাচীনতম সুরমা শিলা শ্রেণী ২৫০০০-৩০০০০ ফুট গভীরে ভূকম্পন ও গিরিজনি আন্দোলনকালে গঠিত।

৫। মায়োপ্রায়োসিন (সুরমা সিরিজ ৩৫০০ ফুট গভীর) : এতে ধূসর ও আঠালা কাদা থাকে। বেগমগঞ্জ, মূলান্দ, কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিনের কাছে স্বল্প জলে পাওয়া যায়।

৬। তিপাম বেলে পাথর বাঁকা বল ও ভূবন গঠণ শ্রেণী : এতে মধ্যম ও মিহি বেলে পাথর যুক্ত শেল, নুড়ি ও জৈব পদার্থ শেল জাতীয় রয়েছে। সামুদ্রিক কিনারায় স্তরায়নের বিবর্তন স্পষ্ট ধরা পড়ে।

সৈকত ও মোহনা : বাংলাদেশ মূলত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের বৃহদাংশের অধিকারী যা বঙ্গ বদ্বীপ নামে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে ক্রমশ প্রসারিত। উত্তরাংশে পলল কাদা আর বালির বিক্ষিপ্ত চরা কিন্তু পূর্বাংশে কক্সবাজার থেকে বদর মোকাম পর্যন্ত ৯০ মাইল দীর্ঘ সরু বালির সৈকত যা সারা পৃথিবীতে সবচাইতে দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত। বঙ্গোপসাগরের উত্তর উপকূল সমুদ্রের প্রভাবে এবং আবহাওয়াগত পরিবর্তনে প্রভাবিত হয়ে ভূমিরূপের রূপান্তর ঘটে। যেমন : মৌসুমী ঋতুতে প্রবল ঢেউ, জোয়ারের চাপে লোনা পানির বিপরীত গতি, নদীসমূহ দ্বারা বাহিত অগাধ মিঠা পানির ধারা। মেঘনা ও হুগলী নদীর মোহনাগামী স্রোতধারা উভয়ে স্রোত জোয়ারের আঘাতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং লব্ধগতি যথাক্রমে দক্ষিণ-পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বেঁকে একটি সমন্বিত ধারা সৃষ্টি করে এবং বাহিত পলল সঞ্চয়ে সমুদ্রগর্ভে চরাভূমি বা ক্ষুদ্র দ্বীপের সৃষ্টি করে, যেমন তালপট্টা ও নিখুম দ্বীপ। তবে বঙ্গোপসাগরের মহীতালে ব্যাপক নিমগ্ন ক্যানিয়ন থাকায়, বদ্বীপ গঠন কাজ ব্যাহত হয়। কারণ নদীবাহিত অগাধ পলল উক্ত গভীর খাতে খাড়া ঢাল বেয়ে নেমে যায়, তবে দূরবর্তী মহাসাগরের প্রবল ঢেউয়ে কিছু পলল এর কিনারায় মহীসোপান অঞ্চলে জমা হয় এবং চরা বা দ্বীপ জাতীয় উথিত ভূমিরূপ সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। বঙ্গোপসাগরে ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে গৃহীত আলোকচিত্রে ৪০ হাজার বর্গমাইল এলাকায় নয়া উপকূল ভূমি জাগার নমুনা ধরা পড়েছে।

বঙ্গোপসাগরের উপকূল ভাগের তটরেখা প্রাকৃতিক কারণে বা মনুষ্য সৃষ্ট কর্মতৎপরতার ফলে প্রায় সময়ই পরিবর্তিত হয়েছে। এখনও হচ্ছে যা পরিত্রাজকদের বর্ণনা বা প্রাচীন ম্যাপ থেকে জানা যায়। বঙ্গোপসাগরের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় উপকূলেই তেজস্ক্রিয় পদার্থ বেলাভূমিতে জমা আছে। সমুদ্র উপকূল থেকে ১২ মাইল দূরে ৫৪

মিটার গভীরে যে বালিরাশি তাতে ১১-১৪ (ঘণ্টাম), ৩-৭ (নিম্ন) এবং ১৩-১৫ (উচ্চ) $\times 10^{-3}$ গ্রাম ইউরেনিয়াম সম তেজস্ক্রিয়তা প্রতি গ্রাম তলানিতে রয়েছে। (মহাদেবান, ১৯৫৪)।

কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকতের ভূতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশ

বাংলাদেশী ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানী অধ্যাপক হোসেন মনসুর উপরোক্ত বিষয়বস্তুর উপর তাঁর গবেষণালব্ধ যে ফলাফল ছাপিয়েছেন (Monsur H.M. et. al, 1994) তার সারমর্ম হলোঃ

কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ৯০ কিলোমিটার বিস্তৃত ঢালু সমুদ্র সৈকত পৃথিবীর অন্যান্য সৌন্দর্যমণ্ডিত সৈকতের শীর্ষেই স্থান পেতে পারে কয়েকটি কারণে যথা- এই সৈকত নুড়ি পাথরের নয়; এখানে শুধুই বালু, এখানকার তীর ধীর গতিতে ঢালু হয়ে সাগরের দিকে নেমে গেছে। সাগরের দিকে অনেক দূর হেটে গেলেও সাঁতার হয় না। ১৮ হাজার বছর আগে এই সমুদ্রপৃষ্ঠ নেমে গিয়েছিল বর্তমান সমুদ্র সমতল থেকে ১০০ মিটার নিচে। তখন চলছিল বরফ যুগ। কক্সবাজার-টেকনাফের পশ্চিমাংশের বিশাল এলাকা ছিল টিলা বা ছোট ছোট পাহাড়ে পরিপূর্ণ। সমুদ্রের পানির উচ্চতা কমে যাওয়ায় নদীর গভীরতা বেড়ে গিয়েছিল। তখন পদ্মা-মেঘনা নদীর তল নিচে নামতে নামতে গভীর খাদ তৈরি করেছিল। আর নদীগুলোর মোহনা সরে গিয়েছিল আরও অনেক দক্ষিণে। তখন উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর শুষ্ক আবহাওয়ায় বৃষ্টিপাত সামান্য হতো। প্রধানত হিমালয় পর্বতমালার বরফগলা পানিই শুধু শীর্ণকায় গভীর নদীগুলো দিয়ে বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত হতো। তারপর মৌসুমী বায়ু দিক পরিবর্তন করে আজ থেকে ১৫ হাজার বছর আগে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু মুসলধারে বৃষ্টিপাত ঘটায়। পৃথিবী গরম হতে থাকে এবং স্থলভাগের বরফ গলা পানি নদী দিয়ে সমুদ্রে পড়ে। এ সময়ে পৃথিবীর সর্বত্রই সাগরের পানির উচ্চতা বাড়তে থাকে। এর প্রভাবে কক্সবাজার থেকে টেকনাফের পশ্চিমে বিস্তৃত পাহাড়ীয় এলাকা ক্ষয় হতে থাকে এবং পানিতে ডুবতে থাকে। ৬ হাজার বছর আগে সমুদ্রপৃষ্ঠ এখানকার চেয়ে ৬ মিটার বেশি উঁচু ছিল। প্রচণ্ড ঢেউয়ে পশ্চিমের বিশাল এলাকা ক্ষয় হয়ে তীর বর্তমান পর্যায়ে চলে আসে কক্সবাজার-টেকনাফ বরাবর। তারপর সাগরপৃষ্ঠ নিচে নামতে নামতে প্রায় ৩/৪ হাজার বছর আগে বর্তমানের অবস্থানে আসে। কক্সবাজারের পাহাড়ে ও হিমছড়ির পাহাড়ে আছড়ে পড়া সাগরের ঢেউ সরতে সরতে বর্তমানে কক্সবাজার মোটেল ও পরমাণু শক্তি কমিশনের সৈকত বালি আহরণ কেন্দ্রের নিচের দিকে চলে আসে। পাহাড়ের পাদদেশ হতে বর্তমান তীর পর্যন্ত বিস্তৃত সমতল এলাকার সল্টমার্শ-এর ৫০ সেন্টিমিটার মাটির নিচেই রয়েছে সেকালের সৈকত বালু। এ সল্টমার্শে বর্তমানে বসতি ও সুপারি-নারকেলের বাগান গড়ে উঠেছে।

১৫-৫০০০ বছর আগ পর্যন্ত যে টিলা-পাহাড় ভেঙ্গে সাগর কক্সবাজার-টেকনাফ বরাবর এসেছে তা ছিল লক্ষ লক্ষ বছর আগের বালি বা শেলের জমাট বাঁধা পাললিক শিলা (Tipcen ও Bokabil)। এ থেকে প্রাকৃতিক উপায়েই জমা হয়েছে মূল্যবান ভারি

তেজস্ক্রিয় মানিক, খেয়ন মোনাজাইট, রুটাইল, জিরকন, কায়ানাইট, ম্যাগনেটাইট ইত্যাদি। সৈকতে এসব খনিজ সম্পদ ছাড়াও রয়েছে ইনালী থেকে টেকনাফ পর্যন্ত তীর বরাবর বিস্তৃত বিরাট বিরাট বোন্ডার বা কনক্রেশন। এগুলো সৈকতকে রক্ষা করে উত্তাল ঢেউয়ের হাত থেকে।

অপর বাংলাদেশী ভূতত্ত্ববিদ সিকাতুল কাদের চৌধুরী বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমায় বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিনের উপকূলীয় ভূ-অঙ্গ সংস্থান বর্ণনা করেছেন (Chowdhury, S.G. et. al, 1992)। সেন্টমার্টিনে পাওয়া গেছে সৈকত শিলা (beach rock), প্রবাল প্রাচীর, (coral reef) শৈবালজ চ্যাপ্টা (Alsal flat), সৈকত বালি এবং বালিয়াড়ি (dune)। এগুলোর প্রাচুর্যতা এবং বিতরণ, বিশেষ করে সৈকত শিয়ার, ইঙ্গিত দেয় যে দ্বীপটির উত্থান ঘটছে। এটা ঘটছে দক্ষিণ পাড়া এবং সিরাদিয়া এলাকায় বেশি করে আর উত্তরপাড়া ও মধ্যপাড়াতে সামান্য হারে। দ্বীপের নব-ভূ-গাঠনিক (neotectonics) প্রক্রিয়ার জাজ্জল্যমান প্রমাণ হচ্ছে ভূখণ্ডের উত্থান। চৌধুরী এবং তার সহযোগীরা আগের প্রাপ্ত কোকিনাস্তরকে (Coquina bed) সৈকত শিলা (beach rock) নামকরণ করেছেন। প্লেইস্টোসিন যুগের এই সৈকত শিলার এ দ্বীপে পুরুত্ব (স্তর) রয়েছে ৬ মিটারের। ভারতে এ শিলাকে লিটোরাল কনক্রিট বলা হয়। সিরাদিয়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকাতে সৈকত শিলা বেশি দেখা যায়। সমুদ্রোপকূলের অপসারণের সঙ্গে সৈকত শিলার প্রাপ্তির সংযোগ রয়েছে। তীরভাগ যতই পিছিয়ে যায়, সৈকত শিলা তখন ফেলে যাওয়া সীমা নির্দেশ করে। দক্ষিণ পাড়ার ৬ মিটার উঁচু খাড়া ঢাল (Cliff) যা ১৬৫ মিটার লম্বা (চিত্র ৫.১৩) এই নির্দেশ করে যে ১০ লক্ষ বছর আগে (প্লেইস্টোসিন যুগে) সমুদ্রতল আরো ছয় মিটার উপরে ছিল।



চিত্র ৫.১৩ : সেন্ট মার্টিনের দক্ষিণ পাড়ায়

প্লেইস্টোসিন সৈকত শিলার বলয়

বঙ্গোপসাগরের তলদেশের ভূসংস্থান চিত্র : বঙ্গোপসাগরের গভীরতা (উপপাললিক) মাপক উপাত্ত থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, বাংলাদেশ মহাদেশীয় সোপান ২০০ মিটার সমোন্নত সীমারেখা (Contom line) পর্যন্ত বিস্তৃত। সোপানের ঢাল আস্তে আস্তে প্রতি মাইলে ৭ মিটার নেমে যায়। পদ্মা ব্রহ্মপুত্র নদীর মোহনায় মহীসোপান ৬০—১৪০ মাইল প্রশস্ত, আর সংকীর্ণ উপকূল অঞ্চলে ৫০মিটার গভীরতায় ৩০—৮০ মাইল প্রস্থ। বাংলাদেশের ২০০ মিটার সীমারেখায় মহীসোপানের আয়তন হচ্ছে ২৭ হাজার বর্গমাইল। মহীসোপানের উপরতল সমতল হলেও ১৫০ মিটার

উচ্চতা বিশিষ্ট নিচু পাহাড় লক্ষ্য করা গেছে। বাংলাদেশের উপকূলভাগ বঙ্গোপসাগরের তীর ধরে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল মাত্র। উপসাগরের মোট আয়তন ৮৫০ হাজার বর্গমাইল আর ২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত মহীসোপানের আয়তন হচ্ছে ২০২ হাজার বর্গমাইল। বাংলাদেশ সীমান্তে ২০০ মিটার গভীরতায় মহীসোপানের আয়তন হচ্ছে ২৭ হাজার বর্গমাইল এবং ৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত মহীসোপানের আয়তন হচ্ছে ১৪ হাজার বর্গমাইল। বঙ্গোপসাগরে উত্তর অংশে মহীচাল (continental slope) ১০০০ মিটারের বেশি নয়। এর আড়াআড়ি সদৃশ চিত্রটি হচ্ছে অবতল (Concave), কেননা এর তলদেশটি আস্তে মহীচালে উঠে আসে। অভিক্ষেপণের (Projection) নিমজ্জন (sleepness) উপর থেকে নিচে নামবার সময় $১৫-১০^\circ$ ডিগ্রি থেকে $২-১^\circ$ ডিগ্রিতে কমে আসে। উপত্যকা ও খাদ দ্বারা মহীচাল ভঙ্গ হয়। ভারতীয় উপকূলে ও শ্রীলংকার উপকূলে মহীসোপান মাত্র ৩-১৫ মাইল প্রশস্ত এবং সীমারেখা হচ্ছে গোলাকার। মান্নার উপসাগরে ৬০ থেকে ১২ মাইলে মহীসোপান হ্রাস পায় এবং মহীচাল কমে ২ হাজার থেকে ১ হাজার মিটারে। শ্রীলংকার উত্তর অংশে ১৫ মিটার গভীরতায় পাকপ্রণালীর জলরাশি অবস্থিত। এ প্রণালীর স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য দ্বীপ জেগে আছে যাদেরকে অ্যাদমের (Adams bridge) সেতু বলা হয়।

ভারতীয় উপকূলে মহীসোপান মাত্র ২০-২৫ মাইল প্রশস্ত এবং গোদাবরী, কঙ্গো, মহানদীর মোহনায় মহীসোপান সংকীর্ণতর হয়। সোপানের উপরিতল আস্তে বেকে যায় ১০০ মিটার গভীরতায় এবং শেষ হয় ২৫০ মিটার গভীরে। ভারতীয় উপকূলের মহীচাল হচ্ছে সংকীর্ণ এবং দক্ষিণ থেকে উত্তরে যেতে মহীচালের উচ্চতা ৩৫০০ মিটার থেকে ২৫০০ মিটারে কমে আসে। উত্তরে ১ হাজার মিটার পর্যন্ত হ্রাস পায়। মাদ্রাজের উত্তরে মহীচালের নিমজ্জন ১৫° ডিগ্রি এবং ঢালের পার্শ্ব চিত্র দেখতে হয় সোজা। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দ্বারা অঙ্গ উপকূলে অঙ্গ, মহানদী ও কৃষ্ণা খাদ আবিক্ত হয়েছিল। ১২৬০ মিটার গভীরে এদের আকৃতি 'ভি' অক্ষরের ন্যায় এবং ঢাল হচ্ছে $১:৫$ অনুপাতের। আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেশ কিছু ক্যানিয়ন বা খাত এ অঞ্চলে পাওয়া গেছে যাদের নামকরণ করা হয়নি। এরা নদীবাহিত তলানি সাগরে বিসর্জন দেয়ার ক্ষমতা রাখে। এদের উপস্থিতির জন্যই অনেক পক্ষিল জলস্রোত (Turtid Current) বঙ্গোপসাগরের তলদেশে ছড়িয়ে রয়েছে। (Das, 1981)

বঙ্গোপসাগরের তলদেশের পলল

বঙ্গোপসাগরের গভীর পানির পলিতে গ্লোবিজেরিনা ক্ষয়িত কর্দমের উপস্থিতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ (Globigerina ooze)। এ এলাকা উপসাগরের কেন্দ্রীয় অঞ্চল ও গভীর অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত এবং উত্তর দিকে প্রায় ১৭° উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। বঙ্গোপসাগরের উত্তরের অগভীর অঞ্চল স্থলজ সঞ্চয় (Terrigenous deposits) দ্বারা আবৃত। গঙ্গা, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও পেন্নার বদ্বীপের পলি এক রকমের না হলেও এ তলানিগুলো উপকূলের তুলনায় মিহি এবং প্রধানত পলি ও কাদা দ্বারা গঠিত। এ অঞ্চলে পলিতে খোলসের পরিমাণ খুবই কম। বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানের তলানি

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এখানকার মহীসোপানের তলানির প্রকারভেদ মহীসোপানের ঢালের সঙ্গে সম্পর্কিত।

তাপস কুমার মল্লিক (১৯৭৬) হুগলি নদীর মোহনার উপরিতলের নমুনায় বিভিন্ন ধরনের ভারি খনিজ যা পেয়েছেন তা হলো : হর্নব্লেড (Hornblende) ০-৩৬%, ট্রিমোলাইট/একটিনোলাইট (Tremolite/Actinolite) ০-৯%, পাইরোক্সেনে (অর্থো ও ক্লিনো) (pyroxene—ortho, clino) ০-৩ বা ৭%, ওপেকস (opaques), ৩-৭১%, ক্লোরাইড (chlorite) ০-২৮%, কার্বোনেটস (Carbonates) ০-১৫%, গার্নেট (garnet) ০-৩৭%, সিলিমেনাইট (Sillimanite) ০-১২%, কায়ানাইট (Kyanite) ০-৪%, স্টাউরোলাইট (Staurolite) ০-১%, এন্ডালুসাইট (Andalusite) <১%, এপিডোট (epidote) ০-১০%, ক্লিনোজোসাইট (clinozosite) ০-৩%, জিরকোন (zircon) ০-১১%, মোনাজাইট (Monazite) ০-৩%, রুটাইল (Rutile) ০-১%, স্পেনেন (Sphene) ০-১%, এপাটাইট (apatite) ০-২%, বাইওটাইট (biotite) ০-৪৯%, মস্কোভাইট (Moscovite) ০-৫৯%, রিবেকাইট (Rebeckite) ০-৫%, টুরমালিন (tourmaline) ০-২%, গ্লাস ০-১%, কোলোফেন (Collophane) ০-১%, গ্লুকোনাইট (gluconite) ০-২%, এগিরাইন (Aegirine) ০-১%।

গোল্ডবার্গ (১৯৭০) ভারতীয় উপকূলে নদীবাহিত পলিতে মন্টমরিলোনাইট (Montmorillonite) ৪০% পর্যন্ত পাওয়া গেছে। আর গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীবাহিত পলিতে ইলাইট (illite) এবং ক্লোরাইট (chlorite) সবচেয়ে বেশি। কাওলিনাইট (kaolinite) এবং ক্লোরাইট হিমালয়ে অনেক জমা আছে।

বঙ্গোপসাগরের অবক্ষেপ বা পলল : যেখানে সারা বিশ্বের নদীগুলো ১৮.৩ × ১০^{১৫} গ্রাম (Holeman, 1964) অবক্ষেপ সাগরগুলোতে বয়ে নিয়ে যায়, সেখানে শুধু ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা নদী ২.৬ × ১০^{১৫} গ্রাম পলল বঙ্গোপসাগরে বিসর্জন দেয়। (বিশ্বমান মাত্র ৭ গুণ বেশি)। ইলাইট এবং ক্লোরাইট পাঞ্জাবে বেশি পাওয়া যায়, তা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র দিয়ে বঙ্গোপসাগরে ঢোকে (Rao, 1963; Gorbunova, 1966)। আর গোদাবরী এবং ভিসাখাপত্তম এর নদীগুলো ইলাইট এবং স্বল্প পরিমাণে কাওলিনাইট (Gorbunova) সাগরে নিয়ে যায়। কৃষ্ণা নদীসহ দক্ষিণ ভারতের নদীগুলো ইলাইট, মন্টমরিলোনাইট, মিশ্র কর্দম, মিশ্র স্তর মন্টমরিলোনাইট-ইলাইট দাক্ষিণাত্যের পর্বত থেকে পেয়ে ভেঙ্গে চুড়ে পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ফেলে।

সিদ্ধিকী (১৯৬৭) বঙ্গোপসাগরকে ৯টি ভাগে ভাগ করেন বিভিন্ন সাইজের অবক্ষেপের প্রাচুর্যতার পরিসংখ্যান নিয়ে। তিনি দেখান যে, হিমালয় অঞ্চলের পললে প্রধান্য থাকে ইলাইট, কাওলিনাইট এবং মন্টমরিলোনাইটের (এগুলো কর্দম খনিজ)। গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীগুলোর পললে মন্টমরিলোনাইটের সংখ্যা ৪০ শতাংশ। উত্তর বঙ্গোপসাগরে কাওলিনাইট ও ইলাইট পলল সবচেয়ে বেশি। মৌসুমী বায়ু ও ধাতুকণা উড়িয়ে নিয়ে সাগরে ফেলে। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহে প্রতি ঘন

মিটারে ১৬ মাইক্রোগ্রাম ধূলিকণা রেকর্ড করা হয়েছে। এ সংখ্যার সর্বনিম্ন মান হচ্ছে $1.6-5.8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ গোল্ডবার্গ (১৯৭০) হিসেব করেছেন বঙ্গোপসাগরে প্রতি হাজার বছরে ৫০ সেন্টিমিটার পুরু পলল জমা হয় নদী দ্বারা। আর বায়ুত্যাগিত ধূলিকণার পরিমাণ নির্ণীত হয়েছে 2×10^{13} গ্রাম বা ৫০ সেঃ মিঃ প্রতি হাজার বছরের হিসাবের ১ শতাংশ মাত্র। তিনি ১৯৬৮ সনের মে মাসে বঙ্গোপসাগরে কীটনাশক রাসায়নিক উপাদান ডিডিটিসহ ডিডিই, ডিডিডি পান গড়ে 3.02×10^{-9} গ্রাম/প্রতি গ্রাম ধূলিকণায়। এটি প্রতি মাসে আধা টনের সমান।

মহাদেবান ও রাও (১৯৫৪) ভারতের পূর্ব উপকূলের দূরে সমুদ্রতলের অবক্ষেপে যেসব খনিজ শনাক্ত করেন তা হলোঃ

ভিসাখাপত্তম এলাকায় : কোয়ার্টজ, কেলস্পার, সিলিমেনাইট, কায়ানাইট এবং এম্পিবোলে, জিরকন, গার্নেট, মোনাজাইট, হাইপারসবেলে, পাইরোক্সিন, ঘন বাদামী স্বচ্ছ দানা, বর্ণহীন মাইকা।

মহাদেবান ও অশ্বথ নারায়ণ (১৯৫৪) এ তলদেশে প্রাপ্ত এসব খনিজের তেজস্ক্রিতার পরিমাণও নির্ণয় করেন :

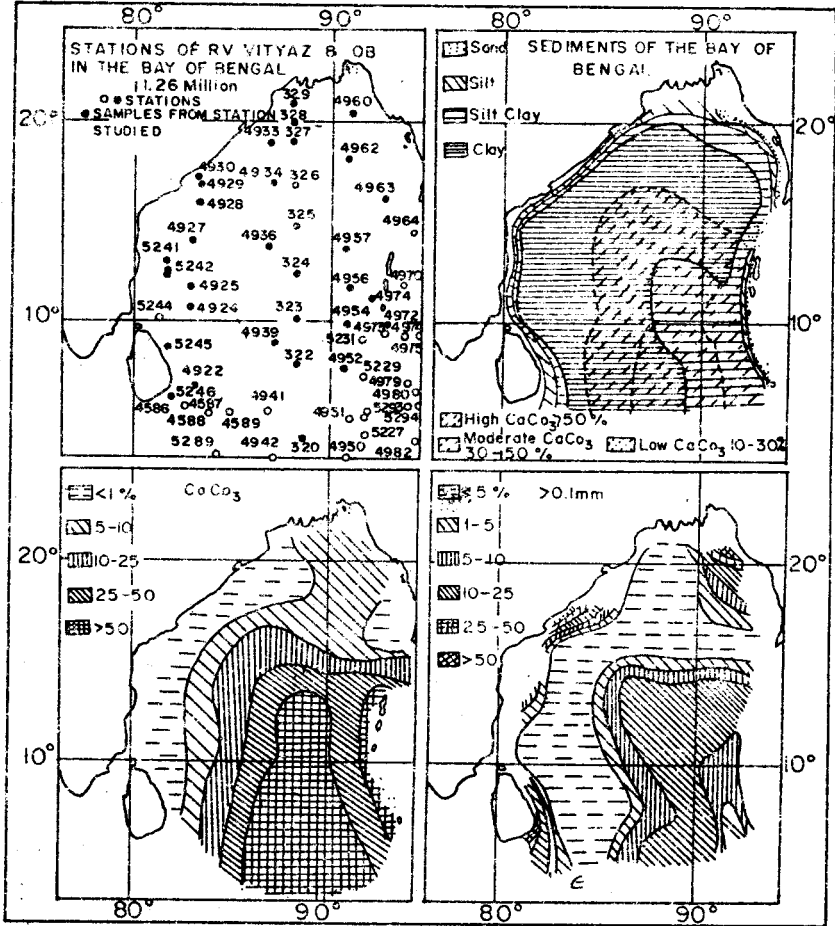
জোন এ : উচ্চ তেজস্ক্রিয় মাত্রা 18.80×10^{-6} থেকে 10.86×10^{-6} গ্রাম ইউরেনিয়াম/প্রতি গ্রাম পললের মধ্যে। সমুদ্রের ২৭০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত এবং ১২ মাইল দূর তীর থেকে এই পরিমাণ উচ্চ তেজস্ক্রিয় খনিজ পাওয়া যায়।

জোন বি : তীর থেকে ১২-২৩ মাইল দূর সমুদ্রে ২৭০-৬০০ ফুট গভীরে পাওয়া যায় 3.526×10^{-6} থেকে 6.826×10^{-6} গ্রাম ইউরেনিয়াম/প্রতি গ্রাম পললে। এটি মাঝারি।

জোন সি : ২৩ মাইলের বেশি দূরে এবং ৬০০ ফুটের বেশি গভীরে উচ্চ মাত্রার তেজস্ক্রিয়তা রেকর্ড হয়েছে 18.55×10^{-6} থেকে 13.19×10^{-6} গ্রাম ইউরেনিয়াম/প্রতি গ্রাম অবক্ষেপে।

গঙ্গা নদীর মোহনায় সবচেয়ে বেশি তেজস্ক্রিয়তা দেখা গেছে। $21^{\circ}25'$ উত্তর এবং $88^{\circ}41'$ পূর্ব অক্ষাংশ অতলম্পর্শী মহীখাদে ৬৩ ফুট গভীরের পললে (তীর থেকে ৪ নটিক্যাল মাইল দূরে মাটি এবং মসৃণ বালি নমুনা সংগ্রহ করা হয়) 26.60×10^{-6} গ্রাম ইউরেনিয়াম প্রতি গ্রাম অবক্ষেপে পাওয়া যায়। অথচ গঙ্গা নদী ও মহানদীর অদূরে এ সংখ্যা হচ্ছে ১৫.৫, মহানদীর অদূরে ১৮.০৫, গোদাবরী ও মহানদীর ধারে ১৮.৭৮, গোদাবরীর বিপরীতে ৮.২৬৮, কৃষ্ণায় ৫.৭২০, পেনারে ৭.৩৪৩ এবং ১০.৭৬ আর মাদ্রাজের নিকটে ১১.৬৫। গঙ্গা নদীর পললে মাইকা ও জিরকোন বেশি থাকায় (এগুলোতে সামান্য পরিমাণে হলেও তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যায়) এ নদী বাহিত পললে ও উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয়তা শনাক্ত হয়। তদুপরি Plagiolase এবং amphibole খনিজে তেজস্ক্রিয় কণা থাকে না। আর গঙ্গা নদীতে এই ধরনের পললও রয়েছে অনুপস্থিত। কক্সবাজার-টেকনাফ সৈকতে জিরকনসহ ভারি খনিজ বহু আছে, তাই বঙ্গোপসাগরের পূর্বকূলের তলানিতে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ 26.60 এর চেয়ে বেশি হবে, সন্দেহ নেই তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় এ সম্পর্কে কোনো উপাত্ত আমাদের হাতে নেই।

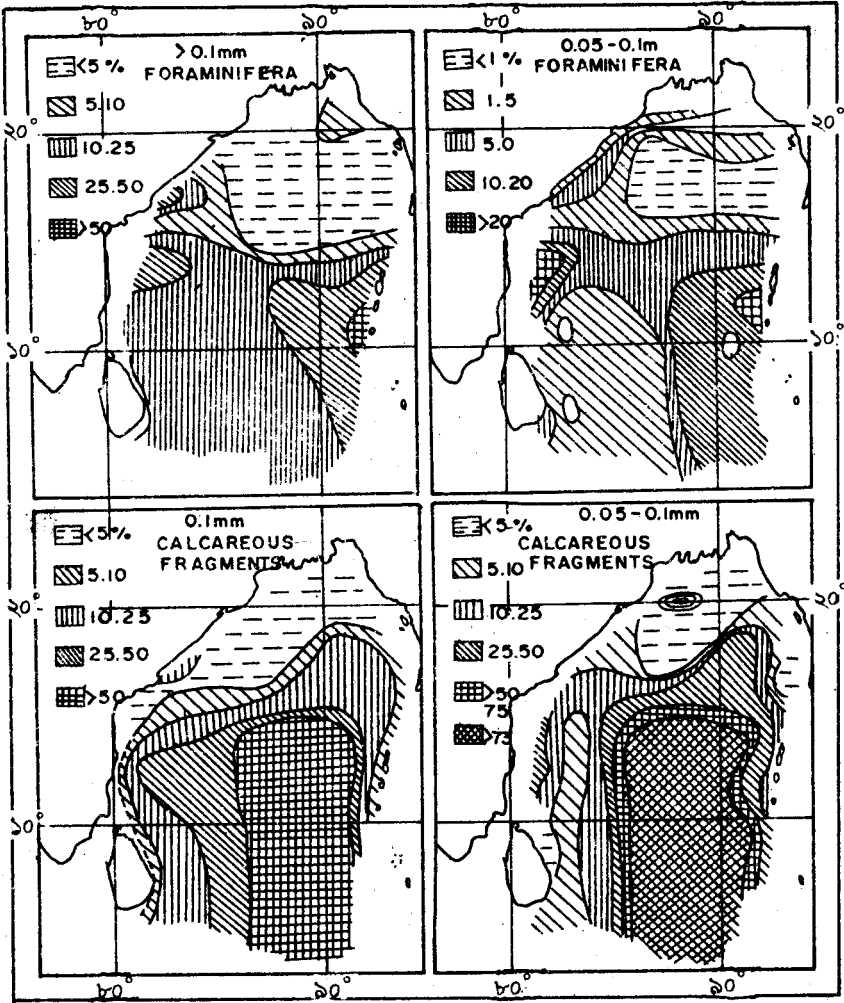
উপরে বর্ণিত সিন্দিকী (১৯৬৭) তার প্রকাশিত 'Recent Sediments of the Bay of Bengal' গ্রন্থে ৪৩ পৃষ্ঠার এক সারণী নিবন্ধে (Marine Reology, 5 (1967, 249-291) বঙ্গোপসাগরের ইদানীংকালের পলল সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এ মূল্যবান প্রবন্ধটির সারমর্ম এখানে বিবৃত করা হলো।



চিত্র ৫.১৪ : বঙ্গোপসাগরের অবক্ষেপ ক্যালসিয়াম কার্বনেট বিতরণ।

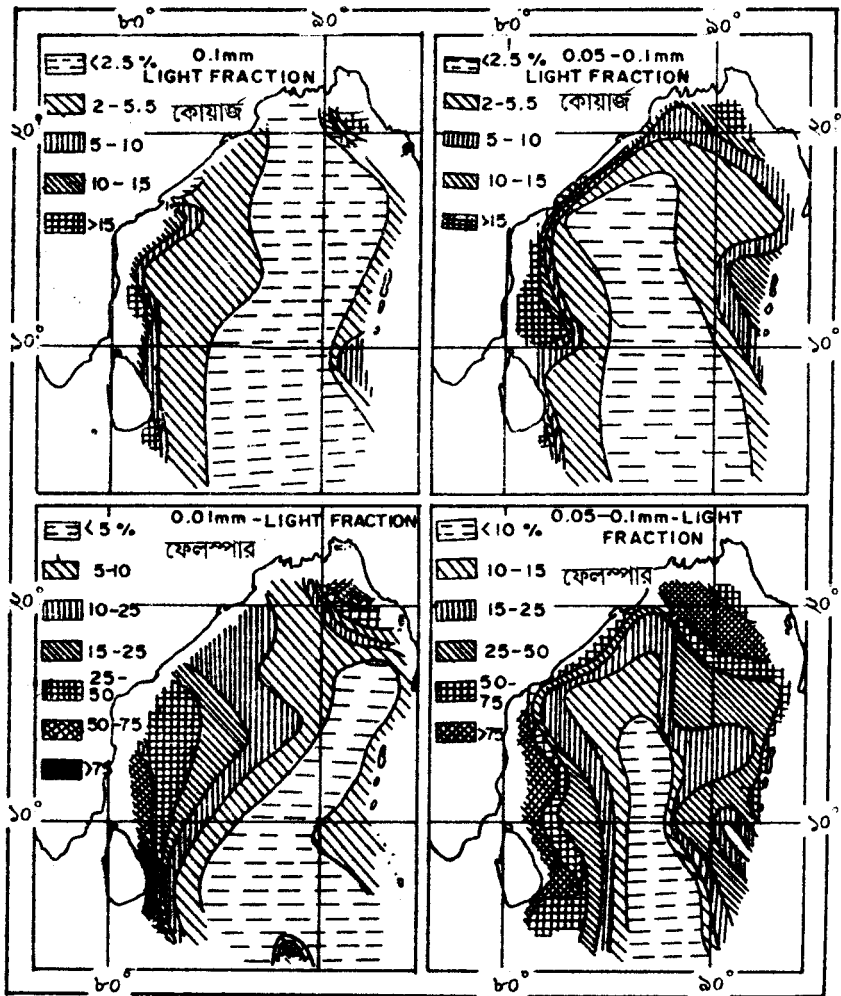
নেপ্রোচনভ (১৯৬৪) ভূকম্পীয় পদ্ধতি দ্বারা নির্ণয় করেন যে, বঙ্গোপসাগরের পললের স্তর ২.৫—৩.০ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ দিকে ১.৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পুরু। উপসাগরের ৭৫% তলদেশ কদম মাটি দ্বারা আবৃত। উপকূলের দিকে বালি ও মাটির

তলানি পড়ে; মহীসোপানে পঙ্ক, বালির অবক্ষেপ পড়ে বিশেষ করে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায়। বঙ্গোপসাগরের ৭৫% অংশের অবক্ষেপে রয়েছে ১০% CaCO_3 ক্যালসিয়াম কার্বনেট। এ শতকরা অংশ কেন্দ্রের দিকে বৃদ্ধি পায়, সেখানে উপসাগরের ২৫% ভূমিতে কার্বনেট পললে আবৃত। উচ্চ কার্বনেট পললে আছে মাটি ও পঙ্ক আর উপকূলভাগের কার্বনেটে ফোরামিনিফেরাল (Foraminiferal) বালি রয়েছে। কার্বনেটের বিতরণ দেখে বুঝা যায় এটি জীবগঠিত উপাদান থেকে প্রাপ্ত। (চিত্র-৫.১৪—৫.১৭)।



চিত্র ৫.১৫ : ফোরামিনিকেরা এবং ক্যালসারিয়াস খণ্ড বিতরণ

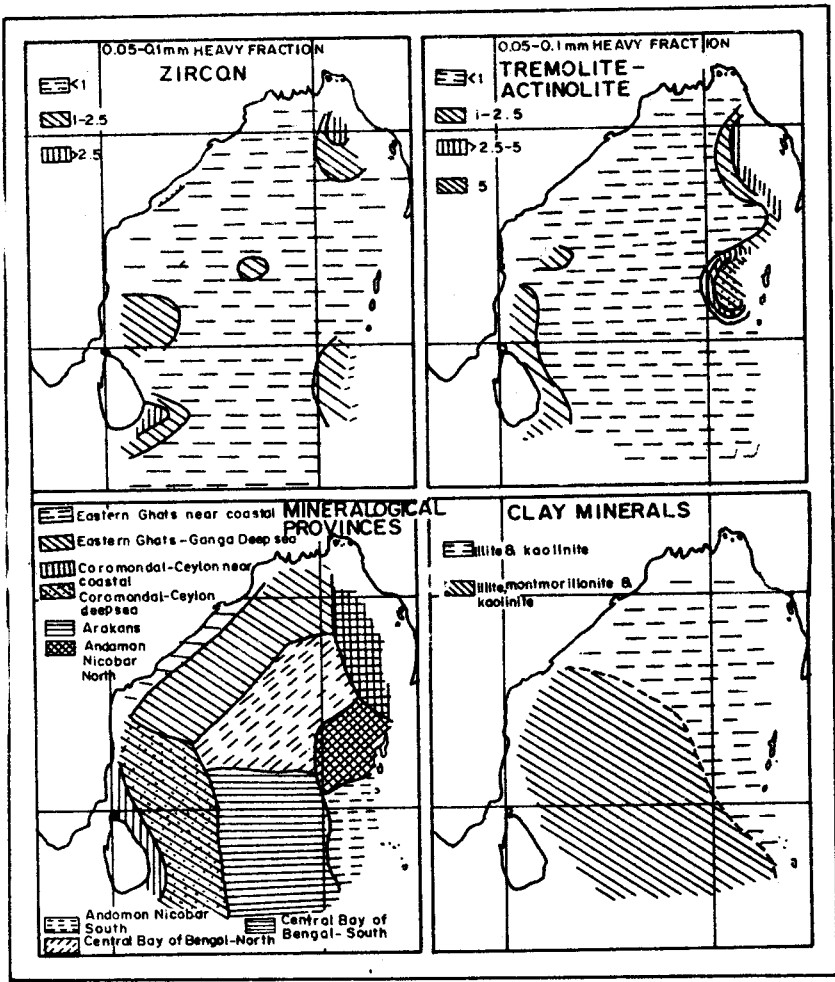
আন্দামান উপকূলের পক্ষ পলল গাঙ্গেয় অববাহিকার মতই। কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ফোরামিনিফেরা এবং ক্যালকেরিয়াম (৫০% CaCO_3) অবক্ষেপ বেশি। এখানে স্থলভাগের দ্রব্যাদি এবং অদ্রব্য বস্তুর পরিমাণ কম অথচ উপকূলভাগে এদের পরিমাণ বেশি। তাছাড়া এসিড দ্বারা পরীক্ষিত অবক্ষেপ আছে কোয়ার্টজ, কেলস্পার, শিলা টুকরা এবং বেড়িয়োলাবিয়া। ভারি খনিজের মধ্যে ফেলস্পার, হর্ণব্লেন্ডে, মাইকা, পাইরোক্সিন, এপিডোট, গার্নেট, ওপাক, সিলিম্যানাইট, টুরমালাইন, জিরকোন,



চিত্র : ৫.১৬ কোয়ার্টজ ও ফেলস্পার অবক্ষেপ বিতরণ

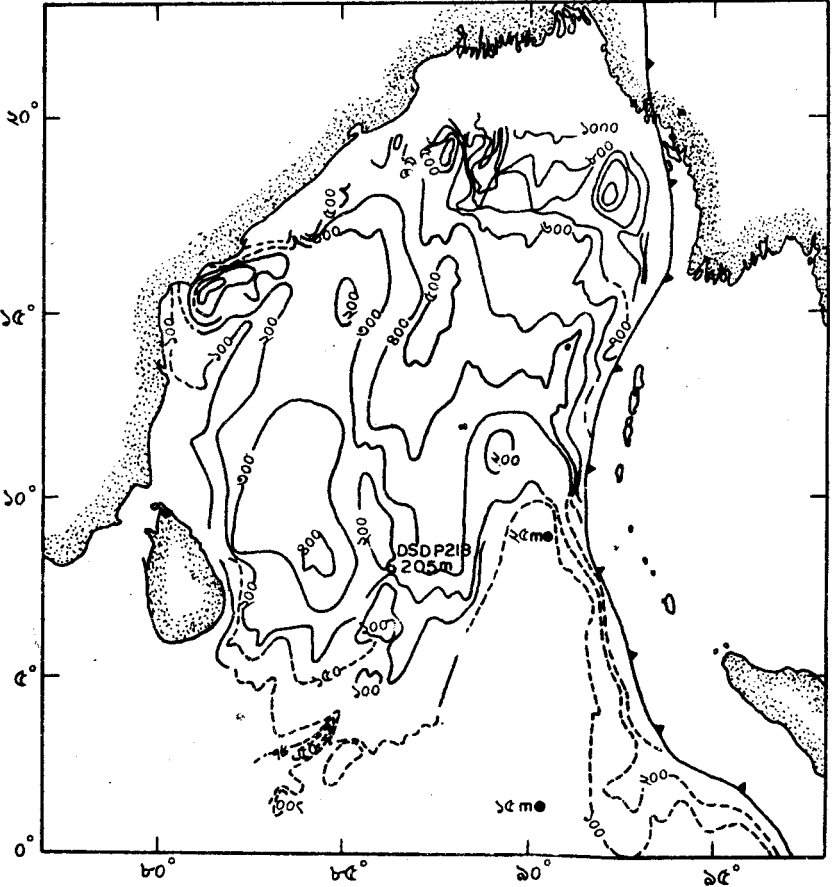
ট্রেমোলাইট- একটিনোলাইট ইত্যাদি। এলাকাভিত্তিক ইলাইট, কাওলিনাইট এবং মন্টমরিলোলাইট অবক্ষেপ পড়ে। তাছাড়া রয়েছে মিশ্র স্তরবিশিষ্ট খনিজ ও ক্লোরাইট। এ সম্পর্কে আগেই আলোকপাত করা হয়েছে।

কারে এবং ম্যুর (১৯৭১) হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, বর্তমানে যে হারে পলল প্রবাহ হিমালয় থেকে ভেঙ্গে চুড়ে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীগুলো দিয়ে বঙ্গোপসাগরে চলে আসছে এতে বুঝা যায় হিমালয় (উৎস) এলাকায় নগ্নীভবন (denudation) হচ্ছে প্রতি



চিত্র : ৫.১৭ জিরকন, ট্রেমোলাইট-একটিনোলাইট, খনিজ শিল্প এবং কর্দম মাটি বিতরণ।

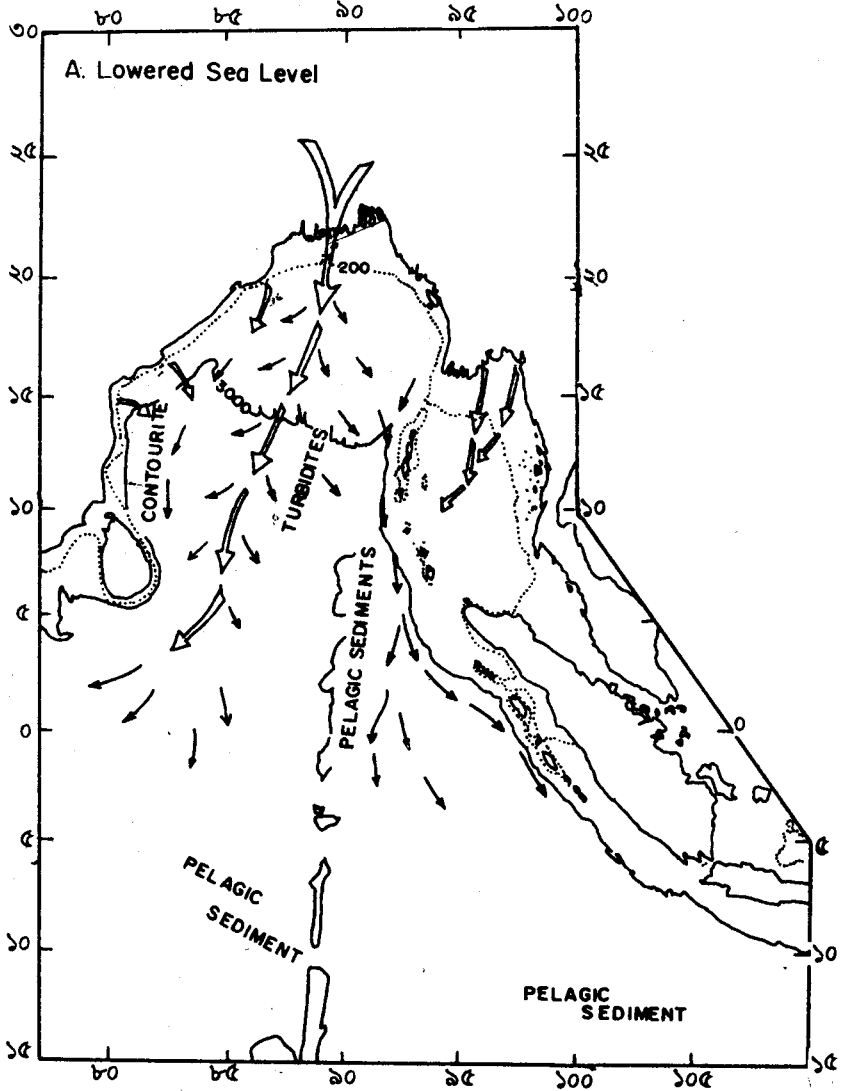
হাজার বছরে ৭০ সেন্টিমিটার এলাকা। এ হার ধরে অতীতকালে এক্সট্রাপোলেশন বা বহির্বিস্তার করলে দেখা যাবে বঙ্গোপসাগরের অসম স্তর দুটির বয়সকাল একটির ১৮ লাখ বছর (প্রাইস্টোসিন) আরেকটি ৭০ লক্ষ বৎসর আগের। হিমালয়ের গিরিজনিক (Orogeny) সময়কালের সঙ্গে এই হিসাব মিলে যায়।



চিত্র ৫.১৮ : কোয়াটারনারী অবক্ষেপের সমবেধ ম্যাপ (মিটারে)।

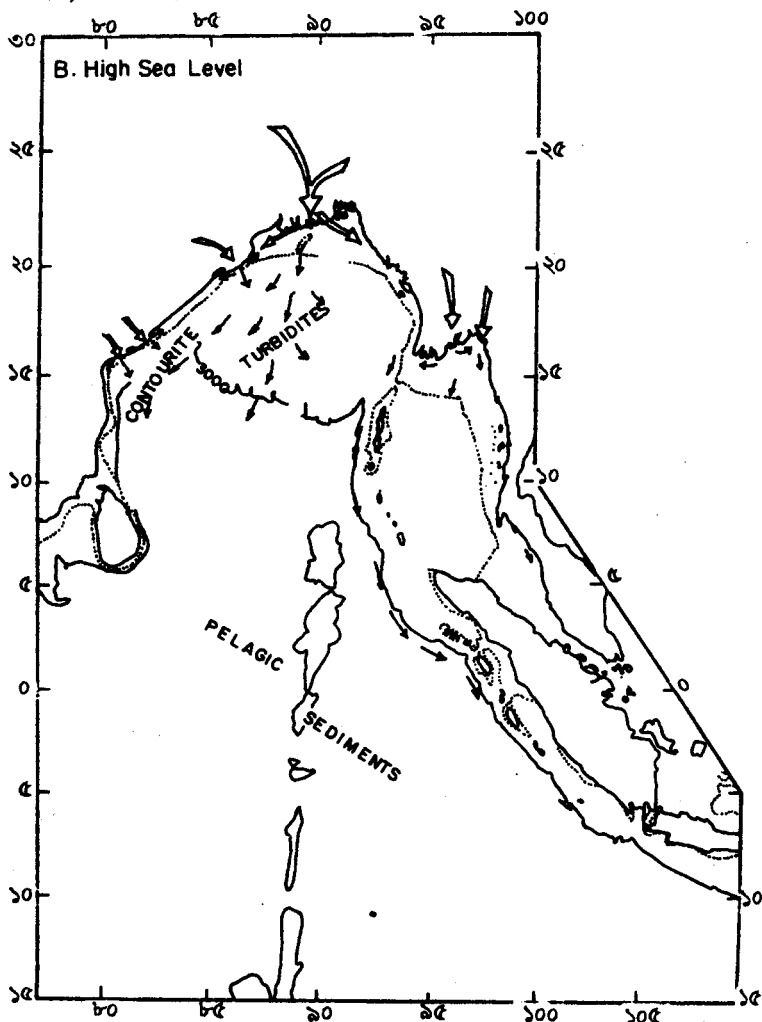
ভূতত্ত্ববিদ কারের অন্য হিসেবে (১৯৮২) কোয়াটারনারী অধিযুগে (১৮ লক্ষ থেকে ১ কোটি বা ২ কোটি ৭০ লক্ষ বৎসর পর্যন্ত) বঙ্গোপসাগরে অবক্ষেপের পরিমাণ দেখানো হয়েছে (চিত্র ৫.১৮)। এই প্রাইস্টোসিন- কোয়াটারনারী (১৮ লক্ষ-৬০ লক্ষ)

যুগের পললের নিচের স্তরে গভীর খনন প্রকল্পের বদৌলতে প্রাচীন প্রণালী আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু কোয়ার্টারনারীকালে পরিত্যক্ত এবং পরিপূর্ণ এমনি প্রণালীর প্রাচুর্য লক্ষ্য করা গেছে। প্রণালীর এত আধিক্য দেখে মনে হয় ১০ লাখ বৎসর আগে (প্রাইস্টোসিন) সমুদ্র সমতল খুব নিচে ছিল। তাই গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র (ভারতের অন্যান্য নদীসহ) নদীগুলোর



চিত্র ৫.১৯ : সমুদ্রতল নীচু থাকাকালীন কোয়ার্টারনারী অবক্ষিপের রূপ এবং বিস্তরণের ধরন।

সব পলল সরাসরি মহীঢ়াল দিয়ে বঙ্গ অববাহিকায় পড়তো। পলল সরবরাহের হার সম্ভবত খুব বেশি ছিল এবং এর প্রায় সবটাই বেঙ্গল ফ্যানে চলে গেয়েছিল (চিত্র ৫.১৯)। বিপরীত দিকে সমুদ্র যখন আরো উঁচু ছিল আজকের দিনের মত (দুই হিমযুগের মধ্যবর্তীকালে) তখন পললের অধিকাংশই নদীগুলোর মোহনায় বহীপ অঞ্চলে আটকা পড়ে যায়, ফলে খুব কম পললই ফ্যান এলাকায় প্রবেশ করে (চিত্র-৫.২০)। ঘন স্রোতের তৎপরতা হ্রাস পায়, তাই সমুদ্রতল নিচে থাকার সময়



চিত্র : ৫.২০ আন্তঃ হিমবাহ যুগের উঁচু সমুদ্রতল থাকাকালে কোয়াটারনারী অবশ্কেপের বিতরণের ধরন।

ঘন স্রোতের অতিরিক্ত তৎপরতার দরুন গঠিত প্রণালীগুলো আন্তে আন্তে পূর্ণ হয়ে যায় বেঙ্গল ফ্যানের নিকটবর্তী অংশগুলোতে। ফ্যানের সংলগ্ন অংশগুলোর পাড় পললের দ্বারা উপচে উঠে, তাই প্রাচীন প্রণালীগুলো পরিত্যক্ত হয় এবং নতুন প্রণালী সৃষ্টি হয়।

ইদানীংকালের গবেষকরা (Chauhan, et, al, 1992) মধ্য বঙ্গোপসাগরে আন্দামান দ্বীপের উত্তরে ২৭১৩ মিটার গভীরে ৫.৪০ মিটার লম্বা একটি আদি পাথরের (Core) নমুনার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, জৈব কার্বন এবং মৌল গাঢ়মাত্রার তারতম্য ও আন্তঃসম্পর্কীয়তা এই দেখায় যে, উক্ত পাথরের ৪০ সেন্টিমিটার আনুভূমিক হচ্ছে হলোসিন এবং প্লেইস্টোসিন যুগের সীমানা। গড় অবক্ষেপ হার বৎসর প্রতি ৪ সেন্টিমিটার। ৪০ সেন্টিমিটার সমতলে উপরে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের পরিমাণ দ্বারা বোঝায় উক্ত সময়ে সমুদ্র উঁচু হয়ে উঠেছিল, ফলে নদীগুলোর পলল আর বঙ্গোপসাগরে বেশি হারে জমতে পারেনি। আদি পাথরটির ৪০ সেন্টিমিটার উপরের অংশে ম্যাঙ্গানিজ ও মন্টমরিলোমাইট বেশি আছে যা হলোসিন সময়কাল শুরু হওয়ার পর থেকে নদীগুলো বঙ্গোপসাগরকে দান করেছে।

ক্লশ গবেষক ইসায়েড (১৯৬৪) এর গবেষণার ফল ২৫ নং সারণিতে দেয়া হলো।

সারণি ২৫ : মধ্য বঙ্গোপসাগরের পললের রাসায়নিক বিশ্লেষণ

দিগন্ত (সে: মিঃ)	গভীরতা মিটার	পললের বৈশিষ্ট্য	অর্দ্রতা (%)	Fe ²⁺ (%)	Fe ³⁺ (%)	MuO ₂ (%)	S ²⁺
৫-১১	৩৪৯৫	কর্দম, হাই-বাদামী	৬৪.৫৭	-	০.৭১	০.৮৭	-
৫২-৬২		এলব্রিট-কর্দম, কালো	৫৭.২৯	০.৭৮	০.১২	-	-
১৫০-১৭০		এলব্রিট, হাইড্রোটাইলিট	৪২.৭২	১.৬৬	০.১৬	-	০.০০২
৩০০-৩২০		বড় এলব্রিট (Alevrit)	২৬.৫০	০.৮৭	০.১০	-	০.০০৪
৪২৫-৪৪৬		কর্দম, কালোবাদামী, হাইড্রোটাইলিট	৪০.০০	১.৮৬	০.১৫	-	০.০০৪৪
৬৪০-৬৬৫		কর্দম, কালোবাদামী, হাইড্রোটাইলিট	৪১.৮১	২.১৯	০.১৩	-	০.৭১
২-১৩	৩১০৩	চুন, এলব্রিট কর্দম হালকা ধূসর	৫৫.৩৪	০.৪	০.৪৮	-	-
৬০-৭০		কর্দম, ধূসর	৪২.৬০	১.৩৪	০.১৮	-	-
২০০-২১৭		কর্দম, ঘন ধূসর, গছকের গছ	৪০.৬৩	১.৬৯	০.১৭	-	০.০০৪
৩০১-৩১২		চুন, এলব্রিট কর্দম, ঘন ধূসর, হাইড্রোটাইলিট, গছকের গছ	৩৬.৭৪	১.৭৫	০.১২	-	০.০৪০
৩৯৫-৪০৫		ঐ, গছকের গছ নেই	৩৫.৭৬	১.৩২	০.১১	-	০.০২৫

অপর রুশ গবেষক Zhelezova (1964) উত্তর বঙ্গোপসাগরের তলানির পদার্থের জারন বিজারনের ক্ষমতা নির্ণয় করেন। এটি জানার দরকার পড়ে খনিজ গঠনের জন্য রাসায়নিক ক্রিয়ার অবস্থা জানার জন্য। তিনি ৩৪৮২ মিটার গভীরে অবক্ষিপের pH নির্ণয় করেন ৭.২০ থেকে ৭.৫৪ অর্থাৎ নিরপেক্ষের একটু উপরে। ২০২৯, ৩৫০৯ মিটার গভীরেও একই ফলাফল। ৩১৯৮ মিটার গভীরতা থেকে ১৭১০ মিটার পর্যন্ত pH ৭.১৪—৭.৬৮ অর্থাৎ নিরপেক্ষের একটু উপরে ক্ষারের দিকে।

পরিশিষ্ট-১

প্রাসঙ্গিক পরিভাষা পরিচিতি ও ব্যাখ্যা

সমুদ্র বিষয়ক আলোচনায় প্রয়োজনীয় ১২৪টি বৈজ্ঞানিক নামের অর্থ এখানে ইংরেজি বর্ণনানুক্রমে দেওয়া হলো। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিস্তৃত পরিচিতও দেওয়া হয়েছে। বাংলা পরিভাষাগুলো বাংলা একাডেমী ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত বিষয়ভিত্তিক পরিভাষা কোষ ও বিভিন্ন অভিধান থেকে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া মুহাম্মদ ইনায়েত হোসাইন প্রণীত 'বৈজ্ঞানিক শব্দকোষ' (১৯৭৯, ১৯৮২, ৫৭৮ পৃষ্ঠা) এবং সাহিত্য সংসদ কলিকাতা, সংকলন গোলোকেন্দ্র ঘোষ-এর 'সংসদ বিজ্ঞান পরিভাষা কোষ', (১৯৯৩, ৩০৩ পৃষ্ঠা) ইত্যাদি গ্রন্থও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

A

Abyssal : অতল সমুদ্র, পাতালিক। গভীর সমুদ্রের ২০০০ থেকে ৬০০০ মিটার গভীরতায় অবস্থান।

Abyssal plain : পাতালিক সমতল। সমুদ্রের ৩৫০০ মিটার গভীরতার নিচে অবস্থিত সমুদ্র তলের সমভূমিকে বোঝায়, তবে সমুদ্রের খাদকে বুঝায় না।

Agar agar : আগার। সমুদ্র শৈবাল থেকে পাওয়া যায় এবং ব্যাকটেরিয়া কালচারে, ওষুধে, আঠা প্রস্তুতকরণে এবং জেম, জেলি বানানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

Antarctic circle : কুমেরু বৃত্ত। দক্ষিণ মেরুকেন্দ্রিক একটি বৃত্ত রেখা, যাঁর সাহায্যে দক্ষিণ মেরু অঞ্চল চিহ্নিত করা হয়। এ বৃত্তের অক্ষাংশ : দক্ষিণ ৬৬°৩০'।

Antarctic Convergence : কুমেরু অভিসৃতি। দক্ষিণ মেরুর ৫০°/৬০° অক্ষাংশের মধ্যে সঙ্গীর্ণ সর্পিলা অঞ্চল যা এক্টার্কটিকার আবৃতকারী ঠাণ্ডা পানিকে নিরক্ষীয় অঞ্চলের গরম পানি থেকে আলাদা রাখে।

Anti-trade winds : স্থিরপথ প্রতি বায়ু। উত্তর গোলার্ধে নিরক্ষ অঞ্চল মুখী, উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসা স্থিরপথ বায়ু এবং দক্ষিণ গোলার্ধে নিরক্ষ-অঞ্চলমুখী দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে আসা স্থিরপথ বায়ু মিলিত হয়। নিরক্ষ অঞ্চলে এ মিলিত বাতাস পৃথিবীর স্পর্শ ছেড়ে বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বতর স্তরে ওঠে এবং স্থিরপথ বাতাসের অভিমুখের বিপরীত অভিমুখে প্রবাহিত হয়। উর্ধ্বতর স্তরের এ বাতাসকে (উত্তর গোলার্ধেই) স্থিরপথ প্রতিবায়ু বলে। দুই গোলার্ধেই এ বাতাস অশ্বাক্ষ (horse latitudes) বরাবর আবার নিচে নামে এবং পৃথিবীর তল ঘেঁষে 'স্থিরপথ বায়ু' হিসেবে নিরক্ষ অঞ্চল অভিমুখে চলে। অতএব পৃথিবী পৃষ্ঠের কাছে যা 'স্থিরপথ বাতাস' নামে পরিচিত, তারই গতিপথের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় (দুই গোলার্ধেই) উর্ধ্বতর স্তরের প্রতি বায়ুতে। দুই গোলার্ধের দুই অশ্বাক্ষ বরাবর ঐ প্রতিবায়ুর স্রোত দুটি অত্যন্ত গুরু অবস্থায় পৃথিবীর তল স্পর্শ করে এবং মরুভূমির জন্ম দেয়।

Archipelago : দ্বীপমালা। দ্বীপসমূহের একটি গ্রুপ বাছারা দ্বীপ শৃঙ্খল বুঝায়।

Area, the : অঞ্চল। জাতীয় সার্বভৌমত্বের বাইরে অর্থাৎ মহীসোপানের বাইরের অঞ্চলকে বুঝায়।

‘সমুদ্রের আইনে’ UNCLOS III এ এটির নতুন আইনগত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

Arctic Circle : সুমেরু বৃত্ত। উত্তর মেরু কেন্দ্রিক একটি বৃত্ত রেখা, যার সাহায্যে উত্তর মেরু অঞ্চল চিহ্নিত করা হয়। এই বৃত্তের অক্ষাংশ উত্তর ৩৬°৩০’।

Asthenosphere : অ্যাসথিনো মণ্ডল। ভূ-ত্বকের উপরের আচ্ছাদন-এর অর্ধগলিত স্তর যার উপরে ভূত্বকীয় প্রেট নড়াচড়া করে।

Atoll : বলয় শিরা। সমুদ্রের বুকে দৃশ্যমান বলয়াকার অথবা অস্থষ্কুরাকৃতি শিরাকে ‘বলয় শিরা’ বলে। সম্পূর্ণ আকারটি সাধারণত অগ্নি অবস্থায় থাকে না। বলয় শিরার আংশিক বেষ্টিত জলরাশিকে উপহ্রদ বলে। অনেক বলয় শিরার অন্তর্গত উপহ্রদে এক বা একাধিক দ্বীপ আছে। বলয় শিরার আকার সব সময়ে নিখুঁত বলয় বা অস্থষ্কুরাকৃতি হয় না। বৃহত্তম বলয় শিরাটি মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত। এটির আয়তন ৮৪০ বর্গমাইল। গভীর সমুদ্রের বুকে যেসব বলয় শিরা দেখা যায়, তাঁরা সম্ভবত মৃত এবং ডুবে থাকা আগ্নেয়গিরির উপর গড়ে উঠেছে।

B

Basin : পর্যঙ্ক বা অববাহিকা। পৃথিবীর বুকে বিস্তীর্ণ খাত বা গর্ত সমুদ্র বা হ্রদের পানি যা অধিকার করে রেখেছে। কার্যত, সমুদ্র বা হ্রদের তলদেশকেই ‘basin’ বলা হয়।

Bathymetry : গভীরতা মাপন। সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপের বিদ্যা। অতীত যুগে শক্ত দড়িতে বেঁধে কোনো ভারি বস্তুকে পানিতে নামিয়ে গভীরতা মাপা হত। আধুনিক যুগে শব্দের প্রতিধ্বনি গ্রহণের পদ্ধতি চালু হয়েছে। সাগর তলার গভীরতা মাপক মানচিত্রকে bathymetric map বলে। সাধারণত সমোন্নতি রেখার (Contour line)-এর সাহায্যে এই মানচিত্র আঁকা হয়।

Bathypelagic : গভীর সামুদ্রিক অঞ্চল। সমুদ্রের গভীর পানিতে আলো প্রবেশের সীমারেখার পরে কিন্তু অতল সমুদ্রের উপরের অংশটি।

Bathyscaphe : গভীর যান। এক ধরনের জলযান, গবেষণার প্রয়োজনে যা সাগরের যে কোনো গভীরতায় নামতে পারে। পিকার্ড এই যানের উদ্ভাবক। এই যানের এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র গোলাকার কক্ষে দুই বা তিনজন মানুষ কোনোক্রমে অবস্থান করতে পারে। যানটির অধিকাংশ আয়তন জুড়ে থাকে গ্যালোলিনের অনেকগুলো কক্ষ। এদের এবং ব্যালাটের সাহায্যে যানটি পানির গভীরে ডুবতে কিংবা উপরে ওঠে আসতে পারে। মোটর চালিত পাখার (Propeller-এর) সাহায্যে যানটি পানির গভীরেও যে কোনো অভিমুখে ধীরগতিতে চলতে পারে। সমুদ্রের গভীরে অন্ধকার জলকে আলোকিত করার ব্যবস্থা থাকে এবং উল্লিখিত গোলাকার কক্ষের কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য কিছু দূর অবধি দেখা যায়।

Bathy Sphere : আদি গভীরযান বা ডুবোযান। সমুদ্রের গভীরতর দৃশ্য পর্যবেক্ষণের জন্য গোলাকার কক্ষ। ইম্পাতের তৈরি এই কক্ষে দু’জন অভিযাত্রীর স্থান হয়। এ কক্ষের সংলগ্ন কোনো মোটর বা ইঞ্জিন থাকে না। সাগরের বুকে ভাসমান কোনো জলযান থেকে শক্ত দড়ির সাহায্যে এই গোলক জলের গভীরে নামিয়ে দেওয়া হয়। বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে গভীরের অন্ধকার জলকে কিছুদূর পর্যন্ত আলোকিত করা যায় এবং কাঁচের বা গলিত কোয়ার্টজের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা যায়। এই গোলকের সঙ্গে কোনো এঞ্জিন না থাকায় আশপাশে কোনো দিকে এগোতে পারে না। এও উপরেও জাহাজের সঙ্গে সংযোগকারী দড়ি ছিড়ে গেলে আর উঠে আসতেও পারে না। উইলিয়াম বীব (১৯৩০)-এর পরিকল্পনাকারী।

Bay : উপসাগর। সমুদ্রের সুবিস্তৃত খাড়ি। হ্রদের ক্ষেত্রেও 'bay' শব্দটি প্রযোজ্য। কতখানি বিস্তৃতি যথেষ্টই এ সম্পর্কে সংজ্ঞাগত নির্দেশ কিছু নেই। এই প্রসঙ্গে উপসাগর (gulf) অর্থও চলে।

Benthic : তলদেশীয়। সমুদ্রের তলদেশে মহীঢালে ৩০০—৯০০ মিটার গভীর পানিতে যা থাকে।

Benthos : তলজীবী প্রাণীকুল। প্রাণীকুল ও উদ্ভিদকুল।

Bromass : জীবজন্তু। সমুদ্রের যে কোনো অঞ্চলে সামুদ্রিক প্রাণীর জীবন বৈচিত্র্য ও রূপ ভেদ।

C

Calcareons : চুনযুক্ত, চূর্ণকময়, চুনময়। ক্যালসিয়াম কার্বনেট দ্বারা তৈরি।

Calcite compensation' Depth, CCD) : ক্যালসাইট ক্ষতিপূরণীয় গভীরতা। সমুদ্রের এমন গভীরতা যেখানে খেঁচে সমুদ্রের তলদেশের দিকে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সরবরাহ চলতে থাকে, ভারসাম্য রক্ষা করে অর্থাৎ যে গতিতে এটি দ্রবীভূত হয় (৩.৫—৪.৫ কিঃমিঃ গভীরে) তার সঙ্গে সরবরাহের একটা সমতা সম্পর্ক আছে।

Carnivores : মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রাণী। সমুদ্রের স্টীল, সিন্দুঘোটক, তিমি বা মাংসভোজী।

Cephalopod : শিরপদী কষোজ জাতীয় (শামুক)। যেমন কুইড, অট্টোপাস এবং কাটলমাছ যাদের খোলস থাকে না।

Coelenterata : সিলেন্টেরাটা। প্রবাল, সী-অ্যানিমোন এবং জেলি মাছ।

Cape : অন্তরীপ। সমুদ্রের বুকে প্রলম্বিত কোনো দেশ বা মহাদেশের শীর্ষভাগ। দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ শীর্ষে হর্ন অন্তরীপ; ভারতের দক্ষিণ শীর্ষে কুমারিকা অন্তরীপে।

Channel : প্রণালী। সমুদ্রের একটি অপ্রশস্ত অংশ (দুই দেশ বা মহাদেশের মধ্যবর্তী) দু'টি বিস্তীর্ণ সাগরকে যা যুক্ত করে।

Coast : কূল বা উপকূল। কোনো স্থলভাগের প্রান্তদেশ সমুদ্র বা অন্য কোনো বিস্তীর্ণ জলরাশিকে যা স্পর্শ করে।

Contiguous Zone : সংলগ্ন অঞ্চল। ভূমি রেখা থেকে ২৪ কিঃ মিঃ দূর সমুদ্র পর্যন্ত আঞ্চলিক সাগরের নৌ চলাচলের এলাকা। এ পর্যন্ত সীমারেখায়, নৌযানে উপকূলের দেশের কাঁটমস, অভিবাসন, অর্থনৈতিক ও পরিবেশ দৃষ্টীয় ব্যাপারে বিদেশী জাহাজে তল্লাসী চালাতে পারবে।

Continental margin : মহাদেশীয় প্রান্ত/কিনারা। গভীর সমুদ্রের তলদেশ থেকে মহাদেশকে যে সীমানায় আলাদা করা হয় সেই পর্যন্ত; মহীসোপান, মহীঢাল ও উত্থান এর অন্তর্ভুক্ত।

Continental rise : মহাদেশীয় উত্থান। অধিকাংশ মহাদেশীয় প্রান্তে গভীর সমুদ্রে চলে যাবার আগে একটু উপরে উঠে যায়।

Continental Shelf : মহীসোপান। উপকূলবর্তী সমুদ্রের অগভীর তলদেশ; সাধারণত, তীর থেকে এক হাজার ফুট গভীরতা পর্যন্ত সমুদ্রের তলা। এর বিস্তৃতি স্থান বিশেষে বিভিন্ন; গভীরতা হঠাৎ বৃদ্ধি পেলে এই 'সোপান' বা 'তাক' অপ্রশস্ত হয়।

Continental slope : মহীঢাল। মহীসোপানের পর থেকে ১০০০০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত সমুদ্রের তলদেশ। এর বিস্তৃতিও স্থানবিশেষে বিভিন্ন। যে অঞ্চলে গভীরতা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানে মহাদেশিক ঢাল সুবিস্তৃত; যেখানে গভীরতা হঠাৎ বৃদ্ধি পায় সেখানে অবশ্যই অত বিস্তৃত নয়।

Copepoda : কপোপোডা। ক্ষুদ্র দৃঢ়ত্বকী জীব (Crustaceans)। কঠিন খোলস দ্বারা আবৃত প্রাণী (চির্ঘড়ি, কাকড়া), এদের একটি চোখ, খোলক নেই, দাঁতের মত সঁতার কাটার পা নেই। সমুদ্রের প্রায়শঃটনের শতকরা ৭৫ ভাগই কোপেপড। এরাই উদ্ভিজ্জ বস্তুকে প্রাণীজ মাংসে পরিণত করে।

Curi point : কিউরি বিন্দু। গলিত চৌম্বকীয় খনিজকে ঠাণ্ডা করতে যে তাপমাত্রা লাগে। এতে খনিজ দ্রব্যটি চৌম্বকীয় ক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়। এই তাপমাত্রার উপরে চুম্বকত্ব লোপ পায়।

D

Demersal : তলচারী। সমুদ্রের তলদেশে তলদেশ বিহারী মাছকে বলা হয়।

Deep : কূপ। সমুদ্রের নিচের গভীর খাত বা গহ্বরের (trench) এর ভিতরের আকস্মিক গভীর অংশকে 'deep' বলা হয়। কিন্তু খাতের ভিতরে না হয়ে সমুদ্রের তলায় যে কোনো অঞ্চলেও কূপ থাকতে পারে। অবশ্য, খাত বা গহ্বরগুলো দৈর্ঘ্যে খুব ছোট হলেই তারা কার্যত কূপ হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীর গভীরতম বিন্দুটি অবস্থিত ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চের অন্তর্গত 'চ্যালেঞ্জার ডিপ'-এ। বলাবাহুল্য, deep বা কূপের চারপাশের দেয়াল খুবই ঢালু, প্রায় লম্ব হয়।

Deposition : অবক্ষেপ। পানি অথবা বাতাসে প্রাকৃতিকভাবে বাহিত বস্তুকণা থিতিয়ে পড়ার ঘটনা, কিংবা ঐ থিতিয়ে পড়া বস্তুকে অবক্ষেপ বলে। পৃথিবীর সব জঞ্জাল সমুদ্রে জমা হয়।

Detrital deposits : কর্মরীয় বা কাঁকর জাতীয় ভাণ্ডার। শিলার ক্ষয় এবং বিচূর্ণীভবনের ফলে অধঃক্ষেপণীয় পালন।

Deuterium : হাইড্রোজেনের আইসোটন। ভারি পানি।

Diatam : ডায়টম। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জলজ, উদ্ভিদ যার সিলিকা খোল আছে। সমুদ্রের তলদেশে পুরু সিলুম বা কর্দমা (ooze) জমা হয়।

Doldrums : নিম্নচাপ বলয়। পৃথিবীর নিরক্ষ রেখাবর্তী নিম্ন বায়ুচাপের অঞ্চল। উত্তর গোলার্ধে উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে আসা 'স্থিরপথবায়ু' (trade winds) নিরক্ষ অঞ্চলে মিলিত হয়ে উপরে উঠে যায়। এ কারণে, এই অঞ্চল প্রধানত বাতাসহীন এবং বায়ুচাপও কম (প্রখর সূর্য রশ্মির দরুন)। এখানে প্রচণ্ড ঝড় হয়, প্রচুর বৃষ্টিপাতও হয় বাতাস উপরে উঠে খুব ঠান্ডা হয়ে যাওয়ায়। পালতোলা জাহাজের যুগে নিরক্ষ অঞ্চলের সমুদ্রকে এড়িয়ে চলা হতো বাতাসহীনতার জন্যই। মোটামুটিভাবে নিরক্ষরেখার অঞ্চলে অবস্থান করলেও এই নিম্নচাপের অঞ্চলের অবস্থান বছরের বিভিন্ন সময়ে কিছুটা সরে যেতে পারে সূর্যের ভ্রমণ পথের পরিবর্তন অনুসারে, যদিও সূর্য যতখানি সরে যায় ততটা নয়।

Drift net : সঞ্চরণ জাল। নিশ্চল ফুলকা জাল ভাসানী (floats) দ্বারা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ঝুলতে থাকে।

E

Echinoderma : একিনোডারমা। সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণী, স্টারকিস, ব্রিটল স্টার, সী-আর্চিন, সী-লিলি এবং সমুদ্র শশা।

Echosyplem : প্রতিধ্বনি পদ্ধতি। উদ্ভিদ জগৎ এবং প্রাণী জগতের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এর পরিবেশ।

Epipelagic : মধ্য সাগরের উপরিবর্তী অঞ্চল। সমুদ্র পৃষ্ঠদেশ থেকে ১০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত যেখানে সালোকসংশ্লেষণ ঘটে।

Estuary : খাড়ি। নদীর মোহনা— যেখানে সমুদ্রের জোয়ারভাঁটার ক্রিয়া স্পষ্ট বোঝা যায় এবং যেখানে নদীর জল লবণাক্ত জলে এসে মিশে। স্থলভাগে আংশিকভাবে আবদ্ধ সমুদ্রের ক্ষুদ্র অংশকেও 'estuary' বলা হয়। খাড়িকে উপকূলবর্তী উপদ্রুদও বলা যায়। 'Estuarine Oceanography' দ্রষ্টব্য।

Euphotic Zone : আলোকিত অঞ্চল। সমুদ্র পানির উপরের স্তর, যেখানে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পতিত হয় ফলে প্রাণী জীবন ধারণ করে। ৫০—১০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত এর আওতা।

Fathom : ফ্যাদম। দৈর্ঘ্যের একক। ১ ফ্যাদম ৬ ফুট। সমুদ্রের গভীরতা মাপার কাজে এই একক আগে ব্যবহৃত হতো।

Food chain : খাদ্য শৃঙ্খল। বিভিন্ন দেহ সমষ্টি একে অপরের উপর নির্ভরশীল ও পরস্পরের সঙ্গে খাদ্য পিরামিডের শৃঙ্খলে জড়িত। বড় প্রাণী ক্ষুদ্র প্রাণীকে খাবার হিসাবে গ্রহণ করে। শৈবাল থেকে শুরু করে হাঙ্গর পর্যন্ত এ খাদ্য শৃঙ্খল প্রচলিত রয়েছে সমুদ্রে।

Fracture Zone : ভঙ্গিল অঞ্চল। ভূপৃষ্ঠের বিরাট বিচ্যুতি বা ঝলন যার ফলে সমুদ্র তলদেশের অসম ভূ-সংস্থান গঠন হয়, সাথে খাড়া পার্শ্বীয় শিরা, খাদ এবং খাড়া ঢাল (escarpment) থাকে।

G

Geodesy : জিওডেসি। পৃথিবীর মাপ ও আকার নির্ণয়ের বিদ্যা।

Gill nets : গিল নেট। কঞ্চ, ফুস্কা, কানকুয়া, তরঙ্গ; সাতার কাঁটা মাছকে আটকানোর জন্য ফুস্কা জাতীয় জাল। পানির মধ্যভাগে বা তলদেশে স্থাপন করা হয়।

Glacier : হিমবাহ। মধ্যাকর্ষণের প্রভাবে পর্বতের হিন-রেখার (snowline) উপর থেকে উপত্যাকাপথে ধীরে ধীরে বয়ে আসা তুষার রাশি। হিমবাহের গভীরতা সাধারণত নদীর তুলনায় বেশি হয় তা একেবারে নিচের স্তরে তুষার উপরের স্তরে চাপে গলে যেতে পারে, যেহেতু চাপের ফলে হিমাক্ত (freezing point) আরও নেমে যায়। হিমবাহ সাধারণতঃ তুষার রেখা ছাড়িয়ে নেমে আসে অনেক নিচে, এবং উষ্ণতার আধিক্যে গলতে থাকে। এই গলনের পরিমাণ এবং উপর থেকে নেমে আসা তুষারের পরিমাণ যেখানে এসে সমান হয়, সেই অবধি এসে হিমবাহ শেষ হয়। হিমবাহের গতি খুব ধীর।

Gulf : উপসাগর। উপসাগর (bay) দ্রষ্টব্য। অভিধান অনুসারে বৃহৎ 'bay' কে 'gulf' বলা উচিত। কিন্তু বাস্তবে বিপরীত। Persian Gulf, Gulf of Aden, Gulf of Bothnia ইত্যাদির তুলনায় Bay of Bengal, Hudson Bay অনেক বড়।

Guyot : গ্যায়ট। অতল সমুদ্রের সমতলে চ্যাপ্টা মাথা পর্বত।

Gyre : চক্রাগতি, কুণ্ডলী, মোচড়ানো। সমুদ্রস্রোতে কয়েকশ' কিলোমিটার ব্যাসার্ধ ধরে যে বৃত্তাকার বা Spiral সর্পিল প্রবাহ।

H

Herbivores : তৃণভোজী। তৃণ বা ঘাস খায় এমন জীবাণু।

High seas : গভীর সমুদ্র। একান্ত অর্থনৈতিক এলাকার ২০০ মাইলের বাইরে বহিঃসমুদ্রের যে সীমানায় সমুদ্র বা মহাসাগর অবস্থিত।

Horse latitudes : অশ্বাক্ষরেখা। উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের দু'টি উচ্চচাপ বলয়। প্রত্যেক গোলার্ধে এই অঞ্চল কার্যত 'স্থিরপথ বায়ু' এবং 'পশ্চিমী বায়ু' (Westerlies) এর মধ্যবর্তী অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত। দুটি বায়ু স্রোতের মধ্যবর্তী এই অঞ্চল বাতাসহীন বা মৃদু বাতাসের অঞ্চল হিসাবে পরিচিত। অতীতের পালতোলা জাহাজ এইখানে এসে পড়লে বাতাসের অভাবে দীর্ঘকাল গতিহীন হয়ে থাকত। তখন আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডজে চালানোর জন্য যেসব ঘোড়া মজুত থাকতো, তাদের সমুদ্রে ফেলে দিতে হতো খাদ্যের অভাবে। তাই অশ্বাক্ষর রেখা নাম হয়েছে।

Hot spot : উষ্ণ বিন্দু। অশু বা শিলা মণ্ডলে আগ্নেয় ভাগ-এর সীমাবদ্ধ স্থান যার নিচে ম্যাগমার শিখা (Plumes) ভূঅভ্যন্তর থেকে বাইরে নির্গত হয়।

Hydrosphere : বারিমণ্ডল বা জলমণ্ডল পৃথিবীর পানি থাকে সমুদ্রে, ভূমিতে এবং ভূঅভ্যন্তর ভাগে এবং বায়ুমণ্ডলে বাষ্প আকারে।

I

Ice age : হিমযুগ বা তুষার যুগ। ভূগোলকের ৪৬০ কোটি বছরের প্রায় ৮০ শতাংশ কাল ধরে বায়ু মণ্ডল ও জলমণ্ডলের অস্তিত্ব। এই বিপুল সময়ের বেশির ভাগটাতাই কিন্তু ভূপৃষ্ঠে কোনো হিমবাহ ছিলনা। শুধু মাঝে মাঝে মেরু অঞ্চল এবং উচ্চ অক্ষাংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বরফে ঢাকা পড়ে যেত। এ বিশেষ সময় গুলোকেই হিমযুগ বলে। তুষার যুগের কাল পরিসর কয়েক লক্ষ থেকে কয়েক নিযুত বর্ষ। (চার্ট দ্রষ্টব্য)

বৎসর আগে-	বর্তমানের তুলনায় সাগর পৃষ্ঠের গভীরতা (মিটারে) ছিল
১০০০০ "	২০-৪০ মিটার
১৩০০০ "	৬৮ মিটার
২০০০০ "	৯০ মিটার
৩০০০০ "	৪০ মিটার
৩৩০০০ "	৬২ মিটার
৩৮০০০ "	৪২ মিটার
৪০০০০ "	৫৮ মিটার
৪৫০০০ "	৩৮ মিটার
৫০০০০ "	৫০ মিটার
৬০০০০ "	৭০ মিটার
৭০০০০ "	৪০ মিটার
৭২০০০ "	২৮ মিটার
৭৫০০০ "	৩৫ মিটার
৮০০০০ "	০ মিটার (আজকের চাইতে একটু কম)
৮৩০০০ "	৬০ মিটার
৮৮০০০ "	২৮ মিটার
৯০০০০ "	৪০ মিটার

এক লক্ষ বছর আগে বর্তমানের তুলনায় সাগর পৃষ্ঠের গভীরতা ১০ মিটার ছিল।

Iceberg : হিমশৈল। সাগরতটীয় হিমবাহ অথবা কোনো উপকূলবর্তী তুষারের তাক থেকে ভেঙে সমুদ্রে ভেসে থাকা তুষার স্তূপকে হিমশৈল বলে। গ্রীনল্যান্ডে হিমবাহ অঙ্গুলি রয়েছে। হিমশৈলের গড় ঘনত্ব ০.৮৯ যার ফলে জলের উপর ভেসে থাকা অংশটি মোট পরিমাণের আট ভাগের এক ভাগের মতো হয়। আগেকার যুগের অনেক জাহাজ (যেমন টাইটানিক) অতিক্রম হিমশৈলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ডুবে গেছে।

Ice-cap বা Ice Sheet : হিমমুকুট। মেরু অঞ্চলে স্থলভাগের উপরে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তুষারের গভীর স্তর। উপরের অংশ সমতল। গ্রীনল্যান্ডের হিম মুকুট ঐ দেশের সবটা অধিকার করে আছে।

Ice island : তুষারদ্বীপ। সুমেরু অঞ্চলের সমুদ্রে ভাসমান অতিক্রম এবং অস্বাভাবিক পুরু তুষার স্থান। হিমশৈলের তুলনায় তুষারদ্বীপ অনেক বেশি মসৃণ। তুষার দ্বীপ কয়েকশো বর্গমাইলের আয়তন বিশিষ্ট হয় এবং দুশো ফুট পর্যন্তও পুরু হয়। তুষার দ্বীপের জন্ম হয় উত্তর কানাডার দ্বীপপুঞ্জ ও গ্রীনল্যান্ডের উত্তর উপকূলে। ৪০০টি এরূপ দ্বীপ আছে।

Interenal Waters : আভ্যন্তরীণ জল। ভূমি রেখা থেকে দেশের মূল ভূখণ্ডের দিকে অবস্থিত সব পানি। এতে উপকূল, নদী বন্দর, আভ্যন্তরীণ নৌপথ সবই অন্তর্ভুক্ত। বিদেশী জাহাজের 'নির্দোষ অতিক্রমণ' নিষিদ্ধ।

Isobar : সমপ্রেশ রেখা। কোনো স্তরে বা তল-এ যেসব বিন্দুতে চাপ সমান (বাতাসের বা পানির) সেই সব বিন্দুর সংযোগকারী রেখা। নির্দিষ্ট ব্যবধানের বিভিন্ন চাপের জন্য অনেকগুলো সমপ্রেশ রেখা মানচিত্রে দেখানো চলে। ৪৫° অক্ষরেখায় ০°C উষ্ণতার ৭৫০.১ মিলিমিটার দীর্ঘ মরু স্তরের চাপকে একবার ধরা যায়।

Isobath : সমগভীর রেখা। সমান গভীরতার সমোন্নতি রেখা।

Isothem : সমোষ্ণতা রেখা। কোনো স্তরে বা তল-এ সমান উষ্ণতা সম্পন্ন বিন্দুগুলোর সংযোগকারী রেখা।

J

Jetsam : জেটসাম। জাহাজের ভার কমানোর জন্য জাহাজ থেকে যেসব মালপত্র সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়; ঐ রকমভাবে নিষ্কিঞ্চ মালের যে অংশ পড়ে ভেসে আসে।

Jettison : জেটিসন। ভার কমানোর জন্য ঝড়ের সময় জাহাজ থেকে মালপত্র পানিতে ফেলে দেওয়া।

K

Kelp : কেপ। বাদামী রঙের সামুদ্রিক বৃহৎ শৈবাল যা alginates এর উৎস হিসেবে কাজে লাগে।

Knot : নট। বেগের একক। প্রতি ঘন্টায় এক নটিক্যাল মাইল। প্রতি সেকেন্ডে ৫০ সেন্টিমিটারের সমান।

L

Lagoon : উপহ্রদ। অগভীর লবণাক্ত জলের হ্রদ। খোলা সমুদ্র হতে বালির তীর বা প্রাচীর দ্বারা অগভীর হ্রদ আলাদা থাকে।

Latitude : অক্ষাংশ/অক্ষরেখা। পৃথিবীর তল-এ কোনো বিন্দুর কৌণিক দূরত্ব বিষুবরেখার সাপেক্ষে।

এ কোলকে ঐ বিন্দুর অক্ষাংশ বলে। সমান কোনো বিশিষ্ট বিন্দুগুলোর সংযোগকারী রেখাকে অক্ষরেখা বলে।

League : লীগ। দৈর্ঘ্যের একক। বর্তমানে অপ্রচলিত। এক লীগ=তিন মাইল বা ৪.৮ কিঃমিঃ। জুলভের্নের সমুদ্রের কুড়ি হাজার লীগ নিচে নামার প্রশ্নই ওঠে না।

Lithosphere : শিলামণ্ডল, অশামণ্ডল। পৃথিবীর বাইরের দিকের শক্ত আচ্ছাদনে যা ভূত্বক এবং গুরুমণ্ডলের (Mantle) সবচেয়ে উপরের অংশ দ্বারা গঠিত। এই দুইটা মিলে Crustal plate গঠিত হয় যা তরল অ্যাসথেনোমণ্ডলের উপরে চলাচল করতে থাকে।

Littoral Zone : বেলা অঞ্চল তট। জোয়ার ও ভাটার মধ্যকার স্থানের উপকূলের এলাকা।

Longitude : দ্রাঘিমা। পৃথিবীর তল-এ কোনো বিন্দুর কৌণিক দূরত্ব-একটি বিশেষ মধ্যতলের (meridian-এর) সাপেক্ষে। সমান কৌণিক দূরত্ব বিশিষ্ট বিন্দুগুলোর সংযোগকারী রেখাকেও দ্রাঘিমা বলে। ঐ বিশেষ মধ্যতলটি গ্রীনিচ-এর মধ্য দিয়ে যায় বলে ধরা হয়।

M

Magma : ম্যাগমা। গলিত আগ্নেয় দ্রব্য।

Mantle : আচরণ (জীব বিজ্ঞান)। কষোজ বা শামুক জাতীয় জীবের দেহ আচ্ছাদনকারী বস্তু যা ঘোলকের ভিতরেই থাকে।

Mantle : গুরুমণ্ডল (ভূবিদ্যা)। ভূত্বকের নিচে শুরু হয়ে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছায়। ভূপৃষ্ঠের ৪০ কিলোমিটার নিচে, সাগরতলের ১০ কিঃ মিঃ নিচে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে ২৯০০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত এই এলাকা।

Mesopelagic Zone : মেসোপেলাজিক এলাকা। সমুদ্রের ২০০ মিটার থেকে ১০০ মিটার গভীরতায় সেখানে সামান্য আলো পৌঁছায় এবং সেখানে তাপমাত্রার তারতম্য অতি সামান্য এমন জীবমণ্ডল।

Mollusc : কষোজ। শক্তখোলক বিশিষ্ট নরম দেহের অধিকারী ছিন্নাংশবহীন প্রাণী। যেমন বড় শামুক (clams), ওয়েস্টার, বিনুক, অট্টোপাস এবং কুইড।

N

Nanoplankton : ন্যানোপ্লান্কটন। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্লান্কটন জীবদেহধারী যথা কোনো প্ল্যাঙ্কটন জালেই ধরা পড়ে না।

Nekton : নেক্টন। সমুদ্রের স্রোতের বাধা পরিয়ে যেসব জীবজন্তু সাঁতার কাটতে পারে, যেমন, তিমি, হাঙ্গর।

Nautical mile : সামুদ্রিক মাইল। সমুদ্র যাত্রায় ব্যবহৃত দূরত্বের (দৈর্ঘ্যের) একক। ১ সামুদ্রিক মাইল = ১.১৫০৮ মাইল = ১.৮৫২০ কিঃ মিঃ। কোনো জলযানের গতিবেগ এক নট (knot) -এর অর্থঃ প্রতি ঘণ্টায় এক সামুদ্রিক মাইল বা সেকেন্ডে ০.৫১৪৪ মিটার গতিবেগ। পৃথিবীর সমান ক্ষেত্রফলের একটি গোলকের যে কোনো একটি গুরুবৃত্তের (great circle) কেন্দ্রে ১ মিনিট (১) কোন ঐ বৃত্তের পরিধির যে দৈর্ঘ্য নির্দেশ করে, তাই এক সামুদ্রিক মাইল।

O

Oceanic Crust : সমুদ্র ত্বক। পৃথিবীর বহির্ভাগের পুরো এলাকা যা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সমুদ্রের নিচে এটি ৮ কিঃ মিঃ পুরু।

Oceanography : সমুদ্র বিজ্ঞান। সমুদ্র বিষয়ক বৈজ্ঞানিক আলোচনার শাস্ত্র। সমুদ্রের পানির বিশ্লেষণ, স্রোত, উষ্ণতা, গভীরতা, তলদেশ, উদ্ভিদ এবং জন্তু, আবহাওয়া ইত্যাদি সবকিছুই এই বিদ্যার অন্তর্গত। সুতরাং এই বিজ্ঞান বস্তুত একটি শাস্ত্র বা বিষয় নয়, অনেক বিষয়ের। যথাঃ ভূ-বিজ্ঞান, আবহাওয়া বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থ বিদ্যা, ফলিত গণিত, ভূগোল, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান ইত্যাদির সহাবস্থান। এমনকি সমুদ্রের উৎপত্তির ইতিহাস, পরিবেশ বিজ্ঞান, আইন বিদ্যা, সমাজ বিজ্ঞানের সঙ্গে সমুদ্রের সম্পর্কবলী ও রাজনীতি, অর্থনীতি ব্যবসা-বাণিজ্য, সংস্কৃতির আদান-প্রদান, নৌ-পরিবহণ, বিশ্রাম, উপকূলীয় অঞ্চলের সব বিষয় ইত্যাদি এখানে স্থান পায়।

‘সমুদ্র বিজ্ঞান’ নামে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান কার্যত গড়ে ওঠে মধ্য ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে। ম্যাথু কন্টেন মরির ‘Physical Geography of the Sea’ কে এই বিষয়ের প্রথম পাঠ্যবই বলে মনে করা হয়। এ সময় ভূগোল বাদে অন্য কোনো দিক নিয়ে তেমন মাথা ঘামানো হত না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কিছু প্রকৃতি বিজ্ঞানী এরেনবার্গ, হমবোল্ট, হকার, ওয়েরস্টেড সমুদ্রের প্রাণী সমাজ নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেন। ডারউইন প্রবাল শিরা পর্যবেক্ষণ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে সমুদ্রকে সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণের রীতি শুরু হয় এবং কার্যত এটাই আধুনিক সমুদ্র বিজ্ঞানের সূচনা। যুক্তরাষ্ট্রের উডস বোল ওসেনোগ্রাফিক ইনস্টিটিউশন এর জাহাজ ‘আটলান্টিস-২’ ক্রিপস ইনস্টিটিউশন অব ওসেনোগ্রাফির জাহাজ ‘আরগো’, ‘ল্যামার্ট জিওলজিক্যাল অবজারভেটরি’র ‘ভেমা’, ফরাসী জাহাজ ‘ক্যালাইপসো’, রামিয়ার ‘ভিটজ’ এবং ‘লমোফোসভ’ সমুদ্র বিজ্ঞান গবেষণায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

Omnivores সর্বভোজী, সর্ব খাদক। যেসব জীবদেহ প্রাণী ও উদ্ভিদ আহার করে থাকে। সিন্দুকামি, সিন্দুমল, ক্ষরণ, কাদা (oze)ঃ সমুদ্রের এমন পলন বা তলানী যাতে ৩০% বেশি বিভিন্ন মাইক্রো জীবের খোলক বর্তমান।

Ovoviviparous : আন্ডজ, ডিম্বজ। নিষিক্ত ডিম যা মাতৃদেহেই ফুটে।

P

Pelagic fish : দূর সমুদ্রচর মাছ। দূর সমুদ্রে সাঁতরে বেড়ায় এমন মাছ।

Pelagic sediments : সৈন্ধব জৈব তলানি। গভীর সমুদ্রের অধঃক্ষেপ যাতে ভূখণ্ডের মোটা দানাকার পদার্থ অনুপস্থিত।

Photic zone : আলোকিত অঞ্চল। সমুদ্রের সবচেয়ে উপরের অংশ যেখানে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে।

Phytoplankton : ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন। সবজী প্ল্যাঙ্কটন। সমুদ্রের অতি ক্ষুদ্র ভাসন্ত জীব প্রাণী এবং যাদেরকে খেয়ে অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী বেঁচে থাকে।

Placer deposits : প্রকীরণক, স্রোতজাত অধঃক্ষেপ। ধাতব খনিজ কণা অনেক সময় বালু ও কাকরের স্তরে জমা হয়ে যায় সাধারণত নদীতে ও সমুদ্র সৈকতে। যেমন মোনাজাইট, ইলমেনাইট, রুটাইল ইত্যাদি।

- Plankton** : প্ল্যাকটন। সূক্ষ ক্ষুদ্র ভাস্কর্য এবং সঞ্চরণশীল উদ্ভিদ ও প্রাণী জগত যা সমুদ্রে বাস করে।
- Plate tectonics** : প্লেট বা ফলক ভূগঠন প্রণালী। পৃথিবীর শিলা মণ্ডলটি কয়েকটি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র প্লেটে বিভক্ত এবং এরা গতিশীল সেন্টিমিটার/বৎসর প্রতি) এমন তত্ত্ব।
- Polyp** : বহুবাদ, নাকের আব, বৃত্তাব্দ Cnidaria (প্রবাল, সী-অ্যানামোন) এর নিষ্ক্রিয় (Sedentary) রূপ, যারা একত্রে মিলে কলোনী (প্রবাল দ্বীপ) তৈরি করে।
- Purse-Seine** : পার্শ সেইনে। অগভীর পানিতে দৃঢ় সমুদ্রকারী মৎস্য বহুল পরিমাণে উঠার জন্য বৃহৎ ফিস গিয়ার। এগুলো এমন বৃত্তাকার জাল দিয়ে তৈরি যার মুখ বন্ধ করা যায়। মাছের চতুর্দিকে বেড় দিয়ে খালের মত আবদ্ধ করে একটি Power pulley দিয়ে টুলারে তোলা হয়।
- Quartz** : কোয়ার্টজ। খনিজ, সিলিকনের অক্সাইড, বহু আগ্নেয় শিলা, পালল এবং মেটামরফিক শিলার অঙ্গীভূত দ্রব্য। বালি ও কাকরের প্রধান অংশ।

R

- Roaring forties** : গর্জনশীল চল্লিশ। দক্ষিণ সাগরের ৪০° ও ৫০° অক্ষাংশে অবস্থিত এলাকায় ঝঞ্ঝাবিষ্ফুর্ত অংশ যেখানে পশ্চিমা শক্তিশালী বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, কোনো ভূখণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত হয় না বলে।
- Reef** : শিরা। জলাশয়ের বুকে পার্থক্য বা পাথরের মত কঠিন পদার্থের প্রাচীর যা সাধারণত জোয়ারের সময়ে ডুবে থাকে এবং ভাঁটায় মাথা তোলে। জলের মুক্ত তলের ও ফ্যাদম গভীরের ভিতরে যে কোনো কঠিন পদার্থের অস্তিত্ব যা জাহাজের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে তাকেই 'শিরা' বলার রীতি আছে। নিছক পাথরের শিরা সব সমুদ্রে, হ্রদে হতে পারে। বালি জমে গিয়েও শিরা তৈরি হয়। সমুদ্রের উদ্ভিদ ও প্রাণী নিঃসৃত ক্যালসিয়াম কার্বনেট থেকে তিলে তিলে গড়ে উঠতে পারে জৈব-শিরা। এরা উষ্ণজলের সমুদ্রে সুলভ। প্রবালদ্বীপ বা প্রবাল শিরা এভাবেই গড়ে উঠে। চার রকমের শিরা বর্তমানঃ সীমান্ত বা প্রাপ্ত শিরা (bringing reef), প্রাচীর শিরা (barrier reef), বলয় শিরা (atoll), প্রশস্তশিরা table reef)।

S

- Seabirds** : সমুদ্র বিহঙ্গ। সমুদ্রে বসবাসকারী এবং সমুদ্র থেকে খাদ্য আহরণকারী পাখি বিশেষ।
- Seamount** : সমুদ্রচূড়া। সমুদ্রতল থেকে উথিত নিঃসঙ্গ উচ্চভূমি। সাধারণত ১ কিলোমিটারের বেশি উঁচু এবং কৌণিক আকারের হয়ে থাকে।
- Seaweed** : সমুদ্র শৈবাল। সামুদ্রিক আগাছা, ১০০০ ধরনের আছে।
- Seine net** : সেইনে জাল বিরাট আকারের মাছ ধরার জাল যা ঘেরাও করে মাছকে ধরা হয়।
- Sea level** : সমুদ্র তল। সমুদ্রতল বা গড় সমুদ্রতল বলতে বোঝায়। সমুদ্রের মুক্ত তলের গড় উচ্চতা, অবশ্যই নিস্তরঙ্গ অবস্থায়। যেহেতু সমুদ্রের বুকে সবচেয়ে বড় ঢেউগুলো সাধারণত জোয়ারেরই ঢেউ হয়ে থাকে, অতএব দীর্ঘকালীন জোয়ার-ভাটার পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। এতে দেখা যায় সময়ের সঙ্গে সমুদ্রতলের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়ে থাকে বিক্ষিপ্তভাবে। কোথাও সমুদ্রতল উপরে উঠে (মেরু বরফের গলনের দরুন) আবার কোথাও জমি উপরে উঠে ক্ষুদ্রতলের তুলনায়। এর কারণ হিসাবে বলা যায়, ভূতপূর্ব তুষার যুগের সঞ্চিত বরফের চাপ থেকে এসব দেশ ক্রমশ মুক্তি পাবার ফলে পৃথিবীর গভীর স্তরের তরলে ভাসমান দেশগুলো হাঙ্কা হয়ে উপরে উঠছে।

Sedimentary rock : বালি পাথর/পাললিক শিলা। সমুদ্রের তলায় থিতুয়ে পড়া বালি, কাদা, পাথরের টুকরো, ইত্যাদির স্তর যথেষ্ট পুরু হবার পর অপেক্ষাকৃত নিচের স্তর পানির স্পর্শ হারায় এবং উপরের স্তরের দীর্ঘকালীন চাপে পাথরে পরিণত হয়। হ্রদ কিংবা নদীতেও এরূপ ঘটে থাকে। বেলে পাথর (sandstone), কাদাপাথর (shale), চুনাপাথর (limestone), নুড়িখচিত পাথর (conglomerate) ইত্যাদি। পলি পাথরের নানা দৃষ্টান্ত। কয়লাও পলি-পাথর, তবে এর উৎস জৈব।

Silt : পলি। অধঃক্ষেপ যা সাধারণত নদী, সমুদ্র এবং হ্রদের নিচে জমা হয়। বালি-কণিকার ব্যাস ০.০২—০.০০২ মিলিমিটার হয়। অর্থাৎ বালির চেয়ে সূক্ষ্ম, কিন্তু কাদার (clay) চেয়ে বড়।

Strait : প্রণালী। সমুদ্রের একটি সংকীর্ণ অংশ দুটি বিস্তীর্ণ সাগর বা জলাশয়কে যা সংযুক্ত করে। দু'টি নিকটবর্তী ভূমি ভাগের(দেশের) মধ্য দিয়ে প্রণালীর জল প্রবাহিত হয়। বাংলায় 'প্রণালী' শব্দটি ইংরেজি Strait এবং Channel দু'টি শব্দেরই প্রতিশব্দ হিসাবে গণ্য। Strait সংকীর্ণতার অর্থে, প্রণালী প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট। কৃত্রিমভাবে তৈরি প্রণালীকে 'খাল' (canal) বলে।

Subduction zone : অবনমিত অঞ্চল। একটি প্লেটের ধাক্কায় অপর প্লেটের নিচে যখন চলে যায় তখন ঐ অঞ্চলটিকে অবনমিত অঞ্চল বলে। নিচে চলে যাওয়া প্লেটটি উপরস্থ মেটনে পুনঃশোষিত (absorbed) হয়ে থাকে। এটি গভীর সামুদ্রিক গহ্বরের (deep-sea trench) সঙ্গে মিলে যায়।

Swim bladder : সাঁতার থলে। গ্যাস ভর্তি সূক্ষ্ম দেয়াল বিশিষ্ট থলে যা অনেক হাড়ওয়ালা মাছের থাকে এবং ভেসে থাকার ক্ষমতা অর্জন করে।

T

Tectonics : শিলা গঠন বিদ্যা, ভূগঠন প্রণালী, ভূগঠন প্রক্রিয়া, ভূগঠন বিদ্যা। ভূপৃষ্ঠের বিরাট বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোচনা এবং তাদের অভ্যুদয় কাহিনী।

Thermocline : তাপনতিস্তর। সমুদ্রের বা হ্রদের জলের যে স্তরে তাপমাত্রা গভীরতার সঙ্গে অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তিত হয় সেই স্তরকে তাপনতি স্তর বলা হয়। নতি (gradient)= পরিবর্তনের হার। এই স্তরের উপরের জল উষ্ণতর এবং নিচের জল যথেষ্ট ঠাণ্ডা। সমুদ্রে সাধারণত দুটি তাপনতি স্তর থাকে। অল্প গভীরে একটি পরিবর্তনশীল স্তর এবং অপেক্ষাকৃত গভীরে একটি অপরিবর্তনীয় তাপনতি স্তর। বিষুবরেখা বরাবর এই স্থায়ী তাপনতি স্তর অল্প গভীরেই অবস্থান করে, ২৫°—৩৫° অক্ষরেখার ভিতরে এর অস্তিত্ব সবচেয়ে বেশি গভীরে হয় এবং ৫৫° থেকে ৬০° অক্ষরেখায় একেবারে মুক্ত তলে চলে আসে। উপরে উষ্ণতর স্তর এবং নিচে শীতল স্তর, দুটি স্তরই চলমান সব সময়ে। সুতরাং, মিশ্রণের ফলে উষ্ণতার বৈষম্য ঘুচে যাবার তেমন সুযোগ হয় না। তবে উপেক্ষিত দুই স্তরের সংযোগ ভাল বরাবর যেখানে তাপ বিনিময় কিছুটা ঘটে, যেখানে স্থায়ী তাপনতি স্তর গড়ে উঠে। এখানে তাই গভীরতার সঙ্গে উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটে অত্যন্ত দ্রুতহারে।

Trade winds : স্থির বায়ু বা বাণিজ্য বায়ু। উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের উচ্চ চাপ বলয় (অশ্বাচ্চ বলয়) থেকে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় অভিমুখী পৃথিবী তলস্পর্শী বাতাস। (উর্ধ্বস্তরে এর বিপরীতমুখী বাতাস লক্ষণীয়; এর নাম 'স্থিরপথ প্রতিবায়ু'। উত্তর গোলার্ধে এই বাতাস উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে আসে। এই বাতাস প্রধানত শুষ্ক;

বিশেষত নিরক্ষ-অঞ্চল থেকে দূরবর্তী জায়গায়।

এ বাতাসের স্রোত মূলত সম্পূর্ণ স্রোত বৃত্তের অংশ। নিরক্ষ অঞ্চলে দুই গোলাধের 'স্থিরপথ বায়ু' উর্ধ্বস্তরে ওঠে এবং স্থিরপথ প্রতিবায়ু হিসাবে দুই গোলাধে দু'অভিমুখে ধাবিত হয়। উর্ধ্বস্তরে এই বাতাস ওঠার দরুন ঠাণ্ডা হয় এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি হয়। এই অঞ্চলে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় বাতাসের উর্ধ্বগামিতার দরুন। উর্ধ্বস্তরের ঐ প্রতিবায়ু দুই গোলাধের দুই অক্ষীয় বরাবর নিচে নামে। দুইটি অঞ্চলকে উচ্চচাপের অঞ্চল বলা হয়। পানিশূন্যতার কারণে এ বাতাস অত্যন্ত শুষ্ক হয় এবং যে অঞ্চলে পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করে, সে সব অঞ্চলে মরুভূমির জন্ম হয়। এ বাতাস তখন নিরক্ষ অঞ্চলগামী বাতাস এবং 'স্থিরপথ বায়ু' নামে পরিচিত হয়। পুরোনো সামুদ্রিক পরিভাষায় 'to blow trade' এর অর্থ অপরিবর্তনশীল পথে প্রসারিত হওয়া। বস্তুত, এ বৈশিষ্ট্যের জন্যই ঐ নামকরণ।

Trawl fishing : ট্রল-ফিসিং। তারে পেচিয়ে মধ্য পানিতে বা সমুদ্রের তলদেশ ধরে যে জাল টেনে মাছ ধরা হয়।

Trench/Trough : গহ্বর। সমুদ্রের তলদেশের অতি গভীর ও দীর্ঘায়িত পরিখা যা সাধারণত সমুদ্রের সচল তলদেশের জন্য পৃথিবীর গভীরে প্রবেশের পথ। এই 'গহ্বর' সাধারণত মধ্য সমুদ্রের কাছে দেখা যায় না; সমুদ্রের প্রান্তে বা সীমানার কাছে অবস্থান করে।

Tsunami : সুনামি। বিরাট দৈর্ঘ্যে ও উচ্চ গতিবেগের সমুদ্রের ঢেউকে জাপানি ভাষায় সুনামি বলে। সমুদ্রতলে ভূমিকম্পের দরুন সৃষ্টি হয়।

Turbidity Currents : ঘোলাস্রোত/ঘনস্রোত অবক্ষেপ। সমুদ্রের তলদেশে হিমবাহ বা ভূষার ধসের (avalanche) এর দরুন ভূ-পৃষ্ঠে যে কম্পন বা শিহরণ উঠে অথবা মাধ্যাকর্ষণ জনিত অবক্ষেপের অস্থিতিশীলতা বা মহীঢালে গভীর গর্তের সৃষ্টি করে এবং দূর গভীর সমুদ্রে বিপুল পরিমাণের পলল নিয়ে যায়।

U

Upwelling : জলক্ষীতি, পানির উর্ধ্ববাহিতা। সমুদ্রপৃষ্ঠের দিকে শীতল, পুষ্টির সমৃদ্ধ পানির প্রবাহ।

Z

Zooplankton : জুপ্ল্যাঙ্কটন। সমুদ্রের ক্ষুদ্র সঞ্চরণশীল (drifting) বৃহৎ জীব বা প্রাণীর শূককীট। সাতার কাটার সময় ডিম ছেড়ে দেয়।

পরিশিষ্ট-২

সমুদ্র বিজ্ঞানে ব্যবহৃত এককসমূহ (ভৌত সমুদ্র বিজ্ঞানে)

গতিবেগ : ১মি/সেকেন্ড = ১০০ সেঃ মিঃ/সেকেন্ড.

১ Knot (Kn) (নট) = ৫১ সেঃ মিঃ/সেকেন্ড = ১.৮৫ কিঃ মিঃ/ঘণ্টা।

ঘনত্ব (ρ) : ১ কিঃ গ্রাঃ/মিটার^৩ = ১০^{-৩} গ্রাম/সেঃমিঃ^৩

বল : ১ নিউটন N = ১ কেজি ভরকে ১ মিটার/সেকেন্ড^২ ত্বরন করতে যে শক্তি প্রয়োগ করতে হয় এটিই ১ নিউটন।

চাপ (P) : ১ পাশকাল Pa = ১ N/মিটার^২

বিদ্যুৎ শক্তি : ১ জুল J = ১ N. মিটার

শক্তি : ১ ওয়াট W = ১ J/সেকেন্ড

ভলুম ট্রান্সপোর্ট ১ Sverdrup Sv = ১০^৬ মিটার^৩/সেকেন্ড

ঘনত্ব (সমুদ্র পানি) (ρ)-এটি লবণাক্ততার একটি কাজ, সেই সাথে তাপমাত্রা ও চাপের উপরও

নির্ভরশীল, অর্থাৎ $\rho = \rho_{S,T,P}$

সমুদ্রের পানির গড় লবণাক্ততা (S) = ৩৫%

সমুদ্রের পানির গড় তাপমাত্রা (T) = ১০.০০°C

সমুদ্রের পানির গড় চাপ (P) = ১০১.৩২৫ KP_a

ঘনত্বের একক হচ্ছে কিলোগ্রাম/মিটার^৩

সিগমা-t (σ_t): গড় $\sigma_t = ২৬.৯৭$ (কোনো একক নেই)

নির্দিষ্ট আয়তন ($\alpha = 1/P$) একক = ১ মিঃ^৩/কিঃ গ্রাম। = ১০^{-৩} সেঃ মিঃ^৩/গ্রাম

উপরিউক্ত লবণাক্ততার জন্যে $\alpha_{৩৫,১০,০} = ০.৯৭৩৭৪ \times ১০^{-৩}$ মিঃ^৩/কিঃ গ্রাম।

$\alpha_{৩৫,০,০} = ০.৯৭২৬৪ \times ১০^{-৩}$ মিঃ^৩/কিঃ গ্রাম।

Specific volume anomaly (δ) : SI ইউনিট হচ্ছে মিটার^৩/কিঃ গ্রাম।

Mixed একক হচ্ছে সেঃ মিঃ/গ্রাম।

থার্মোক্সিটি অসঙ্গতি (δ_t) = $[১০০০ / \rho - ০.৯৭২৬৪] \times ১০^{-৩}$ মিঃ^৩/কিঃ গ্রাম।

= ১০৯.৮৩ $\times ১০^{-৮}$ মিঃ^৩/কিঃ গ্রাম।

Mixed Unit এ হবে = ১০৯.৮৩ $\times ১০^{-৫}$ সেঃ সেঃ মিঃ^৩/গ্রাম

অর্থাৎ ১০৯.৮৩ সেন্টিলিটার/টন (cL/t)

১ cL/t = ১০^{-৮} মিটার^৩/কিলোগ্রাম।

কোনো কোনো সময় δ_t এর বদলে Δ_T বা $\Delta_{S,T}$ ব্যবহৃত হয়।

চাপ—সমুদ্র বিজ্ঞানে SI একক হচ্ছে ১kPa = ১০^৩ Pa.



আগে ছিল ১ বার (প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান)

১ ডেসিবার (db) = ১ মিটার সমুদ্রের গভীরতায় চাপ।

এগুলো SI এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

খোলা সমুদ্রে ১০০০ মিটার গভীরতায় চাপ হচ্ছে

১০,১০০ kPa (= ১০১০db)।

প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ = ১০১.৩২৫ kPa

= ১০১৩.২৫ mb

= ৭৬০ m.m. পারদ।

তাপ শক্তি (Heat energy) (SI) = ১ জুল (J) = ০.২৩৯ ক্যালরি

১ ক্যালরি = ৪.১৮৫ জুল

তাপ প্রবাহ (heat flow) (SI) = ১ ওয়াট (W) = ১ J/সেকেন্ড

তাপ প্রবাহ ঘনত্ব (SI) = ১ W/m² [= ২.৩৯ × ১০^{-৫} Cal/ (Sec. cm²)]

মিক্সড সিস্টেমে ১ Langley (Ly) = ১ cal/cm²

রেডিয়েশান তাপপ্রবাহ = ১ Ly/min = ৬৯৮ W/m² বা

১ Ly/d = ০.৪৮৪ W/m²।

সুগুতাপ (latent heat) SI ইউনিটে J/kg বা KJ/kg.

১ Cal/g = ৪.১৮৫ KJ/Kg

বিশুদ্ধ পানির গলনের জন্য সুগুতাপ লাগে ৮০ cal/g = ৩৩৫ KJ/kg.

বাপ্পীভবনের সুগুতাপ ১০°C তে = ৫৯১ cal/g

= ২.৪৭ × ১০^৩ kJ/kg.

বৈদ্যুতিক শক্তি (SI) = ১ KW = ১.৩৪ h.p.

বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা (SI) = ১ siemens/m (S/m)

১ mho/m = ০.০১ mho/cm.

দ্রবীভূত অক্সিজেন = ১ mL/L (= ১.৪৩ mg/L = ০.০৮৯ mg at/L)



web

4